Sahitya Akademi 1960

সাহিত্য অকাদেমী

রবীন্দ্র-ভবন, ফিরোজ শাহ্ রোড, নিউ দিল্লী ১

রবীন্দ্র-সরোবর স্টেডিয়াম, ব্লক ৫ বি, কলিকাতা ২৯

৩৪ ক্যাথিড্রেল গার্ডেন রোড, মাদ্রাজ ৩৪

মুদ্রাকর

শ্রীরণজিত কুমার দত্ত, নবশক্তি প্রেস,

১২৩, আচার্য জগদীশ বোস রোড,

কলিকাতা ১৪

গ্রন্থটি ইউনেস্কোর সহায়তায় প্রকাশ করা হইল। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক মূল্য-বোধের পারস্পরিক সপ্রশংস-গ্রহণেচ্ছা পরিবর্ধনের জন্য ইউনেস্কোর যে-সুবৃহৎ পরিকল্পনা আছে এই গ্রন্থ প্রকাশ তাহারই অন্তর্গত।

ভূমিকা

জনাথান সুইফটের জন্ম ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে, আয়ার্ল্যাণ্ডের ডাবলিন সহরে। তাঁর জন্মের আগেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছিল। কাকা গডউইন সুইফটের অভিভাবকত্বে কিলকেনিতে স্কুলে ও ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজে তিনি পড়াশুনা করেন।

১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে স্যার উইলিয়াম টেম্পলের সেক্রেটারির পদ গ্রহণ করে বছর খানেক সুইফট ঐ পদেই বহাল থাকেন। মাঝে ধর্ম যাজকত্বের পরীক্ষা পাশ করে কিছুকাল পাদ্রীর কাজও করেন। টেম্পলের বাড়িতে থাকাকালে বিস্তর পড়াশুনা ও বহু জ্ঞানীগুণীর সাক্ষাৎ পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটে এবং রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে সুইফটের একটা সুস্পষ্ট ধারণাও জন্মায়। ঐ বাড়িতেই তিনি এস্থার জন্‌সনের গৃহশিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। পরে ঐ কন্যার উদ্দেশেই তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Journal to Stella রচিত হয়েছিল। এস্থারই ছিল ষ্টেলা।

টেম্পল ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে মারা যান। তারপর সুইফট আর্ল অফ বার্কলির গৃহে পাদ্রীর পদে নিযুক্ত হন এবং নানান স্থানে পাদ্রীর কাজ করেন। এই অবসরে তিনি Doctor of Divinity উপাধিও লাভ করেন।

এদিকে এস্থার জন্‌সনের সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব, লোকে নানা কথা বলে, কিন্তু সুইফটের বিবাহে মন নেই। বয়সের অনেক ব্যবধান, তাঁর স্বাস্থ্যও ভালো নয়, মাথা ঘোরে, থেকে থেকে কানে শোনেন না, স্নায়ুর দুর্বলতা অনুভব করেন।

১৭০১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭০৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অনেকবার লণ্ডন গিয়েছিলেন ও বিখ্যাত লেখক অ্যাডিসন, পোপ, ষ্টিলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল। ১৭০৭ থেকে কার্যব্যপদেশে লণ্ডনে বাস করেছিলেন ও কাব্য-রচনা এবং নানান বিতর্কে যোগদান করে ব্যঙ্গরস রচয়িতা বলে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

১৬০৯ খৃষ্টাব্দে আয়ার্ল্যাণ্ডে ফিরে, পরের বছর সুইফট পুনরায় লণ্ডনে গিয়ে রাজনীতিতে যোগদান করেন ও টোরিদের পক্ষ অবলম্বন করে অনেক প্রবন্ধ রচনা করেন। কিন্তু প্রভূত খ্যাতি-লাভ ও যোগ্যতা সত্ত্বেও চার্চের ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি লাভ হল না।

১৭১৩ খৃষ্টাব্দে সুইফট ডাবলিনে ডীন অফ সেণ্ট প্যাট্রিক পদে নিযুক্ত হলেন। এদিকে রাণী অ্যানের মৃত্যুর সঙ্গে টোরিদের পরাজয় হল ও সুইফটের ক্ষমতাও হ্রাস পেল। আর তাঁর প্রিয় ইংল্যাণ্ডে এসে বাস করা হল না, অথচ জন্মভূমি আয়ার্ল্যাণ্ডেও মন বসে না।

ইংল্যাণ্ডে এস্থার ভ্যানম্রি বলে আরেকজন তরুণীর সঙ্গেও সুইফটের গভীর বন্ধুত্ব হয়েছিল। তাঁর উদ্দেশেও অনেক পত্র ও কাব্য রচনা করেছিলেন; সুইফট তাঁর নাম দিয়েছিলেন ভ্যানেসা। ভ্যানেসা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, দেশ ছেড়ে ডাবলিনের কাছে বাস করতে লাগলেন। সেখানে স্টেলাও ছিলেন, কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত কেউ কারো কথা জানতেন না।

কেউ কেউ বলেন স্টেলাকে তিনি গোপনে বিবাহ করেছিলেন, তবে তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি। ভ্যানেসার মৃত্যু হয় ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে, স্টেলার ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে।

সুইফটের শেষ জীবন কাটে নিজের দেশের সেবায়. দেশের লোক তাঁকে যেমন শ্রদ্ধা-ভক্তি করত, তেমনি ভালোও বাসত। যেমন তীক্ষ্ণ তাঁর শ্লেষ রচনা, তেমনি উদার তাঁর স্বদেশের উন্নতিসাধনের চেষ্টা।

'গালিভারের ভ্রমণবৃত্তান্ত' লেখা হয় সম্ভবত: ১৭২১ থেকে ১৭২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। ১৭২৬ সালে তিনি ইংল্যাণ্ডে গিয়ে প্রকাশনের ব্যবস্থা করে আসেন। বেরোবামাত্র বইখানি জনসাধারণের সাদর অভ্যর্থনা পায়। একমাত্র এই বইখানি থেকে লেখকের কিঞ্চিৎ আর্থিক লাভ হয়েছিল, তাও মাত্র দুই শত পাউণ্ড। তবে সাহিত্য-জগতে চিরকালের মতো প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেলেন।

ভ্যানেসা ও ষ্টেলার মৃত্যুর পর কয়েক বছর সুইফট স্বাভাবিক জীবন যাপন করেছিলেন, পড়াশুনা, শ্লেষ, ব্যঙ্গ, প্রবন্ধ ও কাব্য রচনা, বন্ধু বান্ধবদের পত্র লেখা, তাঁদের বাড়িতে যাওয়া আসা। দুঃখের বিষয় শারীরিক অসুস্থতার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে মনে তিক্ততা এসে গেল, খিটখিটে হয়ে উঠলেন, সর্বদাই বিষণ্ণ, মাঝে মাঝে অতিশয় রাগারাগি। তার উপর সদাই উন্মাদ হয়ে যাবার ভয়; একেবারে শেষের দিকে হলেনও তাই। ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু এসে তাঁকে শান্তি দিল।

'গালিভারের ভ্রমণবৃত্তান্ত' কাহিনী হিসাবে অতুলনীয়; শৈশবসুলভ

কল্পনার স্বচ্ছতার সঙ্গে পরিণত বুদ্ধির এমন অপূর্ব সমাবেশ কম দেখা যায়। ভাষার দিক থেকেও এই রচনার উৎকর্ষ অবিসংবাদিত। এমন প্রাঞ্জল ও সাবলীল গদ্য গল্পের রস জমাবার পক্ষে অদ্বিতীয়। এ ভাষা এলিজাবেথীয় যুগের বিলাসিতার বাড়াবাড়ি কাটিয়ে উঠেছে, অথচ জনসনীয় যুগের পণ্ডিতম্মন্যতার বেড়াজালে জড়ায়নি। এমন কাহিনীর পক্ষে এর চেয়ে যোগ্যতর ভাষা ভাবা যায় না।

'গালিভারের ভ্রমণবৃত্তান্তে'র অনেক মাধুর্যই হল তার কপট গম্ভীর প্রকাশভঙ্গীতে এবং অভাবনীয় পরিস্থিতিতে বাস্তবধর্মী নায়কের প্রতিক্রিয়ায়। অভূতপূর্ব ঘটনাগুলিকে তাদের ছোট ছোট খুঁটিনাটি সহ এমন নিরাসক্তভাবে সংযত ও স্পষ্ট ভাষায় বিবৃত করা হয়েছে যে বিস্ময়ে অভিভূত পাঠক গালিভারের লোমহর্ষক অভিজ্ঞতার সঙ্গের সাথী হয়ে ওঠেন।

মনে হয় গল্পের চারিটি খণ্ডের মধ্যে লিলিপুট কাহিনী সবচেয়ে কাব্যময় এবং ব্রবডিংনাগের ব্যাপার সবচেয়ে উদ্ভট। লাপুটার বিবরণী তেমন ভালো উৎরোয় নি, কিন্তু তার মধ্যেকার ভবিষ্যদ্বানীর ইঙ্গিত পাঠককে বিস্মিত না করে ছাড়ে না। হুইন্‌হ্ম্‌দের দেশের কাহিনীতে যেরকম উগ্র ও তিক্ত শ্লেষ পাওয়া যায়, তার জুড়ি মেলা ভার।

কিন্তু কাহিনীর উৎকৃষ্টতায় তার শ্লেষের দিকটি একেবারে চাপা পড়ে গিয়েছে। কি ছেলে কি বুড়ো, সবাই গল্পের জন্যে এ বই পড়ে; শ্লেষের তারা ধার ধারে না। কিন্তু এ কথাও মানতে হবে যে সে সময়কার ইংল্যাণ্ডের রাজনীতির এমন কটু সমালোচনা কেউ বড় একটা করে নি, তবু স্রষ্টিকারের কাছে সমালোচক পরাজিত।

গল্পের শেষটুকু বড় কটু; কিন্তু হুইন্‌হ্ম্‌দের গল্প সমগ্র মানবসমাজের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণায় পরিপূর্ণ হলেও এমনি প্রাণশক্তিতে বলিষ্ঠ এই কাহিনী, যে সেই বিদ্বেষকে জগতের সব শিল্পীদের মনে আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে যে-চিরন্তন দ্বন্দ্ব চলেছে, তারি একটি অভাবনীয় প্রকাশ বলে মনে করা যায়।

ভূমিকা ও মূল গ্রন্থের অনুবাদ কলিন্স সংস্করণের ভিত্তিতে রচিত।

সূচী

প্রথম খণ্ড

লিলিপুট ভ্রমণ

প্রথম অধ্যায়

লেখক কর্তৃক নিজের ও নিজের পরিবার সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বিবৃতি প্রদান—বিদেশ ভ্রমণ সম্পর্কে আগ্রহের স্ফুরণ—জাহাজডুবি ও প্রাণের দায়ে সন্তরণ—লিলিপুট রাজ্যের উপকূলে নিরাপদে আগমন—গ্রেপ্তার হওন ও ঐ দেশের অভ্যন্তরে আনয়ন।

নটিংহ্যামসেয়ারে আমার বাবার সামান্য কিছু জমিজমা ছিল, ছেলেও ছিল তাঁর পাঁচটি, তার মধ্যে আমি হলাম তৃতীয়। আমার বয়স যখন চোদ্দ বাবা আমাকে কেম্ব্রিজে ইম্যানুয়েল কলেজে পড়তে পাঠালেন। সেখানে আমি তিন বছর ছিলাম ও অভিনিবেশ সহকারে পড়াশুনা করেছিলাম, কিন্তু সেখানকার খরচ যৎসামান্য হলেও, বাবার পক্ষে কুলিয়ে ওঠা দায় হল। তখন মিঃ জেম্স বেট্স্ বলে লণ্ডনের একজন নামকরা অস্ত্রচিকিৎসকের কাছে শিক্ষানবিশির জন্য আমাকে বিধিমতে ভর্তি করে দেওয়া হল।

তাঁর কাছে চার বছর ছিলাম। বাবা মাঝে মাঝে সামান্য যা টাকা পাঠাতেন তাই দিয়ে নৌবাহবিজ্ঞান আর গণিতশাস্ত্রের যে অংশ নাবিকদের কাজে লাগে, সেই সমস্ত শিখবার ব্যবস্থা করেছিলাম। চিরকালই আমার মনে কেমন একটা বিশ্বাস ছিল যে একদিন না একদিন আমাকে সমুদ্রযাত্রা করতে হবে।

শিক্ষানবিশি শেষ করে গেলাম বাবার কাছে। তারপরে কতক তাঁর কাছ থেকে আর কতক আমার কাকা জন ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে মোট চল্লিশ পাউণ্ড নগদ জোগাড় করে আর বছরে ত্রিশ পাউণ্ডের প্রতিশ্রুতি নিয়ে, লেডেন্‌এ গিয়ে আরো পড়াশুনো করবার বন্দোবস্ত করে ফেললাম। পুরো দু বছর সাত মাস সেখানে পড়াশুনো করলাম, কারণ আমি জানতাম যে দূর সাগরে পাড়ি দিতে হলে এ সব বিদ্যা কাজে লাগবে।

লেডেন থেকে ফিরবার অল্পদিন পরেই, আমার শ্রদ্ধেয় গুরু মিঃ বেট্সের সুপারিশে 'সোয়ালো' জাহাজে ডাক্তারের পদ পেয়ে গেলাম, কমাণ্ডারের নাম ছিল ক্যাপ্টেন এব্রাহাম প্যানেল। ঐ জাহাজে ছিলাম সাড়ে তিন বছর, এই সময়ে ভূমধ্যসাগরের পুবদিকে নানান জায়গায় ঘুরেছিলাম।

ফিরে এসে ভেবেছিলাম লণ্ডনে ডাক্তার হয়ে বসব। আমার গুরু মিঃ বেট্‌স্‌ যথেষ্ট উৎসাহও দিয়েছিলেন, উপরন্তু অনেকগুলি রুগীর কাছে আমার হয়ে সুপারিশও করেছিলেন। ওল্ড জুরির দিকে ছোট একটা বাড়ির এক অংশ ভাড়া নিলাম ; এদিকে সকলেই পরামর্শ দিতে লাগলেন এবার সংসারী হও, তাই নিউগেট ষ্ট্রিটের মোজা ব্যবসায়ী মিঃ এডমণ্ড বার্টনের দ্বিতীয় কন্যা মেরিকে বিয়ে করলাম। যৌতুক পেলাম চার শো পাউণ্ড।

এর দু বছর পরেই আমার শ্রদ্ধেয় গুরু মিঃ বেট্‌স্‌ মারা গেলেন। বন্ধু-বান্ধবও তেমন ছিল না আমার ; ব্যবসা পড়ে যেতে লাগল। তার কারণ অন্য ডাক্তারদের মধ্যে অনেকেই যে সব অন্যায় আচরণ করতেন, সে সব করতে আমার আবার বিবেকে বাধত। শেষ পর্যন্ত আমার স্ত্রী আর বন্ধুবান্ধবদের কারো কারো সঙ্গে পরামর্শ করে, আবার সমুদ্রে যাওয়াই স্থির করলাম।

পর পর দুটো জাহাজের ডাক্তার হয়ে, ছ' বছর ধরে বহুবার পুব ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যাতায়াত করলাম, ঘরে কিছু অর্থাগমও হল। অবসর সময়টুকু সেকালের ও একালের শ্রেষ্ঠ লেখকদের বই পড়ে কাটাতাম ; আমার সঙ্গে সর্বদাই প্রচুর বই থাকত। জাহাজ কোথাও তীরে লাগলে, নেমে পড়ে সেই দেশের আচার-আচরণ লক্ষ্য করতাম, তাদের ভাষা শিখতাম ; স্মৃতি-শক্তিটা প্রখর হওয়াতে ভাষা শেখা আমার পক্ষে খুবই সহজ ছিল।

শেষবারের যাত্রাটা তেমন সুবিধার হল না, তাই সমুদ্রের উপর কেমন বিরক্তি ধরে গেল, স্থির করলাম স্ত্রীপুত্র-পরিবারের সঙ্গে দেশেই থেকে যাব। ওল্ড জুরির বাসা বদলে ফেটার লেনে গেলাম ; সেখান থেকে আবার গেলাম ওয়াপিংএ, ভাবলাম ওখানকার নাবিকদের মধ্যে যদি পসার জমাতে পারি। কিন্তু হল না কিছুই। তিন বছর ধরে, কবে অবস্থা ফিরবে এই আশায় থেকে, শেষটা 'অ্যাণ্টেলোপ' জাহাজের কর্তা ক্যাপ্টেন উইলিয়াম প্রিচার্ডের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলাম ; মনে হল এতে কিছু সুবিধা হতে পারে। ওঁরা যাচ্ছিলেন দক্ষিণ সাগরে। ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে আমরা বৃটেন থেকে যাত্রা করলাম ; যাত্রার গোড়ার দিকটা বেশ ভালোভাবেই কাটল।

নানান কারণে আমাদের দক্ষিণ সাগরের ভ্রমণকাহিনীর খুঁটিনাটি বলে পাঠককে বিরক্ত করতে চাই না। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যাবার পথে দারুণ ঝড়ের মুখে পড়ে আমরা একেবারে ভ্যান

ভিয়েমেন্স ল্যাণ্ডের উত্তর-পশ্চিমে গিয়ে উপস্থিত হলাম। হিসাব কষে দেখা গেল যেখানে পৌঁছেছি, সে জায়গাটা হল ৩০ ডিগ্রী ২ মিনিট দক্ষিণ অক্ষাংশে। ভালো করে খেতে না পেয়ে আর তার উপরে অতিরিক্ত খেটে, ততদিনে আমাদের নাবিকদের মধ্যে বারোজন মারাই গেছে, বাকি সবাইয়েরও অবস্থা সঙ্গীন।

নভেম্বর মাসের ৫ তারিখ—ও অঞ্চলে তখন সবে গ্রীষ্মের শুরু—চারদিকে কুয়াশা, এমন সময় নাবিকরা দেখলে জাহাজ থেকে তিন শো ফুট দূরে একটা বিশাল পাথর। বাতাসের তখন এমনি জোর যে জাহাজটা সোজা গিয়ে ঐ পাথরের উপর আছড়ে পড়ে, নিমেষের মধ্যে চুরমার হয়ে গেল।

তখন জাহাজের ছ' জন লোক কোনো মতে একটা নৌকা জলে নামিয়ে জাহাজ আর ঐ পাথরের কাছ থেকে দূরে যাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। আমি ছিলাম তাদের মধ্যে একজন। আমিই দিক্ নির্ণয় করে দিলাম, কিন্তু তিন লীগ, অর্থাৎ নয় মাইল দাঁড় বাইবার পর আর আমাদের শক্তিতে কুলোল না। জাহাজে থাকতেই খেটে খেটে শরীর আমাদের অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। কাজেই শেষ অবধি সমুদ্রের ঢেউএর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই উত্তর দিক থেকে প্রবল এক দমকা ঝোড়ো হাওয়া এসে নৌকো উল্টিয়ে দিল। যারা আমার সঙ্গে নৌকোয় ছিল, কিম্বা পাথরটার উপরে আশ্রয় নিয়েছিল, কিম্বা জাহাজেই থেকে গিয়েছিল, তাদের কার যে কি হল সে আমি ঠিক বলতে পারছি না; তবে কেউই বোধ হয় বাঁচে নি। আমি নিজে তো ভাগ্য যে দিকে নেয় সাঁতরে চললাম, পিছন থেকে ঝোড়ো হাওয়া আর সমুদ্রের স্রোত আমাকে ঠেলে নিয়ে চলল।

মাঝে মাঝে পা দুটোকে জলের মধ্যে ঝুলিয়ে দিচ্ছিলাম, কিন্তু তল আর পাই নে; শেষটা শরীরের সমস্ত শক্তি যখন ফুরিয়ে এসেছে, জলের সঙ্গে আর লড়াই করতে পারছি না, তখন পায়ের নিচে মাটি পেলাম। ঝড়ের বেগও তখন কমে গেছে। ওখানকার পাড়ের ঢাল বড় কম, মাইলখানেক হেঁটে তবে শুকনো ডাঙ্গা পেলাম। তখন রাত আটটা নাগাদ হবে। আরো আধ মাইল হেঁটেও বাড়িঘর কিম্বা কোনো অধিবাসীর চিহ্ন দেখলাম না; অবশ্যি এমনও হতে পারে যে শরীরটা এত কাহিল হয়ে পড়েছিল যে চোখে পড়েনি কিছুই।

বাস্তবিক ভারি ক্লান্ত লাগছিল; তার উপরে গরম হচ্ছিল খুব আর জাহাজ থেকে নামবার সময় আধ পাঁট ব্র্যাণ্ডি খেয়েছিলাম, সমস্ত মিলিয়ে দারুণ ঘুমও পাচ্ছিল। পায়ের নীচে নরম খাটো ঘাস, তারই উপরে শুয়ে এমন ঘুমিয়ে পড়লাম যে জীবনে আর কখনও সেরকম ঘুমিয়েছি বলে মনে হয় না। বোধ হয় নয় ঘণ্টারও বেশি ঘুমোলাম; যখন জাগলাম তখন ভোর হয়ে গেছে।

উঠতে চেষ্টা করলাম, দেখি নড়তে পারছি না। চিং হয়ে শুয়েছিলাম, টের পেলাম হাত পাগুলো শক্ত করে মাটির সঙ্গে আটকানো। মাথার চুল-গুলো ছিল লম্বা আর ঘন, সেগুলোও ঐ রকম মাটির সঙ্গে বাঁধা। আরও মনে হল যে বগল থেকে উরু অবধি আমার গায়ের উপর দিয়েও এপাশ থেকে ও পাশ পর্যন্ত অনেকগুলো সরু সরু সুতো বাঁধা।

পাশ ফেরা যাচ্ছে না, শুধু উপর দিকে চেয়ে থাকতে হচ্ছে; ওদিকে রোদের তেজ বাড়ছে, চোখে আলো পড়ে কষ্ট হচ্ছে। চারদিকে কেমন একটা গোলমালও শুনতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু যেভাবে শুয়েছিলাম তাতে, আকাশ ছাড়া আর কিছু দেখার জো ছিল না। তবে একটু বাদেই মনে হল আমার বাঁ পায়ের উপর দিয়ে একটা জ্যান্ত কিছু হাঁটছে। আস্তে আস্তে বুকের উপর দিয়ে এগিয়ে সেটা প্রায় আমার থুতনির কাছে পৌছল। যতটা পারা যায় চোখ নামিয়ে দেখি ছোট্ট একটা মানুষ, মাথায় ছ ইঞ্চিও হবে না; হাতে তার তীর ধনুক, পিঠে একটা তূণ। ততক্ষণে ঐ রকম আরও গোটা চল্লিশ জীব প্রথমটার পিছু নিয়েছে টের পেলাম। আমি তো দারুণ চমকে গিয়ে এমনি এক হুঙ্কার দিলাম যে ভয়ে তারা দে দৌড়! পরে শুনেছিলাম নাকি আমার গায়ের উপর থেকে লাফিয়ে মাটিতে নামতে গিয়ে ওদের মধ্যে কেউ কেউ বেশ জখম হয়েছিল।

সে যাই হোক, একটু বাদেই ওরা আবার ফিরে এল; একজন সাহস করে এতটা কাছে এগিয়ে এল যে আমার সমস্ত মুখটা দেখতে পায়। তারপরে ভারি বিস্ময়ের ভঙ্গী করে শূন্যে দুই চোখ আর দুই হাত তুলে তীক্ষ্ণ অথচ স্পষ্ট গলায় সে বললে—"হেকি না দেগুল!" বাকিরাও বারবার ঐ একই কথা বলতে লাগল, কিন্তু কথাটার মানে যে কি তখন কিছুই বুঝতে পারলাম না।

পাঠকমহাশয় নিশ্চয় বুঝতে পারছেন কি দারুণ অস্বস্তির মধ্যেই না

আমি এতক্ষণ শুয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত ছাড়া পাবার জন্যে হাঁচড়পাঁচড় করতে গিয়ে, কপালজোরে আমার বাঁ হাতের দড়িদড়া খুঁটিসুদ্ধ উপড়িয়ে এল। তারপর হাতটাকে মুখের কাছে আনতেই বুঝলাম কি উপায়ে আমাকে বাঁধা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা হ্যাঁচকা টান দিলাম যে খুব ব্যথা পেলাম বটে, কিন্তু বাঁ দিকের চুলগুলো যে দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল সেটাও খানিকটা ঢিলে হয়ে গেল, আর আমিও মাথাটাকে ইঞ্চি দুই এপাশ ওপাশ করতে পারলাম। কিন্তু খুদে প্রাণীগুলোকে ধরবার আগেই আবার তারা পালিয়ে গেল। তারপরে খুব তীক্ষ্ণ কণ্ঠে একটা চিৎকার শোনা গেল, সে চিৎকারটা থামলে পর কে যেন চেঁচিয়ে বলল, "টল্গো ফোনাক্!" আর সঙ্গে সঙ্গে একশো তীর এসে আমার বাঁ হাতে বিঁধল। মনে হল যেন একশো ছুঁচ ফুটল। তারপর ইউরোপে যে রকম বোমা ছোঁড়ে, সেই রকম করে ওরা শূন্যে তীর ছুঁড়ল; তার অনেকগুলোই হয় তো আমার গায়েও পড়েছিল, তবে আমি কিছুই টের পাই নি। কিন্তু কতকগুলো পড়ল মুখের উপরে, মুখটাকে তক্ষুণি হাত দিয়ে ঢাকতে হল।

তীরের বৃষ্টি থামলে পর ব্যথায় যন্ত্রণায় আমি গোঙাতে লাগলাম। কিন্তু আবার যেই বাঁধন ছিঁড়তে চেষ্টা করেছি অমনি তারাও আরো বড় এক ঝাঁক তীর ছুঁড়েছে! কেউ কেউ আবার আমার গায়ে তলোয়ারের খোঁচা দিতে চেষ্টা করছিল, ভাগ্যিস চামড়ার কুর্তা পরেছিলাম, সেটাকে ছ্যাঁদা করা ওদের কর্ম নয়।

খুদে মানুষগুলোর কথা আর কি বলব, মাপে সবাই যদি আমার সামনের ঐ লোকটার মতো হয়, তা হলে যত বড় সৈন্যদলই আসুক না কেন ওরা তাদের সঙ্গে যে আমি একাই পেরে উঠব, এরকম মনে করবার আমার যথেষ্ট কারণ ছিল।

কিন্তু ভাগ্যদেবী আমার জন্য অন্য ব্যবস্থা করেছিলেন। ওরা যখন দেখল আমি আর কিছুই বলছি না, ওরাও তীর ছোঁড়া বন্ধ করল। তবে যে রকম সব শব্দ কানে আসছিল তাই শুনে মনে হল ভিড় আরো বেড়েছে। ঘণ্টা-খানেক ধরে আমার ডান কান থেকে গজ চারেক দূরে একটা ঠোকাঠুকির শব্দ হচ্ছিল, যেন মজুর খাটছে। শেষটা দড়িদড়া খুঁটি নিয়ে যতটুকু সম্ভব মাথা ঘুরিয়ে দেখি কি না মাটি থেকে ফুট দেড়েক উঁচু একটা মঞ্চ তৈরী

হয়েছে। দু-তিনটে মই লাগিয়ে তার উপরে উঠে চারজন খুদে মানুষ দিব্যি দাঁড়াতে পারে। সম্ভ্রান্ত চেহারার একজন লোক তার উপর চড়ে আমাকে উদ্দেশ করে লম্বা এক বক্তৃতা শুরু করলেন, অবিশ্যি তার আমি এক বর্ণও বুঝলাম না। এর আগেই আমার একটা কথা বলা উচিত ছিল, বক্তৃতা আরম্ভ করবার আগে ঐ গণ্যমান্য লোকটি তিনবার চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, "ল্যাংগ্রো দেহুল সান।"—এই সমস্ত কথা আমাকে পরে আবার শুনিয়ে ওর মানে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

যাই হোক, ঐ রকম চেঁচিয়ে উঠবামাত্র জনা পঞ্চাশ লোক এগিয়ে এসে আমার মাথার বাঁ দিকের বাঁধন সব কেটে দিল, তাতে ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে বক্তার চেহারা আর অঙ্গভঙ্গী ভালো করে লক্ষ্য করবার স্থবিধা হল।

দেখে আধাবয়সী মনে হল, সঙ্গে আর যে তিনজন ছিল তাদের চেয়ে মাথায় খানিকটা উঁচু; ঐ তিনজনের একজন তো খাস চাকর, মুনিবের পোষাকের যে অংশটা মাটিতে লুটোচ্ছিল সেটাকে তুলে ধরে রেখেছে, এ লোকটা হয়তো আমার মাঝের আঙ্গুলের চেয়ে সামান্য একটু লম্বা হবে; অন্য দুজন ভদ্রলোকের দুপাশে দাঁড়িয়ে রইল, যেন দরকার হলেই ঠেকা দেবে।

ভদ্রলোকের হাবভাব বাস্তবিক বক্তারই উপযুক্ত। অনেকবার লক্ষ্য করলাম যেন আমাকে শাসাচ্ছেন, আবার কোনো সময়ে কিসের প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছেন, অনুগ্রহ প্রকাশ করছেন, দয়া দেখাচ্ছেন। আমিও সূর্যের দিকে বাঁ হাত আর দুচোখ তুলে যেন তাকেই সাক্ষী মানছি এইরকন একটা ভাব দেখিয়ে উত্তর দিলাম খুব কম কথায়, কিন্তু অত্যন্ত বিনীতভাবে।

এদিকে খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে, জাহাজ ছেড়ে আসবার আগেও অনেকক্ষণ কিছু খাই নি; বারবার মুখে আঙ্গুল দিয়ে ওদের বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে আমি কিছু খেতে চাই। তাতে হয়তো খানিকটা সৌজন্যের অভাব প্রকাশ পেল, কিন্তু কি করি, খিদের জ্বালা আর সইতে পারছিলাম না।

হুর্গো মহাশয়—পরে শুনেছিলাম ওদের দেশের খুব সম্মানিত লোকদের হুর্গো বলে—আমার অবস্থাটা বেশ বুঝতে পারলেন। মঞ্চ থেকে নেমে এসে হুকুম দিলেন যেন আমার পাশে অনেকগুলো মই লাগানো হয়। তারপর একশোরও বেশি লোক ঝুড়ি ঝুড়ি মাংস নিয়ে মই বেয়ে আমার মুখের কাছে

এগিয়ে আসতে লাগল। আমার কথা দেশের রাজা যেই শুনেছিলেন অমনি এই ব্যবস্থা করে পাঠিয়েছিলেন। টের পেলাম অনেক রকম প্রাণীর মাংস, কিন্তু খেয়ে বুঝলাম না কিসের। ভেড়ার মতো সব কাঁধ, ঠ্যাং, পিঠের টুকরো মনে হল, রান্নাও খাসা, কিন্তু মাপে সেগুলো চাতক পাখির ডানার চেয়েও ছোট। এক এক গ্রাসে ওগুলোর দু-তিনটে করে খেয়ে ফেললাম, সেই সঙ্গে তিনটে আস্ত পাঁউরুটিও মুখে পুরলাম, সেগুলো বন্দুকের গুলির চেয়েও ছোট। তারাও যত তাড়াতাড়ি পারে খাবার জোগাতে থাকল আর সেই সঙ্গে আমার দেহের ও খিদের বহর দেখে হাজার রকম ভাবে বিস্ময় প্রকাশ করতে লাগল।

এর পরে আমি ইসারায় জানালাম যে আমার তেষ্টা পেয়েছে। আমার খাওয়ার পরিমাণ দেখে ততক্ষণে ওরা আঁচ করে নিয়েছে যে খুব অল্পে আমার পোষাবে না। উদ্ভাবন শক্তির তো আর ওদের অভাব ছিল না, কাজেই দেখতে দেখতে কৌশল করে বিরাট একটা পিপে ঝুলিয়ে নিয়ে এল, ওর চেয়ে বড় পিপে ওদের দেশে আর হয় না। পিপেটাকে গড়িয়ে আমার হাতের কাছে এনে ঠুকে ঠুকে তার মুখটা খুলে দিল। এক চুমুকে দিলাম শেষ করে; কিন্তু সে আর এমন কি, ওতে আধ পাঁটও ছিল কি না সন্দেহ, স্বাদটা অনেকটা বার্গাণ্ডির মদের মতো, তবে তার চেয়েও ভালো। আবার ঐ রকম আরেকটা পিপে এনে দিল, সেও আমি ঐ ভাবে এক চুমুকে শেষ করে, আরো আনবার জন্য ইসারা করলাম। কিন্তু আর থাকলে তো আনবে!

আমার এই সব আশ্চর্য কীর্তিকলাপ দেখে ওরা আনন্দে কোলাহল করতে করতে আমার বুকের উপরে নাচ শুরু করে দিল আর বার বার বলতে লাগল, "হেকি না দেগুল!"

তারপরে আমাকে ইসারায় বলল পিপে দুটোকে ছুঁড়ে নিচে ফেলে দিতে; তার আগে অবিশ্যি নিচে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের "বোরাচ্ মি ভোলা," এই বলে চিৎকার করে সাবধান করে দেওয়া হল, যাতে তারা পথ থেকে সরে যায়। শেষটা পিপে দুটোকে যখন শূন্যে ছুঁড়ে দিলাম সবাই মিলে আবার "হেকি না দেগুল" বলে চ্যাঁচাতে লাগল। এখানে একটা কথা স্বীকার করতে হচ্ছে। ওরা যখন আমার গায়ের উপর দিয়ে চলাফেরা করছিল, তখন কতবার লোভ হচ্ছিল হাতের নাগালে যারা এসে যাচ্ছে তাদের মধ্যে থেকে গোড়ার দিকের

গোটা পঞ্চাশেককে ধরে মাটিতে আছড়ে ফেলি! কিন্তু তখুনি আবার মনে পড়ে গেল একটু আগেই ওদের হাতে কি নাকালটাই হতে হয়েছে, ইচ্ছে হলে হয়তো আমাকে ওরা তার চেয়েও বেশি জব্দ করতে পারে; তাছাড়া ওদের কাছে এক রকম কথাও দিয়েছি—এই যে আত্মসমর্পণ করেছি, আমার মতে তার মানেই তো তাই—কাজেই ওসব খেয়াল তৎক্ষণাৎ মন থেকে দূর করে দিতে হল। উপরন্তু আতিথ্য-গ্রহণেরও তো কতকগুলো বাধ্যবাধকতা থাকে, আমার মনে হল আমিও সেইরকম দায়িত্বে আবদ্ধ, বিশেষতঃ এরা যখন আমার জন্যে এত খরচ করে এমন এলাহি আয়োজন করেছে।

এই খুদে মানুষগুলোর নির্ভীক চালচলন দেখে মনে মনে আমার বিস্ময়ের সীমা ছিল না, কেমন দিব্যি আমার গায়ের উপর চড়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে, অথচ আমার একটা হাতের বাঁধন খোলা রয়েছে। ওদের চোখে আমি নিশ্চয় একটা বিশাল অতিকায় মানুষ, তবু আমাকে দেখে ভয়ে থরহরিকম্পমান হচ্ছে না, আশ্চর্য! আরো খানিকটা সময় কেটে গেল, তারপরে ওরা যখন দেখল যে খাবারের জন্য আর আমি হাঁকডাক করছি না, তখন স্বয়ং সম্রাটের কাছ থেকে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী এসে উপস্থিত হলেন। এই গণ্যমান্য ভদ্রলোকটি আমার ডান পাশ বেয়ে উঠে সোজা আমার মুখের কাছে হাজির হলেন। সঙ্গে আবার জন বারো অনুচর। প্রথমেই তিনি রাজার সীল-মোহর দেওয়া পরিচয়পত্রাদি বের করে আমার চোখের সামনে ধরলেন, তারপর একটুও রাগ না দেখিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে দশ মিনিট ধরে কথা বলে গেলেন। কথার মাঝে মাঝে অনেকবার হাত দিয়ে সামনের দিকে দেখাতে লাগলেন, পরে শুনেছিলাম ঐদিকেই আধ মাইল দূরে রাজধানী, সম্রাট ও তাঁর মন্ত্রিসভার নির্দেশ অনুসারে নাকি সেইখানে আমাকে নিয়ে যাওয়া হবে।

অল্প কথায় উত্তরও দিলাম কিন্তু তাতে কোনো লাভ হল না। খোলা হাতটা দিয়ে অন্য হাতটার দিকে ইঙ্গিত করলাম, অবিশ্যি পাছে রাজ-প্রতিনিধির কিম্বা তাঁর অনুচরদের গায়ে লেগে যায়, সেইজন্য সর্বদা তাঁদের মাথার কিঞ্চিৎ উপর দিয়ে হাত চালাতে হচ্ছিল। নিজের মাথার দিকে দেখলাম, শরীরের দিকে দেখলাম, যাতে ওঁরা বুঝতে পারেন যে আমি চাই আমায় বাঁধন খুলে দেওয়া হক। মনে হল উনি বেশ ভালো করেই আমার কথার মানে বুঝলেন, কারণ মাথা নেড়ে আপত্তি জানালেন আর হাত তুলে

ইসারা করলেন যেন আমাকে কয়েদীর মতো করে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। অবিশ্যি আকারে ইঙ্গিতে এও বোঝালেন যে আমাকে যথেষ্ট পানাহার দেওয়া হবে, ভালো ব্যবহার পাব।

ব্যাপার দেখে আরেকবার মনে হয়েছিল বাঁধনগুলো ছিঁড়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করা যাক। কিন্তু মুখে হাতে তীরের ক্ষতগুলো তখনো জ্বলছে, সেখানে ফোস্কা পড়ে গেছে, তার মধ্যে অনেকগুলো তীরের ফলা বিঁধেও রয়েছে; উপরন্তু শত্রুদের সংখ্যাও অনেক বেড়ে গেছে। কাজেই শেষ অবধি ইসারায় জানালাম আমাকে নিয়ে ওরা যা খুসি করতে পারে। তাই শুনে সৌজন্য প্রকাশ করে হুর্গো মহাশয় সদলবলে হাসিমুখে বিদায় নিলেন। খানিক বাদেই ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা চিৎকার উঠল "পেপ্‌লম সেলান", ঐ একই কথা ওরা অনেকবার করে চেঁচিয়ে বলতে লাগল। তারপরেই টের পেলাম আমার বাঁ দিকের দড়িগুলোকে এতটা ঢিলে করে দেওয়া হয়েছে যে অনায়াসে ডান পাশে ফিরে প্রস্রাব করে শরীরের অস্বস্তি দূর করা গেল। এত প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাব হল যে লোকগুলো তাই দেখে অবাক! অবিশ্যি আগে থেকেই আমার হাবভাবে আমার অভিপ্রায়টা আন্দাজ করে নিয়ে তারা নিজে থেকেই ডাইনে বাঁয়ে যেদিকে পারে সরে আত্মরক্ষা করেছিল; ঐ প্রবল স্রোতের যেমন শব্দ তেমনি বেগ!

এ ঘটনার আগেই ওরা আমার মুখে আর দুই হাতে কি একটা মলম লাগিয়ে দিয়েছিল, তার গন্ধটি বড় সুন্দর আর লাগাবার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তীরের সমস্ত জ্বালা জুড়িয়ে গেল। তার উপরে ওদের ঐ পুষ্টিকর খাবার খেয়ে শরীরের এতই আরাম হয়েছিল যে ঘুমে চোখ বুজে আসছিল। পরে ওরা বলেছিল আমি নাকি আট ঘণ্টা এক নাগাড়ে ঘুমিয়েছিলাম। অবিশ্যি তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই ছিল না, কারণ সম্রাটের হুকুমে মদের পিপেতে ঘুমের ওষুধ মেশানো হয়েছিল।

শুনলাম ডাঙায় উঠে যখন আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তখনি আমাকে দেখতে পেয়ে ওরা বিশেষ বার্তাবহ দিয়ে সম্রাটের কাছে খবর পাঠিয়েছিল। অমনি তিনিও মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে, যে ভাবে বলেছি ঐ ভাবে আমাকে বেঁধে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। তখন তো রাত ছিল আর আমিও ঘুমে অচেতন। কিন্তু তখনি আদেশ হয়েছিল যেন আমার জন্য যথেষ্ট খাবার

আর মদ পাঠানো হয় আর একটা যন্ত্রের ব্যবস্থা করা হয়, যাতে চাপিয়ে আমাকে রাজধানীতে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে।

অনেকেরই মনে হতে পারে যে প্রস্তাবটা অসমসাহসিক ও বিপজ্জনক আর এ কথাও আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি যে ঐ রকম অবস্থায় ইউরোপের শাসনকর্তাদের মধ্যে খুব কমই অনুরূপ আচরণ করতেন। আমার নিজের মতে এতে অনেকখানি বিচক্ষণতা আর ঔদার্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ খুদে মানুষগুলো যদি আমাকে ঘুমন্ত অবস্থাতেই তলোয়ার আর তীরের সাহায্যে মেরে ফেলবার চেষ্টা করত, একটুখানি জ্বালা করে উঠতেই নিশ্চয় আমি জেগে যেতাম আর হয়তো আমার এমনি রাগ হত আর গায়ে বল পেতাম যে বাঁধনের দড়িগুলো সব পটাপট ছিঁড়ে ফেলতাম। তারপরে ওরা আমার বিপক্ষে দাঁড়াতেও পারত না, আমার কাছ থেকে কোনো রকম ক্ষমা-ঘেন্নাও আশা করতে পারত না।

লোকগুলো গণিতশাস্ত্রে পণ্ডিত; ওদের সম্রাটও জ্ঞানসাধনার পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বিখ্যাত। তাঁরই প্রসাদে উৎসাহ পেয়ে যন্ত্রবিদ্যাতেও ওরা আশ্চর্যরকম পারদর্শী হয়ে উঠেছিল। রাজার অনেকগুলো চাকায় বসানো কল আছে তাতে করে বড় বড় গাছপালা ও ভারি ভারি জিনিস এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। রাজার যেসব যুদ্ধের জাহাজ আছে, তার কতকগুলো নয় ফুট পর্যন্ত লম্বা; যে বন থেকে কাঠ সংগ্রহ হয়, অনেক সময় রাজার আদেশে জাহাজও সেইখানেই তৈরী হয়, তারপর সেগুলোকে ঐ কলে বসিয়ে তিন চার শো গজ দূরে সমুদ্রে নিয়ে যাওয়া হয়।

এখন পাঁচশো ছুতোর মিস্ত্রী আর এঞ্জিনিয়ার লাগানো হল এত বড় একটা যন্ত্র তৈরী করে ফেলতে যেমন আগে আর কখনো হয় নি। কাঠ দিয়ে একটা কাঠামো তৈরী করা হল, মাটি থেকে তিন ইঞ্চি উঁচু, প্রায় সাত ফুট লম্বা আর চার ফুট চওড়া; বাইশটা চাকার উপর সেটা চলে। ঐ যে চিৎকার শুনেছিলাম তার কারণ হল যন্ত্রটা এতক্ষণে এসে পৌছোল; বেরিয়েছিল নাকি আমি পৌছবার চার ঘণ্টা পরেই।

মাটিতে যেমন শুয়েছিলাম, আমার শরীরের সঙ্গে সমান্তরালভাবে যন্ত্রটাকে এনে রাখা হল। এখন আসল সমস্যা হল কি করে আমাকে ওটার উপরে তোলা যায়। এই জন্য আমাকে ঘিরে এক ফুট উঁচু আশীটা ডাণ্ডা পোঁতা হল

আর আমার গলার, হাতের, গায়ের, পায়ের চারদিকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হল; ঐ ব্যাণ্ডেজের সঙ্গে আঁকড়া দিয়ে পার্শেল বাঁধা সুতোর মত মোটা আর খুব মজবুত সব দড়ি লাগানো হল। তারপরে ও দেশের সবচেয়ে পালোয়ান দেখে ন শো জন লোক মিলে ডাণ্ডার সঙ্গে আটকানো কপিকলের সাহায্যে দড়ি ধরে টানতে শুরু করল। এমনি করে আমাকে টেনে তুলে, যন্ত্রে চাপিয়ে, বেঁধে ফেলতে তিন ঘণ্টারও কম লাগল। অবিশ্যি এ সবই আমি পরে শুনেছিলাম, কারণ যতক্ষণ এত কাণ্ড করা হচ্ছে, মদে মেশানো ঘুমের ওষুধের দৌলতে আমি ততক্ষণ গভীর ঘুমে অচেতন! গাড়ি করে আমাকে টেনে আধ মাইল দূরে রাজধানীতে যেতে, সম্রাটের সব চেয়ে বড় ঘোড়াগুলোর মধ্যে থেকে বেছে পনেরোশোটাকে জুততে হয়েছিল।

আমাদের যাত্রা শুরু হবার চার ঘণ্টা বাদে দৈবাৎ একটা মজার ঘটনার ফলে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। কলকব্জার কি একটা যেন বিগড়েছিল, সেটাকে ঠিক করবার জন্য গাড়ি একটু থেমেছে, এমন সময় তরুণ অধিবাসীদের মধ্যে দুচারজনের ভারি কৌতূহল হল যে ঘুমোলে আমাকে কেমন লাগে তাই একবার দেখতে হবে। যন্ত্রটার উপরে চড়ে, আস্তে আস্তে তারা আমার মুখের কাছে এল। ওদের মধ্যে একজন রক্ষীবাহিনীর কর্মচারী ছিল। সে করল কি, তার বেঁটে বল্লমটার অনেকখানি আমার নাকের বাঁ দিকের ফুটোর মধ্যে দিল ঢুকিয়ে। খড় ঢোকানোর মতো সুড়সুড়ি লাগল আর আমিও দারুণ এক হাঁচি দিলাম। তারা গুটিগুটি সরে পড়ল, অন্যরা কেউ টেরও পেল না; অমন হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গার আসল কারণটা আমি নিজেও জেনেছিলাম তিন সপ্তাহ পরে।

সারা দিন ধরে চলল আমাদের লম্বা সফর। রাত্রে বিশ্রাম করলাম দু পাশে পাঁচশো করে পাহারাদার নিয়ে তাদের অর্ধেকের হাতে মশাল, অর্ধেকের তীরধনুক। সকালে আবার যাত্রা শুরু হল; নগরদ্বারের দুশো গজের মধ্যে যখন পৌছলাম তখন বেলা প্রায় বারোটা। স্বয়ং সম্রাট তাঁর সভাসদ্দের নিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে এলেন। অবিশ্যি তাঁর শ্রেষ্ঠ কর্মচারীরা কিছুতেই তাঁকে আমার গায়ের উপরে চড়ে ব্যক্তিগতভাবে বিপদের সম্মুখীন হতে দেন নি।

গাড়ি যেখানে থেমেছিল তারই পাশে একটা প্রাচীন মন্দির, দেশের মধ্যে সবচেয়ে বিশাল মন্দির বলে তার খ্যাতি। কয়েক বছর আগে ওখানে একটা

অস্বাভাবিক ধরণের খুন হওয়াতে, ওদের ধর্মমতে মন্দিরটাকে অপবিত্র বলে মনে করা হত। এখন আর ওখানে কোনো ধর্মানুষ্ঠান হয় না, জনসাধারণের নানান কাজে ওটাকে লাগানো হয়। মন্দিরের সমস্ত সাজসজ্জা আসবাবও বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

স্থির হল এই অট্টালিকাতেই আমাকে রাখা হবে। উত্তরমুখী বিশাল ফটকটা উঁচুতে প্রায় চার ফুট, চওড়ায় দুই ফুট, তার ভিতর দিয়ে আমি অনায়াসে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে পারি। ফটকের দুপাশে ছোট দুটি জানালা, মাটি থেকে ছ ইঞ্চির বেশি উঁচুতে নয়। বাঁ দিকের জানালাটার মধ্যে দিয়ে রাজার কামাররা করল কি, আট কুড়ি এগারোটা শিকল চালিয়ে, আমার বাঁ পায়ের সঙ্গে ছত্রিশটা কুলুপ দিয়ে এঁটে দিল! ইউরোপে মেয়েদের ঘড়ি থেকে যে ধরণের চেন ঝোলে এই শিকলগুলোও অনেকটা সেই রকম দেখতে, মাপেও প্রায় তাই।

মন্দিরের কাছেই, রাজপথের ওপাশে কুড়ি ফুট দূরে একটা চূড়োর মতো বুরুজ, উঁচুতে সেটা পাঁচ ফুটের কম হবে না। তার উপরে সম্রাট উঠলেন, সঙ্গে তাঁর সভার প্রধান অধিনায়কদের মধ্যে অনেকে, কাউকেই দেখতে পাচ্ছিলাম না, তবে শুনলাম নাকি আমাকে দেখাই ওঁদের উদ্দেশ্য ছিল। নগরবাসীদের মধ্যেও আন্দাজ এক লাখের উপরে ঐ একই উদ্দেশ্যে বেরিয়ে এসেছিল, আর রক্ষীদল বাধা দিলে কি হবে, মই লাগিয়ে যারা বারে বারে আমার গায়ের উপরে চড়ছিল তারাও এক এক দফায় দশ হাজারের কম ছিল বলে মনে হয় না। তবে এটা বন্ধ করবার জন্য অবিলম্বে একটা ইস্তাহার বেরুল, না মানলে প্রাণদণ্ড!

কারিগররা যখন বুঝল শিকল ছিঁড়ে পালানো আমার পক্ষে অসম্ভব, তখন দড়িদড়া সব কেটে দিল। আমিও যে রকম নিদারুণ মনমরা হয়ে উঠে বসলাম, জীবনে আর কখনো তেমন হই নি। আমাকে উঠে হেঁটে বেড়াতে দেখে ওখানকার অধিবাসীরা অবাক হয়ে গিয়ে কি রকম চ্যাঁচামেচি যে করতে লাগল, সে আর ভাষায় বোঝানো যায় না। শিকলগুলো ছিল চার হাত লম্বা, কাজেই শুধু যে অর্ধচন্দ্রাকারে পাইচারি করতে পারছিলাম তা নয়, শিকলের খুঁটি ফটক থেকে মোটে চার ইঞ্চি দূরে হওয়াতে, হামা দিয়ে মন্দিরের মধ্যে ঢুকে একেবারে লম্বা হয়ে শুয়ে থাকতেও পারছিলাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কারারুদ্ধ লেখককে দেখিবার উদ্দেশ্যে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত সঙ্গীসহ লিলিপুটের সম্রাটের আগমন—সম্রাটের চেহারা ও পোষাকের বর্ণনা—লেখককে ওদেশের ভাষা শিখাইবার জন্য পণ্ডিত নিয়োগ—বিনীত ব্যবহারে প্রীতিলাভ—পকেট সার্চ ও তলোয়ার বন্দুক প্রত্যাহার।

যেই উঠে দাঁড়ানো সম্ভব হল, চারিদিকে চেয়ে দেখলাম। একথা মানতেই হবে এমন মজাদার দৃশ্য আগে কখনো দেখি নি। আমার চার পাশে যেন শুধু বাগানের পর বাগান চলেছে; বেড়া দিয়ে ঘেরা খেতগুলোর বেশির ভাগই আকারে চারকোণা লম্বায় চওড়ায় চল্লিশ ফুট করে হবে আর দেখতে যেন ঠিক কেয়ারি করা ফুল বাগান! খেতের মাঝে মাঝে বন; সেখানকার সবচেয়ে বড় গাছগুলো মাথায় হবে সাত ফুট। বাঁ দিকে ফিরে সহরটাকে দেখলাম, যেন রঙ্গমঞ্চের পটভূমিকায় আঁকা একটা নগর।

কয়েক ঘণ্টা যাবৎ প্রাকৃতিক প্রয়োজনের তাগিদে খুবই কষ্ট পাচ্ছিলাম। সে আর এমন আশ্চর্য কি, প্রায় দুদিনের মধ্যে তো আর শরীরটাকে আবর্জনামুক্ত করতে পারি নি। বড়ই মুস্কিলে পড়েছিলাম, একদিকে লজ্জা অন্যদিকে প্রয়োজনের তাগিদ। একমাত্র উপায় ছিল হামাগুড়ি দিয়ে আমার ঘরের মধ্যে ঢোকা। শেষে তাই করলাম, ঢুকে ফটকটাকে বন্ধ করে দিলাম, তারপর শিকল নিয়ে যতটা সম্ভব দূরে সরে গিয়ে দেহটাকে হাল্কা করলাম। তবে এমন নোংরা কাজ ঐ একবারই করেছিলাম। আশা করি আমার অবস্থা আর প্রয়োজনের কথা স্মরণ করে পাঠকমহাশয় আমাকে ক্ষমা করবেন। এর পর থেকে রোজ ভোরে উঠেই বাইরে বেরিয়ে, শিকল যতখানি লম্বা ততটা দূরে সরে গিয়ে ঐ কাজটি সারতাম। আর রোজ লোক সমাগম হবার আগেই দুটো ঠেলাগাড়ি করে ময়লাগুলোকে তুলে নিয়ে যাওয়া হত। এই কাজের জন্য দুজন লোকও রাখা হয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটাকে সামান্য বলে মনে হয়; এর এমন বিশদ বিবরণ আমি কখনই দিতাম না যদি না মনে করতাম যে সর্বসমক্ষে আমার স্বাভাবিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার একটা প্রমাণ দেওয়া দরকার। আসল কথা হল যে আমি শুনেছি আমার নিন্দুকরা নাকি

শুধু এই ব্যাপার নিয়ে কেন, অন্যান্য প্রসঙ্গেও আমার সম্বন্ধে এই ধরণের সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

কাজ শেষ হলে সেদিন আমি আবার বাড়ির বাইরে এলাম, মুক্ত বাতাসের দরকার বোধ করছিলাম। সম্রাট ইতিমধ্যে বুরুজের উপর থেকে নেমে, ঘোড়ায় চড়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছিলেন। আরেকটু হলেই তিনি দারুণ বিপদে পড়তেন, কারণ ঘোড়াটা ভালোভাবে শিক্ষিত হলেও, এরকম দৃশ্য তো আর সে কখনো দেখে নি, ঠিক যেন সামনে একটা পাহাড় নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে, কাজেই সামনের দু পা শূন্যে তুলে সে তো উঁচু হয়ে দাঁড়াল। রাজা কিন্তু অশ্বচালনায় ওস্তাদ, আসন থেকে নড়লেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না অনুচররা এসে লাগাম ধরল আর তিনিও ধীরে সুস্থে নামতে পারলেন। ঘোড়া থেকে নেমে সম্রাট আমার চারদিকে ঘুরে দেখে খুবই বিস্ময় প্রকাশ করলেন বটে, কিন্তু সমস্তক্ষণ আমার শিকলের নাগালের বাইরে থাকলেন। এবার পাচক আর ভাণ্ডারীদের হুকুম দিলেন আমার খাবার দিতে। তারা তৈরী হয়েই এসেছিল; ছোট ছোট ঠেলাগাড়িতে পানাহার সাজিয়ে সেগুলোকে ঠেলে আমার নাগালের মধ্যে পৌছে দিতে লাগল আর আমিও দেখতে দেখতে সব কটাকে সাবাড় করলাম। মাংসের গাড়ি কুড়িটা আর মদের দশটা। মাংসের একেকটা গাড়ি তিন গ্রাসে শেষ করলাম। মদের গাড়িগুলোতে ছিল দশটা করে মাটির কলসিতে মদ, সেগুলোকে গাড়ির মধ্যে ঢেলে নিয়ে এক চুমুকে শেষ করলাম। এইভাবে দশটা গাড়ি ফুরুল।

সম্রাজ্ঞী আর রাজপরিবারের ছেলেমেয়েরা অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে খানিক দূরে চেয়ারে বসেছিলেন। সম্রাটের ঘোড়াটা দৈবাৎ ওরকম করাতে তাঁরা সবাই নেমে তাঁর কাছে এলেন। এবার সম্রাটের চেহারার একটু বর্ণনা দিই। সভাসদ্‌দের চেয়ে মাথায় প্রায় এক আঙুল লম্বা, সেইজন্য তাঁকে দেখবামাত্র সকলের মনে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে ভরে যায়। মুখের অবয়ব দৃঢ় আর পুরুষোচিত, অষ্ট্রিয়ানদের মতো ঠোঁট, ঈগলের মতো বাঁকা নাক, গায়ের রং ফর্সা তবে তাতে একটু হলদের আভাস, উন্নত ললাট, সমস্ত শরীর আর হাত পায়ের গড়নের মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য, চলাফেরায় ভারি একটা কমনীয়তা, হাবভাব বাস্তবিকই রাজার মতো। সে সময় তাঁর প্রথম যৌবন কেটে গেছে,

বয়স আটাশ বছর ন' মাস, এরই মধ্যে সাত বছর দিব্যি সুখস্বাচ্ছন্দ্যে রাজত্ব করেছেন, বিজয়ীও হয়েছেন প্রায় সর্বদাই।

তাঁকে ভালো করে দেখবার জন্য আমি পাশ ফিরে শুলাম, মুখটা তাঁর সঙ্গে সমান্তরাল করে; তিনি দাঁড়ালেন মাত্র তিন গজ তফাতে। এর পরে বহুবার তাঁকে হাতে করে তুলে দেখেছি, কাজেই বর্ণনায় কোনো ভুল থাকতে পারে না। পোষাক পরিচ্ছদ তাঁর ভারি সাদাসিধা, প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের মাঝামাঝি ঢঙের।

মাথায় তাঁর মনিমানিক্য বসানো সোনার শিরস্ত্রাণ, তার চূড়োয় একটা পালক। পাছে আমি হঠাৎ বাঁধন ছিঁড়ি, তাই নিজেকে রক্ষা করবার জন্য হাতে খোলা তলোয়ার, সেটি ইঞ্চি তিনেক লম্বা, খাপ আর হাতল সোনার তৈরী, তাতে হীরে বসানো। গলার স্বর ভারি তীক্ষ্ণ, কিন্তু স্পষ্ট আর উচ্চারণ ভালো, উঠে দাঁড়িয়েও সুন্দর শুনতে পাচ্ছিলাম। মহিলাদের আর সভাসদদের সাজপোষাকের কিন্তু ভারি জাঁকজমক। যেখানে ওঁরা দাঁড়িয়েছিলেন, সে জায়গাটাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন মাটিতে একটা ঘাগরা পাতা হয়েছে, তার উপরে সোনা রূপোর সুতো দিয়ে মানুষের নক্সা তোলা।

সম্রাট আমার সঙ্গে অনেক কথা বললেন আর আমিও তার উত্তর দিলাম, অবিশ্যি কেউই কারো কথার এক বর্ণও বুঝলাম না। যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের পোষাক দেখে উকীল কিম্বা পুরোহিত বলে মনে হচ্ছিল ; এঁদের প্রতি আদেশ হল যেন আমার সঙ্গে কথা বলেন আর আমিও যে ক'টি ভাষার একটুখানিও জানি সব ঝেড়ে দিলাম, যথা হাই আর লো ডাচ্, লাতিন, ফরাসী, স্প্যানিস, ইতালীয়, মায় লিঙ্গা ফ্রাঙ্কা বলে যে জগাখিচুড়ি ভাষা চলে সেও ; কিন্তু সে গুড়ে বালি।

ঘণ্টা দুই বাদে সভা ভঙ্গ হল, আমার সঙ্গে রইল বলিষ্ঠ রক্ষকদল, কারণ জনতা যতটা সম্ভব কাছে আসতে চায়, তাদের ঠেকানো দায়। তাদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করা দরকার, হয়তো বেয়াদবি করবে, কিম্বা অনিষ্টও করতে পারে। বাস্তবিক লোকগুলোর আস্পর্ধা কম নয়, আমার বাড়ির দোরগোড়ায় মাটির উপরে বসে আছি, অমনি আমাকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়েছে। আমার বাঁ চোখে তো আর একটু হলেই একটা তীর বিঁধেছিল। সৈন্যাধ্যক্ষ তখন দলের পাণ্ডা ছ' জনকে ধরে আনবার হুকুম দিলেন। তাঁর মনে

হল, এদের সবচেয়ে ভালো শাস্তি হবে ধরে বেঁধে আমার হাতে সঁপে দিলে। সেপাইরা কয়েকজন করলও তাই, বল্লমের হাতল দিয়ে ঠেলে ঠেলে আমার নাগালের মধ্যে ওদের পৌছে দিল। সব কটাকে ডান হাতে তুলে নিলাম, তারপর পাঁচজনকে পকেটে পুরে, ষষ্ঠ জনকে তুলে এমন মুখ করলাম যেন এক্ষুণি তাকে জ্যান্ত খেয়ে ফেলব। সে বেচারা তো মহা কান্না জুড়ে দিল, সৈন্যাধ্যক্ষ আর তাঁর কর্মচারীরাও ভারি দুর্ভাবনায় পড়লেন, বিশেষতঃ যখন আমার পেন্সিলকাটা ছুরিটা বের করলাম। অবিশ্যি তক্ষুণি আমি ওদের ভয় ভেঙ্গেও দিলাম। মুখে একটা অমায়িক ভাব করে, লোকটার বাঁধন কেটে, আস্তে আস্তে ওকে মাটিতে নামিয়ে দিলাম আর সেও চোঁ-চাঁ দৌড় লাগাল। বাকিগুলোরও ঐ ব্যবস্থা করলাম, একটা একটা করে পকেট থেকে বের করে ছেড়ে দিলাম। লক্ষ্য করলাম যে আমার দয়ামায়ার এইরকম প্রমাণ পেয়ে, একদিকে সৈনিকরা, অন্যদিকে সাধারণ লোকেরা সকলেই যেন কৃতার্থ হল। পরে খবরটা যখন রাজসভায় পৌছল, তখন আমারই সুবিধা হয়ে গেল।

রাতের দিকে অনেক কষ্ট করে ঘরে ঢুকে মাটিতে শুয়ে রইলাম ; দু সপ্তাহ মাটিতে শুয়েছিলাম ; এর মধ্যে সম্রাট আমার জন্য তোষক তৈরীর হুকুম দিলেন। ওদের প্রমাণ মাপের ছ'শো তোষক গাড়ি করে নিয়ে এসে আমার ঘরের মধ্যে পোরা হল। তারপরে দেড়শো তোষক সেলাই করে করে জুড়ে, লম্বায় চওড়ায় মাপসই হল। এই রকম চার পুরু তোষক পেতে শুয়ে তবু আরাম হত না, মসৃণ পাথরের মেঝেটা ছিল এমনি শক্ত। ঐ হিসাবে আমার জন্যে ওরা বিছানার চাদর, কম্বল, সুজনি, সবই জুগিয়েছিল। কষ্ট সহ্য করা আমার বহুকালের অভ্যাস ; মোটের উপর মন্দ ব্যবস্থা হয় নি।

এদিকে আমার আগমনবার্তা যেমন রাজ্যময় রাষ্ট্র হতে লাগল, অমনি অসংখ্য ধনী, নিষ্কর্মা আর কৌতূহলী লোক আমাকে দেখতে আসতে আরম্ভ করে দিল। গাঁগুলো প্রায় খালি হয়ে গেল আর বলা বাহুল্য যে চাষবাস ও ঘরকন্নার কাজেরও নিশ্চয় খুবই অযত্ন হত, যদি না সম্রাট অনেকগুলো ইস্তাহার এবং হুকুম জারি করে সেটা বন্ধ করতেন। আদেশ হল যারা আমাকে এর মধ্যে একবার দেখে নিয়েছে তাদের সবাইকে বাড়ি ফিরে

যেতে হবে আর রাজসভার অনুমতিপত্র ছাড়া আমার বাড়ির পঞ্চাশ গজের মধ্যে কেউ যেন আসবার স্পর্ধা না রাখে। এই লাইসেন্সের ব্যাপার থেকে সরকারী কর্মচারীরা বেশ দু পয়সা কামিয়েছিল।

ইতিমধ্যে সম্রাট ঘন ঘন মন্ত্রণাসভা ডাকতে লাগলেন, আমার কি ব্যবস্থা হবে তাই নিয়ে পরামর্শ করা দরকার। পরে আমার জনৈক বিশিষ্ট বন্ধু, তিনি ওখানকারই একজন সম্ভ্রান্ত অধিবাসী এবং ভিতরের ব্যাপার সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল, আমাকে বুঝিয়েছিলেন যে আমাকে নিয়ে মন্ত্রিসভা মহা সমস্যায় পড়ে গিয়েছিল।

তাঁদের বড ভয় কবে আমি বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে না পড়ি। তাছাড়া আমাকে খাওয়ানোও একটা মস্ত খরচের ব্যাপার। শেষে দেশে দুর্ভিক্ষ না দেখা দেয় ইত্যাদি। মাঝে মাঝে তাঁদের মনে হচ্ছিল আমাকে না খাইয়ে মেরে ফেলাই বাঞ্ছনীয়, নিদেন হাতে মুখে কয়েকটি বিষাক্ত তীর মেরে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। তারপরে আবার তাঁরা ভেবে দেখলেন এইরকম বিরাট একটা লাস পচলে কি দুর্গন্ধই না ছড়াবে চারিদিকে, শেষটা সম্ভবতঃ সহরের মধ্যে মহামারী লেগে তারপরে দেশময় ছড়িয়ে পড়বে।

এই রকম জল্পনা কল্পনা চলছে এমন সময় মন্ত্রণাগৃহের দরজায় সৈন্যাধ্যক্ষরা কয়েকজন এসে উপস্থিত হলেন। তাঁদের মধ্যে দু জন অনুমতি পেয়ে ভিতরে গিয়ে ঐ ছ জন অপরাধীর সঙ্গে আমি কি রকম সদয় ব্যবহার করেছি তার একটা বিজ্ঞপ্তি দিলেন। তাই শুনে সম্রাটের ও তাঁর মন্ত্রীদের মনে আমার সম্বন্ধে এমনি ভালো ধারণা হয়ে গেল যে তখুনি এক পরওয়ানা বেরিয়ে গেল যে শহরের বাইরে, ন'শো গজের মধ্যে, যত গ্রাম আছে, তাদের সবাই মিলে আমার জন্যে রোজ সকালে ছ'টা গোরু, চল্লিশটা ভেড়া আর অন্যান্য খাবার জিনিস জোগাতে হবে। সেই সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণে রুটি আর মদও দিতে হবে। এ সব জিনিসের ন্যায্য দাম দেবার জন্যেও রাজকোষে হুকুম গেল।

দেখলাম সম্রাট নিজের জমিজমার আয় থেকেই নিজের খরচ চালান, কোনো বিশেষ উপলক্ষ্য ছাড়া কখনো প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায় করেন না, যুদ্ধের সময়ে অবিশ্যি প্রজাদের সবাইকেই নিজেদের খরচে রাজার সৈন্যদলে যোগ দিতে হয়।

আমার গৃহস্থালী দেখাশোনার জন্য ছ'শো চাকর রাখা হল, তারা খোরাকি আর মাসমাইনে পেত, তাদের থাকবার জন্য আমার দরজার দু পাশে তাঁবু ফেলা হল। এতে আমার ভারি সুবিধা হয়ে গেল। তার উপরে হুকুম হল যে তিন শো দরজি বসে ওদেশের ফ্যাশান মতো আমার জন্য এক প্রস্থ পোষাক তৈরী করে দেবে আর সম্রাটের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের মধ্যে ছ' জন এসে আমাকে ওদের ভাষা শেখাবেন। সব শেষে আদেশ হল যে সম্রাটের, তাঁর পরিজনবর্গের আর রক্ষীদলের ঘোড়াগুলোকে রোজ আমার সামনে এনে কুচকাওয়াজ করানো হবে, যাতে আমাকে দেখে দেখে তারা অভ্যস্ত হয়ে যায়।

সময় মতো এই সমস্ত আদেশই কার্যে পরিণত হয়েছিল। তিন সপ্তাহের মধ্যেই ওদের ভাষা আমার অনেকখানি রপ্ত হয়ে এল; এই সময়ে সম্রাট প্রায়ই আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে আমাকে সম্মানিত করতেন, সখ করে মাষ্টারমশাইদের আমাকে ভাষা শেখাতে সাহায্য করতেন। এরই মধ্যে আমরা পরস্পরের সঙ্গে একরকম কথাবার্তা চালাতাম। ওদের ভাষায় আমার প্রথম কথাই হল মুক্তি ভিক্ষা। হাঁটু গেড়ে বসে রোজ ঐ একই কথা বলতাম। যতটা বুঝেছিলাম, উত্তরে তিনি বলতেন এ সব ব্যাপারে সময় লাগে, মন্ত্রীদের পরামর্শ ছাড়া কিছুই হবার নয়, আর সবার আগে "লুমস্ কেল্মিন পেসো ডেস্‌মার লন এমপোসো" অর্থাৎ সম্রাট ও তাঁর সাম্রাজ্যের সঙ্গে মৈত্রীর শপথ করতে হবে। অবিশ্যি সর্বদা আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা হবে বলে সম্রাট আশ্বাস দিতেন। সেই সঙ্গে এই পরামর্শও দিতেন যে ধৈর্য ধরে থেকে আর সর্বদা বিবেচনা করে কাজ করে যেন তাঁর আর তাঁর প্রজাদের শ্রদ্ধা অর্জন করি।

তারপরে সম্রাট বললেন যে যদি তিনি তাঁর নির্দিষ্ট কর্মচারীদের আমাকে সার্চ করবার হুকুম দেন, তাহলে আমি যেন কিছু মনে না করি, কারণ সম্ভবতঃ আমার সঙ্গে নানান অস্ত্রশস্ত্র আছে, সেগুলো যদি আমার বিশাল বপুর উপযুক্ত মাপের হয় তবে তো সাংঘাতিক ব্যাপার। আমি জানালাম সম্রাট নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আমি আমার পরনের সব কিছু ছেড়ে দিচ্ছি, পকেট উল্টে দেখাচ্ছি। এই কথাগুলো খানিকটা ভাষায় খানিকটা ইসারায় জানালাম।

উত্তরে তিনি বললেন তাঁদের দেশের আইন অনুসারে দুজন কর্মচারী আমাকে সার্চ করবে; তিনি ভালো ভাবেই জানেন আমার সম্মতি ও সহযোগিতা ছাড়া এ কাজ সম্ভব নয়; আমার উদারতা ও ন্যায়বিচার সম্বন্ধে তাঁর এতই উঁচু ধারণা যে স্বচ্ছন্দে তিনি কর্মচারী দুটিকে আমার হাতে ছেড়ে দিচ্ছেন। আমি যখন ওদের দেশ ছেড়ে চলে যাব, আমার কাছ থেকে যা কিছু নিয়ে নেওয়া হচ্ছে সে সমস্তই তখন ফিরিয়ে দেওয়া হবে, অন্ততঃ আমি যে দাম চাইব তাই দিয়ে দেওয়া হবে।

তখন কর্মচারী দুটিকে হাতে করে তুলে নিয়ে আমি দিলাম আমার কোটের পকেটে পুরে। তার পর একে একে সব পকেটেই ভরলাম, বাকি থাকল শুধু আমার ঘড়ির খোপগুলো আর একটা গোপন পকেট, যেটা দেখাতে আমার বিশেষ আপত্তি ছিল। তার মধ্যে এমন কয়েকটা ছোটখাটো দরকারি জিনিস রেখেছিলাম যা আমার নিজের ছাড়া আর কারো কোনো কাজে আসতে পারে না। খোপ দুটোর একটাতে ছিল আমার রূপোর ঘড়ি, অন্যটিতে একটা থলির মধ্যে খানকতক মোহর। কর্মচারীরা দুজনে কালি কলম আর কাগজ নিয়ে আমার পকেটে যা যা পেয়েছিল তার হুবহু তালিকা তৈরী করেছিল; কাজ শেষ হলে তারা তাদের মাটিতে নামিয়ে দিতে বলল, তালিকাটি সম্রাটকে দিতে হবে। পরে আমি ওদের ঐ তালিকার ইংরিজি অনুবাদ করেছিলাম, যেমন যেমন লিখেছিলাম এখানে তার অবিকল নকল দিচ্ছি।

তালিকা—বিশাল মানুষ-পর্বতের (ওদের ভাষার "কুইন্‌বুস ফ্লেষ্ট্রিনের" এই রকম অনুবাদ করেছিলাম) কোটের ডান ধারের পকেটে উত্তমরূপে খুঁজিয়াও কেবলমাত্র প্রকাণ্ড এক খণ্ড পুরু কাপড় পাইলাম। তাহা আকারে এতই বৃহৎ যে স্বচ্ছন্দে মহারাজের সভাগৃহের গালিচারূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

বাঁদিকের পকেটে দেখিলাম বিরাট একটি রৌপ্যনির্মিত আধার, তাহার ঢাকনাও রূপার তৈরী। যাহারা অনুসন্ধান করিতে গিয়াছিলাম তাহাদের মধ্যে কেহই এই ঢাকনা তুলিতে পারি নাই; মানুষপর্বতকে অনুরোধ জানাইয়া খুলিতে হইয়াছিল। অতঃপর উহার মধ্যে আমাদের একজন প্রবেশ করিয়া দেখিল ভিতরে তাহার কটিদেশ পর্যন্ত কোনো পদার্থের চূর্ণ রহিয়াছে।

সেই চূর্ণের কিছুটা বাতাসে উড়িয়া আমাদের নাসায় প্রবেশ করিলে পর আমরা এক নাগাড়ে বহুবার হাঁচিয়াছিলাম।

ওয়েষ্টকোটের ডাইন পকেটে বৃহৎ এক গুচ্ছ সূক্ষ্ম ও শুভ্র কি যেন দ্রব্য পাইলাম। মাপে সেগুলি তিন মানুষ লম্বা হইবে, মোটা দড়ির সাহায্যে একত্র করিয়া বাঁধা এবং তাহাদের উপরে কালো কালো দাগ অঙ্কিত আছে। বিনীতভাবে এই মীমাংসা করিলাম যে ওগুলি নিশ্চয় লেখা; এক একটি অক্ষর এক বিঘৎ করিয়া লম্বা।

বাঁ ধারের পকেটে একটি যন্ত্র পাইলাম, তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে বিশটি দণ্ড বাহির হইয়াছে, দেখিতে অনেকটা মহারাজের সভাগৃহের সম্মুখের বেড়াগুলির মতো; অনুমান করিতেছি উহা দ্বারা মানুষ-পর্বত চুল আঁচড়াইয়া থাকে। বলা বাহুল্য বারংবার উহাকে প্রশ্ন করিয়া বিরক্ত করি নাই। তাহার আরেকটি কারণ যে উহাকে আমাদের কথার অর্থ বোঝানোই একটি ব্যাপার বিশেষ!

উহার কোমর-ঢাকার (এইভাবেই 'রাণফুলো' কথাটার অনুবাদ করেছিলাম, অর্থাৎ আমার ইজের) ডাইনের বড় পকেটে মানুষ প্রমাণ একটি ফাঁপা লোহার থাম্বা পাইলাম, সেটি আরো বৃহৎ একটি কাষ্ঠখণ্ডের সহিত যুক্ত। তাহার এক পাশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লৌহখণ্ড বাহির হইয়া রহিয়াছে, সেগুলি নানান আকারে কাটা। এ দ্রব্যটি যে কি তাহা বুঝিতে পারি নাই।

বামদিকের পকেটেও ঐরকম আরেকটি যন্ত্র। ডাইনের ছোট পকেটে সাদা ও লাল ধাতুনির্মিত নানান মাপের চেপ্টা কতকগুলি চাকতি পাইলাম। সাদাগুলিকে রূপার মনে হইল। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি এতই বৃহৎ ও ভারি যে আমি ও আমার সঙ্গী উভয়ে মিলিয়া সেগুলিকে প্রায় তুলিতেই পারি না!

বাম পকেটে এবড়োখেবড়ো দুইটি কালো চোঙা পাইলাম, সেগুলি এত লম্বা যে পকেটের তলদেশে দাঁড়াইলে তাহাদের মাথায় হাত পৌঁছায় না। একটি সম্পূর্ণ ঢাকাচাপা দেওয়া, কোথাও কোন জোড়ের চিহ্ন নাই, অপরটির শিরোভাগে একটি সাদা গোলাকার দ্রব্য, আমাদের মাথার দ্বিগুণ বড়। এগুলি আমাদের দেখাইতে উহাকে বাধ্য করিয়াছিলাম, কারণ কে জানে কোনো সাংঘাতিক অস্ত্রও হইতে পারে। মানুষ-পর্বত জিনিস দুইটিকে

খাপ হইতে খুলিয়া বলিল একটির সাহায্যে নাকি সে ক্ষৌরকর্ম করে এবং অপরটি দিয়া মাংস কাটে।

আরো দুইটি পকেটও ছিল, কিন্তু তাহার মধ্যে প্রবেশ করা সম্ভব হইল না। সেগুলি নাকি উহার ঘড়ি রাখিবার কক্ষ। ঠিক পকেটও নহে বরং উহার কোমর-ঢাকার উপরি ভাগে দুইটি চেরা ফাঁক, উহারই পেটের চাপে একেবারে লেপটিয়া বুজিয়া রহিয়াছে।

ডান কক্ষ হইতে একটি মোটা রূপার শিকল ঝুলিয়া আছে, তাহার অপর প্রান্তে আশ্চর্য একটি যন্ত্র। আমরা আদেশ করিলাম—শিকলের মাথায় কি আছে বাহির কর। বাহির হইল একটি গোলক, তাহার এক দিক রূপোর, অপর দিক কোনো একটি স্বচ্ছ পদার্থের তৈরী। দেখিলাম সেইদিকে বৃত্তাকারে অদ্ভুত সব দাগ কাটা রহিয়াছে। মনে করিয়াছিলাম স্পর্শ করিয়া দেখিব, কিন্তু ঐ স্বচ্ছ পদার্থে অঙ্গুলি বাধা পাইল।

মানুষ-পর্বত তখন যন্ত্রটিকে আমাদের কানের কাছে ধরিল, জলশক্তিতে চালিত গম পিশিবার জাঁতার মতো শব্দ শুনিতে পাইলাম। আমরা অনুমান করিতেছি হয় উহা কোনো জন্তু-বিশেষ, নয়তো মানুষ-পর্বতের উপাস্য দেবতা। শেষের অনুমানটিকেই সঠিক বলিয়া বিবেচনা করি কারণ—অর্থাৎ উহার কথার অর্থ যদি বুঝিয়া থাকি, অবশ্য লোকটি বড়ই গোলমেলে কথা বলে—ও বলিল উহাকে নাকি একবার না দেখিয়া ও ক্বচিৎ কোনো কার্যে প্রবৃত্ত হয়; উহাই নাকি উহার আজ্ঞাদাতা এবং জীবনের প্রত্যেকটি কর্তব্যের সময়-নির্ধারক।

বাম পার্শ্বের খোপ হইতে একটি জাল বাহির করিয়া সে আমাদের দেখাইল, জালটি এতই বৃহৎ যে জেলেদের কাজে লাগিতে পারে; আবার টাকার থলির মতো সেটিকে খোলা ও বন্ধ করা যায়, সেই কাজেই মানুষ-পর্বত উহাকে নিযুক্ত করিয়াছে। উহার মধ্যে দেখিলাম প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হলুদবর্ণ ধাতুর চাকতি, সেগুলি যদি যথার্থই সোনার হয়, তাহা হইলে মূল্য হইবে বিস্তর।

মহারাজের আদেশে এইভাবে বিশেষ যত্ন সহকারে পকেট সার্চ শেষ করিলাম। উহার কটিদেশে দেখিলাম কোনো অতিকায় জানোয়ারের চামড়া হইতে প্রস্তুত একটি কোমরবন্ধ রহিয়াছে, তাহার বাম দিক হইতে পাঁচ মানুষ লম্বা একটি তলোয়ার ঝুলিতেছে; ডান পার্শ্বে একটি থলি বা

বটুয়া, তাহাতে দুইটি খোপ, একটিতে মহারাজের তিনজন করিয়া প্রজা ধরিয়া যায়।

একটি খোপে দেখিলাম কোনো ভারি পদার্থের তৈরী, আমাদের মাথার মতো বড় অনেকগুলি গোলক, তুলিতে হইলে প্রচুর শক্তির প্রয়োজন। অন্যটিতে এক ঢিবি কালো কালো কিসের দানা, এগুলি খুব বড় কিম্বা ভারি নয়, আমাদের হাতের তেলোয় গুটি পঞ্চাশেক আঁটিয়া যায়।

মানুষ-পর্বতের দেহে যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে ইহাই তাহার সম্পূর্ণ তালিকা। সে আমাদিগের সহিত অতিশয় ভদ্র ব্যবহার করিয়াছে এবং মহারাজের আদেশের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছে। মহারাজের মঙ্গলময় রাজত্বের ঊন-নবতিতম চান্দ্রমাসের চতুর্থ দিনে এই লিপি দস্তখৎ ও সীলমোহর করা হইল।

গ্লেফ্রেণ ফ্রেলক্
মাসি ফ্রেলক্

তালিকা সমাপ্ত।

এই তালিকা সম্রাটকে পড়ে শোনানো হলে তিনি আমাকে জিনিস-পত্রগুলি ওদের কাছে গচ্ছিত রাখতে আদেশ করলেন। প্রথমেই চাইলেন আমার তলোয়ার, খাপসুদ্ধ দিলাম বের করে। ইতিমধ্যে ওঁর সঙ্গে যে বাছাইকরা সৈনিকের দল ছিল, তাদের মধ্যে থেকে তিন হাজার লোকের উপর হুকুম হয়েছিল তীর ধনুক নিয়ে প্রস্তুত হয়ে, খানিকটা জায়গা ছেড়ে দিয়ে, আমাকে ঘিরে থাকবে। অবিশ্যি আমার চোখ ছিল সম্রাটের উপর, এ সব কিছুই লক্ষ্য করিনি।

তারপরে সম্রাট আমাকে তলোয়ারটা খাপ থেকে খুলতে আদেশ করলেন। সমুদ্রের জল লেগে খানিকটা মর্চে পড়ে গেলেও তলোয়ারটা ছিল বেজায় ঝকঝকে। যেই না খাপ থেকে বের করেছি সমস্ত সৈন্যদল খানিকটা ভয়ে খানিকটা চমকে গিয়ে চিৎকার করে উঠেছে! তারপর হয়েছে কি, চারদিক রোদে ভরা আর তারি মধ্যে যেই আমি তলোয়ারটাকে ঘুরিয়েছি, ওদের চোখ গেছে ঝলসে।

সম্রাট বাস্তবিকই মহৎ ব্যক্তি, যতটা মনে করেছিলাম মোটেই ততটা ভয় পান নি। তিনি আমাকে আদেশ করলেন তলোয়ারটাকে আবার খাপে

ভরে, শিকলের মাথা থেকে দু'ফুট দূরে, যতটা আস্তে পারি যেন মাটিতে ফেলে দিই।

তারপরে আমার ফাঁপা থামের একটা চেয়ে বসলেন, অর্থাৎ আমার পকেট-পিস্তলের একটা। বের করলাম সেটা, তাঁর অনুরোধে, যতটা আমার ভাষায় কুলোয় ওটা ব্যবহার করবার নিয়ম বুঝিয়ে দিলাম। পিস্তলে শুধু খানিকটা বারুদ ভরলাম। ভাগ্যিস বটুয়ার মুখ ছিল শক্ত তাই সমুদ্রের জলে বারুদটা ভিজে যায় নি, এইজন্যই বিচক্ষণ নাবিকরা এই বিষয় সর্বদা সতর্ক থাকেন।

প্রথমে সম্রাটকে অভয় দিলাম, তারপর শূন্যে বন্দুকটা ছুঁড়লাম। তলোয়ার দেখে এরা যতটা অবাক হয়েছিল, এবার তার চেয়েও অনেক বেশি হল। শত শত লোক ধপাধপ মাটিতে পড়ে গেল যেন হঠাৎ মরেই গেছে। এমন কি সম্রাটেরও নিজেকে সামলিয়ে নিতে একটু সময় লেগেছিল, যদিও এতটুকু নড়েন নি তিনি। তলোয়ারের মতো পিস্তল দুটোকেও সমর্পণ করলাম; তারপরে বারুদ আর গুলির থলেও। দেবার সময় সম্রাটকে অনুনয় করে বললাম যেন বারুদটাকে আগুনের কাছ থেকে সরিয়ে রাখা হয়, কারণ ওর মধ্যে এতটুকু আগুনের ফুলকি পড়লেই এমনি বিস্ফোরণ হবে যে সম্রাটের প্রাসাদ কোথায় মহাশূন্যে উড়ে যাবে।

ঐভাবে পকেট-ঘড়িটাও দিয়ে দিলাম , সেটা দেখবার জন্যে সম্রাটের ভারি কৌতূহল।

রক্ষীবাহিনীর মধ্যে মাথায় সবচেয়ে লম্বা দুজনকে তিনি হুকুম করলেন, ওটাকে বাঁকে ঝুলিয়ে কাঁধে তুলে নিয়ে যেতে, ঠিক যেভাবে ইংল্যাণ্ডের মদের গাড়ির গাড়োয়ানরা পিপে ঝুলিয়ে নিয়ে যায়।

ঘড়িটা থেকে ক্রমাগত আওয়াজ হয় আর মিনিটের কাঁটাটা কেমন এগোয় তাই দেখে সম্রাট ভারি আশ্চয হয়ে গেলেন। ওদের দেশের লোকদের দৃষ্টিশক্তি আমাদের চেয়ে অনেক বেশি তীক্ষ্ণ, কাজেই মিনিটের কাঁটার এগিয়ে চলা দেখতে সম্রাটের কোনোই অসুবিধা হল না। সঙ্গে পণ্ডিতরা ছিলেন, এসব বিষয়ে সম্রাট তাঁদের মতামত জিজ্ঞাসা করলেন; বলা বাহুল্য তাঁরা নানারকমের এবং সুদূরপরাহত সব উদ্ভট মন্তব্য করতে লাগলেন; অবিশ্যি তাঁদের সব কথা আমি বুঝতে পারি নি

তারপরে আমার রূপোর আর তামার টাকা পয়সা, ন'টা বড় মোহর আর অন্য ছোট মুদ্রা সুদ্ধ আমার টাকার থলি, আমার ছুরি, ক্ষুর, চিরুণী, রূপোর নস্যির কৌটো, রুমাল আর ডাইরি, সব দিয়ে দিলাম। আমার তলোয়ার, পিস্তল আর বটুয়া গাড়ি করে রাজ-ভাণ্ডারে নিয়ে যাওয়া হল আর বাকি সমস্ত জিনিস আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হল।

এর আগেই বলেছি আমার একটা গোপন পকেট ছিল, খুঁজবার সময় সেটি ওদের নজরে পড়ে নি। তার মধ্যে ছিল আমার চশমা জোড়া, চোখ খারাপ বলে মাঝে মাঝে সেটি আমার দরকার হয়; একটা পকেট দূরবীণ আর কয়েকটা ছোটখাটো দরকারি জিনিস যাতে সম্রাটের কিছু যায় আসে না, কাজেই সেগুলো প্রকাশ করা কর্তব্য মনে হয় নি। তা ছাড়া মনে ভয়ও ছিল যে ওগুলো হাতছাড়া করলে শেষটা হয়তো হারিয়ে যাবে কিম্বা নষ্ট হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

লেখক কর্তৃক অতি বিস্ময়করভাবে সম্রাট এবং তাঁর নারী ও পুরুষ অনুচরদের চিত্ত বিনোদন—লিলিপুট রাজসভার আমোদপ্রমোদের বর্ণনা—কতকগুলি সর্তে লেখকের মুক্তিলাভ।

আমার নম্র আচরণ আর ভালো ব্যবহার দেখে সম্রাট ও তাঁর সভাসদ্‌দের, আর শুধু তাঁদেরই বা কেন, সৈন্যদলের ও সাধারণ অধিবাসীদের সকলেরই মনে আমার সম্বন্ধে এমন একটা উঁচু ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে আমার মনে বড় আশার উদ্রেক হচ্ছিল হয়তো অল্পদিনের মধ্যেই আমাকে মুক্তি দেওয়া হবে। ওঁদের এই মনের ভাবটা যাতে আরো দৃঢ় হয়, সেইজন্য আমিও যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলাম। একটু একটু করে ওখানকার অধিবাসীদের মন থেকেও আমার কাছ থেকে কোনো বিপদের ভীতি কমে যেতে লাগল।

মাঝে মাঝে শুয়ে থাকতাম আর ওদের পাঁচ ছ'জনকে আমার হাতের তেলোয় নেচে বেড়াতে দিতাম; শেষটায় ছেলেমেয়েরা সাহস করে আমার চুলের মধ্যে লুকোচুরিও খেলতে আরম্ভ করল। ততদিনে ভাষা শেখা অনেকখানি এগিয়েছে, এখন ওদের কথা বেশ বুঝতেও পারি, বলতেও পারি।

সম্রাটের একদিন সখ গেল আমাকে ওদের দেশের খেলা দেখাবেন। বাস্তবিক অন্য কোনো দেশে খেলার এমন কসরৎ আর দক্ষতা আমি কখনো দেখি নি। তার মধ্যে দড়াবাজির খেলাটাকে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক বলে মনে হয়েছিল; মাটি থেকে বারো ইঞ্চি উঁচুতে, দু' ফুট লম্বা একটা সরু সুতোর উপরে খেলা। পাঠক মহাশয়ের ধৈর্য ভিক্ষা করে এই খেলার আরেকটু বিশদ বর্ণনা দেব।

এই খেলা দেখায় কেবলমাত্র তারাই যারা রাজসভায় কোনো উচ্চপদপ্রার্থী, কিম্বা যারা কোনো বিশেষ অনুগ্রহের আশা রাখে। অল্প বয়স থেকেই তারা এই বিষয় শিক্ষানবিশি করে, তাই বলে সব সময় যে তারা অভিজাত বংশীয় কিম্বা উচ্চশিক্ষিত হয় তাও নয়। কারো মৃত্যুতে, কিম্বা—যেমন অনেক সময়ই হয়ে থাকে—নিন্দা বা অপমানের জন্য কেউ পদত্যাগ করতে বাধ্য

হলে, যখনি কোনো বড় পদ খালি হয়, তখনি এই ধরণের পাঁচ ছয়জন পদপ্রার্থী সম্রাটের কাছে আবেদন জানায় যে তারা সম্রাট ও তাঁর সভাসদ্‌দের দড়াবাজির খেলা দেখাবে ; তারপরে দড়ি থেকে না পড়ে যে উমেদার সবচেয়ে উঁচুতে লাফাতে পারে সেই ঐ পদে বহাল হয়। প্রধান মন্ত্রীদের পর্যন্ত সম্রাট অনেক সময় আদেশ করেন দড়াবাজির কসরৎ দেখিয়ে প্রমাণ কর এখনো তোমরা কর্মকৌশল ভোল নি! রাজকোষাধ্যক্ষ, ফ্লিম্‌ন্যাপকে সাম্রাজ্যের অন্য সমস্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের চেয়ে অন্ততঃ এক ইঞ্চি উঁচু দড়িতে ডিগবাজি খাবার অনুমতি দেওয়া হত। আমি নিজে তাঁকে দেখেছি দড়ির উপরে কাঠের থালা বসিয়ে তার উপরে পরপর অনেকগুলো ডিগবাজি খেতে আর সে দড়িটা ইংল্যাণ্ডের পার্শেল বাঁধা স্থতোর চেয়ে কোনো অংশে মোটা নয়। আমার চোখ যদি নিরপেক্ষ হয়ে থাকে, তা হলে আমার মতে কোষাধ্যক্ষের পরেই স্থান দিতে হয় আমার বন্ধু রেলড্রেসালকে, যিনি হলেন সম্রাটের স্বকীয় বিষয়াদির প্রধান সচিব। অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সকলেরই সমান দৌড়।

এই খেলায় অনেক সময় এমন সব আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটে যার ফল হয় মারাত্মক ; এরকম বহু ঘটনা ওদের লিপিবদ্ধ আছে। আমি নিজেই দু তিনজনকে হাত পা ভাঙ্গতে দেখেছি। তবে মন্ত্রীদের যখন কসরৎ দেখাবার হুকুম হয়, তখন বিপদের সম্ভাবনা আরো বেড়ে যায়। তার কারণ হল সহকর্মীদের চেয়ে, এমন কি নিজেদের আগেকার দক্ষতার উপরে এখনকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে, তাঁরা এত অতিরিক্ত চেষ্টা করেন যে এমন একজনও বাকি নেই যিনি এক আধবার না পড়েছেন। কারো কারো দু' তিনবারও পতন হয়েছে। শুনলাম আমি আসবার বছর দুই আগে স্বয়ং ফ্লিম্‌ন্যাপ পড়ে গিয়ে নির্ঘাৎ ঘাড় ভাঙ্গতেন, নেহাৎ সম্রাটের একটি গদী দৈবাৎ এমন জায়গায় পাতা ছিল যে ঠিক তারি উপরে পড়াতে, আঘাতের চোটটা অনেকখানি কেটে গিয়েছিল।

এইরকম আরেকটা খেলাও আছে ; তবে সেটা কেবলমাত্র বিশেষ উপলক্ষ্যে শুধু সম্রাট, সম্রাজ্ঞী ও প্রধানমন্ত্রীকে দেখানো হয়। একটা টেবিলের উপরে সম্রাট ছ'ইঞ্চি লম্বা তিনটি মিহি রেশমি স্থতো পেতে রাখেন। একটা নীল, একটা লাল আর তৃতীয়টা সবুজ। সম্রাট যাদের বিশেষ সম্মান

দেখাতে ইচ্ছুক, এই সুতোগুলো তাদেরই পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়।

এই অনুষ্ঠানটি হয়ে থাকে সম্রাটের প্রধান সভাগৃহে আর পরীক্ষাও একেবারে অন্য ধরণের। বাস্তবিক পৃথিবীর নতুন বা প্রাচীন গোলার্ধের কোনো দেশেই আমি এই ধরণের পরীক্ষা আজ অবধি দেখি নি।

সম্রাট ছু' হাত দিয়ে একটা লাঠি এমন ভাবে ধরেন যাতে তার ছুটো মাথা দিগন্তরেখার সঙ্গে সমান্তরালে থাকে। লাঠিটাকে কখনো উঁচু করে আবার কখনো নামিয়ে ধরা হয়। সেই অনুসারে পরীক্ষার্থীরা একজন একজন করে এগিয়ে এসে কখনো লাঠির উপর দিয়ে লাফিয়ে, কখনো বা তলা দিয়ে গলে বার বার আসা যাওয়া করে। মাঝে মাঝে সম্রাট হয়তো লাঠির এক দিকটা ধরলেন আর প্রধানমন্ত্রী অন্য দিকটা, আবার কোনো সময়ে মন্ত্রী একাই লাঠি ধরলেন। যে সবচেয়ে বেশি দক্ষতা দেখাতে আর সবচেয়ে বেশিক্ষণ দম রেখে ঐ রকম লাফাতে আর হামাগুড়ি দিতে পারে, তাকে নীল রেশমি সুতো পুরস্কার দেওয়া হয়। দ্বিতীয় স্থান যার, সে পায় লাল সুতো আর তৃতীয় পায় সবুজ। কোমরের চারদিকে সুতোগুলোকে ছু' বার জড়িয়ে পরে থাকে ওরা। সম্মানিত সভাসদদের মধ্যে খুব কমই দেখা যায়, যার এইরকম একটা কটিবন্ধ নেই।

সৈনিক বিভাগের আর সম্রাটের নিজের ঘোড়াশালের ঘোড়াগুলোকে রোজ আমার সামনে নিয়ে আসা হত। ক্রমে তাদের ভয় ভেঙ্গে গেল, এখন এতটুকু না ঘাবড়িয়ে একেবারে আমার পায়ের গোড়া অবধি তারা এগিয়ে আসে। মাটিতে হাতের চেটো রাখি, ঘোড়সোয়াররা তার উপর দিয়ে ঘোড়া লাফায়। একবার সম্রাটের শিকারীদলের একজন একটা মস্ত ঘোড়ায় চেপে আমার জুতোসুদ্ধ পায়ের উপর দিয়ে ডিঙ্গিয়ে গিয়েছিল। ওদের পক্ষে এটা বাস্তবিক একটা অসাধারণ কীর্তি।

একবার একটা অভিনব উপায়ে সম্রাটের চিত্ত বিনোদন করবার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁকে অনুরোধ করলাম যেন ছু'ফুট লম্বা আর প্রমাণ মাপের হাতছড়ির মতো মোটা অনেকগুলো লাঠি আনতে আদেশ করেন। সম্রাট তাঁর বন-রক্ষীদের সর্দারকে সেই আদেশ পাঠালেন। পরদিনই ছ'জন বনরক্ষী ছ'টা আট-ঘোড়ায়-টানা গাড়ি নিয়ে উপস্থিত হল।

আমি করলাম কি, ন'টা লাঠি নিয়ে চতুষ্কোণ আকারে মাটিতে পুঁতে ফেললাম, লম্বা ও চওড়ার দিকে চতুষ্কোণের মাপ হল আড়াই ফুট করে। তারপরে আরো চারটে লাঠি নিয়ে কোণায় কোণায় জুড়ে চারকোণা করে মাটি থেকে দু'ফুট উঁচুতে আড়ভাবে বাঁধলাম। এবারে আমার রুমালটাকে নিয়ে ঐ ন'টা খাড়া লাঠির উপরে এমন টান করে পেতে বাঁধলাম, যে ঢোলের উপরের চামড়ার মতো আঁটো হয়ে থাকল। এরই চারপাশ ঘিরে, চারকোণা করে বাঁধা লাঠি চারটে রুমালের চেয়ে পাঁচ ইঞ্চির উঁচুতে একটা বেড়ার মতো হয়ে রইল।

কাজ শেষ হলে, সম্রাটকে অনুরোধ করলাম তাঁর শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহীদলের মধ্যে থেকে চব্বিশজন ঘোড়সোয়ারকে ডেকে, এই রুমাল-ভূমির উপরে কুচকাওয়াজ করাতে। সম্রাট এই প্রস্তাবে রাজী হলেন ; আমি তখন অস্ত্রশস্ত্র-সুদ্ধ ঘোড়সোয়ারদের একজন একজন করে হাতে নিয়ে রুমালের উপরে তুলে দিলাম। ওদের পরিচালনার জন্য উপযুক্ত সেনানায়করাও ছিলেন।

সারিবদ্ধভাবে প্রস্তুত হয়েই ওরা দু'দলে ভাগ হয়ে গেল। তারপরে সে যা কৃত্রিম যুদ্ধ দেখাল, কখনো ভোঁতা তীর ছোঁড়ে, কখনো তলোয়ার বের করে, কেউ পালায়, কেউ তাড়া করে যায়, কেউ আক্রমণ করে, কেউ পিছু হটে। সামরিক শিক্ষা ও কৌশলের এমন দৃষ্টান্ত আমি আর কখনো দেখি নি। আড়ে বাঁধা লাঠি চারটে থাকাতে কেউ মঞ্চের উপর থেকে গড়িয়ে পড়ে নি। সম্রাট তো এত খুসি হলেন যে হুকুম দিলেন কয়েক দিন ধরে যেন এই খেলাই দেখানো হয়। একবার আবার অনুগ্রহ করে আমার হাতে উঠে অশ্বারোহীদের নিজে আদেশ দিতে লাগলেন। এমন কি অনেক কষ্টে স্বয়ং সম্রাজ্ঞীকেও তাঁর ঘেরাটোপ দেওয়া চেয়ারসুদ্ধ আমার হাতে চড়ে, মঞ্চের দু গজ দূর থেকে খেলা দেখতে রাজী করালেন ; হাত থেকে দৃশ্যটাকে ভালোই দেখা যাচ্ছিল।

খেলার মাঝখানে যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে নি সেটা নিতান্তই আমার কপালগুণে। শুধু একবার একজন সেনাধ্যক্ষের তেজী ঘোড়া খুরের লাথি দিয়ে রুমালে একটা ছ্যাঁদা করে ফেলে, পা হড়কে সোয়াবসুদ্ধ আছাড় খেয়েছিল। আমিও তৎক্ষণাৎ দু'জনকেই বাঁচিয়ে দিয়েছিলাম। ফুটোটাকে এক হাতে চেপে ধরে, অন্য হাতে সৈন্যসামন্তদের যেমন একজন একজন করে

রুমালে তুলে দিয়েছিলাম, নামিয়েও দিলাম ঠিক সেইভাবে। যে ঘোড়াটা পড়ে গিয়েছিল তার বাঁ কাঁধটা মচকে গিয়েছিল, তবে সোয়ারের একটুও লাগে নি। পরে যথাসম্ভব রুমালটাকে সারিয়ে নিয়েছিলাম, তবু মনে হল এটার উপরে আর এরকম বিপজ্জনক খেলা দেখানো সমীচীন নয়। মুক্তি পাবার দু তিন দিন আগে সভাসদদের আমোদের জন্য খেলা-ধুলোর ব্যবস্থা করেছি, এমন সময় সম্রাটের কাছে বার্তা এল যে যেখানে আমাকে প্রথম দিন পাওয়া গিয়েছিল, তারি কাছে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে গিয়ে কয়েকজন প্রজা একটা প্রকাণ্ড কালো জিনিস দেখে এসেছে। পড়ে আছে মাটিতে, অদ্ভুত তার আকার, মাঝখানটা এক মানুষ উঁচু আর ধারটা সম্রাটের শয়নমন্দিরের মতো চওড়া হবে। প্রথমে ওদের ভয় হয়েছিল ওটা বুঝি একটা জ্যান্ত জানোয়ার, পরে বুঝল তা নয়, কারণ পড়েই আছে মাটিতে, নড়েও না চড়েও না। কয়েকজন ওটার চারদিকে অনেকবার করে ঘুরে দেখে এসেছে। তারপরে এ ওর কাঁধে চেপে ওটার উপরেও চড়ে দেখেছে, ওপরটা চ্যাপ্টা আর মসৃণ, পা দিয়ে ঠুকে বুঝেছে ভিতরটা ফাঁপা। বিনীতভাবে ওরা এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে ওটা নিশ্চয়ই মানুষ-পর্বতের সম্পত্তি। সম্রাট অনুমতি দিলে মাত্র পাঁচটা ঘোড়ার সাহায্যে জিনিসটাকে এখানে নিয়ে আসা যায়। খানিক বাদেই ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম, মনে মনে এই সংবাদে খুব খুসিও হলাম। বোধ হয় জাহাজডুবির পরে আমার মাথাটা একটু গুলিয়ে গিয়েছিল। দাঁড় বাইবার সময় টুপীটাকে দড়ি দিয়ে মাথার সঙ্গে বেঁধে রেখেছিলাম; সাঁতার কাটার সময়ও টুপীটা মাথাতেই ছিল, তারপর ডাঙ্গায় ওঠার পরে কখন মাথা থেকে পড়ে গিয়ে থাকবে। যেখানে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম সেখানে পৌঁছবার আগেই ব্যাপারটা ঘটে থাকবে, দড়িটা হয়তো দৈবাৎ ছিঁড়ে গিয়েছিল, আমি খেয়াল করি নি। আমার ধারণা হয়েছিল টুপীটা বুঝি সমুদ্রেই খোয়া গেছে।

সম্রাটকে বুঝিয়ে বললাম জিনিসটা কি এবং কিসের জন্য ব্যবহার করা হয়, তারপরে অনুরোধ করলাম যেন যত শিগগির সম্ভব ওটা আমার কাছে পৌঁছে দেবার হুকুম দেন। পরদিনই গাড়োয়ানরা টুপী নিয়ে হাজির, কিন্তু টুপীর অবস্থা কাহিল, কিনারা থেকে দেড় ইঞ্চি দূরে দুটো ছ্যাঁদা করে দুটো আঁকড়া পরানো হয়েছে, তারপর আঁকড়া দুটোকে লম্বা দড়ি দিয়ে

ঘোড়ার সাজের সঙ্গে বেঁধে, ইংল্যাণ্ডের হিসাব অনুসারে আধ মাইলের বেশি পথ টেনে আনা হয়েছে। তবে ওদেশের জমি খুব সমতল আর মোলায়েম বলে, যতটা ভেবেছিলাম ততটা ক্ষতি হয় নি।

এই ব্যাপারের দুদিন বাদে সম্রাটের সখ হল এক অভিনব উপায়ে আমোদ করতে হবে। রাজধানীর ভিতরে ও আশেপাশে যেসব সৈন্য ছিল, তাদের উপর হুকুম হল প্রস্তুত হতে। রোড্‌স দ্বীপে যে বিশাল "কলসাস" মূর্তি ছিল, তার মতো ভঙ্গীতে যতটা সম্ভব দু' পা ফাঁক করে সম্রাট আমাকে দাঁড়াতে বললেন। একজন জেনারেল ছিলেন প্রবীণ ও অভিজ্ঞ, আমার উপরে তাঁর যথেষ্ট আনুকূল্যও ছিল; এঁকে আদেশ করা হল খুব ঘন সারি বেঁধে আমার পায়ের ফাঁক দিয়ে সৈন্য মার্চ করিয়ে নিয়ে যেতে। পদাতিকরা এগোবে এক এক সারিতে চব্বিশ জন করে আর অশ্বারোহীরা ষোল জন করে। এদের যেতে হবে ড্রাম বাজিয়ে, নিশান উড়িয়ে, বল্লম আগিয়ে। পদাতিক ছিল চার হাজার আর এক হাজার ঘোড়াসোয়ার।

সম্রাটের আদেশ ছিল যে আমার ব্যক্তিগত সম্মান বাঁচিয়ে সবাইকে চলতে হবে, নতুবা প্রাণদণ্ড। তাতে অবিশ্যি আমার তলা দিয়ে চলে যাবার সময় জনাকতক তরুণ অফিসারের চোখ তুলে আমার দিকে তাকানো বন্ধ হয় নি! আর সত্যি কথা বলতে কি ততদিনে আমার ইজেরের যে অবস্থা দাঁড়িয়েছিল, তাতে হাসাহাসি করবার আর অবাক হবার যথেষ্ট কারণও ছিল!

এদিকে মুক্তিলাভের জন্য আমি এতগুলি আবেদন আর স্মারকলিপি পাঠাতে লাগলাম যে শেষ পর্যন্ত সম্রাট প্রথমে মন্ত্রিসভায়, তারপরে সাধারণ সভাতেও কথাটা পাড়লেন। একজন বাদে কেউ আপত্তি জানান নি। সেই একজন হলেন স্কাইরেস বলগোলাম, বিনা কারণে তিনি ছিলেন আমার পরম শত্রু। কিন্তু তাঁর মতের বিরুদ্ধেই আর সকলে প্রস্তাবটাকে সমর্থন করলেন, সম্রাটও অনুমোদন করে দিলেন।

ঐ মন্ত্রীটি ছিলেন ওদেশের 'গ্যালবেট', অর্থাৎ পোতবহরের অধ্যক্ষ, সম্রাটের একজন বিশ্বাসী কর্মচারী, অতি বিচক্ষণ, কিন্তু সেই সঙ্গে স্বভাবটা বড়ই বিমর্ষ আর মেজাজটা খিটখিটে। যাই হক, শেষ অবধি তাঁকেও রাজী করানো গেল, তবে এই সর্তে যে আমার মুক্তিলাভের নিয়ম-কানুনগুলো তিনি

নিজে তৈরী করে দেবেন। আর সেই সব নিয়ম মেনে চলব বলে আমাকে শপথ করতে হবে।

স্কাইরেস বলগোলাম তুজন নিম্ন-সচিব সঙ্গে নিয়ে নিজে এসে নিয়মগুলি আমার কাছে পৌঁছে দিলেন। প্রথমে সেগুলো আমাকে পড়ে শোনানো হল, তারপর ওগুলো মেনে চলব বলে আমাকে তু' তু'বার শপথ গ্রহণ করতে হল, প্রথমে আমাদের দেশের নিয়মে, তারপরে আবার ওদের দেশের নিয়ম অনুসারে, অর্থাৎ আমার ডান পাটাকে বাঁ হাতে ধরে, ডান হাতের মাঝের আঙ্গুল দিয়ে মাথার চাঁদি ছুঁয়ে, বুড়ো আঙ্গুলটা ডান কানের ডগায় লাগিয়ে।

পাঠক মহাশয়ের হয়তো ওদেশের ভাষার বৈশিষ্ট্য, ভাবপ্রকাশের ধরণ আর কি কি সর্তে আমাকে মুক্তি দেওয়া হল, এই সমস্তই জানবার কৌতূহল হচ্ছে। যতটা আমার ক্ষমতায় কুলিয়েছিল গোটা দলিলটার অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ করে রেখেছিলাম; সেইটি এবারে জনসাধারণের কাছে নিবেদন করছি।

"লিলিপুটের প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট, গোলবাস্তো মোমারেন এভ্লামে গুর্দিলো সেফিন মুলি উলি গিউ; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আনন্দ ও ভীতির আকর; পঞ্চ সহস্র ব্লুষ্ট্রুগ্ (অর্থাৎ প্রায় বারো মাইল পরিধি) ব্যাপিয়া ধরণীর সীমান্ত অবধি যাঁহার সাম্রাজ্যের বিস্তার; সকল সম্রাটের যিনি অধীশ্বর; সকল মানব-সন্তানের মধ্যে দীর্ঘতম যাঁহার দেহ; যাঁহার পদযুগল পৃথিবীর ভারসাম্যের কেন্দ্রবিন্দু, যাঁহার শিরোদেশ সূর্যকে স্পর্শ করে; যাঁহার শিরশ্চালনে পৃথিবীর অধিপতিগণ ভয়ে কম্পিত হয়েন; যিনি বসন্তকালের ন্যায় মধুর, বর্ষার ন্যায় আরামদায়ক, শরতের ন্যায় সুফলপ্রসূ ও শীতের ন্যায় ভয়াবহ, সেই রাজ-রাজেশ্বর আমাদিগের স্বর্গতুল্য সাম্রাজ্যে নবাগত 'মানুষ-পর্বতের' নিকট নিম্নলিখিত যে সকল প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছেন, তাহা যথার্থভাবে পালন করিবার জন্য তাহাকে শপথ গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রথম, সম্রাটের সীলমোহর করা অনুমতি ছাড়া মানুষ-পর্বত আমাদের রাজ্য ত্যাগ করিবে না।

দ্বিতীয়, আমাদের বিশেষ আদেশ না পাইলে রাজধানীতে সে পদার্পণ করিবে না; এবং যখন্ আসিবে, তাহার তুই ঘণ্টা পূর্বে নগরবাসীদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইবে যেন কেহ ঘরের বাহির না হয়।

তৃতীয়, প্রধান রাজপথগুলি ছাড়া অন্য কোন স্থানে মানুষ-পর্বত বেড়াইবে না এবং মাঠে বা শস্যক্ষেত্রে হাঁটার বা শয়ন করার প্রস্তাব করিবে না।

চতুর্থ, রাজপথে বেড়াইবার কালে তাহাকে বিশেষভাবে সাবধান হইতে হইবে যেন আমাদের প্রিয় প্রজাবর্গের কেহ বা তাহাদের অশ্বাদি ও যানবাহন পদদলিত না হয় এবং প্রজাদিগের নিজেদের সম্মতি ছাড়া তাহাদের কাহাকেও হাতে তুলিয়া লওয়া না হয়।

পঞ্চম, কোথাও দ্রুত সংবাদ প্রেরণের প্রয়োজন হইলে, বার্তাবহ এবং তাহার অশ্বকে পকেটে লইয়া মানুষ-পর্বত প্রতি পক্ষকালে একবার করিয়া ছয় দিন ধরিয়া ক্রমাগত যাতায়াত করিতে বাধ্য হইবে এই প্রয়োজন হইলে রাজসমীপে তাহাকে ফিরাইয়া আনিবে।

ষষ্ঠ, আমাদেব ব্লেফুস্কু দ্বীপবাসী শত্রুদের বিরুদ্ধে তাহাকে আমাদের পক্ষ অবলম্বন করিতে হইবে এবং তাহাদের যে নৌবহর আমাদের আক্রমণ করিবার নিমিত্ত আধুনা প্রস্তুত হইতেছে, তাহাকে বিনষ্ট করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে।

সপ্তম, অবসরকালে মানুষ-পর্বত আমাদের প্রধান প্রমোদকানন ও রাজ-প্রাসাদের অন্যান্য অট্টালিকার দেওয়াল নির্মাণের জন্য কয়েকটি বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর-খণ্ড উঠাইতে সাহায্য করিয়া আমাদের শ্রমিকমণ্ডলীর সহায়তা করিবে।

অষ্টম, দুই পক্ষকালের মধ্যে উক্ত মানুষ-পর্বত স্বীয় পদক্ষেপের দৈর্ঘ্য অনুসারে আমাদের সমগ্র তীরভূমির পরিমাপ করিয়া সমুদায় সাম্রাজ্যের পরিধি ও বিস্তার সম্বন্ধে একটি নির্ভুল মানচিত্র প্রস্তুত করিয়া দিবে।

পরিশেষে, এই সকল সর্ত পালন করিতে সশ্রদ্ধ অঙ্গীকার করিলে উক্ত মানুষ-পর্বতকে প্রতিদিন আমাদিগের ১৭২৮ জন প্রজার খোরাকের সমান পানাহার যোগান দেওয়া হইবে; তৎসঙ্গে রাজসমীপে উপস্থিত হইবার অধিকার ও আমাদিগের প্রসন্নদৃষ্টির অন্যান্য প্রমাণ দেওয়া হইবে।

বেলফোর‍্যাক্ প্রাসাদে, মদীয় রাজত্বের এক নবতিতম চান্দ্রমাসের দ্বাদশ দিবসে, এই দলিল প্রদত্ত হইল।"

আমি তো সন্তুষ্ট মনে, এমন কি মহা খুসি হয়েই এই সব সর্তে সম্মত হয়ে শপথ নিলাম। সর্তের মধ্যে অবিশ্যি এমন কতকগুলো কথা ছিল যাতে আমার মতে আমাকে যতটা সম্মান দেখানো উচিত, তা হয় নি, এবং তার একমাত্র

কারণ হল নৌবহরের অধ্যক্ষ স্কাইরেস বলগোলামের গাত্রদাহ ! যাই হক, তক্ষুণি আমার শিকলগুলো খুলে দেওয়া হল আর আমিও সম্পূর্ণ মুক্তি পেলাম। এই অনুষ্ঠানটির সময় আগাগোড়া আমার কাছে কাছে থেকে সম্রাট আমাকে সম্মানিত করেছিলেন। আমি তাঁর পায়ের কাছে প্রণিপাত করে কৃতজ্ঞতা জানালাম। তিনি অবিশ্যি আমাকে উঠতে আদেশ করলেন এবং অনেক প্রসন্ন বচন প্রকাশ করলেন, তবে পাছে লোকে আমাকে অহঙ্কারী বলে নিন্দা করে, তাই সেগুলির উল্লেখ করলাম না। সব শেষে সম্রাট বললেন যে তিনি আশা করে আছেন আমি তাঁর বিশ্বাসযোগ্য অনুচর হয়ে উঠব এবং যে সমস্ত প্রীতির চিহ্ন দিয়ে ইতিপূর্বেও তিনি আমাকে সম্মানিত করেছেন, ভবিষ্যতেও করতে পারেন, তার যোগ্যতার প্রমাণ দেব।

পাঠক মহাশয় লক্ষ্য করে থাকবেন যে মুক্তিলাভের শেষ সর্ত অনুসারে সম্রাট আমাকে ১৭২৮ জন লিলিপুটবাসীর যোগ্য খাবারের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কিছু দিন পরে আমার একজন সভাসদ বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করে ঐ রকম একটা নির্দিষ্ট সংখ্যার হিসাবের প্রণালীটি জেনেছিলাম। তিনি বলেছিলেন যে মানযন্ত্রের সাহায্যে ওরা আমার দৈর্ঘ্যের মাপ নিয়ে দেখে ওদের চেয়ে মাথায় আমি বারোগুণ লম্বা। আর শরীরের গড়ন যখন একই রকম তখন আমার দেহের ঘনত্ব ওদের ১৭২৮ গুণ হবে, কাজেই পুষ্টিও দরকার হবে ততগুণ। এই হিসাব থেকেই পাঠক মহাশয় অনুমান করে নিতে পারবেন ওদের উদ্ভাবনশক্তি কতখানি আর শুধু তাই নয়, অত বড় যে সম্রাট, তিনি নিজেও কত মিতব্যয়ী আর তাঁর হিসাব কেমন নিখুঁত।

চতুর্থ অধ্যায়

লিলিপুটের রাজধানী মিল্ডেণ্ডোর ও রাজপ্রাসাদের বর্ণনা—একজন প্রধান সচিবের সঙ্গে সম্রাজ্যের নানান বিষয়ে লেখকের কথোপকথন—যুদ্ধ ব্যাপারে সম্রাটকে উদ্ধার করা সম্পর্কে লেখকেব প্রস্তাব।

মুক্তি পাবার পর রাজার কাছে আমার প্রথম প্রার্থনা হল মিল্ডেণ্ডো সহর দেখতে যেন আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়। সম্রাট তক্ষুনি সে প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন, সেই সঙ্গে বিশেষ ভাবে আমাকে সতর্ক করে দিলেন যেন লোকজনদের বা তাদের বাড়িঘরের কোনো ক্ষতি না করি। ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে নগরবাসীদের আমার অভিপ্রায়ের কথা জানিয়ে দেওয়া হল। সহরের চারিদিকে ঘিরে রয়েছে আড়াই ফুট উঁচু দেওয়াল; সেটা অন্ততঃ এগারো ইঞ্চি পুরু হওয়াতে তার উপর দিয়ে একটা জুড়ি গাড়ি নিরাপদে চালানো যায়। দেয়ালের লাগোয়া দশ ফুট অন্তর একটা বুরুজ। আমি বিরাট পশ্চিম দুয়ার ডিঙ্গিয়ে, পাশ ফিরে খুব আস্তে আস্তে প্রধান রাজপথ দুটিকে পেরিয়ে গেলাম। পাছে আমার লম্বা কোটের ঝাপটা লেগে বাড়ির ছাদ বা কার্ণিশ ভেঙ্গে যায়, তাই শুধু খাটো ওয়েষ্ট কোট পরেছিলাম। আর যদিও কড়া হুকুম ছিল প্রাণের মায়া থাকলে কেউ যেন বাড়ির বার না হয়, তবুও ছুটোছাটা এক আধজন যদি দৈবাৎ পথে বেরিয়ে থাকে, তাদের যাতে মাড়িয়ে না ফেলি, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে চলাফেরা করতে লাগলাম।

বাড়ির চিলেকোঠার জানলায় আর ছাদের উপরে এমনি লোকে লোকারণ্য যে তাই দেখে আমার মনে হচ্ছিল এত বেড়ালাম, কিন্তু কোথাও কোনো সহরে এত লোকের বাস দেখি নি। সহরের আকারটা সমচতুষ্কোণের মতো, এক এক দিকের দেয়াল পাঁচশো ফুট করে লম্বা। দুটি বড় বড় রাজপথ দিয়ে সহরটি চারিটি সমান ভাগে বিভক্ত; এই রাস্তা দুটি পাঁচ ফুট করে চওড়া। দু'পাশ দিয়ে যে সব ছোট ছোট অলিগলি চলে গিয়েছে, তার মধ্যে আমার ঢুকবার উপায় ছিল না; তবে পেরিয়ে যাবার সময় দেখে মনে হল ওগুলো চওড়ায় হবে বারো থেকে আঠারো ইঞ্চি। পাঁচ লাখ লোক ধরে

ঐ সহরে। বাড়িগুলো তিন থেকে পাঁচতলা উঁচু। দোকান বাজারে প্রচুর জিনিসপত্র।

সহরের ঠিক মাঝখানে যেখানে বড় রাজপথ দুটি পরস্পরকে কেটে বেরিয়ে গেছে, সেইখানে সম্রাটের প্রাসাদ। মাঝখানে রয়েছে অট্টালিকাগুলো, তার থেকে কুড়ি ফুট তফাতে দু' ফুট উঁচু একটা দেয়াল সমস্ত প্রাসাদটাকে ঘিরে রয়েছে। দেয়াল ডিঙ্গিয়ে ভিতরে যাবার অনুমতি দিয়েছিলেন সম্রাট আর এতটা জায়গাও ছিল যে প্রাসাদের চারদিক ঘুরে ভালো করে দেখে নিতে পারলাম।

বাইরের মহলটি চারকোণা, এক এক দিকের মাপ চল্লিশ ফুট। এরই ভিতরে আরো দুটি মহল। সব চেয়ে ভিতরেরটি সম্রাটের নিজের মহল। সেটি দেখবার বড়ই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তার মেলা অসুবিধা, কারণ একটা মহল থেকে তার ভিতরের মহলে যাবার সদর দরজাগুলো মোটে আঠারো ইঞ্চি উঁচু আর সাত ইঞ্চি চওড়া! ওদিকে বাইরের মহলের ঘরবাড়িগুলো অন্ততঃ পাঁচফুট উঁচু। সেগুলো ডিঙ্গিয়ে যাবারও উপায় নেই, কারণ চার ইঞ্চি পুরু দেয়াল পাথর কেটে মজবুৎ করে তৈরী হলেও, ডিঙ্গোতে গেলে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

এদিকে সম্রাটের বড় ইচ্ছা যে আমি তাঁর প্রাসাদের জাঁকজমক দেখি। কিন্তু তিন দিনের আগে সেটা সম্ভব হল না। ঐ তিন দিনের মধ্যে সহর থেকে একশো গজ দূরে রাজোদ্যানের গোটা কতক বড় বড় গাছ আমার ছুরি দিয়ে কেটে ফেললাম। তারপর সেই কাঠ দিয়ে দুটো তিন ফুট উঁচু টুল বানালাম, এমন মজবুৎ করে যাতে তার উপরে দাঁড়ালে আমার ভার সয়।

তারপরে সহরের লোকদের আবার নোটিশ দেওয়া হল আর আমি টুল দুটো হাতে নিয়ে, সহরের মাঝখানে রাজবাড়ির সামনে গিয়ে হাজির হলাম। প্রথমে বাইরের মহলের পাশে একটা টুল পেতে তাতে চড়লাম। তারপর অন্য টুলটাকে হাতে নিয়ে বাড়িগুলোর ছাদ ডিঙ্গিয়ে সেটাকে প্রথম ও দ্বিতীয় মহলের মাঝখানকার ফাঁকা জমির উপরে রাখলাম। এই জায়গাটা হল আট ফুট চওড়া। তারপর অতি সহজেই বাড়ির উপর দিয়ে এক টুল থেকে অন্য টুলে টপকে গেলাম; গিয়েই একটা আঁকড়া লাগানো লাঠি দিয়ে প্রথম টুলটাকেও উঠিয়ে আনলাম। এইভাবে দ্বিতীয় মহল থেকে একেবারে

ভিতরের মহলে পৌছলাম। তারপরে পাশ ফিরে শুয়ে মাঝখানকার তলাগুলোর জানলা দিয়ে ভিতরে উঁকি মারলাম। এই জন্যই জানলা খুলেও রাখা হয়েছিল। ভিতরকার ঘরগুলোর জাঁকজমক কল্পনা করা যায় না!

সম্রাজ্ঞীকে দেখলাম, রাজকুমারদের দেখলাম, যাঁর যাঁর নিজের মহলে। সঙ্গে তাঁদের দাসদাসীরা। সম্রাজ্ঞী অনুগ্রহ করে প্রসন্ন হাসি হেসে জানলা দিয়ে হাতখানি বাড়িয়ে দিলেন, যাতে আমি তাতে চুমো খেতে পারি।

আগে থেকেই এই ধরণের বর্ণনা বেশি দিতে চাই না, সেগুলো বরং আমার বড় বইখানির জন্য তোলা থাক, সে বইও ছাপাখানায় যাবার জন্য প্রায় তৈরী হয়ে এল বলে। তাতে এই সাম্রাজ্যের বিশদ বর্ণনা আছে, প্রথমে কি ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তারপর একের পর এক বহু রাজা কি ভাবে রাজত্ব করলেন। সেই সঙ্গে আছে বিশেষ করে তাঁদের যুদ্ধবিগ্রহ, রাষ্ট্রনীতি, আইনকানুন, বিদ্যাশিক্ষা ও ধর্মের কথা আর আছে দেশের গাছপালা, জন্তুজানোয়ার, অদ্ভুত আচার-ব্যবহার ও অন্যান্য আশ্চর্য এবং প্রয়োজনীয় তথ্য। উপস্থিত আমার প্রধান বক্তব্য হল, ন' মাস ওদেশে বাস করবার সময় কি কি ঘটেছিল, ওখানকার জনসাধারণ ও আমি নিজে কোন কোন ব্যাপারে জড়িত ছিলাম, এই সব।

মুক্তি পাবার দিন পনেরো বাদে একদিন সকাল বেলায় যাঁকে বলা হয় ওখানকার ব্যক্তিগত ব্যাপারের মুখ্য সচিব, রেলড্রেসাল, একজনমাত্র চাকর সঙ্গে নিয়ে আমার বাড়িতে উপস্থিত হলেন। গাড়িটাকে কিছু দূরে অপেক্ষা করতে বলে, আমার সঙ্গে ঘণ্টাখানেক কথাবার্তা বলতে চাইলেন; ওঁর পদমর্যাদা ও ব্যক্তিগত নানান গুণের কথা মনে করে আমি তক্ষুনি সম্মত হলাম; তাছাড়া যখন আমি রাজদরবারে প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, সে সময় আমাকে নানান দিক থেকে ইনি প্রচুর সাহায্যও করেছিলেন।

আমি শুয়ে পড়বার প্রস্তাব করেছিলাম, তা হলে আমার কানের নাগাল পাওয়া ওঁর পক্ষে আরো সহজ হত, উনি কিন্তু আমার হাতে উঠে কথাবার্তা বলতে চাইলেন। প্রথমেই আমার মুক্তিলাভের জন্য অভিনন্দন জানালেন, বললেন ও ব্যাপারে ওঁর নিজের কিছু হাত ছিল বলে গর্ব রাখেন, তবে এও বললেন যে ঠিক এই সময়ে রাজদরবারের অবস্থা যদি এতটা সঙ্গীন না হত, তা হলে সম্ভবতঃ এত তাড়াতাড়ি আমাকে মুক্তি দেওয়া হত না।

রেলড্রেসাল বুঝিয়ে বললেন, "বিদেশীদের চোখে আমাদের অবস্থাটাকে যতই সমৃদ্ধিশালী বলে মনে হক না কেন, আসলে আমাদের দুটো সাংঘাতিক বিপদ ঘনিয়ে আসছে। অর্থাৎ দেশের মধ্যেই একটা দুর্দান্ত ষড়যন্ত্র আর বিদেশ থেকে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা। প্রথম বিপদটার বিষয় এইটুকু বলা চলে যে সত্তর মাসেরও বেশি হল, দেশের মধ্যে দুটি দলে দারুণ রেষারেষি চলেছে। এক দলের নাম ট্রামেক্সান, তাদের জুতোর গোড়ালি উঁচু; আরেক দলের নাম স্লামেক্সান তাদের জুতোর নিঁচু গোড়ালি; এই দিয়েই তাদের চেনা যায়।

লোকে অবিশ্যি বলে থাকে যে উঁচু-গোড়ালিরাই আমাদের প্রাচীন শাসনতন্ত্রের অনুকূল। সে যাই হক, আমাদের সম্রাট কিন্তু সঙ্কল্প করেছেন যে রাজকার্যে শুধু নিচু গোড়ালিদেরই নিয়োজিত করা হবে। আর সম্রাটের নিজের যত কর্মচারী নিয়োগ করবার অধিকার আছে, তারা সবাই হবে নিচু-গোড়ালি। সম্রাটের নিজের জুতোর গোড়ালি যে রাজসভার আর সবার চেয়ে অন্ততঃ এক 'ড্রুর'—ড্রুর হল এক ইঞ্চির চোদ্দ ভাগের এক ভাগ—নিচু, তা নিশ্চয়ই আপনি লক্ষ্য না করে পারেন নি।

এই দুই দলের মধ্যে এতই বিদ্বেষ যে তারা পরস্পরের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া, এমন কি বাক্যালাপ পর্যন্ত করে না। আমাদের হিসাবে উঁচু-গোড়ালিরা আমাদের চেয়ে দলে ভারি। তবে ক্ষমতা সবই আমাদের হাতে।

আমাদের আশঙ্কা হয় যে সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী স্বয়ং যুবরাজের হয়তো উঁচু-গোড়ালিদের প্রতি খানিকটা সহানুভূতি আছে, অন্ততঃ এটুকু তো প্রত্যক্ষই দেখা যায় যে ওঁর জুতোর একটা গোড়ালি অন্যটার চাইতে সামান্য উঁচু, তাব ফলে উনি একটু খুঁড়িয়ে চলেন।

নিজেদের ভিতরে এই সব অশান্তির উপরে আবার ব্লেফুস্কু দ্বীপ থেকে আক্রমণের আশঙ্কা। ব্লেফুস্কু হল বিশ্বের অপর সাম্রাজ্যটি, প্রায় আমাদের সাম্রাজ্যের মতোই বড় আর ক্ষমতাও তেমনি। কারণ আপনার কাছে যদিও শুনেছি যে পৃথিবীতে নাকি আরো অনেক সাম্রাজ্য আছে, যেখানে আপনার মতো বিশাল শরীর মানুষরা বাস করে, সে বিষয়ে কিন্তু আমাদের পণ্ডিতদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বরং ওঁরা অনুমান করেন যে আপনি হয় চাঁদ থেকে, নয় তো কোনো তারা থেকে নেমে এসেছেন, কারণ এটা তো নিশ্চিত

যে আপনার মতো শ' খানেক লোক এলে, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের সম্রাটের রাজ্যের সমস্ত ফল, শস্য আর গোরু ভেড়া সাবাড় হয়ে যাবে।

তাছাড়া আমাদের ইতিহাসের ছ' হাজার চান্দ্র-মাসের বিবরণীতেও লিলিপুট আর ব্লেফুস্কু, এই দুটি বিশাল সাম্রাজ্য ছাড়া কোথাও অন্য কোনো দেশের নামও করা হয় নি।

এখন যা আপনাকে বলতে চাইছি সেটা হল এই যে আজ ছত্রিশ মাস ধরে এই দুটি প্রবল প্রতাপশালী দেশের মধ্যে সমানে যুদ্ধ চলেছে, কেউ থামবার নাম করে না। যুদ্ধটা শুরু হয়েছিল এইভাবে :

এ কথা সকলেই জানেন যে খাবার আগে ডিম ভাঙবার প্রাচীন পদ্ধতি হল মোটা দিকটাতে ভাঙতে হয়। কিন্তু আমাদের সম্রাটের ঠাকুরদাদা যখন ছোট ছিলেন, তখন একবার ডিম খেতে গিয়ে পুরোনো নিয়মে যেই না সেটাকে ভেঙেছেন, অমনি তাঁর একটা আঙুল গেছে কেটে! তাইতে তাঁর পিতা, অর্থাৎ তখনকার সম্রাট, হুকুম করলেন যে তাঁর প্রজাদের সবাইকে এখন থেকে ডিমের সরু দিকটা ভাঙতে হবে, নইলে গুরুতর দণ্ড পেতে হবে।

আমাদের ইতিহাস বলে, এই আইনের ফলে প্রজারা এমনি ক্ষেপে গেল যে ছ'বার বিদ্রোহ হল। এই বিদ্রোহে একজন সম্রাটের প্রাণ গেল, একজনের সিংহাসন গেল। এই সমস্ত রাষ্ট্রীয় গোলযোগে ব্লেফুস্কুর রাজারা আরো উস্কানি দিতেন; যে দল হেরে যেত, তারা সবাই ফেরারি হয়ে ব্লেফুস্কুতে আশ্রয় নিত। হিসাব করে দেখা গেছে যে এই সময়ের মধ্যে মোট এগারো হাজার প্রজা প্রাণ দিয়েছে, তবু সরু মাথায় ডিম ভাঙতে রাজী হয় নি।

এই বিবাদ নিয়ে ক' শো মোটা মোটা বই ছাপা হয়েছে তার ঠিক নেই। তবে মোটা মাথার দলের লোকদের লেখা বই ছাপা হয়ে গেছে বহু দিন আগেই, তাছাড়া আইন করে ওদের কোথাও চাকরি পাওয়াও বন্ধ করা গেছে।

যখন এই আন্দোলন চলছে, ব্লেফুস্কুর সম্রাটরা দূত পাঠিয়ে অনেকবার প্রতিবাদ করেছেন, বলেছেন আমরা নাকি ধর্মজগতে ভেদ ঘটাচ্ছি। 'ক্রণ্ডেকাল' গ্রন্থের—ক্রণ্ডেকাল হল ওদের ধর্মগ্রন্থ—চুয়ান্ন নম্বর অধ্যায়ে আমাদের মহান ধর্মগুরু লুষ্ট্রগের নির্দেশের বিরুদ্ধে নাকি আমরা অপরাধ করেছি। আমরা অবিশ্যি এগুলোকে 'ভাষার কচকচি' বলে থাকি, কারণ

মূল কথাগুলো হচ্ছে—'সত্য ধর্মাবলম্বীরা যে মাথায় সুবিধা সেদিকে ডিম ভাঙ্গিবে।' আমার তো মনে হয় তার মানে হল কোন দিকে ডিম ভাঙ্গা হবে সেটা নির্ভর করছে নিজের বিবেকের, নিদেন পক্ষে প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেটের মতের উপর।

ঐ সব দেশত্যাগী মোটা-মাথারা ব্লেফুস্কু রাজদরবারে এত আস্কারা পেয়েছে আর এখানকার দলের কাছ থেকে এত সাহায্য ও উৎসাহ পেয়েছে যে আজ ছত্রিশ চান্দ্রমাস ধরে দুটো সাম্রাজ্যের মধ্যে সে যে কি রক্তাক্ত যুদ্ধ চলেছে সে আর কি বলব! কখনো ওরা জেতে, কখনো আমরা। এর মধ্যে আমাদের চল্লিশটা বড় বড় জাহাজ আর তার চেয়েও ঢের বেশি ছোট জাহাজ এবং সেই সঙ্গে আমাদের বাছাই করা ত্রিশ হাজার নাবিক ও সৈনিক, সব গেছে। শত্রুদের ক্ষতি হয়েছে নাকি আরো বেশি। সে যাই হক, উপস্থিত তারা এক বিশাল নৌবাহিনী প্রস্তুত করে আমাদের আক্রমণ করবার তোড়-জোড় করছে।

আপনার সাহসিকতা আর দৈহিক শক্তির উপরে সম্রাটের অগাধ আস্থা, তিনি আমাকে আদেশ করেছেন এই সঙ্কটের কথা সবিশেষ আপনার কাছে নিবেদন করতে।"

আমিও তখন সচিবকে বললাম সম্রাটের প্রতি আমার বিনীত আনুগত্যের কথা তাঁর কাছে যেন নিবেদন করা হয়। তাঁকে এ কথাও জানাতে বললাম যে আমার মনে হয় আমার মতো একজন বিদেশীর পক্ষে দেশের ভিতরকার দলা-দলির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা শোভা পায় না, কিন্তু প্রাণ তুচ্ছ করে, সকল আক্রমণকারীর হাত থেকে সম্রাটকে ও তাঁর সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে আমি সর্বদাই প্রস্তুত।

পঞ্চম অধ্যায়

অদ্ভুত কৌশলে লেখক দ্বারা আক্রমণ নিবারণ—উচ্চ সম্মানে ভূষিত হওন—ব্লেফুস্কুর সম্রাটের দূতদিগের আগমন ও শান্তি প্রার্থনা—সম্রাজ্ঞীর মহলে আকস্মিক অগ্নিকাণ্ড—লেখকেব সহায়তায় রাজবাড়ির অন্য অংশের রক্ষা লাভ।

ব্লেফুস্কু সাম্রাজ্য হল লিলিপুটের উত্তরপূর্ব কোণের উত্তরে একটি দ্বীপ; দুই সাম্রাজ্যের মাঝখানে কেবলমাত্র আট শো গজ চওড়া একটা প্রণালী। এসব আমার তখনও দেখা হয় নি, তাছাড়া আসন্ন আক্রমণের সংবাদ পেয়ে অবধি, সমুদ্রতীরের ঐ দিকটায় আর দেখাই দিই নি, পাছে শত্রুদের কোনো জাহাজ থেকে আমাকে দেখা যায়। এখন পর্যন্ত ওরা আমার বিষয়ে কোনো খবর পায় নি, কারণ যুদ্ধকালে দ্বীপের মধ্যে কোনোরকম যোগাযোগ রাখা একেবারে নিষিদ্ধ, অন্যথায় প্রাণদণ্ড। সমস্ত জাহাজের উপরেও নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

শত্রুপক্ষের গোটা নৌবহরকে গ্রেপ্তার করবার একটা মতলব ঠাউরে সম্রাটকে জানালাম। চরদের কাছে এর আগেই শুনেছিলাম ওদের জাহাজগুলো প্রস্তুত হয়ে, বন্দরে নোঙর ফেলে অপেক্ষা করে আছে, একটু অনুকূল বাতাস পেলেই রওনা হয়ে যাবে। আমাদের সব চেয়ে অভিজ্ঞ নাবিকরা ওখানকার সমুদ্রের গভীরতা বহুবার মেপে দেখেছে; তাই সেই বিষয়ে তাদের সঙ্গে খানিকটা পরামর্শ করলাম। তারা বললে জোয়ারের সময়ে প্রণালীর ঠিক মাঝখানের গভীরতা হয় সত্তর 'গ্লামগ্লাফ্', অর্থাৎ ইউরোপের মাপে ছ'ফুট, বাকিটা বড় জোর পঞ্চাশ 'গ্লামগ্লাফ্'।

ব্লেফুস্কুর ঠিক উল্টো দিকে, তীরস্থ একটা টিলার আড়ালে শুয়ে পড়লাম, পকেট থেকে ছোট দূরবীণটাকে বের করে নোঙর করা শত্রুপক্ষের জাহাজগুলোকে মনোযোগ সহকারে দেখলাম। পঞ্চাশটা মানোয়ারী আর অনেকগুলো মালবাহী জাহাজ।

বাড়ি ফিরেই মজবুত দেখে অনেকগুলো জাহাজ বাঁধবার কাছি আর

লোহার ডাণ্ডা চেয়ে পাঠালাম ; তার জন্য অবিশ্যি আমার কাছে অনুমতি পত্র ছিল। কাছি এল পার্শেল-বাঁধা দড়ির মতো মোটা, লোহার ডাণ্ডা-গুলো পশম-বোনার কাঁটার মতো মোটা আর সেইরকম লম্বা। আরো শক্ত করবার জন্য দড়িটাকে তিন ফেরতা করলাম আর কাঁটাগুলোর তিনটেকে এক সঙ্গে পাকিয়ে, আগাগুলোকে এক সঙ্গে বাঁকিয়ে আঁকড়ার মতো করে নিলাম। এইরকম পঞ্চাশটা আঁকড়া পঞ্চাশটা দড়িতে গেঁথে নিয়ে, ফিরে গেলাম উত্তর-পূর্ব উপকূলে। সেখানে পৌঁছে কোট জুতো মোজা খুলে ফেললাম। তারপরে জোয়ার আসবার আধঘণ্টা আগে, চামড়ার একটা ফতুয়া গায়ে দিয়ে সমুদ্রে নেমে পড়লাম। যত তাড়াতাড়ি পারি জল ভেঙ্গে খানিকটা হেঁটে গেলাম ; মাঝ-সমুদ্রে পৌঁছে গজ ত্রিশেক সাঁতরাতে হল, যতক্ষণ না পায়ের নিচে আবার মাটি পেলাম। এমনি করে আধঘণ্টার ভিতরে শত্রুদের নৌবহরের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম।

আমাকে দেখে ওরা এমনি ভয় পেল যে জাহাজ ছেড়ে যে যার মতো জলে লাফিয়ে পড়ে, সাঁতরে গিয়ে ডাঙ্গায় উঠল। সেখানেও অন্ততঃ পক্ষে ত্রিশ হাজার লোকের ভিড়! তখন আমি করলাম কি, জাহাজের মাথায় যে একটা করে ছ্যাঁদা থাকে, তার প্রত্যেকটার মধ্যে একটা দড়ি-বাঁধা আঁকড়া পরিয়ে, সবকটা দড়ির মাথা এক সঙ্গে গিট দিয়ে বাঁধলাম।

এই সব করছি, ওদিকে শত্রুরা আমার গায়ে হাজার হাজার তীর ছুঁড়ছে, তার কতকগুলো হাতে মুখেও বিঁধে যাচ্ছে, তাতে দারুণ জ্বালা করছে আর কাজের কম ব্যাঘাত হচ্ছে না! চোখদুটোর জন্যই সব চেয়ে ভাবনা হচ্ছিল ; যদি হঠাৎ একটা ফন্দি না করতাম নির্ঘাৎ ও দুটি যেত।

আমার গোপন পকেটে অন্যান্য কয়েকটা জিনিষের সঙ্গে এক জোড়া চশমাও ছিল, সে কথা আগেই বলেছি। সম্রাটের লোকেরা সেটা লক্ষ্য করে নি। এবারে সেই চশমা বের করে নাকের উপরে যতটা সম্ভব এঁটে বসিয়ে নিলাম। এইভাবে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে শত্রুদের তীর ছোঁড়া সত্ত্বেও বেপরোয়াভাবে কাজ করে চললাম। অনেকগুলো তীর চশমার উপরে এসে পড়ল, কিন্তু একটু বেঁকে যাওয়া ছাড়া তাতে চশমার কোনোই ক্ষতি হল না।

ততক্ষণে সমস্ত আঁকড়া পরানো হয়ে গেছে, এবারে গিঁটটাকে ধরে টানতে শুরু করলাম। কিন্তু একটা জাহাজও দেখি নড়ে না, সব নোঙর দিয়ে শক্ত

করে বাঁধা! কাজেই তখনো সব চেয়ে সাহসের কাজটিই বাকি! দিলাম দড়িটা ছেড়ে, আঁকড়া অবিশ্যি যেমন ছিল জাহাজেই লাগানো রইল আর আমি এতটুকু বিচলিত না হয়ে ছুরি বের করে এক এক করে নোঙরের দড়ি কাটতে লাগলাম। এই কাজ করতে গিয়ে বোধ হয় দুশোর বেশি তীর আমার হাতে মুখে লেগেছিল। কাজ শেষ করে আবার গিঁটটা তুলে নিয়ে, শত্রুপক্ষের পঞ্চাশটা বড় বড় মানোয়ারি জাহাজ অনায়াসে সঙ্গে করে টেনে নিয়ে এলাম।

আমার মৎলবটা যে কি, ব্লেফুস্কুর লোকেরা ধারণাই করতে পারে নি; প্রথমটা তারা এমনি অবাক হয়ে গিয়েছিল যে তাদের বুদ্ধিশুদ্ধি যেন লোপ পেয়েছিল।

জাহাজের দড়ি কাটতে দেখে ভেবেছিল আমার উদ্দেশ্যটা হল জাহাজ-গুলোকে স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়া, কিম্বা একটার সঙ্গে আরেকটাকে ধাক্কা লাগানো। কিন্তু শেষটা যখন দেখল সমস্ত জাহাজ সারি বেঁধে এগিয়ে চলেছে আর আমি দড়ি গাছার অন্য মাথা ধরে টেনে নিয়ে চলেছি, তখন দুঃখে হতাশায় তারা যে কি রকম বিলাপ করে উঠল সে ভাবা যায় না, বলা যায় না!

সঙ্কটের এলাকার বাইরে পৌঁছে, একটু থেমে হাত মুখ থেকে তীরগুলোকে খুলে ফেলে দিয়ে, সেই প্রথম যখন আমি এসেছিলাম তখন আমাকে যে মলম দেওয়া হয়েছিল, যার কথা আগেও বলেছি, তারই খানিকটা ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলাম। তারপরে চশমাটা খুলে ফেললাম। ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করতেই জোয়ারের জল কমে গেল, আমিও আমার লটবহর সুদ্ধ সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে জল ভেঙ্গে হেঁটে লিলিপুটের রাজ-বন্দরে নিরাপদে পৌঁছলাম।

সমস্ত মন্ত্রিসভার সঙ্গে সম্রাট এই মহান্ অভিযানের ফলাফলের অপেক্ষায় সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মস্ত অর্ধচন্দ্রাকারে জাহাজগুলোকে তাঁরা এগিয়ে আসতে দেখলেন, কিন্তু আমার বুক অবধি জল, তাই আমাকে আর লক্ষ্য করলেন না। যখন প্রণালীর মাঝখানে পৌঁছেছি তখন তাঁদের উদ্বেগ আরো বেড়ে গিয়েছিল, কারণ আমার সেখানে গলা-জল। সম্রাট ভাবলেন আমি নিশ্চয়ই ডুবে গেছি আর শত্রুদের নৌবহর যুদ্ধের জন্য এগিয়ে আসছে। অবিশ্যি অল্পকালের মধ্যেই তাঁর ভয় দূর হল, কারণ যেমন আমিও এগোচ্ছি জলের গভীরতাও কমে যাচ্ছে, অল্প সময়ের মধ্যেই আমি এত কাছে এসে গেলাম যে ডাকলে শোনা যায়। তখন জাহাজ-বাঁধা দড়ির গোছা শূন্যে তুলে চেঁচিয়ে বললাম—লিলিপুটের সর্বশক্তিমান সম্রাট দীর্ঘজীবী হউন।

তীরে উঠলে, মহামহিমান্বিত সম্রাট আমাকে যথাসম্ভব উচ্চ প্রশংসায় ভূষিত করে অভ্যর্থনা জানালেন, তাছাড়া তক্ষুণি আমাকে নার্দাক্ উপাধি দিয়ে সম্মানিত করলেন। ওটাই হল ও দেশের শ্রেষ্ঠ সম্মান।

সম্রাটের ইচ্ছা যে কোনো সুযোগে শত্রুপক্ষের বাকি জাহাজগুলোকেও আমি এদিককার বন্দরে নিয়ে আসি। রাজা-মহারাজাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার কোনোই সীমা থাকে না, সম্রাটের এখন অন্য কোনো চিন্তা নেই কেবল ভাবছেন কি উপায়ে ব্লেফুস্কুর গোটা সাম্রাজ্যটাকে তাঁর অধীনে একটা সামান্য প্রদেশ করে রেখে, একজন রাজপ্রতিনিধির সাহায্যে সেখানেও রাজত্ব করা যায়।

তাছাড়া বড়-মাথাদের নির্মূল করে, ওদের দলকে ডিমের সরু দিকটা ভাঙতে বাধ্য করানো ছিল তাঁর আরেকটি অভিপ্রায়। তা হলে তিনি নিজে সমস্ত পৃথিবীর একছত্র অধিপতি হতে পারবেন!

ন্যায় ও রাষ্ট্রনীতির অনেক যুক্তি দেখিয়ে আমি তো সম্রাটকে এই অভিপ্রায় থেকে বিচলিত করতে চেষ্টা করলাম। স্পষ্ট ভাষায় তাঁকে বলে দিলাম যে একটা স্বাধীন বীর জাতিকে দাসত্বে আবদ্ধ করবার জন্য আমি কখনই সাহায্য করতে রাজী নই। মন্ত্রিসভায় যখন এই বিষয়ে আলোচনা হল, যাঁরা সব চেয়ে বিচক্ষণ তাঁরা সকলেই আমার পক্ষ অবলম্বন করলেন।

সম্রাটের মনের মধ্যে যে সব অভিসন্ধি ও কূটনীতি বিরাজ করছিল, আমার প্রকাশ্য ও নির্ভীক কথাগুলোর মধ্যে তার এতই বিপরীত ভাব যে তিনি আমাকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারলেন না। চতুরভাবে সে কথাটা তিনি মন্ত্রিসভায় উল্লেখ করেছিলেন; তবে শুনেছিলাম যে সবচেয়ে বিচক্ষণ মন্ত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ অন্ততঃ নীরব থেকে আমাকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু আমার গোপন শত্রুও ছিলেন কয়েকজন, তাঁরা এই প্রসঙ্গে আমার প্রতি কটাক্ষ করে, কতগুলো মন্তব্য না করে ছাড়েন নি।

এই সময় থেকে সম্রাট এবং আমার প্রতি বিরূপ কয়েকজন মন্ত্রীর মধ্যে এমন একটা ষড়যন্ত্র পাকিয়ে উঠতে লাগল যে দু'মাস না যেতেই তার ফল দেখা গেল; তাতে আরেকটু হলেই আমার সর্বনাশ হয়ে যেত। রাজা-রাজড়াদের জন্য যত বড় কাজই করা যাক না কেন, তাঁদের লোভ সর্বদা চরিতার্থ করতে রাজী না হলে, তার কোনো মূল্যই থাকে না।

এই অভিযানের প্রায় তিন সপ্তাহ পরে, ব্লেফুস্কু থেকে কয়েকজন দূত এসে, গাম্ভীর্য ও বিনয়ের সঙ্গে শাস্তি প্রার্থনা করলেন। যে সব সর্তে শান্তিস্থাপন হল তাতে আমাদের সম্রাটের খুবই লাভ হল, তবে সে বিষয় বলে পাঠক-মহাশয়কে বিরক্ত করতে চাই না।

প্রায় পাঁচশো অনুচর নিয়ে ছ' জন দূত এসেছিলেন; তাঁদের প্রভুর সম্মান আর উদ্দেশ্যের গুরুত্ব অনুযায়ী উপযুক্ত আড়ম্বর করেই এসেছিলেন তাঁরা। তারপরে সন্ধি স্থাপনের অনুষ্ঠানটি চুকে গেল; মন্ত্রিসভায় আমার যেটুকু খাতির ছিল, অন্ততঃ বাইরে থেকে যেটুকু মনে হত, তারই জোরে এই ব্যাপারে আমি ওঁদের খানিকটা সাহায্য করতেও পেরেছিলাম।

আমার সহায়তার কথা পরে গোপনে শুনে ওঁরা যথাবিধি আমার সঙ্গে দেখা করে গেলেন। আমার সাহস আর উদার মনের জন্য প্রথমেই আমাকে অভিনন্দন করলেন, তারপর তাঁদের সম্রাটের পক্ষ থেকে ব্লেফুস্কু যাবার জন্য নিমন্ত্রণ জানালেন আর সব শেষে আমার অসাধারণ শক্তির কিছু প্রামাণ দেখতে চাইলেন; এই বিষয় নাকি তাঁরা নানান বিস্ময়কর গুজব শুনেছেন। আমি খুসি হয়েই কিছু কিছু দেখালাম, কিন্তু সে বিষয় খুঁটিয়ে বলে পাঠক-মহাশয়কে আর বিরক্ত করব না।

এইভাবে আদর আপ্যায়ন করে তাঁদের অশেষ সন্তোষ ও বিস্ময়ের কারণ হলাম, তারপরে তাঁদের অনুরোধ করলাম যে তাঁদের প্রভু ব্লেফুস্কুর সম্রাটকে তাঁরা যেন আমার বিনীত অভিবাদন জানান। আরো বললাম যে ব্লেফুস্কুর সম্রাটের গুণের খ্যাতি সারা পৃথিবীর অধিবাসীদের যথাযোগ্যভাবে বিস্ময়ে অভিভূত করেছে, দেশে ফিরে যাবার আগে আমিও একবার ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে শ্রদ্ধা নিবেদন করব বলে সংকল্প করেছি।

এর পরে যেই আমাদের সম্রাটের সঙ্গে দেখা হবার সৌভাগ্য হল, ব্লেফুস্কুর সম্রাটের সমীপে একবার যাবার অনুমতি প্রার্থনা করলাম। তিনি দয়া করে অনুমতি দিলেন বটে, কিন্তু তাঁর হাবভাবে আমার প্রতি কেমন একটা ঔদাসীন্যও স্পষ্ট লক্ষ্য করলাম। যদিও তখন এর কোনো সঙ্গত কারণ ভেবে পাই নি, পরে একজনের কাছ থেকে গোপনে শুনেছিলাম যে ফ্লিমন্যাপ আর বলগোলাম দুজনে মিলে দূতদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের ব্যাপারটাকে সম্রাটের কানে এমনভাবে লাগিয়েছিলেন, যেন তার মধ্যে সম্রাটের প্রতি

আমার বিরূপ মনোভাবের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। অথচ এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই যে সে ধরণের কিছু আমার মনে আদৌ ছিল না। রাজসভা আর মন্ত্রীদের ব্যাপার যে কি সাংঘাতিক এই প্রথম আমি অস্পষ্টভাবে বুঝতে আরম্ভ করলাম।

এটাও লক্ষ্য করবার বিষয় যে দূতরা আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলেন একজন দোভাষীর সাহায্য নিয়ে। ইউরোপের যে কোনো দুটো ভাষার মধ্যে যে তফাৎ, এই দুটি সাম্রাজ্যের ভাষাতেও ঠিক তাই। উভয়েরই নিজেদের ভাষার প্রাচীনতা, সৌন্দর্য আর সজীবতার জন্য ভারি গর্ব আর অপর পক্ষের ভাষার প্রতি প্রকাশ্য ঘৃণা! আমাদের সম্রাট ওঁদের নৌবহর অধিকার করার সুবিধাটুকু নিয়ে, পরিচয়পত্র আর যা যা বক্তব্য সবই লিলিপুটের ভাষায় লিখে দিতে ওঁদের বাধ্য করেছিলেন।

এখানে এ কথাও উল্লেখ করতে হয় যে দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের নানারকম যোগাযোগ ছিল; দুই পক্ষের নির্বাসিত অধিবাসীরা এদেশ থেকে ওদেশে ক্রমাগত যাতায়াত করত আর দুই দেশেরই প্রথা ছিল যে অভিজাত কিম্বা ধনী পরিবারের যুবকেরা অন্য দেশটাও একবার ঘুরে দেখে আসবে, যাতে পৃথিবী ভ্রমণ করে নিজেদের আচার ব্যবহারের উৎকর্ষ ঘটে এবং তারা মানুষ চিনতে শেখে ও তাদের রীতিনীতি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করে। এ সমস্তর ফলে অভিজাত পরিবারগুলোতে আর উপকূলবাসী বণিকদের ও নাবিকদের মধ্যে এমন লোক কমই আছে যে দুই ভাষাতেই কথাবার্তা চালাতে না পারে। এটা আমি লক্ষ্য করেছিলাম কয়েক সপ্তাহ বাদে; যখন ব্লেফুস্কুর সম্রাটের কাছে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়েছিলাম। আমার শত্রুদের চক্রান্তের ফলে তখন আমাব চারদিকে দুঃসময় ঘনিয়ে এসেছে, তবু সেখানে গিয়ে কি যে আনন্দ পেয়েছিলাম সে কথা যথাস্থানে বলব।

পাঠকমহাশয়ের স্মরণ থাকতে পারে যে মুক্তি পাবার সময়ে যে সব সর্তে আমি স্বাক্ষর দিয়েছিলাম, তার কতকগুলো আমার মনোমত ছিল না, কারণ সেগুলোর মধ্যে কেমন একটা হীন দাসোচিত ভাব ছিল।

কি আর করি, নিতান্ত উপায় ছিল না বলেই সব মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু এখন আমি 'নার্দাক্' উপাধি লাভ করেছি, ওদেশে ওর চেয়ে বড় সম্মান আর কিছু নেই, এখন আর ওসব কাজ আমার পক্ষে শোভা পায় না আর

সম্রাট নিজেও সে সব করবার কথা একবারও মুখে আনেন নি, এটুকু না বললে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। অবিশ্যি খুব বেশি দিন না যেতেই আমিও সম্রাটের একটি বিশেষ উপকার করবার সুযোগ পেয়েছিলাম, অন্ততঃ তখন তো তাই মনে হয়েছিল।

রাতদুপুরে আমার দোরগোড়ায় বহু লোকের চিৎকার শুনে চমকে জেগে উঠেছিলাম, হঠাৎ ঘুম ভাঙাতে খানিকটা ঘাবড়েও গিয়েছিলাম। ওদের মুখে বারবার "বুরগ্রুম" কথাটা শুনতে পাচ্ছিলাম। তারপরে রাজসভার অনেকে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে আমাকে অনুনয় করতে লাগলেন যেন অবিলম্বে রাজপ্রসাদে যাই, কারণ সম্রাজ্ঞীর মহলে আগুন লেগেছে। একজন সখীর অসাবধানতার জন্যেই এমন হয়েছে, সে উপন্যাস পড়তে পড়তে আলো না নিবিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল।

তক্ষুনি উঠে পড়লাম, আমার জন্য পথ ছেড়ে দেবার হুকুম হল। ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাত, কাউকে না মাড়িয়েই রাজবাড়িতে পৌছতে পারলাম। গিয়ে দেখি এরই মধ্যে রানীর মহলের দেয়ালে মই লাগানো হয়ে গেছে, প্রচুর বালতিও রয়েছে, কিন্তু জল আনতে হবে খানিকটা দূর থেকে। বালতিগুলো ছিল আমাদের সেলাই করার থিম্বলের মতো ছোট, বেচারিরা যত তাড়াতাড়ি পারে আমার হাতে বালতি যোগাচ্ছিল বটে, কিন্তু ও রকম প্রচণ্ড আগুনের সামনে তাতে কোনো সুবিধা হচ্ছিল না। আমার কোট চাপা দিয়ে আগুনটাকে সহজেই নিবিয়ে দিতে পারতাম কিন্তু দুঃখের বিষয় তাড়াতাড়িতে সেটি ফেলে শুধু চামড়ার ফতুয়াটা গায়ে দিয়েই চলে এসেছিলাম। অবস্থাটা একেবারে সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াত, যদি না আমার মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলত, সাধারণতঃ যা হয় না।

আগের দিন সন্ধ্যায় 'গ্লিমিগ্রিন' বলে একরকম সুস্বাদু মদ প্রচুর পরিমাণে পান করেছিলাম। এই মদকে ব্লেফুস্কুর লোকেরা বলে 'ফ্লুনেক', তবে আমাদেরটার 'তার' বেশি। সৌভাগ্যবশতঃ যতটা পান করেছিলাম তার সবটাই আর বের করে দিই নি। এখন হল কি, আগুনের অত কাছে আসাতে, তার গরমে আর আগুন নেবাবার চেষ্টার পরিশ্রমে, ঐ মদের প্রভাবটা গিয়ে পড়ল আমার মূত্রাশয়ে। আমিও সুযোগ বুঝে ঠিক যেখানে যেখানে দরকার সেখানে এমন প্রচুর পরিমাণে মূত্রত্যাগ করলাম যে তিন

মিনিটে আগুন টাগুন নিবে একাকার। এইভাবে যে প্রাসাদ তৈরী করতে অত যুগ লেগেছিল, তাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলাম।

ততক্ষণে ভোর হয়ে গেছে, আমিও তাই বাড়ি ফিরে এলাম। সম্রাটের অভিনন্দনের অপেক্ষায় আর বসে থাকলাম না। তাছাড়া যদিও তাঁদের একটা বড় উপকার করেছি, তবু যে উপায়ে কাজটি সম্পন্ন করতে হয়েছে, সেটাকে সম্রাট যে কি ভাবে নেবেন তা বুঝতে পারছিলাম না। ওদের দেশের মৌলিক আইনের মধ্যেই আছে যে যদি কোনো ব্যক্তি, তার পদমর্যাদা যাই হক না কেন, রাজপ্রাসাদের সীমানার মধ্যে প্রস্রাব করে, তার প্রাণদণ্ড হবে। তবু এইটুকু সান্ত্বনা যে সম্রাট সংবাদ পাঠালেন যে প্রধান বিচারসভায় তিনি আদেশ পাঠাচ্ছেন যেন আমাকে বিধিমতে ক্ষমা করা হয়; সে ক্ষমা কিন্তু আমি পাই নি। গোপনে আমাকে জানানো হয়েছিল যে আমার কাণ্ড দেখে সম্রাজ্ঞী এতই ঘৃণা বোধ করেছেন যে ওখান থেকে তাঁর বাস উঠিয়ে মহলের অন্য ধারে চলে গিয়েছেন আর সংকল্প করেছেন যে ও ঘরগুলির সংশোধন হলেও তিনি আর ব্যবহার করবেন না। শুধু তাই নয়, তাঁর প্রধানা সখীদের সামনেই এর প্রতিশোধ নেবার কথাও নাকি না বলে পারেন নি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

লিলিপুটের অধিবাসীদের কথা—শিক্ষা-দীক্ষা আইন-কানুন ও শিশুপালনের নিয়মাবলী—লেখকের বসবাসের পদ্ধতি—লেখক কর্তৃক জনৈকা উচ্চবংশীয়া মহিলার সম্মানরক্ষা।

যদিও লিলিপুট সাম্রাজ্যের বিশদ বর্ণনা একটা বিশেষ প্রবন্ধের জন্য আমার তুলে রাখার ইচ্ছা, তবুও মোটামুটিভাবে কয়েকটা বিবরণী দিয়ে পাঠক-মহাশয়ের কৌতূহল নিবৃত্ত করে আমি আপাততঃ নিবৃত্ত হচ্ছি। এখানকার অধিবাসীরা গড়ে ছ' ইঞ্চিরও কম লম্বা, সেই অনুপাতেই জীবজন্তু ও গাছ-পালারও মাপ। সব চেয়ে বড় গোরু ঘোড়া যেমন উঁচুতে চার থেকে পাচ ইঞ্চির মধ্যে, ভেড়াগুলো কমবেশি দেড় ইঞ্চি আর রাজহাঁসগুলো আমাদের চড়াই পাখির মতো। এইভাবে জন্তুজানোয়ার ছোট হতে হতে, একেবারে সব চেয়ে ছোটগুলো আমার চোখ দিয়ে দেখাই যাচ্ছিল না। কিন্তু প্রকৃতি-দেবী লিলিপুটবাসীদের চোখও ওদের প্রয়োজন মতোই গড়েছেন ; দৃষ্টি ওদের খুবই তীক্ষ্ণ, তবে বেশি দূর দেখতে পায় না।

কাছের জিনিষ দেখবার পক্ষে ওদের দৃষ্টিশক্তি এতই ভালো যে একজন রাঁধুনিকে একটা মাছির মতো ছোট লার্ক পাখিকে ছিঁড়ে টুকরো করতে, কিম্বা একজন তরুণীকে একটা অদৃশ্য ছুঁচে অদৃশ্য রেশমি সুতো পরাতে দেখে কি যে আনন্দ পেয়েছিলাম সে আর কি বলব !

ওদের দেশের সব চেয়ে বড় গাছগুলি সাত ফুট উঁচু, অর্থাৎ রাজোদ্যানের কয়েকটা বড় গাছের আগা আমি হাত মুঠো করে কোনোমতে ছুঁতে পারি। অন্যান্য তরিতরকারির মাপ এরই অনুপাতে, সে যে কেমন সেটা পাঠক-মহাশয়ই কল্পনা করে নিতে পারেন।

আপাততঃ ওদের জ্ঞানবিদ্যা সম্বন্ধে খুব বেশি বলব না। বহু যুগ ধরে ওদের মধ্যে বিদ্যার যাবতীয় শাখার চর্চা চলেছে, কিন্তু ওদের লেখার ধরণটা ভারি অদ্ভুত। ইউরোপের লোকদের মতো বাঁ দিক থেকে ডান দিকেও নয়, আরব দেশের মতো ডান দিক থেকে বাঁয়েও নয়, চীনদেশের মতো উপর

থেকে নিচেও নয়, কাস্কেজিয়ানদের মতো নিচে থেকে উপরেও নয়; এরা লেখে কোণাকুণি ভাবে, পাতার এক কোণা থেকে উল্টো কোণা অবধি, ইংলণ্ডের মহিলারা চিঠি লিখতে অনেক সময় যেমন করে থাকেন!

মৃতদেহ পোঁতে ওরা মাথাটাকে নিচের দিকে করে, কারণ ওদের বিশ্বাস এগারো হাজার চান্দ্রমাস পার হয়ে গেলে পর ওরা সবাই আবার বেঁচে উঠবে। তখন পৃথিবীটা—ওদের মতে পৃথিবীটা একটা চ্যাপ্টা জিনিস—যাবে উল্টে, কাজেই এভাবে সমাধিস্থ হলে পুনর্জীবন লাভের সময় সবাই নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে একেবারে প্রস্তুত হয়েই থাকবে। ওদের মধ্যে যারা বিদ্বান, তারা অবিশ্যি এই বিশ্বাসটাকে হাস্যকর বলে স্বীকার করে, তবু সাধারণ লোকে মানে বলে নিয়মটা এখনো চলে আসছে।

এদেশের কয়েকটা আইনকানুনও ভারি অদ্ভুত। এই নিয়মগুলো যদি আমার পরম আদরের মাতৃভূমির নিয়মের ঠিক উল্টোটি না হত, তা হলে এদের পক্ষ অবলম্বন করে হয়তো দু চার কথা বলতে পারতাম। তাছাড়া নিয়মগুলো যতটা ভালো, ততটা ভালোভাবে যদি সেগুলো পালন করা হত, তবেই হত বাঞ্ছনীয়। প্রথম যে নিয়মের কথা উল্লেখ করব, সেটা হল গুপ্তচরদের বিষয়। সব চেয়ে গুরু দণ্ড দেওয়া হয় রাজশক্তির বিরুদ্ধে যারা অপরাধ করে তাদের। কিন্তু আসামী যদি নিজের নির্দোষিতার স্পষ্ট প্রমাণ দিতে পারে, তাহলে ফরিয়াদীকে তক্ষুণি অত্যন্ত হীনভাবে হত্যা করা হয়। আর তার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি থেকে নির্দোষ আসামীকে তার সময়ের অপব্যয়, বিপন্ন অবস্থা, কয়েদ থাকার ক্ষতিপূরণ ও মামলার খরচ বাবদ চারগুণ অর্থ দেওয়া হয়। যদি অত টাকা না ওঠে তো রাজাই তার বেশির ভাগ দিয়ে দেন। তার উপরে রাজা তাকে প্রকাশ্যভাবে তাঁর প্রীতির কোনো একটা নিদর্শন দেন আর সহরময় তার নির্দোষিতার কথা ঘোষণা করা হয়। চুরির চেয়েও ওরা লোক ঠকানোকে বড় অপরাধ বলে মনে করে, তার জন্য ক্বচিৎ প্রাণদণ্ড থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়। ওরা বলে সাধারণ বুদ্ধি থাকলে একটু সাবধান ও সতর্ক হলেই নিজের জিনিসপত্রকে চোরের হাত থেকে রক্ষা করা যায়, কিন্তু দুষ্টু বুদ্ধি যার বেশি, তার কাছ থেকে সৎ লোকের আত্মরক্ষার কোনো উপায়ই নেই। আর যখন চিরকালই বেচাকেনা আর বাকিতে কারবার চলবে, যদি জোচ্চুরি অবাধে চলে, কিম্বা আস্কারা পায়, কিম্বা আইনতঃ সাজা না পায়, তা হলে সাধু

ব্যাপারীর যেমন চিরকাল সর্বনাশ হবে, তেমনি ঠগ জোচ্চোরদের চিরকাল সুবিধা হবে।

আমার মনে আছে একবার একটা লোক তার মুনিবকে ঠকিয়ে অনেক টাকা হাত করেছিল; কি যেন ফরমায়েস দেওয়া হয়েছিল, টাকাটি নিয়ে সে পালিয়েছিল। বিচারের সময় লোকটার হয়ে আমি একটু বলতে গিয়েছিলাম যে তেমন কিছু তো করে নি, শুধু একটু বিশ্বাসঘাতকতা বই তো নয়। যে যুক্তি দিলে আসামীর অপরাধের গুরুত্ব বাড়ে, তার দোষ কমাবার আশায় আমাকে ঠিক সেই কথাটি বলতে শুনে সম্রাট স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি, এর উত্তরে আমার এইটুকুর বেশি বলবার উপায় ছিল না যে এক এক দেশের এক এক রকম নিয়ম। বাস্তবিক ভারি লজ্জিত হয়েছিলাম। যদিও আমরা সকলেই সাধারণতঃ বলে থাকি যে যে-দুটি কব্জার উপর সরকারি কল ঘোরে, সে-দুটি হল শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন, তবুও লিলিপুটে ছাড়া অন্য কোনো দেশে এই কথাটাকে কার্যে পরিণত হতে দেখি নি। ওদের দেশে যে-ই প্রমাণ দিয়ে দেখাতে পারে যে তিয়াত্তর মাস ধরে সে দেশের সমস্ত আইন মেনে চলেছে, সে-ই কতকগুলো বিশেষ অধিকার আর নিজের পদ ও সাংসারিক অবস্থা বুঝে কিছু পয়সাকড়িও দাবী করতে পারে; এই উদ্দেশ্যে সরকার থেকে উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ আলাদা করে রাখা হয়েছে। তা ছাড়া তাকে 'স্নিল্‌পল' উপাধি দেওয়া হয়, তার মানে 'যে আইন মেনে চলে'। এই উপাধি তার নামের সঙ্গে সর্বদা উল্লেখ করা হয়, তবে তার বংশধররা উপাধিটাকে উত্তরাধিকার সূত্রে পায় না।

লিলিপুটের লোকদের যখন বললাম যে আমাদের দেশে আইন অমান্য করলে সাজা দেওয়া হয় বটে, কিন্তু পালন করার জন্য কোনো পুরস্কারের ব্যবস্থা নেই, ওদের মনে হয়েছিল এতে আমাদের দেশে ন্যায় বিচারের একান্ত অভাবই প্রমাণিত হচ্ছে। এই জন্যই ওদের দেশের আদালতে ন্যায়ের যে প্রতিমূর্তি থাকে, তার ছ'টা চোখ, দুটি সামনে, দুটি পিছনে আর দু পাশে দুটি। এর অর্থ হল যে ন্যায়ের সব দিকে দৃষ্টি থাকা উচিত। মূর্তির ডান হাতে থাকে এক থলে মোহর, বাঁ হাতে খাপেভরা তলোয়ার; তার মানে সাজার চেয়ে পুরস্কার দিতেই ন্যায়ের দেবতা বেশি ভালোবাসেন।

কোনো পদের জন্য যখন লোক নির্বাচন করা হয়, তখন তার গুণের বহরের

চেয়ে সৎ চরিত্রের দিকেই বেশি দৃষ্টি দেওয়া হয়। ওরা বলে মানুষের পক্ষে রাজশক্তি একটা প্রয়োজনীয় জিনিস আর সাধারণ মানুষের যতখানি বুদ্ধি থাকে তাই দিয়েই সব রকমের কাজ চালানো যায়। সাধারণের জন্য যে শাসন ব্যবস্থা, সেটার পরিচালনাকে এমনি একটা রহস্যজনক ব্যাপার করে তোলা কখনই বিধাতার উদ্দেশ্য নয় যে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক ছাড়া সে সব আর কারো বোধগম্যই হবে না। ও রকম লোক এক যুগে গুটি তিনেকের বেশি কদাচিৎ জন্মায়। ওদের মতে সত্য-পরায়ণতা, ন্যায়পরায়ণতা, সংযম ইত্যাদি গুণ সব মানুষেরই থাকতে পারে এবং ঐ গুণগুলির সদ্ব্যবহারের সঙ্গে যদি কিছুটা অভিজ্ঞতা ও সদিচ্ছা থাকে, তা হলে একমাত্র যে-সমস্ত কাজের জন্য কোনো বিশেষ শিক্ষার দরকার সেগুলিকে বাদ দিলে, দেশের আর সব কাজের জন্যই প্রত্যেকটি মানুষের যথেষ্ট যোগ্যতা থাকে।

ওরা বলে যে নৈতিক গুণের অভাবটা উঁচুদরের মানসিক গুণ দিয়ে কখনও পূর্ণ হয় না, কাজেই সে রকম লোকের হাতে কাজের ভার দেওয়া বিপজ্জনক। অন্ততঃ সচ্চরিত্র মূর্খ লোকেরা যে সব ভুলভ্রান্তি করে থাকে, তাতে জনসাধারণের ততটা মর্মান্তিক ক্ষতি হতে পারে না, যতটা হয় যদি কারো মন্দ কাজে যেমন একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকে, আবার তেমনি মন্দ কাজগুলি গুছিয়ে নিয়ে, তাদের ক্ষেত্র প্রসারিত করে, সেগুলোকে সমর্থন করবারও ক্ষমতা থাকে।

ঠিক এইভাবে ওদের মতে যারা ভগবানের মঙ্গল বিধানে বিশ্বাস করে না, তারা কোনো সরকারী পদের অযোগ্য। যেহেতু রাজারা বলে থাকেন যে তাঁরা ভগবানের প্রতিনিধি হয়ে রাজকার্য চালান, লিলিপুটবাসীদের মতে রাজার পক্ষে এমন লোক নিয়োজিত করার কোনো মানেই হয় না, যে রাজা নিজে যাঁর কাছ থেকে ক্ষমতা পেয়েছেন তাঁকেই অস্বীকার করে।

এই সব আইন আর এর পরেও যে সমস্ত আইনের বিষয় যখনই উল্লেখ করব, যে অর্থে ও উদ্দেশ্যে আইনগুলো প্রথম তৈরী হয়েছিল সেই কথা মনে করেই যা বলবার বলব। মানুষের স্বভাবের দোষে দেশবাসীদের হাতে পড়ে ঐ আইনেরই পরে যে রকম লজ্জাকর দুর্গতি হয়েছিল, তার কথা কিছুই বলব না। দড়ির উপর খানিকটা নেচে বড় বড় পদের অধিকারী হওয়া,

কিম্বা একটা লাঠির উপর দিয়ে লাফালাফি করার জন্য, কিম্বা তলা দিয়ে হামাগুড়ি দেওয়ার জন্য, প্রীতি ও সম্মানের চিহ্নলাভ করার কথাই ধরা যাক না কেন; পাঠকমহাশয়ের জেনে রাখা ভালো যে এইসব অতি নিন্দনীয় ব্যবস্থা প্রথম প্রবর্তন করেছিলেন আমাদের এখনকার সম্রাটের ঠাকুরদাদা। তারপরে দলাদলি আর দ্বন্দ্বের ভাব যত বেড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব নিয়মও মাত্রা ছাড়িয়ে আজকের এই বাড়াবাড়িতে দাঁড়িয়েছে।

ওদেশে অকৃতজ্ঞতার সাজা হল প্রাণদণ্ড, যেমন শুনেছি আরো কোনো কোনো দেশে আগে ছিল। এরা বলে, যে মানুষ উপকারীর সঙ্গেও মন্দ ব্যবহার করে সে হল বাকি মানবজাতির সাধারণ শত্রু, কারণ তার কাছ থেকে তো কোনো রকম উপকার কেউ কখনো লাভ করে নি। কাজেই এ রকম লোকের বেঁচে থাকা উচিত নয়।

বাপ-মা ও সন্তানদের পরস্পরের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধেও আমাদের সঙ্গে এদের মেলে না। লিলিপুটবাসীরা বলে নরনারীর মিলন হয় প্রাকৃতিক নিয়মে, বংশরক্ষা করবার উদ্দেশ্যে। অন্য জীবজন্তুর মতোই প্রবৃত্তির তাড়নায় নরনারী মিলিত হয় আর নিজেদের সন্তানের প্রতি তাদের মায়ামমতাও প্রকৃতিজনিত। এইজন্য ওরা একথা কিছুতেই মানে না যে বাপ জীবন দিয়েছে আর মা জন্ম দিয়েছে বলেই তাদের প্রতি সন্তানের কোনো বাধ্যবাধকতা আছে। সত্যি কথা বলতে কি, পৃথিবীর দুঃখ কষ্ট দেখেও তা মনে হয় না আর বাপ-মার মনেও সে রকম কিছু থাকে না। পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবার সময় সে রকম কোনো চিন্তা আদৌ তাদের মনে আসে না।

এই ধরণের আরো যুক্তির উপর ভিত্তি করে, ওরা বলে যে সন্তান পালনের ভার যাকেই দেওয়া হক না কেন, তাদের নিজেদের মা-বাবাকে যেন কখনো না দেওয়া হয়। সেই জন্য প্রত্যেক সহরে ওদের শিশুপালন-কেন্দ্র আছে, গরীব কুটিরবাসীরা আর শ্রমিকরা ছাড়া সবাইকে সেখানে তাদের ছেলেমেয়ে পাঠাতে বাধ্য করা হয়, যেই তাদের কুড়ি মাস বয়স হয়। ততদিনে নাকি তাদের মনে নিয়ম মেনে চলা সম্বন্ধে খানিকটা প্রাথমিক ধারণা জন্মে যায়। ক রকম অবস্থার পরিবার থেকে ছেলেমেয়েরা আসছে তাই বিচার করে নানান রকমের স্কুলও আছে; ছেলেদের মেয়েদের আলাদা ব্যবস্থা। অধ্যাপকরা আছেন, তাঁরা মা-বাপের পদমর্যাদা আর ছেলেমেয়েদের নিজেদের

ক্ষমতা ও স্বাভাবিক প্রবণতা বুঝে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে সুদক্ষ। আগে ছেলেদের স্কুলগুলোর সম্বন্ধে কিছু বলে, পরে মেয়েদের বিষয় বলব।

উচ্চবংশের ও অভিজাত পরিবারের ছেলেদের জন্য যে সব শিশু-কেন্দ্র আছে, সেখানে গুরুগম্ভীর ও পরম পণ্ডিত অধ্যাপকরা অনেকগুলি সহকর্মীর সাহায্যে কাজ চালান। ছেলেদের কাপড়চোপড় ও খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা একেবারে সাধারণ ও সাদাসিধে। তাদের শিক্ষার ভিত্তি হল সততা, ন্যায়, সাহস, নম্রতা, দয়া, ধর্ম ও দেশপ্রেম। খাওয়া দাওয়া ও বিশ্রামের জন্য খুবই সংক্ষিপ্ত একটুখানি সময় ও চিত্তবিনোদনের জন্য, অর্থাৎ শারীরিক ব্যায়ামের ছেলেদের ঘণ্টা দুই বাদ দিয়ে, বাকি সমস্তক্ষণই নানান্ কাজে নিয়োজিত থাকতে হয়। ছেলেদের চার বছর বয়স অবধি পুরুষ পরিদর্শকরা কাপড়চোপড় পরিয়ে দেন, তারপর থেকেই ওদের নিজেদের কাজ নিজেদের করতে হয়, বংশ তাদের যতই উঁচু হক না কেন। পরিচারিকা যারা আছে, তাদের বয়স হওয়া চাই আমাদের দেশের পঞ্চাশ বছরের মহিলাদের মতো আর তারা কেবলমাত্র সব চেয়ে হীন কাজগুলো করে দেয়।

চাকরদেব সঙ্গে ছেলেদের কথনো গল্প করতে দেওয়া হয় না। আমোদ-প্রমোদের জায়গা থেকে যাওয়া আসার সময় ছোটবড় দল বেঁধে ছেলেরা যায়, সঙ্গে সর্বদা থাকেন অধ্যাপকদের কেউ, কিম্বা তাঁদেরই কোনো সহকারী। তাতে আমাদের ছেলেমেয়েদের মনে অল্পবয়সেই যে রকম মূঢ়তা আর পাপাচারের ছাপ পড়ে যায়, তার কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

মা-বাবা ছেলেদের দেখতে পান বছরে মাত্র দু'বার, তাও এক ঘণ্টার বেশি থাকার জো নেই। আসবার ও যাবার সময় নিজের ছেলেকে তাঁরা চুমো খেতে পারেন বটে, কিন্তু সব সময়ই একজন অধ্যাপক উপস্থিত থাকেন ও কড়া দৃষ্টি রাখেন যাতে তাঁরা ছেলেদের কানে কানে কোনো কথা না বলেন, কিম্বা বেশি সোহাগ না দেখান। ছেলেকে কোনো খেলনা কি মিষ্টি উপহার এনে দেবারও অনুমতি নেই।

সন্তানের শিক্ষা ও বিনোদনের জন্য প্রত্যেক পরিবারকেই চাঁদা দিতে হয়; না দিলে, সরকারী কর্মচারীরা গিয়ে সেই টাকা আদায় করে আনেন।

যাঁদের মধ্যবিত্ত অবস্থা তাদের, অর্থাৎ বণিকদের, ব্যবসাদারদের আর যাঁরা নানা রকম হাতের কাজ করেন তাঁদের, ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থাও প্রত্যেকের

আর্থিক অবস্থা অনুসারে এই একই ধরণের। তবে যারা কোনো ব্যবসায়ে ঢুকবে, সাত বছর বয়স হলেই তাদের শিক্ষানবিশিতে ভর্তি করে দেওয়া হয়।

ওদিকে অভিজাত বংশের ছেলেদের শিক্ষা চলে পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত, তবে ওদের পনেরো হল আমাদের একুশের সমান। শেষের তিন বছর অবিশ্যি নিয়মকানুনের কড়াকড়ি আস্তে আস্তে কমিয়ে আনা হয়।

মেয়েদের শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতেও অভিজাত পরিবারের মেয়ের জন্য একই ধরণের ব্যবস্থা; তবে তাদের কাপড়চোপড় পরায় কয়েকজন শিষ্ট পরিচারিকা, সর্বদাই যদিও একজন না একজন অধ্যাপিকা কিম্বা তাঁদের সহকারী উপস্থিত থাকেন। মেয়েরা পাঁচ বছর বয়স হতে না হতে নিজেরাই কাপড় পরতে শেখে। যদি কখনো জানা যায় যে ধাত্রীদের কারো এতখানি আস্পর্ধা হয়েছে যে সে মেয়েদের কোনো ভয়ের কি মূঢ়তার গল্প বলেছে, কিম্বা ঝিরা সাধারণতঃ যে সব ন্যাকামি করে থাকে, তারই কিছু করেছে, তাহলে তাকে প্রথমে তিনবার সহরের চারদিকে ঘুরিয়ে সকলের সামনে বেত মারা হয়, তারপরে তাকে একটি বছর কারাবাস করতে হয়, তারপরে তাকে রাজ্যের সবচেয়ে নিরানন্দ নির্জন অঞ্চলে নির্বাসন দেওয়া হয়।

এর ফলে পুরুষদের মতো ওদেশের তরুণীরাও ভীতু কিম্বা বোকার মতো আচরণ করতে লজ্জা বোধ করে। শোভনীয়তা আর পরিচ্ছন্নতা ছাড়া অন্য কোনো রকম অলঙ্কার বা প্রসাধনকে ওরা ঘৃণা করে।

শুধু মেয়ে বলে এদের শিক্ষাপদ্ধতির কোনো প্রভেদ আমি লক্ষ্য করি নি, তবে মেয়েদের ব্যায়ামগুলো ছেলেদের মতো ঠিক অতটা জোরালো নয়। তা ছাড়া ঘর-গৃহস্থালী সম্বন্ধেও মেয়েদের কিছুটা শেখানো হয়, সেইজন্য অন্য বিদ্যার ক্ষেত্র সামান্য কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওরা বলে অভিজাত পরিবারের স্ত্রীরাও তো আর চিরদিন যৌবনকে ধরে রাখতে পারবে না, কাজেই তাদের স্বামীদের উপযুক্ত সঙ্গিনী হয়ে, বিবেচনা করে কাজ করতে হবে আর মন-মেজাজও ভালো রাখতে হবে।

বারো বছর বয়সকে ওরা বিয়ের বয়স মনে করে, তাই যেই মেয়েদের বারো বছর বয়স হয়, মা বাবা কিম্বা অভিভাবকরা এসে, অধ্যাপিকাদের গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, তাঁদের বাড়ি নিয়ে যান আর কদাচিৎ এমন হয় যে যাবার সময় মেয়েরা আর তাদের বান্ধবীরা খুব খানিকটা কান্নাকাটি না করে।

এদের চেয়ে নিচু বংশের মেয়েদের শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতেও মেয়েদের উপযুক্ত সব রকম কাজ, ছাত্রীদের বাড়ির অবস্থা বুঝে শেখানো হয়। যারা কোনো শিল্পকাজে শিক্ষানবিশি করবে, তাদের সাত বছর বয়সে ছেড়ে দেওয়া হয়, বাকিদের এগারো বছর অবধি রাখা হয়।

যে সমস্ত পরিবারের অবস্থা তেমন ভালো নয় তাদেরও বিদ্যালয়ের যৎসামান্য বার্ষিক মাইনেটুকু ছাড়া, প্রত্যেক মাসে নিজেদের রোজগার থেকে সামান্য কিছু বিদ্যালয়ের সরকারমহাশয়ের কাছে জমা দিতে হয়; এ টাকা অবিশ্যি ওদের ছেলেমেয়েদের জন্যই তোলা থাকে। এই আইনের ফলে ওদেশের মা বাবাদের সর্বদা হিসাব করে চলতে হয়। লিলিপুটবাসীদের মতে, লোকেরা ভোগসুখে ডুবে থাকবে, সন্তানের জন্ম দেবে, কিন্তু তাদের মানুষ করার ভারটি পড়বে জনসাধারণের উপরে, এর চেয়ে বড় অন্যায় আর কিছু হতে পারে না।

যাদের অবস্থা ভালো, তাদের কথা দিতে হয় যে নিজেদের পদমর্যাদা অনুসারে, প্রত্যেক সন্তানের জন্য কিছু টাকা তারা তুলে রাখবে। সে টাকা থেকে জমাখরচের কাজ চলে খুব হিসাব করে আর এতটুকু অন্যায়ের অবকাশ না রেখে।

গরীব কুটিরবাসীদের আর শ্রমিকদের ছেলেমেয়েরা বাড়িতেই থাকে, কারণ তাদের একমাত্র কাজ হবে মাটি কোপানো আর জমি চষা, কাজেই তাদের শিক্ষা সম্বন্ধে জনসাধারণের বিশেষ কিছু যায় আসে না। তবে গরীবদের মধ্যে যারা বৃদ্ধ কিংবা রুগ্ন, তাদের জন্য হাসপাতালের ব্যবস্থা রয়েছে। এদের দেশে ভিক্ষাবৃত্তি কাকে বলে কেউ জানে না।

তারপরে ও দেশে তো ছিলাম নয় মাস তেরো দিন; ওখানে আমার গৃহস্থালীর কি রকম ব্যবস্থা ছিল আর দিন কাটত কি ভাবে, সে কথা শুনলে কৌতূহলী পাঠকদের হয়তো মজা লাগতে পারে। আমার হল যন্ত্রপাতির মাথা, তাছাড়া অনেকখানি প্রয়োজনের তাগিদেও রাজোদ্যানের সব চেয়ে বড় গাছের কয়েকটাকে কেটে নিয়ে, নিজের সুবিধার জন্য একটা টেবিল আর একটা চেয়ার তৈরী করেছিলাম। দুশো জন মেয়ে দরজিকে আমার জন্য সার্ট আর বিছানার ও টেবিলের চাদর সেলাই করার কাজে লাগানো হয়েছিল। চাদরের কাপড় ছিল ওদেশে যতটা মজবুৎ আর মোটা পাওয়া যায়, তাও

অনেকবার ভাঁজ করে লেপের মতো সেলাই করে নিতে হয়েছিল, কারণ সবচেয়ে যেটা মোটা সেও আমাদের মলমলের চেয়ে মিহি! ওদের কাপড়ের থানগুলো সাধারণতঃ হয় বহরে তিন ইঞ্চি হাতে তিন ফুট।

আমাকে মাটিতে শুইয়ে দরজিরা মাপ নিল, একজন আমার গলার উপরে আর একজন উরুর মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে, একটা মোটা দড়ির দুমাথা টান করে ধরল, তারপরে তৃতীয় একজন একটা এক ইঞ্চি লম্বা গজ রুল দিয়ে দড়িটাকে মেপে নিল। তাছাড়া শুধু আমার হাতের বুড়ো আঙুলটার মাপ নিল, আর কিছুর নাকি দরকার হয় না। ওরা হিসাব করে দেখেছে যে বুড়ো আঙুলের ঘেরের দুগুণ হল হাতের কব্জির ঘের, তার দুগুণ হল গলা আর তার দুগুণ হল কোমর।

আমার পুরোনো সার্টটাকে নমুনার জন্য মাটিতে পেতে দিলাম, তারই সাহায্যে ওরা কি সুন্দর জামা ফিট করিয়ে দিল। ঠিক এইভাবে আমার কোট পেণ্টেলুন ইত্যাদি তৈরী করবার জন্য তিন শো পুরুষ দরজিও খাটতে লাগল। এদের মাপ নেবার ধরণটা কিন্তু অন্য রকম। আমি হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসলাম আর ওরা মাটি থেকে আমার গলা পর্যন্ত একটা মই লাগাল। তারপরে একজন লোক সেই মই বেয়ে উঠে আমার কলার থেকে মাটি পর্যন্ত একটা জল মাপবার ওলন দড়ি ঝুলিয়ে দিল। ঐ মাপটাই হল আমার কোটের ঝুল। কোমর আর হাত আমি নিজেই মেপে দিলাম। কাপড়চোপড়গুলো সেলাই হল আমার বাড়িতে, কারণ ওদের সব চেয়ে বড় বাড়িতেও জায়গা কুলোত না। যখন সেলাই শেষ হল, দেখতে হল আমাদের দেশের মেয়েরা যে জোড়া-তালির কাঁথা করে অনেকটা সেই রকম, তবে এগুলো সবই এক রঙের এই যা তফাৎ।

তিন শো জন রাঁধুনি আমার খাবার তৈরী করত। আমার বাড়ির চারপাশে দিব্যি ছোট ছোট কুটির বানিয়ে নিয়ে তারা সপরিবারে বাস করত। এক একজনে দু ডিস খাবার তৈরী করে দিত। যারা পরিবেশন করত, তাদের জনা কুড়িকে হাতে তুলে নিয়ে আমার টেবিলে চড়িয়ে দিতাম, আর শতখানেক অপেক্ষা করে থাকত নিচে, কারো হাতে মাংসের থালা, কারো কাঁধে মদের কিম্বা অন্যান্য পানীয়ের পিপে ঝোলানো। যখন আমার যা দরকার পড়ছে, টেবিলের উপরকার লোকরা ভারি কৌশল করে

দড়ি দিয়ে টেনে তুলছে, ঠিক যেমন করে আমাদের দেশে আমরা কুয়ো থেকে বালতি করে জল তুলি।

ওদের এক থালা মাংস আমার একটা বড় গ্রাস, ওদের এক পিপে মদে আমার একটা লম্বা চুমুক। ওদের ভেড়ার মাংস আমাদের দেশের মতো অতটা ভালো নয়, কিন্তু গোরুর মাংস অতি উপাদেয়। খেতে গিয়ে এত বড় বড় রাং পেয়েছি যে তিন কামড়ে খেতে হয়েছে, তবে এরকম সচরাচর পাইনি। আমাদের দেশে ছোটখাটো পাখি যেমন আমরা হাড়গোড় সুদ্ধ চিবিয়ে গিলে ফেলি, সেই রকম করে এসব মাংস আমাকে খেতে দেখে চাকররা তো একেবারে হাঁ! ওদের হাঁস পেরু প্রায়ই এক গ্রাসে খেয়ে ফেলতাম আর এ কথা মানতেই হবে যে আমাদের হাঁস পেরুর চেয়ে ওগুলোর স্বাদ অনেক ভালো। আরো ছোট যে সব পাখি দিত, তার বিশ-ত্রিশটাকে একসঙ্গে ছুরির আগায় তুলে নিতে পারতাম।

আমি কি ভাবে থাকি তার গল্প শুনে সম্রাটের একদিন ইচ্ছা হল যে সম্রাজ্ঞী, রাজকুমার ও রাজকন্যাদের নিয়ে আমার সঙ্গে খাবার 'আনন্দ'—এটা তারই কথা—উপভোগ করেন। যথাসময়ে এলেন তাঁরা আর আমি তাঁদের সবাইকে টেবিলে তুলে, চারদিকে তাঁদের প্রহরীদের সাজিয়ে, একেবারে আমার মুখের সামনে সিংহাসনে বসালাম। সাদা ডাণ্ডা হাতে প্রধান অর্থ-সচিব ফ্লিম্‌ন্যাপও ওঁদের সঙ্গে ছিলেন। আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে বারে বারে তিনি বিরস বদনে আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন, কিন্তু আমি যেন তা দেখতেই পাই নি এমন ভাব করে, কতকটা আমার প্রিয় জন্মভূমির সম্মান রাখবার জন্যে, আর কতকটা ওঁদের তাক লাগিয়ে দেবার জন্যে, অন্য দিনের চেয়েও বেশি করে খেলাম।

সে বিষয়ে কিছু মুখে না বললেও, এই কথা মনে করবার আমার যথেষ্ট কারণ ছিল যে আমার বাড়িতে সম্রাটের এই শুভাগমনের ব্যাপারটা থেকেই ফ্লিম্‌ন্যাপ আমার অনিষ্ট করার সুযোগ খুঁজে নিয়েছিলেন। এই মন্ত্রীটি ভিতরে ভিতরে সর্বদাই আমার শত্রু, যদিও বাইরে ওঁর মতো নিরানন্দ প্রকৃতির লোকের পক্ষে আমাকে যেন বেশি করেই আদর দেখাতেন। রাজাকে তিনি মনে করিয়ে দিতেন যে রাজকোষের অবস্থা খারাপ, বাট্টার ভাগ ছেড়ে দিয়ে টাকা তুলতে হচ্ছে, এক্সচেকার বিলগুলো এখন নয় পারসেণ্ট ঊনহারের

নিচে আর চলছে না, আমার জন্য সম্রাটের এরই মধ্যে পনেরো স্প্রুগ্ খরচ হয়ে গেছে। স্প্রুগ্ হল ওদের দেশের সোনার মোহর, মাপে প্রায় একটা চুমকির সমান বড়! মোট কথা সুযোগ পেলেই আমাকে বিদায় করে দেওয়া সম্রাটের কর্তব্য একথা তিনি সর্বদাই বলতেন।

এবারে একজন অতিশয় সদ্গুণসম্পন্না মহিলার সুনাম রক্ষা করবার জন্য আমি কতকগুলো কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি। তাঁর নিজের কোনোই দোষ ছিল না, বরং আমারই জন্য তাঁকে যথেষ্ট কষ্ট পেতে হয়েছিল। ব্যাপার হয়েছিল কি, কয়েকজন নিন্দুক লোক গিয়ে কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের কানে তুলে দিল যে আমার প্রতি তাঁর স্ত্রীর মনে নাকি একটা দারুণ দুর্বলতা জন্মেছে। তাই শুনে তাঁর কি খেয়াল হল যে মনটা একেবারে ঈর্ষায় ভরে গেল। রাজসভায় সবাই বলাবলি করতে লাগল যে ভদ্রমহিলা নাকি একবার গোপনে আমার বাসাবাড়িতে পর্যন্ত এসেছিলেন! এটা যে কত বড় একটা জঘন্য মিথ্যা কথা, যা রটবার আদৌ কোনো কারণ ছিল না, সে আর কি বলব। শ্রদ্ধেয়া ভদ্রমহিলা আমার সঙ্গে সরলভাবে, নির্দোষ বন্ধুর মতো ব্যবহার করতেন।

অবিশ্যি এ কথা স্বীকার করছি যে তিনি প্রায়ই আমার বাড়িতে আসতেন, কিন্তু সর্বদা প্রকাশ্যভাবে, সঙ্গে গাড়িতে দু তিনজন সঙ্গী থাকতেন, হয় তাঁর বোন, নয়তো মেয়ে, নয়তো কোনো বিশেষ বন্ধু। এভাবে রাজসভার অন্যান্য মহিলারাও অনেকেই আসতেন। আজ পর্যন্ত আমার চাকররা বলতে পারবে কোনোদিনও কোনো গাড়ি আমার দোরগোড়ায় এমনভাবে রাখা হয়েছিল কি না, যাতে সোয়ারীদের তারা দেখতে না পায়।

কেউ এলেই একজন চাকর গিয়ে প্রথমে আমাকে খবর দিত, খবর পেয়েই তক্ষুণি দরজায় গিয়ে উপস্থিত হওয়া ছিল আমার অভ্যাস। তারপরে যথা-যোগ্য অভিবাদন জানিয়ে, দুটো ঘোড়া সুদ্ধ গাড়িটাকে সযত্নে হাতে তুলে নিতাম। ছ'টা ঘোড়া থাকলে, সহিস চারটেকে খুলে রাখত। আমার টেবিলের চারধার ঘিরে পাঁচ ইঞ্চি উঁচু একটা বেড়ার মতো তৈরী করে নিয়েছিলাম, পাছে কোনো বিপদ ঘটে; অবিশ্যি বেড়াটাকে খুলে রাখা যেত। টেবিলের মাঝখানে গাড়িটাকে নামিয়ে রাখতাম। কত সময় অতিথি বোঝাই চার চারটে জুড়িগাড়িকে একসঙ্গে টেবিলে রেখে, অতিথিদের দিকে

ঝুঁকে চেয়ার টেনে নিজে বসেছি। যতক্ষণ একদলের সঙ্গে কথা বলছি, ততক্ষণ গাড়োয়ানরা অন্য গাড়িগুলোকে আস্তে আস্তে চালিয়ে টেবিলের চারধারে চক্কর দিত।

কত সময় এইভাবে গল্প-গুজব করে সারা বিকেলটা কত না আনন্দে কাটিয়েছি। কোষাধ্যক্ষ মহাশয় আর তাঁর ঐ দুটি চুকলিখোর চরকে আমি ধিক্কারের সঙ্গে জানাচ্ছি—লোক দুটোর নাম বলেই ফেলি, যা খুসি করুক গে তারা, ক্লুষ্ট্রিল আর ড্রুন্‌লো—আসুক তারা, এসে প্রমাণ করুক সচিব রেলদ্রেসাল ছাড়া কেউ কখনো গোপনে আমার কাছে এসেছে কি না—আর তিনিও যে এসেছিলেন সম্রাটেরই হুকুমে সে কথা তো আগেই বলেছি।

এই ব্যাপারের সঙ্গে একজন অভিজাত মহিলার সুনাম জড়িত না থাকলে, এই তুচ্ছ বিষয় নিয়ে এত বিস্তারিতভাবে আমি কখনোই বলতাম না, নিজের সম্মানের কথা ছেড়েই দিলাম। অথচ আমি নার্দাক্ উপাধি পাবার মর্যাদা-লাভ করেছিলাম, যা কোষাধ্যক্ষ মহাশয় নিজেও করেন নি। কে না জানে যে উনি হলেন ক্লুমগ্লুম মাত্র, নার্দাকের চেয়ে এক ধাপ নিচে, ইংল্যাণ্ডে মারকুইসরা যেমন ডিউকদের এক ধাপ নিচে। তবে এ কথাও মানি যে পদমর্যাদায় তিনি আমার আগে।

এই সব মিথ্যা রটনার বিষয় আমি অনেক পরে শুনেছিলাম, তাও একেবারে আকস্মিকভাবে, তবে কি ভাবে শুনেছিলাম সে আর বলার যোগ্য নয়। এই রটনার ফলে কিছুকাল ধরে কোষাধ্যক্ষ মহাশয় নিজের স্ত্রীকে দেখলেই মুখ ভার করতেন আর আমাকে দেখলে ততোধিক। শেষ পর্যন্ত অবিশ্যি তাঁর চোখ ফুটেছিল আর স্ত্রীর সঙ্গে মিটমাট করে নিয়েছিলেন, কিন্তু আমাকে তিনি কোনো দিনই বরদাস্ত করতে পারলেন না। এমন কি আমার প্রতি সম্রাটের পক্ষপাতিত্বও দেখতে দেখতে কমে যেতে লাগল, তাঁর ওপর ঐ পেয়ারের সভাসদটির এতই বেশি প্রভাব ছিল।

সপ্তম অধ্যায়

লেখকের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আমার ষড়যন্ত্রের সংবাদে ব্লেফুস্কুতে পলায়ন ও সেখানে অভ্যর্থনা লাভ।

লিলিপুটরাজ্য ছেড়ে যাওয়ার কাহিনী বলার আগে, দু মাস ধরে আমার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে যে একটা ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছিল সে বিষয়ে বলা দরকার।

এতাবৎকাল আমি রাজসভার ধরণধারণ সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ ছিলাম, পয়সাকড়ির অভাবে সভায় যাবার যোগ্যতাও ছিল না। অবিশ্যি বড় বড় রাজা মন্ত্রীদের হাবভাব সম্বন্ধে যথেষ্ট শুনেছিলাম আর পড়েওছিলাম।

কিন্তু এরকম একটা দূরদেশে এসে, যেখানকার নিয়মকানুন ইউরোপ থেকে একেবারে আলাদা রকমের, এখানেও যে তাদের এমন বিষময় প্রতিক্রিয়া দেখব, এ আমি কখনো আশা করি নি।

ব্লেফুস্কুর সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে যাবার তোড়জোড় করছি, এমন সময় রাজসভার একজন সম্মানিত সভা বন্ধ পালকি চড়ে, রাত্রে লুকিয়ে আমার বাড়িতে এলেন। নিজের নাম প্রকাশ না করে ভিতরে আসতে চাইলেন। এক সময় ইনিই যখন রাজরোষে পড়েছিলেন তখন আমি তাঁর অনেক উপকার করেছিলাম। পালকি বেহারাদের বিদায় দিয়ে, পালকি সুদ্ধ আমার সম্মানিত অতিথিকে কোটের পকেটে পুরলাম। তারপরে একজন বিশ্বাসী চাকরকে বললাম কেউ জানতে চাইলে বলবে যে আমার শরীর অসুস্থ তাই শুয়ে পড়েছি। তারপর দরজায় ছিটকিনি দিয়ে, অভ্যাসমতো পালকিটাকে টেবিলে নামিয়ে, চেয়ার টেনে সামনে বসলাম।

যথাবিধি অভিবাদন শেষ হলে দেখি তাঁর মুখখানা বড় উদ্বিগ্ন, কারণ জিজ্ঞাসা করাতে আমাকে অনুরোধ করলেন একটু ধৈর্য ধরে তাঁর কথা শুনতে, তার ওপর আমার সম্মান, এমন কি আমার জীবন পর্যন্ত নির্ভর করছে। তারপর তিনি যা যা বলেছিলেন তিনি বিদায় নেবার পরই সমস্ত আমি লিখে রাখলাম।

তিনি বলেছিলেন—

"আপনার জানা উচিত যে সম্প্রতি আপনার সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব গোপনীয়-ভাবে কয়েকটা মন্ত্রণাসভা ডাকা হয়েছে আর দুদিন হল সম্রাট সে বিষয়ে একটা চরম সিদ্ধান্তে উপনীতও হয়েছেন।

আপনি জানেন যে আপনি এখানে আসার সময় থেকেই প্রায় স্কাইরেস বলগোলাম, আমাদের নৌবিভাগের গ্যালবেট বা অধ্যক্ষ, আপনার বিষম শত্রু হয়ে উঠেছেন। তার মূল কারণ আমার জানা নেই, কিন্তু ব্লেফুস্কুর সঙ্গে নৌ-যুদ্ধে আপনার সাফল্যের পর থেকে তাঁর বিদ্বেষ আরো অনেক বেড়ে গেছেঁ, কারণ সেই থেকে তাঁর খ্যাতি অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এখন ইনি গিয়ে কোষাধ্যক্ষ ফ্লিম্‌ন্যাপের সঙ্গে জুটেছেন, কারণ ওঁর স্ত্রীর ব্যাপারে আপনার ওপর ওঁর আক্রোশের কথা কে না জানে। এঁদের সঙ্গে আছেন জেনারেল লিমটক, রাজগৃহাধ্যক্ষ লালকন্‌, প্রধান বিচারাধ্যক্ষ বালমুফ্‌, সবাই মিলে আপনার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের আর অন্যান্য গুরুতর অপরাধের অভিযোগ আনছেন।"

এই ভূমিকাটুকু শুনেই আমার ধৈর্যচ্যুতি হচ্ছিল, কারণ নিজের যোগ্যতা ও নির্দোষিতা সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট সচেতন ছিলাম। তাঁর কথার মাঝখানে বাধা দিতে যাচ্ছি, তিনি আমাকে চুপ করতে অনুরোধ করে বলে যেতে লাগলেন—

"আপনি আমার যে উপকার করেছেন, তার জন্য কৃতজ্ঞতাবশতঃ মন্ত্রণা-সভার কার্যাবলীর একটা সম্পূর্ণ বিবরণী আর সিদ্ধান্তের কপি এনেছি। এ বিষয়ে আমি প্রাণ দিয়ে আপনার সহায়তা করতে প্রস্তুত। শুনুন,

কুইন্‌বুস ফ্লেষ্ট্রিনের (মানুষ-পর্বতের) বিরুদ্ধে অভিযোগ।

প্রথম দফা—সম্রাট কালিন দেফার প্লুনের রাজত্বকালে প্রবর্তিত সংবিধি আইন অনুসারে কোনো ব্যক্তি রাজপ্রাসাদের এলাকার মধ্যে প্রস্রাব করিলে রাজদ্রোহ অপরাধের জন্য দণ্ডার্হ হইবে। এতৎসত্ত্বেও উক্ত কুইন্‌বুস ফ্লেষ্ট্রিন সম্রাটের পরমপ্রিয় মহিষীর মহলে আগুন নিবাইবার ছলে, বিদ্বেষ সহকারে, এবং বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় অতিশয় ক্রূরভাবে, এই সাম্রাজ্যের আইনের বিধান অমান্য করিয়া, উক্ত রাজপ্রাসাদের এলাকার মধ্যে স্থিত ঐ মহলের পূর্বোল্লিখিত কক্ষের আগুনের উপর প্রস্রাব করিয়া তাহাকে নির্বাপিত করে।

দ্বিতীয় দফা—পূর্বোক্ত কুইন্‌বুস ফ্লেষ্ট্রিন ব্লেফুস্কুর নৌবহরকে সম্রাটের বন্দরে আনীত করার পর, সম্রাট তাহাকে আদেশ করেন ব্লেফুস্কু সাম্রাজ্যের

অন্যান্য সমস্ত জাহাজ অধিকার করিয়া, ব্লেফুস্কুকে আমাদের সাম্রাজ্যের অধীনে আমাদের রাজপ্রতিনিধি দ্বারা শাসিত একটি প্রদেশে পরিণত করিয়া দিতে এবং শুধু ওদেশের যত ফেরারী বড়-মাথা নয়, ব্লেফুস্কু দ্বীপবাসীরাও অবিলম্বে বড়-মাথাদিগের ধর্মবিরোধী মতামত ত্যাগ করিতে সম্মত না হইলে, তাহাদের সকলের প্রাণদণ্ড দিতে। তাহাতে পূর্বোক্ত ফ্লেষ্ট্রিন বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় পরমপ্রতাপান্বিত মহামান্য সম্রাটবাহাদুরের নিকট ঐ আজ্ঞাপালনের দায় হইতে মুক্তি ভিক্ষা করে, এই অছিলায় যে নির্দোষ অধিবাসীদের স্ব-স্ব বিবেকের বিরুদ্ধাচরণে বাধ্য করিতে, কিম্বা তাহাদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতে তাহার ইচ্ছা নাই।

তৃতীয় দফা—যখন ব্লেফুস্কু রাজ্যের দূতরা শান্তি ভিক্ষা করিবার জন্য সম্রাটের দরবারে আগত হইয়াছিলেন, তখন পূর্বোক্ত ফ্লেষ্ট্রিন রাজদ্রোহীর ন্যায়, সম্প্রতি সম্রাটবাহাদুরের সহিত যুদ্ধে রত ও তাঁহার প্রকাশ্য শত্রুর অনুচর জানিয়াও তাঁহাদিগকে সাহায্য, সহায়তা, সান্ত্বনাদান করিয়াছিলেন ও তাঁহাদের বিনোদনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

চতুর্থ দফা—আপাততঃ পূর্বোক্ত ফ্লেষ্ট্রিন, রাজভক্ত প্রজার কর্তব্য অমান্য করিয়া, ব্লেফুস্কুর রাজসভায় ও সাম্রাজ্যে যাবার আয়োজন করিতেছে, অথচ ইহার জন্য সম্রাটবাহাদুরের মৌখিক সম্মতি ছাড়া তাহার জন্য কোনো অনুমতিপত্র নাই। ঐ মৌখিক সম্মতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া ব্লেফুস্কুর সম্রাটকে, যিনি অনতিদীর্ঘকাল পূর্বেও সম্রাটবাহাদুরের সহিত যুদ্ধরত প্রকাশ্য শত্রু ছিলেন, সাহায্য, সহায়তা ও সান্ত্বনাদান করাই এই যাত্রার উদ্দেশ্য।”

আমার মাননীয় অতিথি আরো বললেন—“এ ছাড়াও আরো কয়েক দফা অভিযোগ আছে, আমি কেবলমাত্র যেগুলি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেগুলির সারাংশ দিলাম। এইসব অভিযোগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হয়ে গেছে; সে সব আলোচনায় সম্রাট আপনার প্রতি তাঁর বিশেষ পক্ষপাতিত্বের বহু প্রমাণ দিয়েছেন, আপনি তাঁর কত উপকার করেছেন সে কথা বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন, আপনার অপরাধের গুরুত্বও যথাসাধ্য কমাতে চেষ্টা করেছেন। কোষাধ্যক্ষ আর নৌ-বিভাগের অধ্যক্ষের মতে আপনার বাড়িতে গভীর রাতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে আপনাকে অতিশয় যন্ত্রণাময় ও লজ্জাকরভাবে হত্যা

করা উচিত। জেনারেলও সেখানে কুড়ি হাজার সৈনিক নিয়ে উপস্থিত থাকতে পারেন, তাদের হাতে থাকতে পারে বিষাক্ত তীর, সেগুলি ছুঁড়ে আপনার হাতে মুখে মারা যাবে। আপনার চাকরদের মধ্যে কয়েকজনকে আপনার জামায় আর বিছানার চাদরে এক রকম বিষাক্ত রস মাখিয়ে রাখতে বলা যায়, তার জলুনিতে আপনি নিজের গায়ের মাংস নিজে খুবলে তুলবেন, শেষে বড় যন্ত্রণায় মারা যাবেন। জেনারেলও এতে সম্মতি জানিয়েছিলেন, তার ফলে অনেকক্ষণ ধরে আপনার বিপক্ষদলই সংখ্যায় ভারি হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সম্রাটবাহাদুর আপনার প্রাণ রক্ষা করতে সংকল্প করায়, রাজগৃহাধ্যক্ষ তাঁর পক্ষ সমর্থন করলেন।

এই ঘটনার পর সম্রাট ব্যক্তিগত বিষয়-বিভাগের প্রধান সচিব, রেলড্রেসালের মতামত জানতে চাইলেন। রেলড্রেসাল বরাবরই আপনার বিশ্বাসী বন্ধুর মতো কাজ করে এসেছেন, তিনি এবার তাঁর মতটা প্রকাশ করলেন, তাতে তাঁর সম্বন্ধে আপনারও যে উঁচু ধারণা, তারই যাথার্থ্য প্রমাণ হল। তিনি স্বীকার করলেন যে আপনার অপরাধ বাস্তবিক গুরুতর, কিন্তু তা হলেও ক্ষমার অবকাশ আছে, রাজবংশীয়দের শ্রেষ্ঠ ধর্মই হল ক্ষমা আর এই ক্ষমার জন্যই আমাদের সম্রাটবাহাদুরের যথাযোগ্য খ্যাতিও আছে।

তিনি আরো বললেন যে আপনার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের কথা সকলেই জানেন, হয়তো সেইজন্য মাননীয় বিচার-সমিতি তাঁর মতটাকে পক্ষপাতদুষ্ট বলে মনে করতে পারেন, তবুও সম্রাট যখন আদেশ করেছেন, তাঁর প্রকৃত মতটাই তিনি প্রকাশ করেছেন। আপনি তাঁর যে উপকার করেছেন সে কথা মনে রেখে, নিজের ক্ষমাপরায়ণ স্বভাবের গুণে সম্রাট যদি আপনার প্রাণরক্ষা করে কেবলমাত্র চোখ দুটি অন্ধ করে দেবার আদেশ দেন তাহলে অনেকখানি ন্যায়বিচারও হবে, আবার সম্রাটের ক্ষমাগুণের ও তাঁর মন্ত্রিসভার সভ্য হবার সম্মান যাঁরা লাভ করেছেন তাঁদের ন্যায় ও উদার বিচার-পদ্ধতির প্রশংসা পৃথিবী জুড়ে সবাই করবে। চোখ গেলে তো আর আপনার গায়ের জোর কমে যাবে না, কাজেই তখনও আপনি সম্রাটের অনেক কাজে আসবেন। অন্ধ হলে বরং মনের সাহস বেড়ে যায়, কারণ কোন্ দিক দিয়ে বিপদ আসছে দেখা যায় না। শত্রুদের নৌকো টেনে আনবার সময় চোখের জন্যই আপনার

যত ভাবনা ছিল, এখন মন্ত্রীদের চোখ দিয়ে দেখতে পেলেই আপনার পক্ষে যথেষ্ট, শ্রেষ্ঠ রাজাধিরাজরাই বা তার চেয়ে বেশি কি করেন ?

কিন্তু সমস্ত বিচার-সমিতি এই প্রস্তাবে ঘোরতর আপত্তি জানালেন। নৌ-বিভাগের অধ্যক্ষ বলগোলাম তো রাগ সামলাতেই পারলেন না; চটে লাল হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন যে এইরকম একটা বিশ্বাসঘাতকের প্রাণ বাঁচাবার কথা সচিবমহাশয় যে কোন্ সাহসে প্রস্তাব করছেন, তিনি তাই ভেবে পাচ্ছেন না। রাজনীতির বিধান অনুসারে আপনি যে সব উপকার করেছেন, তাতে আপনার অপরাধ বাড়ে বই কমে না। সম্রাজ্ঞীর মহলে প্রস্রাব করে যে আগুন নেবাতে পারে—সে কথা ভেবেও তিনি শিউরে উঠছেন—অন্য সময়ে তো ইচ্ছা করলে সে বাণ ডেকে রাজপ্রাসাদ সুদ্ধ ভাসিয়ে দিতে পারে। যে শক্তি দিয়ে আপনি শত্রুপক্ষের গোটা নৌ বহর টেনে আনলেন, কোনো কারণে অসন্তুষ্ট হলে তো সেই শক্তির সাহায্যেই নৌ-বহর ফিরিয়েও নিয়ে যেতে পারেন। এমন কি মনে মনে আপনিও যে একজন বড়-মাথা, এ কথা ভাবার যথেষ্ট কারণ আছে। যেহেতু বাইরের আচরণে প্রকাশ পাবার আগেই মনের মধ্যে রাজদ্রোহের জন্ম হয়, অতএব আপনাকে তিনি রাজদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত করে আপনার প্রাণদণ্ড দাবী করছেন।

কোষাধ্যক্ষমহাশয়েরও সেই মত; আপনার খাওয়া-পরা বাবদ অতিরিক্ত খরচের ফলে রাজকোষের কি দুরবস্থা ঘটেছে তিনি সেই কথাই ব্যক্ত করলেন, বললেন যে আর কিছুদিন বাদে আপনার খরচ পোষানো দায় হবে। কিন্তু আপনার চোখ গেলে দেওয়া সম্বন্ধে সচিবমহাশয়ের প্রস্তাবে সর্বনাশটি কিছুমাত্র কমবে না, বরং বেড়েই যাবে; এক জাতের মুর্গি আছে তাদের দৃষ্টান্ত থেকেই সেটা প্রমাণিত হয়। ঐ মুর্গিগুলোর চোখ গেলে দিলে তারা এত বেশি খেতে আরম্ভ করে দেয় যে দেখতে দেখতে বেজায় মোটা হয়ে পড়ে। উপরন্তু সম্রাটবাহাদুর ও তাঁর মন্ত্রিসভায় যাঁরা আপনার বিচারকের আসনে বসেছেন, মনে মনে সবাই নিশ্চিত জানেন যে আপনি অপরাধী; আপনার প্রাণদণ্ড দেবার পক্ষে সেই যথেষ্ট, আইনের আক্ষরিক আদেশ অনুসারে অত বিহিত প্রমাণের কোনোই দরকার নেই।

কিন্তু সম্রাটবাহাদুরের স্থির সঙ্কল্প প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে না। তবে মন্ত্রিসভার মতে যখন শুধু চোখ গেলে দেওয়াটা বড় লঘু দণ্ড হয়ে যাচ্ছে, তখন দয়া করে

তিনি বললেন যে পরে তো আরো গুরুতর সাজাও দেওয়া যায়। আপনার অতিরিক্ত খাই-খরচ সম্বন্ধে কোষাধ্যক্ষমহাশয় যা বললেন, তার উত্তরে আপনার বন্ধু সচিবমহাশয় বিনীতভাবে অনুমতি চেয়ে বললেন যে সম্রাটের হাতেই যখন রাজ্যের খরচপত্রের সম্পূর্ণ ভার, তখন তিনি স্বচ্ছন্দে আপনার মাসোয়ারা কমিয়ে দিতে পারেন, তার ফলে যথেষ্ট খাবারের অভাবে দিনে দিনে আপনি দুর্বল হয়ে পড়বেন, আহারেও রুচি থাকবে না। তারপর কয়েক মাসের মধ্যেই শরীরটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে আর কিছু বাকি থাকবে না। তখন আপনার শবদেহের পুতিগন্ধতেও সেরকম কিছু অনিষ্ট হবে না, কারণ ততদিনে তো কমে কমে শরীরটা একেবারে আধখানা হয়ে যাবে। আপনি মরলেই সম্রাটের পাঁচ ছ হাজার প্রজা দু তিন দিনের মধ্যেই আপনার হাড় থেকে মাংসগুলোকে কুপিয়ে কেটে, ঠেলাগাড়িতে বোঝাই করে, দূর দূর সব জায়গায় নিয়ে গিয়ে পুঁতে ফেলতে পারবে, তা হলে কোনো সংক্রামক রোগেরও ভয় থাকবে না। আর আপনার কঙ্কালটা ঐখানেই পড়ে থাকতে পারে, অমন একটা স্মৃতিচিহ্ন দেখে ভবিষ্যৎ বংশধরদের তাক লেগে যাবে।

তিন দিন পরেই আপনার বন্ধু সচিবমহাশয়কে আপনার বাড়িতে পাঠানো হবে, তিনি আপনাকে ঐসব অভিযোগের তালিকা শোনাবেন, তারপর সম্রাটবাহাদুর ও মন্ত্রীদের অপার দয়াদাক্ষিণ্যের দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেবেন, যেহেতু আপনাকে কেবলমাত্র অন্ধ করবার দণ্ড দেওয়া হয়েছে। আপনি যে কৃতজ্ঞচিত্তে ও বিনয়ের সঙ্গে এ দণ্ড গ্রহণ করবেন সে বিষয়ে সম্রাটের কোনো সন্দেহই নেই। তাঁর কুড়িজন অস্ত্রচিকিৎসক উপস্থিত থেকে দেখবেন যাতে আপনাকে মাটিতে শুইয়ে আপনার চোখের মণিতে চোখা চোখা ধারালো সব তীর ছুঁড়ে কাজটাকে ভালোভাবে সমাধা করা হয়।

আপনি এখন এর কি ব্যবস্থা করবেন সেটা আপনার সুবুদ্ধির উপর ছেড়ে দিলাম, আমাকে এক্ষুণি যে রকম গোপনভাবে এসেছিলাম সেই রকম গোপনেই ফিরে যেতে হবে যাতে আমাকে কেউ সন্দেহ না করে।"

তিনি তো বিদায় নিলেন আর আমি রাশি রাশি সংশয় ও সমস্যা নিয়ে একা বসে রইলাম।

সেকালে যদিও সে রকম কোনো আইন ছিল না, তবুও বর্তমান সম্রাট ও

তাঁর মন্ত্রীরা একটা নিয়ম করেছিলেন যে সম্রাটের আক্রোশের জন্যই হক, কিম্বা তাঁর কোনো প্রিয়পাত্রের বিদ্বেষের জন্যই হক, যখন বিচারসভা অতিরিক্ত নিষ্ঠুর কোনো দণ্ড দিতেন, সমস্ত রাজসভার সামনে সম্রাট একটা বক্তৃতা দিতেন। সেই বক্তৃতাতে তাঁর ক্ষমাশীলতা ও কোমলতার কথা সারা পৃথিবীতে সর্বজনবিদিত বলে উল্লেখ করা থাকত। তক্ষুণি এই বক্তৃতাটি রাজ্যময় প্রচার করা হত। প্রজারা সবাই সম্রাটের এই প্রশংসা-বাণীকে যতটা ভয় করত তেমন আর কিছুকে করত না, কারণ তারা সবাই লক্ষ্য করেছিল যে প্রশংসা যত জোর গলায় বাড়িয়ে বাড়িয়ে চারদিকে ছড়িয়ে বলা হত, সাজাও তত কঠোর হত আর যাকে দণ্ড দেওয়া হল সেও ততোধিক নির্দোষ হত।

তবুও, স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, সভাসদের উপযুক্ত বংশমর্যাদা কিম্বা শিক্ষাদীক্ষা না থাকার দরুণ আমি ভেবেই পেলাম না এ সাজাতে আবার ক্ষমাশীলতা কিম্বা প্রীতিটা কোথায়! কোমল হওয়া দূরে থাকুক আমার মতে সাজাটা বরং খুবই কঠোর, তবে আমার ভুলও হতে পারে।

একবার মনে হয়েছিল যে হক না আদালতে বিচার, কারণ যদিও অভিযোগের মধ্যে অনেকখানিক আমার সত্যি বলে মেনে নিতে হচ্ছিল, তবুও উল্টো-পক্ষেও অনেক বলবার ছিল। কিন্তু এই রকম সরকারী অভিযোগে কেমন বিচার হয় সে কথা বহু পড়েছি আর প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখেছি বিচারকর্তাদের নিজেদের অভিরুচি অনুসারে রায় দেওয়া হয়। কাজেই এই রকম ক্ষমতাশালী শত্রুর বিপক্ষে দাঁড়িয়ে, এই রকম সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় ও রকম সঙ্কল্প করায় অনেক বিপদ আছে জেনে তার উপর নির্ভর করবার সাহস হল না।

একবার মনে হয়েছিল বিরোধিতা করি; যতক্ষণ মুক্ত আছি ওদের ঐ সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি একসঙ্গে জড়ো করলেও আমাকে দমাতে পারবে না, ঢিল মেরেই অতি সহজে ওদের রাজধানীটাকে তছনছ করে দিতে পারি। কিন্তু তখুনি আবার শিউরে উঠে সে সঙ্কল্প ছেড়ে দিলাম; সম্রাটের কাছে যে শপথ নিয়েছি; তাঁর কাছ থেকে বহু অনুগ্রহ পেয়েছি; নার্দাক্ উপাধি দিয়ে আমাকে তিনি কত সম্মানিত করেছেন। সভাসদরা যাকে কৃতজ্ঞতা বলে সে কি আর অত শিগ্‌গির শেখা যায় যে নিজের মনকে বোঝাব সম্রাটের

এখনকার কঠোরিতার জন্য আগেকার সব বাধ্যবাধকতা বরবাদ হয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত একটা সঙ্কল্প করে ফেললাম, সে জন্য কেউ কেউ হয়তো আমার দোষ ধরবেন, হয়তো তাতে কোনো অন্যায়ও হবে না, কারণ আমি নিজেই স্বীকার করছি যে আমার চোখ জোড়াকে আর স্বাধীনতাকে যে রক্ষা করতে পেরেছিলাম সেও আমার হঠকারিতা আর অনভিজ্ঞতার গুণেই। আমার চেয়ে কম জঘন্য অপরাধীদের সঙ্গেও অন্যান্য বিচারসভায় কি রকম ব্যবহার করা হয় তাই দেখে রাজা-বাদশাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে পরে আমার যতখানি জ্ঞান হয়েছিল, তখন যদি তা থাকত তা হলে নিশ্চয় খুব আগ্রহ ও তৎপরতার সঙ্গেই সম্রাটের ঐ সহজ সাজাটা মাথা পেতে মেনে নিতাম। কিন্তু বয়স যাদের কম তাদের কিছুতেই তর সয় না ; তাছাড়া ব্লেফুস্কুর সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য সম্রাটবাহাদুরের অনুমতি নেওয়াই ছিল, কাজেই তিনদিন কাটবার আগেই সুযোগ বুঝে আমার বন্ধু সচিবমহাশয়কে লিখে পাঠালাম যে সম্রাটের অনুমতি অনুসারে সেই দিনই সকালে ব্লেফুস্কু রওনা হচ্ছি।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই লিলিপুটদ্বীপের যেদিকে আমাদের নৌবহর বাঁধা ছিল, সেদিকে গেলাম। সেখানে পৌঁছে বড় একটা মনোয়ারি জাহাজের মাথায় একটা মোটা কাছি বেঁধে নিলাম। তারপর নিজের কাপড়-চোপড় ছেড়ে তাতে বোঝাই করলাম, গায়ে ঢাকা দেবার চাদরটাকেও বগলদাবা করে সঙ্গে নিলাম, তারপর নোঙর তুলে জাহাজটাকে টানতে টানতে খানিক জল ভেঙ্গে, খানিক সাঁতরে, ব্লেফুস্কুর রাজ-বন্দরে গিয়ে উঠলাম। সেখানকার লোকেরা বহুদিন থেকেই আমার পথ চেয়ে বসেছিল।

ওদের রাজধানীর নামও ব্লেফুস্কু, সেখানে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমার সঙ্গে ওরা দুটি লোক দিয়ে দিল। লোক দুটিকে আমি হাতে করে নিয়ে চললাম যতক্ষণ না রাজধানীর প্রবেশ পথের দু শো গজের মধ্যে পৌঁছলাম। পৌঁছে তাদের বললাম সচিবমহাশয়দের একজন কাউকে আমার আগমনের খবর দিতে আর এ কথাও বলতে যে আমি ঐখানেই সম্রাটের আদেশের অপেক্ষায় রইলাম।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তার উত্তর পেলাম, শুনলাম যে সম্রাট নিজে, রাজ-পরিবারের সবাইকে আর রাজসভার উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নিয়ে আমাকে

অভ্যর্থনা করবার জন্য ফটকের বাইরে আসছেন। আমিও একশো গজ এগিয়ে এলাম; সম্রাট তাঁর অনুচরদের নিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন, সম্রাজ্ঞী আর অন্যান্য মহিলারাও গাড়ি থেকে নামলেন, দেখে তো মনে হল না কেউ বড় একটা ভয় পেয়েছেন, কিম্বা দুশ্চিন্তায় পড়েছেন।

মাটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে সম্রাটের আর সম্রাজ্ঞীর হাতে চুমো খেলাম। সম্রাটকে বললাম আমার প্রভু, লিলিপুটের অধীশ্বরের অনুমতি নিয়ে আমার প্রতিশ্রুতি অনুসারে এত বড় প্রতাপশালী একজন রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সম্মান পেতে এসেছি, যদি তাঁর জন্য কিছু করা আমার সাধ্যের মধ্যে থাকে তো সেই কাজে নিজেকে নিবেদন করছি, অবিশ্যি আমার নিজের প্রভুর প্রতি আমার কর্তব্যের কথা সর্বদা মনে রেখে। আমার অপদস্থ হবার কথা কিছুই উল্লেখ করলাম না, কারণ সে বিষয়ে আমি নিজেও বিধিমতে কিছু শুনি নি, কাজেই এরকম মনে করা যেতে পারে কোনো ষড়যন্ত্রের কথা আমার কানেই আসে নি আর আমি যতক্ষণ তাঁর এলাকার বাইরে রয়েছি, সেই সময়ে যে লিলিপুটের সম্রাট গোপন কথাটি ফাঁস করে দেবেন, একথাও আমার খুব যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হল না। তবে অল্পকালের মধ্যেই বোঝা গেল যে আমার সে ধারণা একেবারে ভুল।

এই রাজসভায় আমি কি রকম অভ্যর্থনা পেয়েছিলাম তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে পাঠকমহাশয়কে বিরক্ত করে তুলতে চাই না। এত বড় একজন রাজার যোগ্য অভ্যর্থনাই পেয়েছিলাম। থাকবার একটা বাড়ি আর বিছানাপত্রের অভাবে যে সব অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল সে বিষয়ও বেশি বলব না; মাটিতেই শুতাম, আমার সেই চাদরটা গায়ে জড়িয়ে।

অষ্টম অধ্যায়

সৌভাগ্যবশতঃ আকস্মিকভাবে লেখকের ব্লেফুস্কু পরিত্যাগের সুযোগ লাভ ও কিঞ্চিৎ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতঃ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন।

ব্লেফুস্কু পৌঁছবার তিনদিন পরে কৌতূহলবশতঃ দ্বীপের উত্তর-পূর্বদিকে বেড়াতে গিয়েছিলাম। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম যে দেড় মাইল দূরে সমুদ্রের জলে কি একটা ভাসছে, দেখে মনে হল একটা উল্টানো নৌকো।

জুতো মোজা খুলে দু তিন শো গজ জল ভেঙ্গে এগিয়ে গিয়ে দেখি জোয়ারের সঙ্গে জিনিষটা অনেকখানি কাছে এসে পড়েছে। এবার স্পষ্ট দেখতে পেলাম সত্যি নৌকোই বটে, হয়তো ঝড়-ঝাপ্টায় কোনো জাহাজ থেকে আল্গা হয়ে গিয়ে থাকবে। তাই দেখে তক্ষুণি সহরের দিকে ফিরে গেলাম, সম্রাটকে অনুরোধ করলাম নৌবহর খোয়াবার পরেও যে জাহাজগুলো তাঁর বাকি ছিল, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় দেখে গোটা কুড়ি জাহাজ আর নৌ-বিভাগের উপাধ্যক্ষের পরিচালনায় তিন হাজার নাবিক আমাকে ধার দিতে হবে।

জাহাজগুলো যতক্ষণ তীররেখা ঘুরে আসছে, আমি সোজা পথে যেখানে নৌকোটা দেখেছিলাম সেখানে ফিরে গেলাম। দেখি জোয়ারের জলে নৌকোটা আরো কাছে এসেছে। নাবিকদের সঙ্গে দড়িদড়া ছিল, ইতিমধ্যে আমিই সেগুলোকে একসঙ্গে পাকিয়ে যথেষ্ট মজবুৎ করে নিয়েছি। জাহাজগুলো এসে পৌঁছলে, কাপড় ছেড়ে, জল ভেঙ্গে, নৌকোটার একশো গজের মধ্যে উপস্থিত হলাম। তারপরে অবিশ্যি সাঁতরে গিয়ে উঠতে হল।

নাবিকরা দড়ির এক মাথা আমাকে ছুঁড়ে দিল, সেটাকে নৌকোর সামনের দিকে একটা ফুটোর মধ্যে চালিয়ে এঁটে বেঁধে দিলাম। অন্য মাথাটা বাঁধলাম একটা মনোয়ারি জাহাজের সঙ্গে। কিন্তু দেখলাম এত খেটেও কোনো ফল হচ্ছে না, পায়ে তল পাচ্ছিনা কাজেই কিছুই করে উঠতে পারছি না। এ অবস্থায় শেষ অবধি নিরুপায় হয়ে, নৌকোটার পিছন পিছন সাঁতরে যেতে লাগলাম। সুবিধা পেলেই এক হাত দিয়ে নৌকোটাকে

সামনের দিকে ঠেলে দিই, তার উপর জোয়ারের জল আমার সহায়। শেষ পর্যন্ত তীরের এতটা কাছে এসে পড়লাম যে থুতনি তুলে মাথাটাকে জলের ওপর রেখেও পায়ে মাটি ঠেকল। দু তিন মিনিট বিশ্রাম করে আবার নৌকোটাকে দিলাম কষে এক ঠেলা। এইভাবে এগুতে এগুতে দেখি সমুদ্রের জল আমার বগলের উপরে আর উঠছে না।

এতক্ষণে সবচেয়ে কষ্টকর কাজটি শেষ হল। একটা জাহাজে আরো দড়ি কাছি রেখেছিলাম, এবার সেগুলোকে বের করে, এক মাথা নৌকোর সঙ্গে আর অন্য মাথা ন'টা জাহাজের সঙ্গে বেঁধে দিলাম। এ জাহাজগুলো আমার জন্যই অপেক্ষা করেছিল। বাতাস আমাদের অনুকূল, নাবিকরা দড়ি ধরে টানছে আর আমি নৌকো ঠেলছি, এইভাবে তীরের চল্লিশ গজের মধ্যে এসে পৌঁছানো গেল। ভাঁটা পড়া অবধি সেইখানেই অপেক্ষা করলাম, ভাঁটার সময় শুকনো ডাঙ্গার ওপর দিয়েই নৌকো অবধি পৌঁছানো গেল, তারপর দড়িদড়া যন্ত্রপাতি আর দু হাজার লোকের সাহায্যে সেটাকে উপুড় করে ফেললাম। দেখি তলাটা খুব বেশি জখম হয় নি।

দশদিন ধরে কেমন করে অনেক কষ্টে কয়েকটা দাঁড় তৈরী করে, তবে নৌকোটাকে ব্লেফুস্কুর রাজ-বন্দরে নিয়ে যেতে পারলাম, সে বিষয় বিস্তারিত বলে আর পাঠকমহাশয়ের ধৈর্যচ্যুতি করব না। আমি পৌঁছতেই সেখানে বিরাট এক ভিড় জমে গেল; এত প্রকাণ্ড নৌকো দেখে তারা সবাই অবাক। সম্রাটকে বললাম, ভাগ্যদেবীই এই নৌকোটা আমার সামনে এমন আকস্মিকভাবে পৌঁছে দিয়েছেন, যাতে ওটাতে করে আমি এমন কোনো জায়গায় গিয়ে উঠতে পারি, যেখান থেকে দেশে ফেরা সম্ভব হবে। নৌকো সাজাতে আমার যা যা লাগবে, সম্রাটের কাছে সে সব ভিক্ষা করলাম, যাবার জন্য ছাড়পত্রও চাইলাম। ভদ্রতা করে প্রথমে খানিকটা আপত্তি জানিয়ে, শেষ অবধি দয়া করে তিনি সম্মত হলেন।

এতদিনেও যে লিলিপুটের সম্রাট আমার সম্বন্ধে ব্লেফুস্কুর সম্রাটকে তাগাদা দিয়ে চিঠি পাঠান নি, এতে আমি খুব আশ্চর্য হচ্ছিলাম। পরে অবিশ্যি আমাকে গোপনীয়ভাবে জানানো হয়েছিল যে সম্রাট ভাবতেই পারেন নি তাঁর অভিসন্ধি সম্বন্ধে আমি বিন্দুবিসর্গও জানতে পেরেছি, কাজেই তিনি

মনে করেছিলেন আমি আমার পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাঁর অনুমতি নিয়েই ব্লেফুস্কু গেছি, সে অনুমতির কথা ওখানকার রাজসভার সকলেই জানত আর ওখানকার পর্ব শেষ করে অল্পদিনের মধ্যেই আমি নিশ্চয় ফিরে যাব।

শেষ অবধি আমার দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে তিনি দুঃখিত হয়েছিলেন। তখন কোষাধ্যক্ষ আর তাঁর ষড়যন্ত্রকারীর দলের সঙ্গে পরামর্শ করে আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগপত্র বেরিয়েছিল সেটি একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে দিয়ে ব্লেফুস্কু পাঠানো হল। সেই দূতকে বলে দেওয়া হয়েছিল যে তিনি যেন ব্লেফুস্কুর সম্রাটের কাছে নিবেদন করেন যে তাঁর প্রভু এতই সদয় ও কোমলহৃদয় যে আমার চোখদুটি উপড়ে নেওয়া ছাড়া আমাকে আর কোনো সাজা দিতে ইচ্ছুক নন, কিন্তু তবু আমি ন্যায়বিচারের কাছ থেকে ফেরারী হয়েছি এবং যদি দু ঘণ্টার মধ্যে ফিরে না যাই, আমার নার্দাক্ উপাধি প্রত্যাহার করা হবে আর আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলে ঘোষণা করা হবে। দূত আরো বললেন, তাঁর প্রভু এইটুকু আশা করেন যে দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে শান্তি ও সদ্ভাব রক্ষার জন্য, তাঁর ব্লেফুস্কুর সহোদর নিশ্চয় এই আদেশ দেবেন যে আমাকে হাত পা বেঁধে বিশ্বাসঘাতকের যোগ্য সাজা নেবার জন্য লিলিপুট পাঠানো হক।

এই বিষয়ে মন্ত্রণা করতে ব্লেফুস্কুর সম্রাটের তিনদিন লাগল, তারপর মেলা সৌজন্যবাদ আর কৈফিয়তে ভর্তি এক উত্তর পাঠালেন। তাতে তিনি বললেন যে হাত পা বেঁধে আমাকে পাঠানো প্রসঙ্গে তাঁর সহোদর ভালো করেই জানেন সেটা একেবারে অসম্ভব। তাছাড়া যদিও আমিই তাঁর নৌবহর নিয়ে গিয়েছিলাম, তবুও শান্তিস্থাপন ব্যাপারে আমি তাঁর বহু উপকার করেছি বলে তিনি আমার কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। তবে অনতিবিলম্বেই উভয় সম্রাটেরই দুশ্চিন্তা দূর হবে কারণ সমুদ্রতীরে আমি বিরাট একটা নৌকো পেয়েছি, যাতে করে সাগর পাড়ি দেওয়া যায়। সম্রাট এইরকম আদেশও দিয়েছেন যেন আমার সাহায্য ও পরামর্শ নিয়ে নৌকোটাকে সাজিয়ে ফেলা হয়। তাই তাঁর বড় আশা যে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এইরকম একটা দুর্বহ দায় থেকে উভয় সাম্রাজ্যই মুক্তি পাবে।

এই উত্তর নিয়ে লিলিপুটের দূত ফিরে গেল আর ব্লেফুস্কুরাজও আমাকে সবিশেষ জানিয়ে অনুগ্রহ করে বললেন, তাঁর কাজে বহাল হলে তিনি আমাকে আশ্রয় দেবেন, তবে সে কথাটা যেন কেউ টের না পায়। যদিও

তাঁর কথা সত্যি বলেই মনে হয়েছিল, তবুও মনে মনে সঙ্কল্প করেছিলাম যে সম্ভব হলে আর কখনো কোনো রাজা কিম্বা মন্ত্রীর উপর আস্থা রাখব না। কাজেই তাঁর এই সদয় অভিপ্রায়ের জন্য প্রচুর ধন্যবাদ জানিয়ে, বিনীতভাবে অস্বীকৃতি জানালাম। তাঁকে বললাম ভালোর জন্যই হক কিম্বা মন্দের জন্যই হক, ভাগ্যদেবী যখন একটা নৌকো জুটিয়েই দিয়েছেন, তখন দুজন এমন মহীয়ান সম্রাটের মধ্যে বিবাদের কারণ হওয়ার চেয়ে, বরং সাহস করে সমুদ্রে পাড়ি দেওয়াই স্থির করেছি। তাতে যে সম্রাট একটুও অসন্তুষ্ট হলেন তা মনে হল না। বরং দৈবাৎ জেনে ফেলেছিলাম যে আমার ঐ সঙ্কল্পের কথা শুনে সম্রাট আর মন্ত্রীরা সকলেই খুব খুসি হয়েছিলেন।

যে সময় যাত্রা করব ভেবেছিলাম, চারদিক চিন্তা করে যাবার দিনটা তার চেয়ে খানিকটা এগিয়ে দিলাম; রাজসভারও যেন আর তর সইছিল না, তাঁরা আগ্রহের সঙ্গে সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলেন। আমার ফরমায়েস মতো দুটো পাল তৈরী করবার জন্য পাঁচশো কারিগর বহাল হল, ওদের দেশের সবচেয়ে মজবুত কাপড় তেরো পাট একসঙ্গে কাঁথার মতো করে সেলাই দিয়ে পাল তৈরী হল। সমুদ্রের তীরে অনেক খোঁজাখুঁজির পর মস্ত একটা পাথর পেলাম, সেটা হল আমার নৌকোর নোঙর। নৌকোর তেলের কাজ ইত্যাদির জন্যে তিনশো গোরুর চর্বি লাগল। দাঁড় আর মাস্তলের জন্য ওখানকার সবচেয়ে বিশাল দেখে কয়েকটি গাছ কাটতে গিয়ে যে কি কষ্ট পেতে হয়েছিল সে ভাবা যায় না, তবে এ ব্যাপারে সম্রাটের জাহাজের ছুতোর মিস্ত্রীদের কাছ থেকে খুবই সাহায্য পেয়েছিলাম। মোটা কাজটুকু আমি শেষ করলে পর, তারা সে কাঠ চেঁচেছুলে মোলায়েম করতে অনেক সাহায্য করেছিল।

একমাস বাদে সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গেল, তখন সম্রাটের কাছ থেকে যাত্রার অনুমতি ও বিদায় চেয়ে পাঠালাম। সম্রাট সপরিবারে তাঁর প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন। তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন, আমিও উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে সেই হাতে চুমো খেলাম। সম্রাজ্ঞী ও রাজপরিবারের অল্পবয়সী রাজ-কুমাররাও তাই করলেন। সম্রাট আমাকে পঞ্চাশটা টাকার থলে দিলেন, প্রত্যেকটিতে দুশো স্প্রুগ। সেই সঙ্গে মাথা থেকে পা অবধি আঁকা নিজের একখানি ছবিও দিলেন, সেটাকে আমি তক্ষুণি আমার একটা দস্তানার মধ্যে

পুরে নিলাম, পাছে কোনো অনিষ্ট হয়। বিদায়ের সময়ে কত রকম অনুষ্ঠানই যে হল, সে কথা বলে আর পাঠকমহাশয়কে জ্বালাতন করব না।

একশোটা ষাঁড়ের আর তিনশো ভেড়ার মাংস, উপযুক্ত পরিমাণে রুটি আর মদ, চারশো রাঁধুনি যতটা মাংস রেঁধে তৈরী করে দিতে পারে—নৌকোতে এই সব মজুত করলাম। সঙ্গে নিলাম ছ'টা জ্যান্ত গোরু আর দুটো ষাঁড় আর অনেকগুলো ভেড়া আর ভেড়ী। মনে মনে ইচ্ছা ছিল দেশে নিয়ে গিয়ে ওগুলো পালব, বাচ্চা তুলব। ওদের খাবার জন্য এক বোঝা খড় আর এক বোঝা দানাও নিলাম। এক ডজন লোক নিয়ে যেতে পারলে খুবই খুসি হতাম, কিন্তু সেই একটা বিষয়ে কিছুতেই সম্রাটের অনুমতি পাওয়া গেল না। আমার পকেটগুলো ভালো করে খোঁজা ছাড়াও সম্রাট আমাকে দিয়ে অঙ্গীকার করিয়ে নিলেন যে তাঁর প্রজাদের কাউকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাব না, তাদের মত থাকলেও না, আগ্রহ থাকলেও না।

এইভাবে যতটা পারলাম বন্দোবস্ত করে নিয়ে, ১৭০১ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর, সকাল ছ'টায় যাত্রা করলাম। উত্তরদিকে বারো মাইল এগোবার পর, পূব-দক্ষিণ থেকে বাতাস বইতে লাগল, সন্ধ্যা ছ'টার সময় দেখি উত্তর-পশ্চিমদিকে দেড় মাইল দূরে একটা ছোট দ্বীপ। এগিয়ে গিয়ে যে দিক থেকে বাতাস বইছে তার উল্টোদিকে নোঙর ফেললাম, মনে হল দ্বীপটাতে জনমানুষের বাস নেই। কিছু খেয়ে নিয়ে বিশ্রাম করতে গেলাম। অন্ততঃ ছ'ঘণ্টা আন্দাজ খুব ভালো ঘুম হল, কারণ জাগবার ঘণ্টা দুয়ের মধ্যেই ভোর হয়ে গেল। পরিষ্কার রাত, সূর্য উঠবার আগেই প্রাতরাশটা সারলাম।

বাতাস ছিল অনুকূল, নোঙর তুলে, পকেট কম্পাস দিয়ে দিক স্থির করে কাল যে দিকে চলেছিলাম, সেই পথই ধরলাম। আমার মনে মনে ইচ্ছা, সম্ভব হলে ভ্যান ডিয়েমেনের উত্তর-পুবে যে সব দ্বীপ আছে বলে বিশেষ কারণে আমার ধারণা ছিল, তারই একটাতে গিয়ে উঠব।

সারাদিন কিছুই দেখতে পেলাম না, কিন্তু তার পরদিন বেলা তিনটে নাগাদ, আমার হিসেবে যখন ব্লেফুস্কু ছেড়ে বাহাত্তর মাইল দূরে এসেছি, পুব-দক্ষিণগামী একটা জাহাজের পাল দেখতে পেলাম। আমি চলেছি বরাবর পুবে। ডাক দিয়ে কোনো উত্তর পেলাম না, কিন্তু বাতাস পড়ে যাওয়াতে দেখলাম ক্রমশঃ তাকে ধরে ফেলছি। পাল তুলে যতটা পারি বাতাসে ভর

করে এগিয়ে চললাম, আধ ঘণ্টার মধ্যে জাহাজের লোকরা আমাকে দেখতে পেল। তখন তারা তাদের ধ্বজা উড়িয়ে, একবার তোপ ছুঁড়ল।

এইরকম অপ্রত্যাশিতভাবে আবার আমার কত ভালোবাসার মাতৃভূমিকে আর সেখানে যে সব প্রিয়জনদের রেখে এসেছিলাম তাদের দেখবার কথা ভেবে, আমার যে কি আনন্দ হল তা আমি সহজে প্রকাশ করতে পারব না। জাহাজটা পাল নামাল, বিকেল পাঁচটা থেকে ছটার মধ্যে আমি গিয়ে তার কাছে ভিড়লাম। সেদিন ছিল ২৬শে সেপ্টেম্বর। জাহাজে ইংল্যাণ্ডের নিশান দেখে আমার হৃদয় একেবারে নেচে উঠল।

গোরু ভেড়াগুলোকে পকেটে পুরে, নৌকোয় খাবার দাবার যা ছিল সব নিয়ে জাহাজে উঠলাম। ইংল্যাণ্ডের একটা বানিজ্যের জাহাজ, উত্তর ও দক্ষিণ সাগর হয়ে, জাপান থেকে দেশে ফিরছে। জাহাজের ক্যাপ্টেন ডেপ্টফোর্ডের মিষ্টার জন বিডেলের ব্যবহার ভারি ভদ্র, ওস্তাদ নাবিকও বটেন। আমাদের জাহাজটা তখন ত্রিশ ডিগ্রী দক্ষিণ অক্ষাংশে, জাহাজে জনা পঞ্চাশ লোক, তাদের মধ্যে পিটার উইলিয়াম্‌স্ বলে একজন পুরোনো বন্ধুকেও পেলাম, সে ক্যাপ্টেনের কাছে আমার পক্ষ নিয়ে দুটো ভালো কথা বলল।

ক্যাপ্টেন আমার সঙ্গে বড় অমায়িক ব্যবহার করলেন, কোথা থেকে এসেছি কোথায় যাচ্ছি এইসব জানতে চাইলেন। সংক্ষেপে সবই বললাম, কিন্তু তিনি ভাবলেন আমি বুঝি প্রলাপ বকছি।

তাঁর ধারণা হল হয়তো এতরকম দুঃখ বিপদের ফলে আমার মাথা খানিকটা বিগড়ে গিয়েছে। আমি তখন পকেট থেকে আমার গোরু ভেড়াগুলোকে বের করলাম, তাই দেখে প্রথমটা তিনি ভারি আশ্চর্য হয়ে গেলেন, কিন্তু এবার আমার কথা সম্বন্ধে তাঁর আর কোনো সন্দেহ রইল না। তারপরে ব্লেফুস্কুর সম্রাটের দেওয়া মোহরগুলো, সম্রাটের বড় ছবিটা আর ওদেশ থেকে আনা আরো দু একটা জিনিস দেখালাম, যা সচরাচর কোথাও দেখা যায় না। এক-একটাতে দুশো স্প্রুগ ভরা দুটো থলে তাঁকে দিয়ে দিলাম আর কথা দিলাম যে ইংল্যাণ্ডে পৌঁছেই একটা গোরু আর একটা পোয়াতি ভেড়াও দেব।

এই যাত্রা সম্বন্ধে নানান খুঁটিনাটি বলে আর পাঠকমহাশয়ের অসহিষ্ণুতার কারণ হব না; বেশির ভাগই বেশ মঙ্গলমতে কেটেছিল। ১৭০২ সালের

১৩ই এপ্রিল, ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণের উঁচুনিচু তীরে এসে পৌছুলাম। পথে একটিমাত্র দুর্ঘটনা হয়েছিল, ইঁদুরে আমার একটা ভেড়া নিয়ে গিয়েছিল, পরে তার হাড়গোড়গুলোকে একটা গর্তের মধ্যে পেলাম, মাংস সব খুঁটে খেয়ে নিয়েছে।

বাকি জন্তুজানোয়ারগুলোকে নিরাপদে ডাঙ্গায় নামিয়ে, গ্রেনিচের এক খেলার মাঠে চরাতে লাগলাম। সেখানকার মিহি ঘাস তারা পেট পুরে খেতে লাগল; আমার আবার মনে মনে ঠিক উল্টোরকমের ভয় ছিল। জাহাজেও এতটা দীর্ঘপথ তাদের বাঁচিয়ে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হত না, যদি না ক্যাপ্টেন সাহেব তাঁর সবচেয়ে ভালো বিস্কুট থেকে খানিকটা দিতেন। সেগুলোকে গুঁড়ো করে জল মিশিয়ে জানোয়ারগুলোকে বরাবর খাইয়ে এনেছিলাম।

যে অল্প কদিন ইংল্যাণ্ডে ছিলাম আমার জানোয়ারগুলোকে বড়লোকদের কাছে দেখিয়ে বেশ দু'পয়সা কামিয়েছিলাম, তারপর দ্বিতীয় যাত্রা শুরু করার আগে ছয় শো পাউণ্ড দিয়ে ওগুলোকে বিক্রী করে দিয়েছিলাম। এই শেষ যাত্রা থেকে ফিরে দেখছি মাপে ওগুলো দিব্যি বড় হয়ে উঠেছে, বিশেষতঃ ভেড়াগুলো। আশা করছি এতে আমাদের দেশের পশমের ব্যবসার খুব উন্নতি হবে, কারণ আমার ভেড়াগুলোর লোম ভারি মিহি।

স্ত্রীপুত্র-পরিবারের সঙ্গে রইলাম মাত্র দু মাস, কারণ দেশবিদেশ দেখবার সখ আমার কিছুতেই মেটে না, কাজেই বেশিদিন ঘরে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। স্ত্রীর হাতে পনেরো শো পাউণ্ড দিয়ে তাকে রেডরিফে একটা ভালো বাড়িতে গুছিয়ে বসিয়ে দিলাম। বাকি সম্পত্তি সঙ্গে নিলাম, অর্থাৎ কিছু নগদ টাকা আর কিছু জিনিসপত্র। মনে বড় ইচ্ছা যে আমার অবস্থা ফেরাব।

আমার বড় জ্যাঠামশায় জন্, এপিংএর কাছে কিছু জমিজমা আমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। তার আয় ছিল বছরে ত্রিশ পাউণ্ড; তাছাড়া ফেটার লেনে ব্ল্যাক্বুল নামে একটা সরাইখানা লম্বা মেয়াদে ভাড়া নিয়েছিলাম, তার আয় ছিল আরো অনেক বেশি। কাজেই আমার পরিবারকে যে পাচজন প্রতিবেশীর অনুগ্রহের ভরসায় ছেড়ে গেলাম, এমন নয়।

আমার ছেলে জনির নাম হয়েছিল তার জ্যাঠার নামে, সে তখন গ্রামার

স্কুলে পড়ে, ভারি ভালো ছেলে। আমার মেয়ে বেটি তখন সেলাইফোঁড়াই শিখছিল, এখন অবিশ্যি তার বিয়ে হয়ে গেছে, ছেলেপুলেও হয়েছে।

স্ত্রী-ছেলেমেয়ের কাছ থেকে বিদায় নিলাম, উভয় পক্ষেরই চোখে জল। তারপর সুরাটগামী তিন শো টনের বাণিজ্য-জাহাজ 'অ্যাডভেঞ্চারে' গিয়ে উঠলাম। ক্যাপ্টেনের নাম জন নিকোলাস, বাড়ি লিভারপুলে। কিন্তু এ যাত্রার ঘটনাবলীর কথা বলা হবে আমার ভ্রমণ কাহিনীর দ্বিতীয়-খণ্ডে।

দ্বিতীয় খণ্ড

ত্রবভিংনাগ ভ্রমণ

প্রথম অধ্যায়

প্রচণ্ড ঝড়ের বিবরণ—জলের জন্য নৌকো প্রেরণ—তৎসঙ্গে লেখকের দেশ দর্শনে গমন—সমুদ্রতীরে পরিত্যক্ত ও তৎপরে জনৈক অধিবাসীর হস্তে গ্রেপ্তার হওন—কৃষকের বাড়িতে আনয়ন—তথাকার অভ্যর্থনা—কতিপয় আকস্মিক ঘটনা—দেশবাসীদের বর্ণনা।

ভাগ্যদেবী আর আমার নিজের স্বভাব, এই দুয়ে মিলে আমাকে একটা অশান্ত অস্থির জীবনযাত্রার অভিশাপ দিয়েছিল, তাই দেশে ফিরবার দু মাসের মধ্যেই আবার দেশত্যাগী হলাম। ১৭০২ সালের ২০শে জুন ডাউন্স থেকে সৌরাষ্ট্রগামী একটা জাহাজে চাপলাম; জাহাজের নাম 'অ্যাড্‌ভেঞ্চার', ক্যাপ্টেন জন্‌ নিকোলাস হলেন তার কর্তা, বাড়ি তাঁর লিভারপুলে।

উত্তমাশা অন্তরীপ পর্যন্ত অনুকূল বাতাস পেলাম, পানীয় জলের জন্য সেখানে থামলাম, কিন্তু জাহাজের গায়ে ছ্যাঁদা ধরা পড়াতে, জিনিসপত্র নামিয়ে ফেলে সারা শীতকালটা সেখানেই কাটাতে হল। তার উপরে ক্যাপ্টেনের হল পালাজ্বর, কাজেই মার্চ শেষ হবার আগে আর সেখান থেকে নড়বার জো ছিল না।

তারপর তো ভেসে পড়লাম আর মাদাগাস্কারের প্রণালী অবধি ভালোভাবেই গেলাম। কিন্তু ঐ দ্বীপের উত্তরে আন্দাজ পাঁচ ডিগ্রী দক্ষিণ অক্ষাংশে যেই না পৌঁছেছি, দারুণ জোরে বাতাস বইতে লাগল। ঐ সব জায়গায় সাধারণতঃ ডিসেম্বরের গোড়া থেকে মে মাসের গোড়া পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম থেকে সমানে ঝোড়ো হাওয়া দেয়। কিন্তু ঐ ১৯শে এপ্রিল বাতাসটা যেন আরো জোরে, আরো বেশি পশ্চিমদিক থেকে বইতে আরম্ভ করল।

এইভাবে চলল একনাগাড়ে কুড়ি দিন। ততদিনে বাতাস আমাদের ঠেলে নিয়ে ফেলেছে মলাক্কাদ্বীপের একটু পুবে, বিষুবরেখার হয়তো তিন ডিগ্রী উত্তরে। ২রা মে ঝড় থামলে পর আমাদের ক্যাপ্টেন হিসাব কষে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। চারদিকে একেবারে স্থির শান্ত সমুদ্র দেখে আমি তো

মহা খুসি, কিন্তু আমাদের ক্যাপ্টেন ঐ সব সমুদ্রে জাহাজ চালিয়ে পাকাপোক্ত হয়ে গেছেন, তিনি বললেন আমাদের সকলের এবারে ঝড়ের জন্য প্রস্তুত হওয়া দরকার। এলও ঝড় ঠিক তার পরের দিন। দক্ষিণ দিক থেকে দক্ষিণ মৌসুমী বায়ু বইতে লাগল।

গতিক দেখে মনে হল বাতাসের বেগটা আরো বাড়বে, বাড়তি পালটা যাকে 'স্প্রিট-সেল্' বলে তাকে তো গুটিয়েই ফেলা হল,. বড় পালটাকেও নামাবার জন্য আমরা তৈরী হয়ে রইলাম। আবহাওয়া এতই মন্দ যে জাহাজের কামানগুলো মজবুত করে আঁটা আছে কিনা তাও দেখে নিলাম আর পাল মাস্তুল নিয়ে কত যে কসরৎ করলাম তার ঠিক নেই।

প্রচণ্ড ঝড় উঠেছিল, ঢেউগুলোর যেমন অদ্ভুত আকার, তেমনি সাংঘাতিক জোর। আমরা পালের ডাণ্ডার দড়ি শক্ত করে ধরে রইলাম, তাতে হালের মাঝির খানিকটা সুবিধা হল। উপরের পালটা আর নামানো হয় নি, যেমন ছিল তেমনি রইল। জাহাজ তাই ঢেউএর আগে আগে ছুটে চলল। আমাদের জানা ছিল যে উপরের পালটা থাকাতে জাহাজের অবস্থা অনেক বেশি নিরাপদ আর ছুটছিলও দারুণ বেগে, সামনে বাধাহীন সমুদ্রপথ।

তারপর ঝড় থামলে, পাল মাস্তুল আবার যার যেখানে গুছিয়ে নেওয়া হল। তখন আমরা চলেছি পুব ঘেঁষে উত্তর-পুর্বদিকে, বাতাস বইছে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে। ঝড়ের পরেই দক্ষিণ-পশ্চিমের পশ্চিম কোণ থেকে জোর বাতাস দিতে লাগল ; আমার হিসাব অনুসারে ঝড়টা আমাদের পুবদিকে প্রায় দেড় হাজার মাইল ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে যে পড়েছিলাম, জাহাজের সবচেয়ে প্রবীণ নাবিকেরও তা বলবার সাধ্য ছিল না। সঙ্গে যথেষ্ট খাবার ছিল, জাহাজটাও ভারি মজবুত, নাবিকদের স্বাস্থ্য ভালো, কেবল কি যে দারুণ জলকষ্ট সে আর কি বলব। আমাদের মনে হল আর উত্তরদিকে না গিয়ে, যেদিকে চলেছি সেদিকে যাওয়াই ভালো, নইলে বিশাল তাতারভুমির উত্তর-পশ্চিমে যদি গিয়ে পড়ি! সমুদ্র সেখানে জমে বরফ!

১৭০৩, ১৬ই জুন একজন ছোকরা নাবিক বড় মাস্তুলে চড়ে তীররেখা দেখতে পেল। ১৭ই জুন বিশাল একটা দ্বীপের না মহাদেশের—ঠিক যে কি কেউ তা আর ভেবে উঠতে পারলাম না—একেবারে সামনাসামনি এসে

পড়লাম। জায়গাটার দক্ষিণদিকে দেখি ছোট এক টুকরো জমি যেন সমুদ্রের উপর গলা বাড়িয়ে রয়েছে আর সরু একটা খাঁড়ি, তাতে জল এত কম যে একশো টনের বেশি কোনো জাহাজ তার মধ্যে ঢুকতে পারবে না।

এই খাঁড়িটা থেকে মাইল তিনেক দূরে আমরা নোঙর ফেললাম। বারোজন সশস্ত্র নাবিককে ক্যাপ্টেন তাঁর লংবোটে করে জলপাত্র দিয়ে পাঠালেন, যদি পানীয় জল পাওয়া যায়। আমিও তাদের সঙ্গে যাবার অনুমতি চাইলাম, দেশটাও দেখব আর সম্ভব হলে কিছু আবিষ্কারও করব।

ডাঙায় পৌঁছে কোনো নদী কিম্বা ঝর্ণা দেখলাম না, লোকজনের বসবাসের কোনো চিহ্ন নেই। সমুদ্রের কাছাকাছি যদি কোথাও পানীয় জল পাওয়া যায়, এই আশায় আমাদের লোকজনরা উপকূলে ঘুরে বেড়াতে লাগল আর আমি তার উল্টোদিকে একলা একলা মাইলখানেক এগিয়ে গেলাম, কিন্তু চারদিকে দেখলাম শুধু ন্যাড়া পাথুরে জমি।

এবারে ক্লান্তি বোধ করতে লাগলাম আর কৌতূহল মেটাবার মতো কিছু দেখতেও যখন পেলাম না, তখন ধীরে ধীরে আবার খাঁড়ির দিকেই ফিরলাম। চোখের সামনে সমুদ্র; হঠাৎ দেখি আমাদের নাবিকরা ইতিমধ্যে নৌকায় চেপে প্রাণপণে জাহাজের দিকে দাঁড় বেয়ে চলেছে। চেঁচিয়ে ডাকতে যাব—যদিও তাতে বিশেষ লাভ হত না—এমন সময় চোখে পড়ল বিশাল একটা প্রাণী সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে ওদের পিছন পিছন প্রাণপণ ছুটে চলেছে! জল তার হাঁটু অবধিও পৌঁছয় নি আর এই এতখানি দূরে দূরে পা ফেলছে। কিন্তু আমাদের নাবিকরা একে দেড় মাইল এগিয়ে আছে, তার উপরে ওখানকার সমুদ্রের নিচে যত রাজ্যের ধারালো ছুঁচলো পাথর, কাজেই দৈত্যটা কিছুতেই নৌকো ধরতে পারল না।

এসব কথা অবিশ্যি আমি পরে শুনেছিলাম, কারণ তখন বসে বসে ব্যাপারটাকে শেষ অবধি দেখবার সাহসে কুলোয় নি। যে পথে এসেছিলাম সেই পথ ধরেই প্রাণপণে ছুটে পালিয়েছিলাম। তারপর খাড়া একটা পাহাড় বেয়ে উঠে পড়লাম, সেখান থেকে চারধারের দৃশ্য খুব ভালো করে দেখা গেল।

দেখলাম সমস্ত জমিতে কৃষিকাজ হচ্ছে, কিন্তু যা দেখে সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল সেটা হচ্ছে ঘাসগুলো কি অদ্ভুত রকম লম্বা। যে সব জায়গায় সম্ভবতঃ গোরু-ঘোড়া খাবে বলে ঘাস শুকিয়ে রাখা হচ্ছে, সেখানে তো ঘাসগুলো কুড়ি ফুটেরও বেশি উঁচু।

একটা সদর রাস্তায় পড়লাম, অন্ততঃ আমি তাই মনে করেছিলাম, যদিও আসলে সেটা যবের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে পায়েচলা পথ ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই পথ ধরে খানিকটা এগিয়ে গেলাম কিন্তু দুপাশে বিশেষ কিছুই দেখতে পেলাম না, কারণ ফসল কাটার সময় এসে গেছে, শস্যগুলো মাথায় চল্লিশ ফুট উঁচু। মাঠ পার হতে ঘণ্টাখানেক লাগল। মাঠের চারদিকে একশো কুড়ি ফুট উঁচু ঝোপের বেড়া আর গাছগুলো কতখানি লম্বা তার যে হিসাব করব আমার এমন সাধ্য ছিল না। এই মাঠটা থেকে পাশের ক্ষেতে যাবার জন্য বেড়ার উপর দিয়ে সিঁড়ি করা আছে। চারটি ধাপ, তার উপর দিয়ে একটা পাথর ফেলা। ওটা ডিঙিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব, এক এক ধাপই ছ' ফুট উঁচু আর পাথরটা তো কুড়িরও বেশি।

বেড়ার মধ্যে একটা ফাঁক খুঁজে বেড়াচ্ছি, এমন সময় দেখি পাশের ক্ষেত থেকে ঐ দেশের একটা লোক সিঁড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। যে লোকটাকে আমাদের নৌকো তাড়া করতে দেখেছিলাম, এও তারই মতো প্রকাণ্ড।

গির্জার চূড়ো যে রকম উঁচু হয়, একেও সেই রকমই মনে হল। দেখে যদ্দূর মনে হল এক এক বারে দশ গজ লম্বা পা ফেলছে। আমি তো ভয়ে বিস্ময়ে আধমরা, এক দৌড়ে শস্যক্ষেতের মধ্যে গা ঢাকা দিলাম। সেখান থেকে দেখতে পেলাম লোকটা সিঁড়ির উপর চড়ে ডানপাশের ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে আছে। ঐখানে দাঁড়িয়ে তাকে একটা যা হাঁক দিতে শুনলাম, সে রণভেরীর চেয়েও বহুগুণ জোরে। শব্দটা আমার মাথার এতখানি উপর থেকে আসছিল যে প্রথমে ভেবেছিলাম বুঝি মেঘের গর্জন। হাঁক শুনে ওরই মতো আরো সাতটা দৈত্য কাস্তে হাতে এগিয়ে এল ; ছটা কাস্তে জুড়লে যত বড় হয়, এদের এক একটা কাস্তে তত বড়।

প্রথম লোকটার মতো এদের কাপড়-চোপড় অত ভালো নয়; মনে হল এরা ওর চাকর মজুর হবে। ওর হুকুম শুনে আমি যে ক্ষেতের মধ্যে লুকিয়েছিলাম ওরা ঠিক সেইখানেই শস্য কাটতে এল। আমিও যতটা সম্ভব তফাৎ রেখে সরে সরে যেতে লাগলাম, যদিও নড়তে চড়তে খুবই অসুবিধা হচ্ছিল, কারণ শস্য গাছগুলোর বোঁটার মাঝখানে এক এক জায়গায় এক ফুট জায়গাও ছিল না যে তার মধ্যে দিয়ে কোনো গতিকে শরীরটাকে গলিয়ে দিই। যাই হক, কায়ক্লেশে এগিয়ে যেতে লাগলাম, শেষটা এমন একটা জায়গায় এসে পৌছলাম যেখানে ঝড়বৃষ্টির দাপটে শস্যগাছ একেবারে মাটিতে শুয়ে পড়েছে। আর এক পাও এগুনো সম্ভব হল না, ডালপালাগুলো এমনি জড়িয়ে গিয়েছিল যে তার মধ্যে দিয়েও এগুনো যায় না, উপরন্তু যে শীষগুলো মাটিতে পড়েছিল, তাদের এমনই ধারালো খোঁচা খোঁচা শুঁয়ো যে আমার পরনের কাপড়চোপড় ভেদ করে একেবারে গায়ে বিঁধতে লাগল। তার উপর যারা ফসল কাটছিল তাদের গলার আওয়াজ শুনে বুঝতে পারছিলাম যে তারা আমার চেয়ে এক শো গজ দূরেও নেই।

এত বেশি পরিশ্রমের ফলে মনটা একেবারে নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিল; শেষটা দুঃখে হতাশায় অবসন্ন হয়ে, দুসারি গাছের মাঝে নিচু জায়গাটাতে শুয়ে পড়ে মৃত্যু-কামনা করতে লাগলাম। আমার অসহায় বিধবা স্ত্রী আর পিতৃহীন ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে শোক করতে লাগলাম; আত্মীয়বন্ধুদের পরামর্শ না শুনে দ্বিতীয়বার সমুদ্রযাত্রা করায় নিজের মূঢ়তা আর গোঁয়ার্তুমির জন্য কত না আক্ষেপ করলাম! এই নিদারুণ মানসিক অশান্তির মধ্যেও লিলিপুট দেশের কথা না ভেবে পারলাম না। সেখানকার অধিবাসীরা আমাকে মনে করত পৃথিবীর বৃহত্তম আশ্চর্য জীব! সেখানে এক হাতে সম্রাটের গোটা একটা নৌবহর টেনে আনতে পেরেছিলাম, আরো কত না কীর্তি করেছিলাম যা ওদের ইতিহাসে চিরকাল লিপিবদ্ধ থাকবে, ওদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে সে সব কথা অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে, যদিও ঘটনাস্থলে লক্ষ লক্ষ সাক্ষী উপস্থিত ছিল। ভেবে ক্ষোভ হতে লাগল যে একটা লিলিপুটের মানুষকে আমার যত নগণ্য মনে হত, এদেশের লোকদের কাছে আমি নিজেও ঠিক তাই।

আমি এও বুঝতে পারছিলাম যে এটা হল সবচেয়ে কম দুর্ভাবনার কথা।

মানুষদের মধ্যে দেখা যায় আকারে যে যত বড়, নিষ্ঠুরতা বর্বরতা তার তত বেশি। তা হলে প্রথমেই যে দৈত্যের হাতে পড়ব তার মুখের গ্রাস হওয়া ছাড়া আর আমি কি আশা করতে পারি? বাস্তবিক, দার্শনিক পণ্ডিতরা ঠিকই বলেন যে আসলে ছোট বড় বলে কিছু নেই, সবই আপেক্ষিক। ভাগ্যদেবীর সে রকম ইচ্ছা থাকলে, হয়তো লিলিপুট রাজ্যের লোকরাও এমন একটা জাতকে আবিষ্কার করে ফেলতে পারে যারা, ওরা আমাদের তুলনায় যতটা ছোট, ওদের তুলনায়ও ঠিক ততটাই খুদে। আর তাই যদি বলা যায়, কে জানে পৃথিবীর কোনো দূর দেশে, যার বিষয় আমরা এখনো কিছুই জানি না, হয় তো এদের চেয়েও বহু গুণ বিরাট মানুষ সব আছে।

ভয়ে বিহ্বল অবস্থাতেও এই ধরণের চিন্তা না করে পারছিলাম না, এমন সময় যারা শস্য কাটছিল তাদের একজন, আমি যেখানে শুয়েছিলাম, তার দশ গজের মধ্যে এসে পড়ল। আমার তো দারুণ ভয় হল লোকটা আর এক পা ফেললেই হয় আমাকে মাড়িয়ে মেরে ফেলবে, নয় তো কাস্তে দিয়ে কেটে দু টুকরো করে ফেলবে। কাজেই লোকটা যেই না নড়তে যাবে অমনি আমি ভয়ের চোটে যত জোরে পারি চিৎকার করে উঠলাম।

বিশাল দৈত্যটা থমকে দাঁড়াল, তারপর কিছুক্ষণ চারদিকে মাটিতে খুঁজে দেখে শেষটা লক্ষ্য করল আমি ওখানে শুয়ে আছি। একটা ছোট হিংস্র জানোয়ারকে কিভাবে ধরলে সে আঁচড়াতে কামড়াতে পারবে না, এসব ভেবে যে রকম সাবধানে আমরা কাজ করি, এ-ও সেই রকম খানিকক্ষণ ধরে ব্যাপারটা ভেবে দেখল। ইংল্যাণ্ডে বেজি ধরবার সময় আমি নিজেও এই রকম করে থাকি। শেষ পর্যন্ত সাহস করে বুড়ো আঙ্গুল আর তর্জনী দিয়ে পিছন দিক থেকে আমার কোমরটা ধরে তুলে নিজের চোখের তিন গজের মধ্যে নিয়ে এল, যাতে আরো ভালো করে আমার চেহারাটা দেখতে পায়।

ওর উদ্দেশ্য আমি বুঝেছিলাম আর ভাগ্যদেবীও আমাকে খানিকটা উপস্থিত বুদ্ধি জুগিয়ে দিয়েছিলেন, কাজেই আমি স্থির করলাম যে মাটি থেকে ষাট ফুট উঁচুতে শূন্যে আমাকে তুলে ধরলেও, এতটুকু ছটফট করব না। এদিকে পাছে হাত ফস্কে পড়ে যাই, তাই সে আমাকে এমনই জোরে চেপে ধরেছিল যে আমার কোমরে খুব ব্যথা লাগছিল। এইটুকু মাত্র সাহসে কুলোল যে সূর্যের দিকে চোখ তুলে, দয়াপ্রার্থীর মতো হাত জোড় করে, যে অবস্থায় পড়েছি

তারি উপযুক্ত বিনীত বিষণ্ণ সুরে কয়েকটা কথা বললাম। প্রতি মুহূর্তেই ভয় হচ্ছিল এই বুঝি আমাকে মাটিতে আছাড় মেরে ফেলল, ইচ্ছা হলে ঠিক যে রকম করে একটা ছোট কদর্য জানোয়ারকে আমরা মারি। সৌভাগ্যের কথা, ও বোধ হয় আমার স্বর শুনে আর হাবভাব দেখে খুসিই হল এবং আমাকে একটা ভারি মজার জিনিস বলে ঠাওরাল।

একবর্ণ [illegible] না বুঝলেও, আমার মুখে ও রকম কথা শুনে সে তো অবাক! ইতিমধ্যে আমিও আর্তনাদ করে, চোখের জল ফেলে, বারবার মাথা ঘুরিয়ে নিজের দু পাশে তাকিয়ে, তাকে যতটা সম্ভব জানাতে চেষ্টা করলাম যে এত জোরে আঙুল দিয়ে চেপে ধরাতে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। তাছাড়া আর উপায় ছিল না। শেষে মনে হল ব্যাপারটা সে বুঝতে পারল, কারণ নিজের কোটের কোণা তুলে আস্তে আস্তে তার ভাঁজের মধ্যে আমাকে ছেড়ে দিল, তারপর আর কালবিলম্ব না করে এক দৌড়ে আমাকে মুনিবের কাছে নিয়ে চলল। মুনিবটি একজন অবস্থাপন্ন কৃষক, তাঁকেই আমি প্রথমে মাঠের মধ্যে দেখেছিলাম।

ওদের কথাবার্তা থেকে আন্দাজ করলাম চাকরটা আমার সম্বন্ধে যা যা জানে সব মুনিবকে বুঝিয়ে বলছে। তিনি তখন একটা ছোট খড় তুলে নিয়ে—আকারে সেটা আমাদের একটা লাঠির মতোই বড়—তাই দিয়ে খুঁচিয়ে আমার কোটের ধারটা তুলে দেখতে চেষ্টা করতে লাগলেন; তাঁর বোধ হয় ধারণা হয়েছিল যে আমার গায়ে ওটা একটা প্রকৃতিদত্ত আবরণ। তারপর ফুঁ দিয়ে আমার চুল সরিয়ে দিলেন যাতে মুখটা আরো ভালো করে দেখতে পান। পরে শুনেছিলাম যে মজুরদের ডেকে এও জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে মাঠে কখনো আমার মতো ছোট্ট জানোয়ার আর কেউ দেখেছে কি না। তারপর আস্তে আস্তে আমাকে মাটিতে নামিয়ে চার হাত পায়ে ছেড়ে দিলেন। আমি তক্ষুণি সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পাইচারি করে বেড়াতে লাগলাম, যাতে ওরা বুঝতে পারে যে আমার পালাবার মতলব নেই।

ওরাও আমার হাবভাব ভালো করে দেখবার জন্যে আমার চারদিক ঘিরে গোল হয়ে বসে পড়ল। আমি মাথার টুপিটা খুলে কৃষকের দিকে ফিরে নিচু হয়ে নমস্কার জানালাম; হাঁটু গেড়ে বসে দু হাত আর দু চোখ আকাশে তুলে প্রাণপণে চেঁচিয়ে কয়েকটা কথা বললাম, পকেট থেকে আমার মোহরের

থলিটা বের করে বিনীতভাবে তাঁকে দিতে গেলাম। তিনি সেটিকে হাত পেতে নিয়ে চোখের কাছে তুলে দেখতে লাগলেন জিনিসটা কি। জামার হাতা থেকে একটা আলপিন খুলে নিয়ে, তার আগা দিয়ে থলিটাকে উল্টো পাল্টে দেখেও শেষ পর্যন্ত কিছু বুঝে উঠতে পারলেন না। তখন আমিই থলির মুখ খুলে মোহরগুলো তাঁর হাতের তেলোয় ঢেলে দিলাম। ছ'টা বড় বড় মোহর আর বিশ ত্রিশটা অন্য মুদ্রা। দেখলাম তিনি হাতের কড়ে আঙ্গুলটাকে জিভ দিয়ে ভিজিয়ে সব চেয়ে বড় একটা মুদ্রা তুলে নিলেন, তারপর আরেকটা, কিন্তু আমার মনে হল জিনিসগুলো যে কি, সে বিষয়ে তাঁর আদৌ কোনো জ্ঞান নেই। অগত্যা আমাকে ইসারায় বললেন টাকাগুলো থলিতে ভরে, থলিটাকে আবার পকেটে পুরতে। আরো বার কয়েক থলিটা তাঁকে দেবার চেষ্টা করে, শেষ পর্যন্ত ইসারায় যা বললেন তাই করাই বাঞ্ছনীয় মনে হল।

এতক্ষণে কৃষকের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেছে যে আমি একটা বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন জীব। আমার সঙ্গে অনেকবার কথাও বললেন, তার শব্দে আমার কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছিল বটে, কিন্তু কথাগুলো স্পষ্ট করে শোনাও যাচ্ছিল। আমিও যতটা জোরে পারি চেঁচিয়ে অনেকগুলো ভাষায় চেষ্টা করে দেখলাম। তিনি অনেকবার কানটাকে বাড়িয়ে আমার দু গজের মধ্যে নিয়ে এলেন, কিন্তু সবই বৃথা, দুজনার কাছে দুজনার ভাষা একেবারে দুর্বোধ্য!

তখন তিনি চাকরদের যার যার কাজে পাঠিয়ে দিলেন, তারপর পকেট থেকে রুমাল বের করে, সেটাকে ভাঁজ করে হাতের তেলোয় পাতলেন, তারপর হাতটাকে চ্যাপ্টা করে মাটিতে পেতে, আমাকে তার উপর চড়তে ইসারা করলেন। হাতটা এক ফুটের বেশি পুরু ছিল না, কাজেই তাতে চড়া কিছু শক্ত কাজ নয়। তাছাড়া তাঁর কথামত চলাটাই কর্তব্য বলে মনে হল, কাজেই তাঁর হাতে উঠে পড়লাম। তবে পড়ে যাবার ভয়ে রুমালের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে রইলাম, তিনিও আরেকটু নিরাপত্তার জন্যে রুমালের বাকি অংশটা দিয়ে আমাকে গলা অবধি ভালো করে জড়িয়ে নিলেন। এইভাবে তো আমাকে তিনি বাড়ি নিয়ে গেলেন। সেখানে পৌঁছে স্ত্রীকে ডেকে আমাকে দেখালেন। স্ত্রী অমনি চিৎকার করে ছুটে পালালেন, ব্যাঙ কিম্বা মাকড়সা দেখলে ইংল্যাণ্ডের মেয়েরা যে রকম পালায়। যাই হক, খানিকক্ষণ ধরে আমার হাবভাব লক্ষ্য করার পর, আমি তাঁর স্বামীর ইসারা মেনে কেমন চলি

দেখে, শেষ পর্যন্ত আমাকে মেনে নিলেন, এমনকি একটু একটু করে আমাকে খুব ভালোওবাসতে লাগলেন।

তখন বেলা বারোটা, একজন চাকর দুপুরের খাবার নিয়ে এল। চাষীদের উপযুক্ত সাদাসিধাভাবে রান্না একটা মাত্র পাত্রে প্রচুর মাংস, পাত্রটার ব্যাস হবে চব্বিশ ফুট। খেতে বসলেন চাষী, তাঁর স্ত্রী, তিনটি ছেলেমেয়ে আর বুড়ি ঠাকুরমা। সকলে বসলে পর কর্তা আমাকে নিজের কাছ থেকে একটু দূরে টেবিলের উপরে বসিয়ে দিলেন।

টেবিলটা ছিল মাটি থেকে ত্রিশ ফুট উঁচু, আমি তো ভয়েই আধমরা! পাছে পড়ে যাই তাই ধার থেকে যতটা পারি সরে বসলাম। কৃষকের স্ত্রী একটু মাংস কিমা করে আর একটু রুটি গুঁড়িয়ে, একটা থালায় করে আমার সামনে রাখলেন। আমি নিচু হয়ে তাঁকে অভিবাদন করে, ছুরি কাঁটা বের করে খেতে শুরু করলাম, তাই দেখে ওরা তো মহা খুসি! গিন্নী ঝিকে পাঠালেন ছোট একটা ওষুধের গেলাস আনতে, তাতে দু গ্যালন জল ধরে, সেই গেলাসটা ভরে তিনি আমাকে মদ খেতে দিলেন। অনেক কষ্টে দু হাতে গেলাসটা তুলে, বিনীতভাবে প্রাণপণে চেঁচিয়ে ইংরিজিতে ভদ্রমহিলার স্বাস্থ্য-কামনা করে পান করলাম। খেতে মন্দ লাগল না, অনেকটা আমাদের দেশের আপেল থেকে তৈরী সাইডারের মতো।

তারপর কর্তা আমাকে তাঁর থালার পাশে আসতে ইসারা করলেন; টেবিলের উপর দিয়ে আমি তাঁর দিকে এগুতে লাগলাম, তখন আমার মনের মধ্যে সে যে কি ভয় আর বিস্ময় সহৃদয় পাঠকমহাশয় সহজেই অনুমান করতে পারেন। হঠাৎ একটা রুটির ছিলকায় হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম, তবে বিশেষ লাগল না। তক্ষুণি উঠেও পড়লাম, চেয়ে দেখি ওঁরা এত ভালো যে আমার জন্যে সবাই দারুণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। ভদ্রতার খাতিরে টুপিটাকে এতক্ষণ বগলদাবা করে বেড়াচ্ছিলাম, পড়ে গিয়ে আমার যে একটুও ক্ষতি হয় নি তাই দেখাবার জন্যে এবার টুপিটাকে নিয়ে মাথার উপরে বার কয়েক নেড়ে তিনবার জয়ধ্বনি দিলাম।

আমার প্রভুর—এখন থেকে তাঁকে আমার প্রভু বলেই উল্লেখ করব—ছোট ছেলেটা তাঁর পাশেই বসেছিল, বছর দশেকের ভারি চালাক ছোকরা, সে করেছে কি, যেই না তার বাপের দিকে এগুতে আরম্ভ করেছি অমনি

আমার দু ঠ্যাং ধরে এত উঁচুতে শূন্যে তুলে ধরেছে যে আমার হাতপায় কাঁপুনি ধরে গেছে। আমার প্রভু তক্ষুণি আমাকে ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে, ওর বাঁ কানের উপরে এমনি এক ঘুঁষি লাগিয়েছেন যে তার চোটে আমাদের দেশের একদল অশ্বারোহী একেবারে কুপোকাৎ হত! তারপর তাকে খাবার টেবিল ছেড়ে চলে যেতে বললেন। তাই দেখে আমি তো ভয়েই মরি, এবার ছেলেটা আমার উপর রাগ পুষে রাখবে। ছোট ছেলেরা চড়াই পাখি, খরগোস, ছোট ছোট বেড়াল ছানা, কুকুরের বাচ্চার উপর কি দুর্ব্যবহারই না করে থাকে সে কথা আমার খুব ভালো করেই মনে ছিল, কাজেই হাঁটু গেড়ে বসে ছেলেটার দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে, যতটা সম্ভব আমার প্রভুকে বোঝাতে চেষ্টা করতে লাগলাম যে আমার ইচ্ছা ওকে ক্ষমা করা হক। বাপ রাজী হয়ে গেলেন, ছেলেটাও আবার এসে টেবিলে বসল। তখন আমি তার কাছে গিয়ে তার হাতে চুমো খেলাম আর আমার প্রভু ওর হাতটা তুলে তাই দিয়ে আমার গায়ে বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

খাবার মাঝখানে গিন্নিমার আদুরে বেড়াল এক লাফে তাঁর কোলে চড়ে বসল। এক ডজন লোক এক সঙ্গে মোজা বুনবার কল চালালে যে রকম শব্দ হয়, সেই রকম শব্দ শুনে মাথা ঘুরিয়ে দেখি বেড়ালটা গলার মধ্যে ঘড়র ঘড়র আওয়াজ করছে।

গিন্নিমা ওকে খাওয়াচ্ছেন, গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন আর আমি ওর মাথাটার যতটা দেখতে পাচ্ছিলাম আর একটা থাবার মাপ থেকে আন্দাজে হিসাব করলাম একটা ষাঁড়ের চেয়ে তিনগুণ বড হবে এই বেড়ালটা। তার উপর মুখের ভাবটা এতই হিংস্র যে আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া, যদিও আমি ছিলাম টেবিলের অন্য প্রান্তে, ওর চেয়ে পঞ্চাশ ফুটেরও বেশি দূরে। গিন্নিমা ওকে শক্ত করে ধরে থাকা সত্ত্বেও আমার দারুণ ভয় হচ্ছিল এই বুঝি এক লাফে আমাকে নখ দিয়ে ধরে! কিন্তু দেখা গেল যে ভয়ের কোনো কারণই নেই, এমন কি আমার প্রভু যখন আমাকে ওর তিন গজের মধ্যে নামিয়ে রাখলেন, তখনও বেড়ালটা আমার দিকে একবার তাকিয়েও দেখল না।

চিরকাল লোকের মুখে এ কথা শুনেওছি আর নিজের ভ্রমণকালের অভিজ্ঞতা থেকে শিখেওছি যে কোনো হিংস্র জন্তুর সামনে থেকে পালাবার চেষ্টা করার, কিম্বা ভয় পেয়েছি এ কথা জানতে দেওয়ার অবশ্যম্ভাবী ফলই হল

হয় সে তাড়া করবে, নয় তো আক্রমণ করবে। আমি তাই খুব সাহস দেখিয়ে বেড়ালটার মাথার কাছে একেবারে তার আধ গজের মধ্যে, বার পাঁচ ছয় ঘুরে এলাম। তাতে সেই খানিকটা পিছু হটে গেল, যেন আমাকে দেখে তারই বেশি ভয়।

চাষীদের বাড়িতে যেমন হয়, তিন চারটে কুকুরও এসে ঘরে ঢুকল; তার মধ্যে একটা ম্যাষ্টিফ্ ছিল চারটে হাতির সমান বড়, একটা গ্রে-হাউণ্ডও ছিল, ম্যাষ্টিফ্‌টার চেয়ে মাথায় খানিকটা উঁচু কিন্তু গায়ে অতটা বড় নয়। এই কুকুরগুলোকে দেখে কিন্তু আমি সে রকম ভয় পাই নি।

খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় ওদের ধাইমা এল বছর খানেকের একটা খোকা কোলে করে। সে তো আমাকে দেখেই এমনি কান্না জুড়ে দিল যে তা লণ্ডন ব্রিজ থেকে চেল্‌সি অবধি শোনা যেত, অর্থাৎ কিনা আমাকে নিয়ে সে খেলা করবে, শিশুদের ভাষায় এই তার বায়না! মা'টিও তেমনি, স্রেফ্ আহ্লাদে গদ্‌গদ হয়ে দিলে আমাকে বাচ্চাটার দিকে ঠেলে, আর বাচ্চাটাও অমনি আমাকে কোমর ধরে তুলে মুণ্ডুটাকে মুখের মধ্যে ঠুসে দিল। মুখের ভিতর থেকে আমিও এমনি জোরে চ্যাঁচাতে লাগলাম যে শেষ পর্যন্ত খোকাটা ঘাবড়ে গিয়ে আমাকে ফেলেই দিল। সে যাত্রায় নির্ঘাৎ আমার ঘাড় মটকে যেত, যদি না খোকার মা তলায় আঁচল পেতে আমাকে ধরে ফেলতেন। ধাইমা তখন বাচ্চার কান্না থামাবার জন্য একটা ঝুনঝুনি নাড়তে লাগল; ঝুনঝুনিটা হল বিশাল একটা ফাঁপা জিনিষ, তার মধ্যে বড় বড় পাথরের চাঁই পোরা; সেটা আবার মোটা দড়ি দিয়ে খোকার কোমর থেকে ঝোলানো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না; তখন শেষ উপায় অবলম্বন করে বাচ্চাটার মুখে মাই দিয়ে তাকে চুপ করাতে হল। এখানে আমাকে স্বীকার করতে হচ্ছে যে ঐ বিশাল স্তন দেখে আমার মনটা এমনি বিরূপ হয়ে উঠল, যেমন আর কখনো কিছু দেখে হয় নি। পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তি করবার জন্য যে ওটার বিশাল আকৃতি, গড়ন বা রঙের বর্ণনা দেব, তার একটা উপযুক্ত উপমা পর্যন্ত ভেবে পাচ্ছি না।

চোখের সামনে পুরো ছ' ফুট উঁচু, বেড়ে ষোল ফুটের কম হবে না, বোঁটাটাই আমার মাথার অর্ধেক হবে, আর তার উপরে সমস্ত স্তনটাতে সে যে কত বিচিত্র রকমের ফোঁটা, ফুসকুড়ি আর ফুট্‌কির দাগ যে

দেখলে বমি আসে, ও রকম আর কিছু হতে পারে এ আমার মনে হয় না। খুব কাছ থেকেই দেখেছিলাম, কারণ মাই দিতে সুবিধা হবে বলে ধাইমা টেবিলের পাশে বসল আর আমি তো টেবিলের উপরেই দাঁড়িয়ে। এই ব্যাপার দেখে আমার ইংরেজ মহিলাদের ফর্সা রঙের কথা মনে পড়ল। আমাদের চোখে তাদের দেখতে সুন্দর লাগার একমাত্র কারণ হল, মাপে তারা আমাদেরই সমান। ম্যাগনিফাইং গ্লাস্ দিয়ে না দেখলে ওদের চামড়ার খুঁৎগুলো ধরা পড়ে না। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে আতশী কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখলে, সবচেয়ে শুভ্র ও মসৃণ ত্বককেও অসমান, কর্কশ আর কুৎসিৎ রঙের বলে মনে হয়।

আমার মনে আছে যখন লিলিপুট রাজ্যে ছিলাম ওখানকার খুদে খুদে মানুষদের গায়ের রংকে মনে হত পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর। এই প্রসঙ্গ নিয়ে ও দেশের একজন বিজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনাও করেছিলাম ; তিনি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে আমি তাঁকে যখন হাতে তুলে মুখের কাছে আনতাম, তখন অত কাছ থেকে আমার মুখটাকে যে রকম দেখাত, তার চেয়ে তিনি যদি মাটিতে দাঁড়িয়ে উপর দিকে তাকিয়ে আমাকে দেখতেন, তখন আমার মুখটাকে মনে হত অনেক বেশি ফর্সা ও মোলায়েম।

প্রথমবার যখন আমাকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন তিনি নাকি আঁৎকে উঠেছিলেন। গায়ের চামড়ার উপর মস্ত মস্ত গর্ত, দাড়ির খোঁচাগুলো শূওরের কুঁচির চেয়েও দশগুণ মোটা, আর গায়ের রঙের কথা বলে কাজ নেই, নানান বিকট রঙ গুলে তৈরী। এ প্রসঙ্গে পাঠকমহাশয়ের অনুমতি নিয়ে এইটুকু নিবেদন করতে চাই যে আমাদের দেশের অন্য পুরুষমানুষদের মতোই আমি ফর্সা আর এত দেশভ্রমণ করেও সে রকম কিছু রোদেপোড়া রঙও নয় আমার। অপর পক্ষে রাজসভার মহিলাদের কথা আলোচনা করতে গিয়ে, তিনি বলতেন কারো বা মুখে দাগ, কারো হাঁ বড়, কারো নাকটা বেঢপ বড় ইত্যাদি, অথচ এসবের কিছুই আমার চোখে ধরা পড়ত না। এসব কথা অবিশ্যি সকলেই জানেন, তবু এক বার উল্লেখ না করে পারলাম না, পাছে কারো ধারণা হয়ে যায় যে ও দেশের অতিকায় মানুষগুলো বুঝি সত্যি বিকৃতদর্শন ছিল। আসলে তাদের প্রতি সুবিচার করতে গেলে বলতে হয়

যে তারা দস্তুর মতো সুদর্শন। বিশেষ করে আমার প্রভুর কথা বলতে হয়। তিনি তো একজন কৃষকমাত্র, তবু প্রথম যখন ষাট ফুট উঁচুতে তাঁর মুখখানি দেখেছিলাম তখনি তার সুন্দর গড়নটি লক্ষ্য করেছিলাম।

খাবার পর আমার প্রভু তাঁর মজুরদের কাছে ফিরে গেলেন। গলার স্বর আর অঙ্গভঙ্গী থেকে যতটা বুঝলাম, যাবার আগে স্ত্রীকে বিশেষভাবে সতর্ক করে দিয়ে গেলেন যেন আমাকে সাবধানে রাখা হয়।

তখন দারুণ ক্লান্তি বোধ করছি, ঘুমও পাচ্ছে। তাই দেখে গিন্নিমা আমাকে তাঁর নিজের বিছানায় শুইয়ে দিলেন, একটা পরিষ্কার সাদা রুমাল দিয়ে আমার গা ঢাকা দিয়ে দিলেন, সে রুমালটা একটা মানোয়ারি জাহাজের বড় পালের চেয়েও বড় আর কর্কশ।

ঘণ্টা দুই ঘুমোলাম। স্বপ্ন দেখছিলাম যেন স্ত্রীপুত্রের কাছে নিজের বাড়িতে রয়েছি। তারপর ঘুম ভাঙ্গতেই যখন দেখলাম দু তিন শো ফুট চওড়া, দু শো ফুট উঁচু, বিশাল একটি ঘরে, কুড়ি গজ চওড়া একটা খাটে একলা পড়ে আছি, তখন আমার মনের দুঃখ কত গুণ বেড়ে গেল সে আর কি বলব। গিন্নিমা আমার ঘরের দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে সংসারের কাজে ব্যস্ত। খাটটা মাটি থেকে আট গজ উঁচু। প্রাকৃতিক প্রয়োজনে এখন আমার নামা দরকার, অথচ সাহস করে কাউকে ডাকতেও পারছি না। আর যদি বা ডাকতাম তাতে কোনো লাভই হত না, আমার তো ঐ ক্ষীণ কণ্ঠ, বাড়ি সুদ্ধ সবাই ছিল রান্নাঘরে, যে ঘরে শুয়েছিলাম সেখান থেকে বহু দূরে।

এই রকম অবস্থায় রয়েছি, এমন সময় দুটো বিরাট ইঁদুর খাটের ঝালর বেয়ে উঠে, গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে খাটের এপাশ থেকে ওপাশ দৌড়োদৌড়ি লাগিয়েছে। একটা তো প্রায় আমার মুখের কাছে এসে হাজির! আমিও তখন ভয়ের চোটে উঠে পড়ে, আত্মরক্ষার জন্যে তলোয়ারখানা বের করেছি। বিকট জন্তু দুটোর এমনি সাহস যে দু দিক থেকে আমাকে আক্রমণ করেছে। একটা এসে আমার কাঁধের ওপর সামনের পা দুটো তুলে দিয়েছে, ভাগ্যিস কোনো অনিষ্ট করবার আগেই তলোয়ারের খোঁচায় তার পেটটা একেবারে ফেড়ে দিতে পারলাম। সেটা তো আমার পায়ের কাছে পড়ে গেল। অন্যটাও বন্ধুর দশা দেখে দে-দৌড়। কিন্তু সে পালাবার আগে তার পিঠেও খোঁচা লাগালাম, দরদর করে রক্ত পড়তে লাগল।

এই কীর্তি সেরে, দম নেবার আর ভয় কাটাবার জন্যে খাটের ওপর আস্তে আস্তে পাইচারি করতে লাগলাম। ইঁদুর দুটো মাপে ছিল এক একটি বড় ম্যাষ্টিফ্ কুকুরের মতো, কিন্তু আরো হিংস্র আর চটপটে। ঘুমোবার আগে যদি তলোয়ার ঝোলাবার বেল্টটা খুলে রাখতাম, তা হলে নির্ঘাৎ দুটোতে মিলে আমাকে কুচিকুচি করে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলত।

মরা ইঁদুরটার ল্যাজের মাপ নিয়ে দেখি দু গজের চেয়ে মাত্র এক ইঞ্চি কম। লাসটা খাটের উপর পড়ে আছে, তখনো রক্ত ঝরছে, তবু সেটাকে টেনে নিচে ফেলে দিতে মন সরছিল না। দেখলাম তখনো একটুখানি প্রাণ আছে। গলার ওপর তলোয়ারের এক কোপে দিলাম একেবারে যমের বাড়ি পাঠিয়ে।

একটু বাদেই গিন্নিমা এসে ঘরে ঢুকলেন। আমার সর্বাঙ্গে রক্ত দেখে ছুটে এসে আমাকে হাতে তুলে নিলেন। আমি মরা ইঁদুরটাকে দেখিয়ে, হেসে ইসারা করে জানিয়ে দিলাম যে আমি একটুও আহত হই নি। তাতে তিনি তো মহা খুসি। দাসীকে ডেকে বললেন একটা চিমটে দিয়ে তুলে ইঁদুরটাকে জানলা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিতে। তারপর তিনি আমাকে একটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলেন।

তাঁকে আমার রক্তমাখা তলোয়ার দেখিয়ে, সেটাকে কোটের কোণায় মুছে আবার খাপের মধ্যে পুরে ফেললাম। এখন আরেকটা কাজ বাকি থাকল, সে এমন কাজ যা আর কারো পক্ষে আমার হয়ে করে দেওয়া সম্ভব নয়, কাজেই গিন্নিমাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে আমাকে একবার মাটিতে নামিয়ে দেওয়া দরকার। তাই দিলেনও তিনি; তারপরে যে কি করতে চাই, দরজার দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে, বার কয়েক নিচু হয়ে 'বাও' করা ছাড়া লজ্জার কারণে সে বিষয়ে আর বেশি কিছু বলা সম্ভব হল না। অনেক কষ্টে শেষ পর্যন্ত ভদ্রমহিলা বুঝলেন ব্যাপারটা, তখন আবার আমাকে হাতে তুলে নিয়ে বাগানে গিয়ে মাটিতে নামিয়ে দিলেন। আর আমিও একদিকে প্রায় দু শো গজ মতো এগিয়ে গেলাম। তারপর তাঁকে ইসারায় এগিয়ে আসতে বা তাকাতে বারণ করে দিয়ে, দুটো বড় পাতার আড়ালে গিয়ে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিলাম।

আশা করি সুহৃদয় পাঠকমহাশয় এ ধরণের কথা এত বিস্তারিতভাবে

বলার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। আসল কথা হল যে নিচ অশিক্ষিত সাধারণ লোকের কাছে এসব তথ্য অকিঞ্চিৎকর মনে হলেও, বিজ্ঞ দার্শনিকরা এর মধ্য থেকে নিজেদের মন ও কল্পনাশক্তি প্রসারিত করবার উপাদান খুঁজে পাবেন। সে জ্ঞান শুধু নিজের ব্যক্তিগত জীবনে কেন, জনসাধারণের হিতসাধনেও লাগানো যেতে পারে।

আমার পৃথিবী ভ্রমণের এই কাহিনী এবং অন্যান্য বৃত্তান্ত প্রকাশ করার একমাত্র ঐ উদ্দেশ্য। কাজেই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সত্য ঘটনারই বিবরণ দিয়ে গেছি, কোথাও এতটুকু বিদ্যা জাহির করবার বা সাজিয়ে কথা বলবার প্রয়াসে অলঙ্কার ব্যবহার করি নি। তবু বলছি এই ভ্রমণদৃশ্য আমার মনের উপর এমনি ছাপ রেখে গিয়েছিল আর স্মৃতিপটেও এত গভীর রেখাপাত করেছিল যে কাগজে কলমে লিখবার সময়েও কোন তথ্যই বাদ দিই নি। তবে প্রথম পাণ্ডুলিপিতে কয়েকটি তুচ্ছ বিষয়ের উল্লেখ করেছিলাম। দ্বিতীয়বার পড়বার সময়ে সেগুলো কেটে বাদ দিয়েছি, পাছে সমালোচকরা আমার বিবরণীকে বিরক্তিকর ও অকিঞ্চিৎকর মনে করেন ; যেমন অনেক ভ্রমণকাহিনীকেই বলা হয়ে থাকে এবং হয়তো একেবারে অকারণেও নয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চাষীকন্যার বর্ণনা—লেখককে গঞ্জে আনয়ন—তৎপর সহর যাত্রা—যাত্রার বিশদ বিবরণ।

গিন্নিমার একটি ন'বছরের মেয়ে ছিল, বয়সের তুলনায় তার অনেক গুণ ছিল, চমৎকার সেলাই করত আর খোকাকে কাপড়চোপড় পরাতে ওস্তাদ ছিল। মা-মেয়েতে মিলে খোকার দোলায় আমার রাতে শোবার ব্যবস্থা করে ফেললেন। দোলাটাকে একটা সিন্দুকের টানায় রেখে, ইঁদুরের ভয়ে টানাটাকে একটা তাকে ঝুলিয়ে রাখা হল। এঁদের সঙ্গে যতদিন ছিলাম, এইভাবেই আমার বিছানা পাতা হত। অবিশ্যি যেমন ওঁদের ভাষা শিখে নিয়ে নিজের কখন কি দরকার ওঁদের জানাতে লাগলাম, আরামের ব্যবস্থাটাও আরো ভালো হতে লাগল।

এই মেয়েটি এত করিৎকর্মা ছিল যে বার দুই ওর সামনে আমি কাপড় ছাড়বার পর ও-ই আমার কাপড় ছাড়াতে ও পরাতে শিখে নিল। অবিশ্যি পারলে আমি কখনই ও কাজ ওকে করতে দিতাম না, ও বাধা না দিলে নিজেই করতাম। ও আমার জন্য সাতটা শার্ট ও অন্যান্য কয়েকটা জামাকাপড় সেলাই করে দিয়েছিল। তার জন্য যতটা সম্ভব মিহি কাপড় ব্যবহার করেছিল, কিন্তু তাও চটের চেয়ে মোটা। এসব কাপড়জামা ও নিজের হাতেই কেচে দিত।

তার উপর ও আমার মাষ্টারনীও ছিল, ওদের ভাষা শেখাত। কোনো জিনিসের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখালে ওদের ভাষায় তার নাম আমাকে বলে দিত, তার ফলে কয়েক দিনের মধ্যেই কোনো জিনিস দরকার হলে, আমি সেটার নাম করে চাইতে পারতাম। ওর স্বভাবটিও ছিল ভারি অমায়িক, বয়সের তুলনায় বেশ বেঁটেই ছিল, মাথায় মাত্র চল্লিশ ফুটের বেশি হবে না।

সে আমার নাম দিল গ্রিল্‌ড্রিগ। তার দেখাদেখি বাড়ি সুদ্ধ সকলেই ঐ নামেই আমাকে ডাকতে লাগল, শেষ পর্যন্ত দেশ জুড়ে সবাই তাই ডাকত। ঐ কথাটির অর্থ হল খুদে মানুষ অর্থাৎ ল্যাটিনে ন্যানুনকুলুস, ইটালিয়ান ভাষায়

হমুনকেলেটিনো ও ইংরিজিতে ম্যানিকিন বলতে যা বোঝায়। ওদেশে যে আমি প্রাণে বেঁচেছিলাম, তার জন্য আমি বিশেষ করে ঐ মেয়েটির কাছেই ঋণী। যতদিন ওখানে ছিলাম, ওর সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয় নি। আমি ওকে বলতাম আমার গ্লুমডালক্লিচ অর্থাৎ ছোট ধাইমা। ও আমায় যে আদরযত্ন করেছিল শ্রদ্ধার সঙ্গে তার উল্লেখ না করলে, আমি ঘোরতর অকৃতজ্ঞতার দায়ে পড়ব।

এই আদরযত্নের যদি সুযোগ্য প্রতিদান দিতে পারতাম তাহলে আমি বড়ই খুসি হতাম, কিন্তু তার বদলে আমি যে বরং অনেক সময় নিজে না জেনেও ওর লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগের কারণ হতাম, এরকম আশঙ্কা করবার আমার যথেষ্ট কারণ আছে।

ততদিনে পাড়ার মধ্যে লোকে বলাবলি করতে আরম্ভ করে দিয়েছে যে আমার প্রভু মাঠের মধ্যে একটা অদ্ভুত জানোয়ার কুড়িয়ে পেয়েছেন, একটা 'স্প্ল্যাক্নুকের' মতো ছোট, কিন্তু আর সব বিষয়ে অবিকল মানুষের মতো দেখতে। শুধু দেখতে কেন, ভাবভঙ্গীতেও জানোয়ারটা মানুষের ধরণ-ধারণ হুবহু নকল করে, মনে হয় যেন নিজের কি একটা ছোট ভাষায় কথা বলে, আবার এরই মধ্যে এ দেশের অনেক কথা শিখে ফেলেছে। সোজা হয়ে দু পায়ে হাঁটে, ভারি নম্র ও পোষমানা চালচলন, ডাকলে কাছে আসে, যা বলা যায় তাই করে, এত সুন্দর তার হাত পায়ের গড়ন যে পৃথিবীতে কোথাও এমনটি দেখা যায় না আর বড়লোকের বাড়ির বছর তিনেকের মেয়েদেরও এমন ফর্সা গায়ের রং হয় না।

কাছেই আরেকজন চাষী থাকতেন, আমার প্রভুর খুব বন্ধু, তিনি এই গল্পের সত্যমিথ্যা যাচাই করার উদ্দেশ্যেই বিশেষ করে একদিন বেড়াতে এলেন। তখুনি আমাকে এনে টেবিলের উপরে ছেড়ে দেওয়া হল। যেমন যেমন বলা হল ঠিক সেইভাবে চলাফেরা করলাম, তলোয়ার বের করলাম, তলোয়ার খাপে ভরলাম, অতিথিমহোদয়কে কুর্ণিশ করলাম, তাঁদের ভাষায় তাঁর কুশল প্রশ্ন করলাম, তাঁকে স্বাগত জানালাম, আমার ছোট ধাইমা যেমন যেমন শিখিয়েছিল সব করলাম। ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে, চোখে কম দেখেন, আমাকে ভালো করে দেখবার জন্যে নাকের উপর চশমা আঁটলেন। তাই দেখে আমিও খুব একচোট না হেসে পারলাম না, কারণ তাঁর চোখ

দুটোকে মনে হচ্ছিল যেন ঘরের দুই জানালা দিয়ে পূর্ণিমার চাঁদ উঁকি মারছে। আমাদের বাড়ির লোকরা আমার হাসির কারণ বুঝতে পেরে, হাসিতে যোগ দিল, কিন্তু বুড়ো ভদ্রলোক এমনি বোকা যে দারুণ রেগে উঠলেন, মেজাজটাই তাঁর খিঁচড়ে গেল।

লোকে তাঁকে মহা কঞ্জুস বলত এবং আমারই দুর্ভাগ্য যে নামটা তাঁর উপযুক্ত ছিল। আমার প্রভুকে তিনি কুপরামর্শ দিলেন যে আগামী হাটবারে পাশের গঞ্জে আমাকে নিয়ে গিয়ে লোকের কাছে দেখালে বেশ হয়। সে শহরটা আমাদের বাড়ি থেকে বাইশ মাইল দূরে, ঘোড়ায় চড়ে যেতে লাগে আধ ঘণ্টা। যেই দেখেছি আমার প্রভু বন্ধুর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কি সব গুজুর গুজুর করছেন, মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছেন, অমনি বুঝেছি কোনো রকম একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছে। ভয়ের চোটে মনে হতে লাগল বুঝি ওঁদের কথাবার্তা কিছু শুনতে পাচ্ছি ও কিছু কিছু বুঝতেও পারছি। পরদিন সকালে বোধ হয় চালাকি করে মার কাছ থেকে সমস্ত ব্যাপারটা জেনে নিয়ে ছোট ধাইমা আমাকে সব বলে দিল। বেচারা আমাকে বুকে তুলে নিয়ে, লজ্জায় দুঃখে কাঁদতে লাগল।

তার বড় ভয় অশিক্ষিত অভদ্র লোকদের হাতে পড়ে আমার কোনো অনিষ্ট হবে, হয়তো চিপেই মেরে ফেলবে, নয়তো হাতে তুলে নিয়ে আমার একটা হাত-পাই জখম করে দেবে! সে তো লক্ষ করেছিল আমার স্বভাবটা কেমন লাজুক, নিজের আত্মসম্মান সম্বন্ধে আমি কত সচেতন; পয়সার জন্যে যত রাজ্যের আজেবাজে লোকের কাছে সংএর মতো আমাকে দেখালে আমি যে কতদূর অপমান বোধ করব সেটাও তার জানা ছিল।

সে বললে বাবা-মা তাকে কথা দিয়েছিলেন যে গ্রিলড্রিগ হল তার জিনিস, কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে যে গত বছর ভেড়ার ছানা দিয়ে যেরকম তাকে ভাঁওতা দেওয়া হয়েছিল, এবারেও তাই হবে। যেই না ভেড়ার ছানা দিব্যি মোটাসোটা হয়ে উঠল অমনি তাকে কষাইএর কাছে বেচে দেওয়া হল।

সত্যি কথা বলতে কি আমার ছোট ধাইমার মতো আমার নিজের কিন্তু অতটা ভাবনা হচ্ছিল না। একবারের জন্যেও আমার মন থেকে এই আশা দূর হয় নি যে একদিন না একদিন আমি মুক্তিলাভ করব। তাছাড়া লোককে দেখাবার মতো একটা অদ্ভুত জানোয়ার বলে এখানে-ওখানে ঘুরিয়ে নিয়ে

বেড়ানোর কথাই যদি ধরা যায়, আমি তো জানতামই যে ওদেশে আমি একজন সম্পূর্ণ অজানা আগন্তুক, যদি কখনও দেশে ফিরি এসব ব্যাপার নিয়ে কেউ আমাকে দোষ দেবে না, কারণ আমার মতো অবস্থায় পড়লে, স্বয়ং গ্রেট ব্রিটেনের রাজারও আমারই মতো দশা হত!

পরের হাটবারে আমার প্রভু, বন্ধুর পরামর্শ অনুসারে আমাকে একটা বাক্সে পুরে সহরে নিয়ে চললেন। ঘোড়ার পিছনে বসিয়ে আমার সঙ্গে মেয়েকেও নিলেন। বাক্সটার চারদিকে বন্ধ, হাওয়া আসার জন্যে একটা দরজা আর বাতাস যাতায়াতের জন্যে কয়েকটা ঘুলঘুলির মতো ছ্যাঁদা। মেয়েটির যত্ন কত, আমি শোব বলে বাক্সের মধ্যে পুতুলের লেপটা দিয়ে রেখেছে। তা সত্ত্বেও এই আধ ঘণ্টার পথটুকু যেতেই অতিরিক্ত ঝাঁকুনি খেয়ে আমি একেবারে অসুস্থ হয়ে পড়লাম। প্রত্যেক কদমে ঘোড়া চল্লিশ ফুট এগোয় আর এতখানি লাফিয়ে চলে যে ঝড়ের সময় ঢেউএর মাথায় জাহাজ যেমন ওঠে-পড়ে, তার সঙ্গে তুলনা করা যায়, বরং আরও ঘন ঘন লাফ!

লণ্ডন থেকে সেণ্ট অ্যালবান যতটা দূরে, আমাদের যেতে হল তার চেয়েও একটু বেশি। সহরে পৌছে আমার প্রভু একটা সরাইখানায় গিয়ে উঠলেন, এখানে তিনি প্রায়ই এসে থেকেছেন। সরাইখানার মালিকের সঙ্গে খানিকটা পরামর্শ করে, আরও অন্যান্য কিছু কিছু ব্যবস্থা সেরে নিয়ে, সহরের ঢ্যাঁড়াদারকে ভাড়া করে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন যে গ্রীণ ঈগল সরাইখানায় ভারী অদ্ভুত একটা জানোয়ার দেখা যেতে পারে, সেটা স্প্ল্যাক্‌নুকের চেয়েও ছোট, হুবহু মানুষের মতো দেখতে, অনেক কথা বলতে পারে ও একশো রকম মনোহর খেলা দেখাতে পারে। এখানে বলে রাখি যে স্প্ল্যাক্‌নুক্ হল ছয় ফুট লম্বা, মিহি গড়নের একরকম জন্তু।

সরাইখানার সবচেয়ে বড় ঘরটা লম্বায় চওড়ায় প্রায় তিনশো ফুট হবে, সেইখানে একটা টেবিলের উপরে আমাকে রাখা হল। টেবিলের পাশে একটা নিচু টুলের উপরে আমার ছোট ধাইমা দাঁড়াল, যাতে আমার দেখাশুনোও করতে পারে, আবার কখন কি করতে হবে বলেও দিতে পারে। যাতে বেশি ভিড় না জমে, আমার প্রভু করতেন কি এক এক বারে ত্রিশ জনের বেশি লোক ঢুকতে দিতেন না। মেয়েটির আদেশ মতো টেবিলের উপরে চলাফেরা করতাম, বিনীত অভিবাদন জানাতাম, তাদের স্বাগত

বলতাম, তা ছাড়া খানিকটা বক্তৃতা আমাকে শেখানো হয়েছিল সেটি আবৃত্তি করতাম। গ্লুমডালক্লিচ আমাকে একটা সেলাইএর থিম্বল দিয়েছিল, সেটা আমার পেয়ালার কাজ করত; সেই থিম্বলটাকে মদে ভর্তি করে উপস্থিত সকলের স্বাস্থ্য কামনা করতাম। তলোয়ার বের করে, ইংল্যাণ্ডের তলোয়ার খেলোয়াড়দের মত করে শূন্যে ঘোরাতাম। ধাইমা আমার হাতে এক-টুকরো খড় দিত, তাই দিয়ে বর্শার কসরৎ দেখাতাম, যৌবনে যেরকম শিখেছিলাম।

ঐ একদিনে বারোটি দল আমাকে দেখতে এসেছিল, বারোবার ঐ একই খেলা দেখাতে হয়েছিল, বিরক্তিতে ক্লান্তিতে প্রায় আধমরা হয়ে গেলাম। যারাই খেলা দেখে যায়, বাইরে গিয়ে তার বিষয় এমন গল্প করে যে লোকে খেলা দেখার আগ্রহে দরজাটাকে ভেঙ্গে ফেলে আর কি! নিজের স্বার্থের জন্যই আমার প্রভু তাঁর মেয়ে ছাড়া আর কাউকে আমাকে ছুঁবার অনুমতি দেন নি। বিপদ প্রতিরোধ করবার জন্য টেবিলের চারদিকে এতটা তফাৎ রেখে সব বেঞ্চি সাজানো হয়েছিল, যাতে কেউ আমার নাগাল না পায়। তবু এক লক্ষ্মীছাড়া স্কুলের ছাত্র সোজা আমার মাথা লক্ষ্য করে একটা হেজেল গাছের বাদাম ছুঁড়ে মেরেছিল, ভাগ্যিস একটুর জন্যে বেঁচে গিয়েছিলাম, নইলে এমনি জোরে ছুঁড়েছিল যে লাগলে নির্ঘাৎ আমার মাথার ঘিলু উড়ে যেত!

তা আর হবে না, বাদামটা প্রায় একটা ছোটখাটো কুমড়োর মতো বড়। যাই হক, আমি দেখে খুশি হলাম যে লক্ষ্মীছাড়াকে আচ্ছা করে পিটিয়ে ঘর থেকে বের করে দেওয়া হল।

আমার মালিক তো বিজ্ঞাপন দিয়ে দিলেন যে আগামী হাটবারেও আমাকে দেখানো হবে। ইতিমধ্যে আমার আরেকটু আরামে যাতায়াতের ব্যবস্থাও করলেন, তার অবিশ্যি একটা কারণ ছিল। প্রথমবার ঐভাবে গিয়ে, তারপরে একনাগাড়ে আটঘণ্টা লোকের সামনে খেলা দেখিয়ে, আমি এতই ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম যে দু পায়ে দাঁড়ানোই মুস্কিল হচ্ছিল, কথা তো একটাও বলতে পারছিলাম না। শরীরের বল ফিরে আসতে কমপক্ষে তিনদিন লেগেছিল। বাড়িতেও বিশ্রামের উপায় ছিল না, কারণ আশেপাশে একশো মাইল জুড়ে যত ভদ্রলোকেরা বাস করতেন, আমার খ্যাতি শুনে তাঁরা সব আমাকে দেখবার জন্যে আমার প্রভুর বাড়িতে এসে উপস্থিত

হলেন। সংখ্যায় তাঁরা ত্রিশের কম ছিলেন না, তার উপরে সঙ্গে ছিলেন তাঁদের স্ত্রীপুত্ররা। ওদিকে আমার প্রভুও সরাইখানায় একঘর লোকের কাছ থেকে যা চাইতেন, বাড়িতে আমাকে একটিবার দেখাবার জন্যে তার সমান আদায় করতেন; একটিমাত্র পরিবার যদি দর্শক হত তাহলেও তাই। এর ফলে কিছুকাল ধরে বাইরে না গেলেও, সপ্তাহের মধ্যে একদিনও বিশ্রাম পেতাম না, শুধু বুধবার ছাড়া; সেদিনটি হল ওদের রবিবারের মতো বিশ্রামের দিন।

আমার প্রভুও যেই দেখলেন আমার থেকে কত লাভ হতে পারে অমনি তিনি স্থির করলেন রাজ্যে সমস্ত বড় বড় সহরে আমাকে নিয়ে ঘুরবেন। দীর্ঘ ভ্রমণের জন্যে যা যা লাগতে পারে তার সমস্ত বন্দোবস্ত করে, বিষয়-আশয় গুছিয়ে রেখে, স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ১৭০৩ সালের ৩রা আগষ্ট, আমার আগমনের মাস দুই বাদে, তিনি আমাদের নিয়ে রাজধানীর দিকে রওনা হলেন। রাজ্যের ঠিক মাঝখানে রাজধানীর অবস্থান, আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় তিনি হাজার মাইল দূরে।

আমার প্রভু তাঁর মেয়ে গ্লুমডালক্লিচকে তাঁর পিছনে ঘোড়ার উপর বসিয়ে নিলেন, তার কোলে কোমরের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা বাক্স, তার মধ্যে আমি। মেয়েটি করেছে কি, বাক্সের ভিতরে, উপরে, নিচে, চার দেয়ালে, ভালো করে লেপে মুড়ে, তার উপরে যতটা নরম কাপড় পেয়েছে তাই লাগিয়ে নিয়েছে। তার মধ্যে আমার জন্য পুতুলের খাট, কাপড়চোপড় ও দরকারী আসবাব, অর্থাৎ যত রকমে সম্ভব আরামের ব্যবস্থা। বাড়ির একটা ছোকরা চাকর আমাদের জিনিস নিয়ে পিছনে পিছনে ঘোড়ায় চেপে চলেছে, সঙ্গে আর কেউ নেই।

আমার প্রভুটির মৎলব ছিল যাবার পথে যত সহর পড়বে, সব জায়গায় আমাকে তো দেখাবেনই, তার উপরে পথের পঞ্চাশ কি একশো মাইলের মধ্যে কোনো গ্রামে বা বড়লোকের বাড়িতে খোদ্দেরের আশা থাকলে, সেখানেও যাবেন। আমরা আস্তে আস্তে এগুতে লাগলাম, দিনে সাত কি আট কুড়ি মাইলের বেশি নয়। এর কারণ হল আমাকে কষ্ট থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে, গ্লুমডালক্লিচ্ বললে ঘোড়ায় চড়লে তার শরীর বড় ক্লান্ত হয়ে যায়। আমার অনুরোধে অনেকবার সে আমাকে বাক্স থেকে বের করে হাওয়া খাওয়াল,

চারদিকের দৃশ্য দেখাল, তবে সর্বদাই আমার কোমরে বাঁধা দড়িগাছা শক্ত করে হাতে ধরে থাকল।

নীল নদ কিম্বা গঙ্গার চেয়ে অনেক বেশি গভীর, অনেক বেশি চওড়া পাঁচ ছটা নদী পার হয়ে গেলাম। লণ্ডনের পুলের কাছে টেম্স্ নদীর মতো শীর্ণ একটা শাখানদীও দেখলাম কিনা সন্দেহ। এইভাবে দশ সপ্তাহ ধরে চলেছি, আঠারোটা বড় সহরে আমাকে দেখানো হয়েছে, তাছাড়া অনেকগুলো গ্রামে ও লোকের বাড়িতে।

২৬শে অক্টোবর রাজধানীতে পৌঁছলাম। রাজধানীর নাম হল লোরব্রুলগ্রুদ, অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের গৌরব! সহরের প্রধান রাস্তায় আমার প্রভু বাসা ভাড়া নিলেন, জায়গাটা রাজবাড়ি থেকে বেশি দূরে নয়। অন্যান্য জায়গার মতো এখানেও আমার চেহারার ও গুণাবলীর বর্ণনা দিয়ে চারিদিকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল। কর্তা একটা প্রকাণ্ড ঘর ভাড়া করলেন, সেটা তিন শো থেকে চারশো ফুট চওড়া। ষাট ফুট ব্যাসের একটা টেবিলের ব্যবস্থা করলেন, তার উপরে আমাকে খেলা দেখাতে হবে। টেবিলের কিনারা থেকে তিন ফুট তফাতে তিন ফুট উঁচু একটা বেড়া দিলেন, যাতে উল্টে না পড়ি। এখানে দেশসুদ্ধ লোককে বিস্মিত ও চমৎকৃত করে দিয়ে দিনে আমাকে দশবার দেখানো হত। ততদিনে ওদের ভাষাটা আমার বেশ রপ্ত হয়ে গেছে, যা বলা হয় সবই স্পষ্ট বুঝি। তাছাড়া ওদের অক্ষরও চিনে ফেলেছি, একটু চেষ্টা করে দু-একটা কথা বুঝিয়েও বলতে পারি। বাড়িতে গ্লুমডালক্লিচ আমাকে যেমন শেখাত, তেমনি ঐ দীর্ঘ যাত্রাপথেও যখনই সময় পেত তখনই শিক্ষা দিত।

একটা মানচিত্রের থেকে খুব বেশি বড় নয়, এই রকম একটা বই সর্বদা তার পকেটে থাকত। বইটা ছিল অল্পবয়সী মেয়েদের ব্যবহারের জন্য, ওতে ওদের ধর্মবিশ্বাসের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ছিল; এই বইএর সাহায্যেই আমার ছোট্ট ধাইমা আমাকে অক্ষর চেনাত ও কথার মানে বোঝাত।

তৃতীয় অধ্যায়

রাজসভাতে লেখকের তলব পড়া—চাষীর কাছ থেকে রাণীমার দ্বারা ক্রীত হওন ও রাজাকে উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হওন—মহারাজের প্রধান পণ্ডিতদের সঙ্গে বিতর্ক—লেখকের জন্য পৃথক মহলের ব্যবস্থা—রাণীমার প্রিয়পাত্র হওন—স্বদেশের সম্মানরক্ষার জন্য সংগ্রাম—রাণীমার বেঁটে বামনের সহিত কলহ।

রোজকার এই ক্রমাগত পরিশ্রমের ফলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমার স্বাস্থ্যে একটা পরিবর্তন দেখা দিল। আমাকে দিয়ে প্রভুর যত বেশি আয় হতে লাগল, তাঁর লোভও ততই বাড়তে লাগল। এদিকে আমার শরীরের যে হাল হয়েছে, পেট আর দেখা যায় না, দেহ একেবারে কঙ্কালসার। চাষী সেটা লক্ষ্য করে ভাবলেন আমি নিশ্চয়ই এবার মরব, আর তাই তার আগে যতটা পারা যায় পয়সা কামিয়ে নেওয়া যাক। নিজের মনের সঙ্গে যখন এই রকম বোঝাপড়া করছেন, তখন রাজসভা থেকে একজন "স্লারদাল" অর্থাৎ উজির এসে উপস্থিত। কি, না রাণীমা ও তাঁর সখীদের মনোরঞ্জনের জন্য আমার প্রভুকে এক্ষুনি রাজসভায় হাজিরা দিতে হবে। সখীরা কেউ কেউ এর আগেই আমাকে দেখে গিয়ে আমার আশ্চর্য রূপ, ব্যবহার ও বুদ্ধির বর্ণনা দিয়েছেন। রাণীমা ও তাঁর সঙ্গীরা তো আমার কার্যকলাপ দেখে যারপর নাই আহ্লাদিত হলেন। আমি হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে রাণীমার পদচুম্বন করার সম্মান ভিক্ষা করলাম। কিন্তু মহদাশয়া রাণী তাঁর হাতের কড়ে আঙুলটি আমার দিকে এগিয়ে দিলেন, তার আগে অবিশ্যি আমাকে একটা টেবিলে চড়ানো হয়েছিল, আমিও দুই হাতে আঙুলটিকে জড়িয়ে ধরে, অতিশয় ভক্তি সহকারে তার ডগাটি আমার ঠোঁটে ঠেকালাম।

আমার দেশ এবং ভ্রমণবৃত্তান্ত সম্বন্ধে তিনি কতকগুলি সাধারণ প্রশ্ন করলেন। যতটা সংক্ষেপে ও স্পষ্ট করে পারি তার উত্তর দিলাম। তারপর তিনি জানতে চাইলেন রাজসভায় বাস করতে আমি রাজী আছি কি না। আমি টেবিলের তক্তা পর্যন্ত আনত হয়ে বিনীতভাবে বললাম যে আমি

আমার প্রভুর আজ্ঞাধীন দাস। কিন্তু যদি আমার নিজের হয়ে কিছু বলবার অধিকার থাকত, তাহলে রাণীমার সেবায় আমার জীবনটাকে উৎসর্গ করতে পারলে আমি গর্ববোধ করতাম। তখন রাণীমা আমার প্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন ভালো দাম পেলে আমাকে তিনি বিক্রী করতে সম্মত আছেন কি না। প্রভুর এদিকে মনে ভয় যে আমি আর এক মাসও বাঁচি কি না, কাজেই তিনি আমাকে ছেড়ে দিতে তৎক্ষণাৎ রাজি হলেন। দাম চাইলেন এক হাজার মোহর ; তক্ষুণি সেই রকম হুকুম হয়ে গেল। এক একটা মোহর আমাদের দেশের আট শো মোহরের সমান হবে।

তবে ইউরোপের সঙ্গে এদেশটাকে সব দিক দিয়ে তুলনা করে দেখলে এবং এখানকার সোনার দামটা হিসাবের মধ্যে ধরলে, এখানকার ঐ আট শো মোহর ইংল্যাণ্ডের হাজার গিনির সমান হবে কি না সন্দেহ।

যাই হক, এ সব ব্যাপার চুকলে পর আমি রাণীমাকে বললাম এখন আমি তাঁর দীনতম দাসানুদাস, তবু আমার এই প্রার্থনা যে গ্লুমডালক্লিচ এতকাল এত যত্নের ও মায়ামমতার সঙ্গে আমার দেখাশুনো করেছে এবং এ বিষয় ও যখন এত জানে-বোঝে, ওকেও তাহলে রাণীমার অনুচরবর্গের মধ্যে স্থান দেওয়া হক, ওই আমার ধাত্রী ও শিক্ষিকা হয়ে কাজ করে যাক। রাণীমা আমার ভিক্ষা মঞ্জুর করলেন। চাষীর সম্মতিও সহজেই পাওয়া গেল, মেয়ে যদি রাজসভার অনুগ্রহ লাভ করে তাতে তিনি খুশি ছাড়া আর কিছু নন। আর মেয়ে বেচারা তো আনন্দ লুকোবার জায়গা পায় না! তারপর আমার প্রাক্তন প্রভু বিদায় নিলেন, যাবার আগে বলে গেলেন যে আমাকে তিনি ভালো জায়গাতেই রেখে যাচ্ছেন। এর উত্তরে আমি একটি কথাও বলি নি, শুধু সামান্য একটু মাথা নিচু করে নমস্কার জানিয়েছিলাম।

আমার এই হৃদ্যতার অভাব রাণীমার নজর এড়ায় নি। চাষী ঘর থেকে চলে যাবামাত্র তিনি তার কারণ জানতে চাইলেন। আমি তখন সাহস করে তাঁকে বললাম যে শস্যক্ষেতে নিরীহ একটা খুদে প্রাণীকে দৈবাৎ কুড়িয়ে পেয়ে, আমার প্রাক্তন মালিক যে এক আছাড়ে তার মাথা গুঁড়িয়ে ঘিলু বের করে দেননি, মাত্র এইটুকুর জন্য আমি তাঁর কাছে ঋণী। তাছাড়া আধখানা দেশ জুড়ে লোকের কাছে আমাকে দেখিয়ে তিনি যে পয়সা কামিয়েছেন, তার উপরে যে দামে আজ আমাকে বিক্রী করে গেলেন, তাতে সে ঋণের প্রচুর

পরিশোধ হয়ে গেছে। আমি আরো বললাম যে তখন থেকে যেভাবে আমাকে দিন কাটাতে হয়েছে, তাতে আমার দশগুণ শক্তিশালী যে কোনো জানোয়ারের প্রাণ বেরিয়ে যেত। তাছাড়া দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা যত রাজ্যের আজেবাজে খেলা-দেখানোর খাটুনির ফলে, আমার স্বাস্থ্যের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে এবং আমার ভূতপূর্ব প্রভুর মনে যদি এই ভয় না ঢুকত যে আমি আর বেশি দিন বাঁচব না, তাহলে তিনি অত সস্তায় আমাকে ছেড়ে দিতেন না। কিন্তু এখন আর আমার দুর্ব্যবহারের কোনো আশঙ্কা নেই, কারণ আমার আশ্রয়দাত্রী মহীয়সী ও মহদাশয়া, প্রকৃতির অলঙ্কার স্বরূপা, বিশ্বজনের আদরণীয়া, প্রজাবর্গের আনন্দরূপিণী, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বিস্ময়, এমন আশ্রয়ে থাকলে আমার প্রাক্তন প্রভুর সব আশঙ্কা নস্যাৎ হয়ে যাবে, এই আমার আশা ও ভরসা। বাস্তবিক তাঁর মহিমামণ্ডিত সান্নিধ্যে এসে এরই মধ্যে আমার মনের ফুর্তি কত বেড়ে গেছে!

অশোভনভাবে অনেক ইতস্ততঃ করে যা বলেছিলাম, এই হল তার সারমর্ম। বক্তৃতার শেষের দিকটা রচিত হয়েছিল ও-দেশের পদ্ধতি অনুসারে, আমাকে রাজসভায় নিয়ে আসবার সময় গ্লুমডালক্লিচ তার কিছু কিছু আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিল। রাণীমা এক দিকে যেমন আমার বক্তৃতার দোষত্রুটি মার্জনা করতে প্রস্তুত ছিলেন, অপর দিকে তেমন এত ছোট একটা প্রাণীর মাথায় এত রসবোধ ও বিচক্ষণতা দেখে তিনি তো অবাক! আমাকে নিজের হাতে তুলে নিয়ে গেলেন রাজার কাছে। রাজামহাশয় তাঁর মন্ত্রণাগারে ছিলেন, তাঁর চেহারার মধ্যে ভারি একটা গাম্ভীর্য, মুখে চোখে দৃঢ়তার ভাব। প্রথম দর্শনে অতটা লক্ষ্য না করেই নিরুৎসাহ স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন রাণীর আবার কবে থেকে একটা স্প্ল্যাকনুকের উপরে এত টান হল! রাণীমার ডান হাতের তেলোয় উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছি, তাই দেকে ওঁর ঐ রকমই মনে হয়েছিল। কিন্তু রাণীমারও রসবোধের আর কৌতুকের শেষ ছিল না, আমাকে রাজার লিখবার ডেস্কে খাড়া করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে, মহারাজাকে নিজের বিষয় যাবতীয় তথ্য নিবেদন করতে আদেশ করলেন। সংক্ষেপে তাই করলাম, গ্লুমডালক্লিচ দোর গোড়াতেই দাঁড়িয়েছিল, আমাকে সে একটুক্ষণের জন্যও চোখের আড়াল করতে চাইত না। তাকে ভিতরে আসবার অনুমতি দেওয়া হতেই, সেও এসে তার বাবার বাড়িতে আমার

আগমন থেকে আরম্ভ করে যা যা ঘটেছিল আমার সমস্ত বৃত্তান্তের সমর্থন করল।

এখন যদিও রাজাকে ওদেশের হিসাব মতে বেশ শিক্ষিতই বলা চলে, তাছাড়া দর্শনে আর বিশেষ করে গণিতশাস্ত্রে তাঁর যথেষ্ট চর্চাও ছিল, তবু আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পর্যবেক্ষণ করবার আর ও রকম সোজা হয়ে আমাকে চলতে দেখবার পরেও (অবিশ্যি আমি কথা বলবার আগে পর্যন্ত) তিনি আমাকে কোনো ওস্তাদ কারিগরের হাতে তৈরী একটা কলের পুতুল মনে করেছিলেন। ওদেশে নিখুঁত সব কলের খেলনা তৈরী হয়। কিন্তু যেই না আমার গলার স্বর শুনলেন আর দেখলেন যে বেশ গুছিয়ে যুক্তিসঙ্গতভাবেই কথা বলছি, তখন আর বিস্ময় গোপন করতে পারলেন না। কিন্তু আমি কিভাবে তাঁর রাজ্যে এসে পৌঁছেছি তার যে বর্ণনা দিলাম, তাতে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তাঁর কেমন ধারণা হল যে গ্লুমডালক্লিচ আর তার বাবা দুজনে মিলে গল্পটি বানিয়ে, আমাকে পাখি-পড়া করিয়ে নিয়েছে, যাতে আমাকে বেশি দামে বিক্রী করতে পারে। এই মনে ভেবে তিনি তো আমাকে আরো অনেকগুলো প্রশ্ন করলেন এবং তার প্রত্যেকটির যুক্তিসঙ্গত উত্তর পেলেন। আমার উচ্চারণে একটা বিদেশী টান আর ওঁদের ভাষা সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ জ্ঞান ছাড়া অন্য কোনো ত্রুটী খুঁজে পেলেন না। অবিশ্যি তার সঙ্গে খামার বাড়িতে শেখা কতকগুলো গেঁয়ো বুলিও ছিল, সেগুলো মোটেই রাজসভার অভিজাত রীতি-সঙ্গত ছিল না।

তিনজন বড পণ্ডিতও দেশের নিয়ম অনুসারে রাজসভায় তাঁদের সপ্তাহিক হাজিরা দিতে এসেছিলেন ; রাজা তাঁদের ডেকে পাঠালেন। এই তিনটি মহোদয় খানিকক্ষণ ধরে আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খুঁটিয়ে দেখবার পর, তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। এ বিষয়ে তাঁরা একমত ছিলেন যে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে আমার জন্ম হয় নি, কারণ আমার শরীরটা এমনভাবে তৈরীই নয় যে দ্রুত ছুটে, কি গাছে চড়ে, কি মাটি খুঁড়ে নিজের প্রাণটি বাঁচাই। খুব মনোযোগের সঙ্গে আমার দাঁত পরীক্ষা করে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে এলেন যে আমি একটি মাংসাশী জীব। কিন্তু অধিকাংশ চতুষ্পদের সঙ্গে তো আমি এঁটে উঠতে পারব না ; মেঠো ইঁদুর ইত্যাদি আমার চেয়ে ঢের বেশি চটপটে। কি করে যে আমি আহার সংস্থান করি তাই তাঁরা ভেবে পেলেন না, এক যদি

শামুক, গুগলী আর পোকামাকড় খেয়ে থাকি। তাও যে সম্ভবপর নয়, নানান পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তি দিয়ে তাঁরা প্রমাণ করে দিলেন।

মনে হল একজনের ধারণা আমি একটা ভ্রূণ, অসম্পূর্ণ অবস্থায় জন্মেছি। অন্যরা এ মতটা গ্রহণ করতে পারলেন না, যেহেতু তাঁরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন যে আমার হাত পাগুলো সম্পূর্ণ ও নিখুঁৎভাবে গড়া। তাঁরা এও লক্ষ্য করলেন যে আমি বেশ কয়েক বছর বেঁচে থেকেছি, কারণ আমার দাড়ি গজিয়ে গেছে, আতস কাঁচের সাহায্যে চাঁচা দাড়ির গোড়াগুলো পরিষ্কার ধরা পড়ছে। তাঁরা আমাকে বেঁটে বামন বলে সিদ্ধান্ত করতে পারলেন না, কারণ সেক্ষেত্রেও মাপের এতটা বৈষম্য হয় না, রাণীমার পেয়ারের বামনটার মতো অত বেঁটে মানুষ ওদেশের আর ছিলই না, কিন্তু সেও মাথায় প্রায় ত্রিশ ফুট উঁচু! অনেক তর্ক-বিতর্কের পরে তাঁরা সকলে এক মত হলেন যে আমি একটা "রেলপ্লুম স্কালস্কাদ", অর্থাৎ প্রকৃতির খাম-খেয়াল ছাড়া আর কিছু নই। ইউরোপের নব্য দার্শনিকদের মনের মতো সিদ্ধান্ত! এরিস্টট্‌লের শিষ্যরা নিজেদের অজ্ঞতা গোপন করবার উদ্দেশ্যে সব অতিপ্রাকৃত কার্যকারণ সূত্রের প্রশ্ন এড়িয়ে যেতেন; আজকালকার ইউরোপীয় পণ্ডিতরা এ বৃত্তিকে ঘৃণার চোখে দেখেন, তাই তাঁরা সব সমস্যার ঐ চমৎকার সমাধানটি উদ্ভাবন করেছেন, এতে মানুষের জ্ঞানের অকথ্যভাবে প্রগতি হয়েছে।

এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে পর, আমি দুটি কথা বলবার অনুমতি ভিক্ষা করলাম। রাজামহাশয়ের উদ্দেশেই যা বলবার বললাম, তাঁকে আশ্বাস দিলাম যে আমি এমন একটা দেশ থেকে এসেছি যেখানে আমার মতো খুদে কোটি কোটি মানুষের বাস, যেখানকার জন্তুজানোয়ার, গাছপালা ও বাড়িঘর সবই সেই অনুপাতে ছোট, কাজেই মহারাজের প্রজারা এখানে যেমন করে থাকেন, সেখানে আমিও আত্মরক্ষা ও আহারের সেই রকম ব্যবস্থা করতে পারি।

আমার মনে হল পণ্ডিতমহাশয়দের তর্ক-বিতর্কের এই হল উপযুক্ত প্রত্যুত্তর। তাঁরা কিন্তু এর উত্তরে শুধু একটু অবজ্ঞার হাসি হাসলেন আর বললেন, বাঃ, চাষী তো একে বেশ পাঠ শিখিয়েছে।

রাজার কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি বুঝবার ক্ষমতা; পণ্ডিতদের বিদায় করে দিয়ে, তিনি যোতদারকে ডেকে পাঠালেন, ভাগ্যিস সে তখনও সহর ছেড়ে চলে যায় নি। প্রথমে তার সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করে, তারপরে

আমার আর তার মেয়ের সঙ্গে মোকাবিলা করিয়ে নিয়ে, রাজারও মনে হতে লাগল যে আমরা যা বলেছি, সম্ভবতঃ সেটাই সত্যি কথা।

তখন তিনি রাণীকে অনুরোধ করলেন যেন আমার বিশেষ যত্নের ব্যবস্থা করা হয়। তাঁর মতে গ্লুমডালক্লিচেরই আমার তদারকের ভার নিয়ে থাকা উচিত, কারণ তিনি লক্ষ্য করেছেন যে আমাদের পরস্পরের মধ্যে ভারি একটি স্নেহের সম্বন্ধ রয়েছে।

ধাইমার জন্য রাজবাড়িতে একটা সুবিধামতো থাকবার জায়গা ঠিক হল। শিক্ষিকা গোছের একজন মহিলা নির্দিষ্ট হলেন, ওর লেখাপড়ার ভার নেবার জন্য। তাছাড়া কাপড়চোপড়ের ব্যবস্থা করবার জন্য একজন দাসী এল ; আর অন্যান্য মোটা কাজের জন্য দুজন চাকর, তবে আমার দেখাশুনোর সম্পূর্ণ দয়িত্ব নিল সে নিজে।

রাণী তাঁর নিজের আসবাব তৈরীর মিস্ত্রীকে বুদ্ধি করে একটা বাক্স তৈরী করবার ফরমায়েস দিলেন, সেটি হবে আমার শোবার ঘর, গ্লুমডালক্লিচ আর আমি দুজনে পরামর্শ করে তার নক্সা করে দেব। লোকটা বাস্তবিক ওস্তাদ কারিগর। আমার নির্দেশ মতো তিন সপ্তাহের মধ্যে সে আমার জন্য একটা কাঠের ঘর তৈরী করে দিল, লম্বায় চওড়ায় ষোল ফুট, উঁচুতে বারো ফুট ; তার জানলাগুলো ঠিক লণ্ডন সহরের শোবার ঘরের জানলার মতো তোলা যেত, নামানো যেত ; একটা দরজাও ছিল আর পাশাপাশি দুটি ছোট খোপের মতো ঘর। ছাদের তক্তাটা কব্জার উপর খোলা ও বন্ধ করা যেত, ছাদ উঠিয়ে রাণীমার নিজের গদীওয়ালার হাতে তৈরী খাটবিছানা রাখা হল। গ্লুমডালক্লিচ রোজ নিজের হাতে সেই বিছানা বের করে রোদে হাওয়ায় মেলে দিত, আবার নিজের হাতে পেতে দিত ; রোজ রাত্রে ছাদ নামিয়ে তালাচাবি লাগিয়ে দিত। আরেকজন কারিগর ছোট ছোট সাজাবার জিনিস তৈরী করে খুব নাম করেছিল, সে আমার জন্যে দুটো চেয়ার তৈরী করে দেবার ভার নিল ; চেয়ারগুলোর পিঠ আর কাঠামো হাতির দাঁতের মতো কি একটা জিনিসের তৈরী। তাছাড়া দুটো টেবিল আর আমার জিনিসপত্র রাখবার জন্য একটা আলমারিও হল।

ঘরটার চার দেয়াল, ছাদ আর মেজে সব লেপ দিয়ে মোড়া, যাতে কেউ অসাবধান হয়ে বাক্সটা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে গেলে, কিম্বা

ঘোড়াগাড়ির ঝাঁকানি খেলেও জখম না হই। দরজায় লাগাবার জন্য আমিও একটা তালা চাবি চাইলাম, যাতে বড় ইঁদুর কিম্বা নেংটি ইঁদুর ভেতরে ঢুকতে না পারে। অনেক চেষ্টার পর, কারিগর এমন ছোট একটা তালা বানাল যা ওদের দেশের লোকে কখনো চোখেও দেখে নি, অবিশ্যি আমি ওর চেয়েও বড় তালা ইংল্যাণ্ডের এক ভদ্রলোকের বাড়ির ফটকে ঝুলতে দেখেছি। আমার ভয় ছিল পাছে গ্লুমডালক্লিচ চাবিটা হারিয়ে ফেলে, তাই ওটা চেষ্টা-চরিত্র করে আমার নিজের পকেটেই রাখতাম। আমার পোষাক করবার জন্য রাণীমা ওদেশের সব চেয়ে সূক্ষ্ম রেশম ফরমায়েস করলেন। সে রেশম আমাদের দেশের কম্বলের চেয়ে খুব বেশি মোটা নয়। প্রথমটা খুব ভারি লাগত, পরে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। পোষাকগুলো ওদেশের হাল ফ্যাসানে তৈরী হল, কতকটা ফার্সি, আবার কতকটা চীনে ধাঁচে, ভারি একটা ভদ্রোচিত শালীনতা ছিল ঐ পোষাকে।

শেষটা রাণীমার আমার সঙ্গ এত ভাল লেগে গেল যে আমি না থাকলে ওঁর খাওয়াই হত না। রাণীমার খাবার টেবিলের উপরে, ওঁর বাঁ হাতের কনুইএর কাছে আমার জন্যেও টেবিল পাতা হত, বসবার জন্য চেয়ার থাকত। টেবিলের কাছে মেজের উপরে একটা টুলে গ্লুমডালক্লিচ দাঁড়িয়ে আমার দেখাশুনা করত। আমার এক প্রস্থ রূপোর বাসনকোসন আর অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস ছিল। লণ্ডনে একটা খেলনার দোকানে পুতুলঘরের আসবাব দেখেছিলাম, রাণীমার বাসনের মাপের সঙ্গে তুলনা করলে আমার বাসনগুলোও সেই রকম ছোটই মনে হত। বাসনগুলিকে আমার ছোট্ট ধাইমা সর্বদা নিজের হাতে ধুয়ে, একটা রূপোর বাক্সে ভরে, নিজের পকেটে রাখত, খাবার সময় দরকার হলেই বের করে দিত। রাণীমার সঙ্গে বসে দুই রাজকুমারী ছাড়া আর কেউ খেত না। বড়টির বয়স তখন ষোল আর ছোটটির তেরো বছর এক মাস।

রাণীমা আমার পাতে এক টুকরো মাংস তুলে দিতেন, আমি তার থেকে কেটে কেটে নিয়ে খেতাম ; আমার ঐ খুদে মাপের খাওয়া দেখতে তাঁর ভারি মজা লাগত। সত্যি কথা বলতে কি রাণীমা ছিলেন একটু পেট-রোগা, কিন্তু বারোজন ইংরেজ চাষী এক বেলায় যতটা খেতে পারে উনি এক গ্রাসেই ততটা মুখে তুলতেন। তাই দেখে অনেক দিন পর্যন্ত আমার বমি আসত। ভদ্রমহিলা হাড়গোড় শুদ্ধ একটা লার্ক পাখির ডানা কুড়মুড় করে চিবিয়ে খেয়ে

ফেলতেন, পাখিটা অবিশ্যি একটা বড় পেরুর নয় গুণ! দুটো বারো পেনি দামের গোটা রুটির মত বড় একটুকরা পাঁউরুটি হয়তো গালে ফেলে দিলেন, কিম্বা একটা সোনার পেয়ালা থেকে এক এক চুমুকে এক পিঁপে মদই খেয়ে ফেললেন। একটা কাস্তের ফলা যদি সোজা করে হাতলে বসান যেত, তার দুগুণ মাপের ছুরি ব্যবহার করতেন রাণীমা; কাঁটা চামচ আর অন্যান্য জিনিস সবই ছিল সেই অনুপাতে। আমার মনে পড়ে গ্লুমডালক্লিচ একবার আমাকে রাজবাড়ির ভোজসভা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল, সেখানে ঐরকম বড় দশ-বারোটা ছুরি কাঁটাকে এক সঙ্গে উঠতে পড়তে দেখে আমার মনে হয়েছিল এমন সাংঘাতিক দৃশ্য জন্মে দেখি নি!

ওদেশে বুধবার হল আমাদের রবিবারের মতো বিশ্রামের দিন; নিয়ম ছিল যে প্রত্যেক বুধবার রাজা, রাণীমা, রাজকুমার ও রাজকুমারীরা সকলে এক সঙ্গে রাজার নিজের মহলে রাত্রে খাবেন। ততদিনে আমি রাজামহাশয়েরও প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছি, তাই বুধবার দিন আমার ছোট্ট চেয়ার টেবিল রাজার বাঁ হাতের কাছে নূনদানির পাশে পেতে দেওয়া হত। আমার সঙ্গে আলাপ করে, রাজা ভারি আনন্দ পেতেন, ইউরোপের রীতিনীতি, ধর্ম, আইন, রাজনীতি, জ্ঞানবিদ্যা সব বিষয়ে জানতে চাইতেন, আমিও যথাসম্ভব ভালো করে বুঝিয়ে বলতাম। তাঁর বোধ-শক্তি এমনি পরিষ্কার আর বিচারবুদ্ধি এতই সূক্ষ্ম ছিল যে আমার কথা শুনে বহু বিচক্ষণ মন্তব্য প্রকাশ করতেন।

তবে এও স্বীকার করতে হবে যে একবার আমি প্রাণপ্রিয় জন্মভূমির কথা বলতে গিয়ে বড় বেশি প্রগল্ভ হয়ে পড়েছিলাম। আমাদের ব্যবসাবাণিজ্যের কথা, জলে-স্থলে যুদ্ধবিগ্রহের কথা, ধর্ম নিয়ে বিভেদ ও রাজনীতি নিয়ে দলাদলির কথা খুব ফেনিয়ে বলবার পর দেখি যে তাঁর শিক্ষাদীক্ষাতে গোঁড়ামির এতই প্রভাব যে তিনি আমাকে ডান হাতে তুলে না নিয়ে পারলেন না। তারপর অন্য হাতটা আমার গায়ে বুলিয়ে প্রাণ খুলে খানিকটা হেসে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন আমি কোন রাজনৈতিক দলে, উদারপন্থীদের দিকে না গোঁড়াদের দিকে।

প্রধানমন্ত্রী পিছনেই দাঁড়িয়েছিলেন, হাতে সাদা দণ্ড, সেটি আমাদের দেশের রাজপোত 'সভারেনের' বড় মাস্তুলের প্রায় সমান সমান লম্বা। তাঁর দিকে ফিরে রাজা বললেন, দেখছ তো মানুষের জাঁকজমক কত তুচ্ছ ব্যাপার যে এই খুদে খুদে

পোকাগুলো পর্যন্ত তার নকল করে। এমন কি এদের হয় তো সম্মান দেখাবার, উপাধি খেতাব দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে ; এদের ছোট ছোট বাসা আর মাটির নিচে গর্ত আছে হয় তো, সেগুলোকে ওরা বলে বাড়ি-ঘর, সহর, নগর ; ওরাও সাজগোজ, লোকলস্কর নিয়ে বাহার দেয় ; ওরাও প্রেম করে, লড়াই করে, তর্ক করে, জুয়োচুরি বিশ্বাসঘাতকতা করে!

এইভাবে রাজা তো বলেই চললেন আর আমার বহু সম্মানিত মাতৃভূমি, যিনি শিল্পকলা ও যুদ্ধবিদ্যার সম্রাজ্ঞী, ফ্রান্সের যিনি বিভীষিকা, ইউরোপের দণ্ডবিধাতা, পবিত্রতা, ভক্তি ও সম্মানের যিনি পীঠস্বরূপা, বিশ্বের গর্ব ও ঈর্ষার যিনি কারণ, তাঁকে এরকম তাচ্ছিল্য করায়, রাগে দুঃখে কখনো আমার মুখচোখ লাল হয়ে উঠছে, কখনো বা ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু অপমানের প্রতিবাদ জানাবার মতো তো আর আমার তখনকার অবস্থা নয়, কাজেই খানিকটা পাকা বুদ্ধি খাটাবার পর আমার নিজেরই সন্দেহ হতে লাগল সত্যিই আমার কোনো ক্ষতি হয়েছে কি না। তার কারণ হল যে আজ অনেক মাস ধরে এদের দেখে দেখে, এদের কথাবার্তা শুনে আর এখানে যা কিছু দেখি তার বিশাল আয়তন লক্ষ্য করে, আমার এমন হয়েছিল যে ওদের ঐ বিকট চেহারা আর ধরণধারণ দেখে প্রথমটা যে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল, সেটি অনেকখানি এতদূর কেটে গিয়েছিল, এমন কি তখন যদি একদল অভিজাত ইংরেজ ভদ্রলোক ও মহিলা সেজেগুজে, উৎসবের পোষাক পরে, রাজসভায় যেভাবে বুক ফুলিয়ে চলেনফেরেন, নমস্কার করেন, সাজানো বুক্‌নি ঝাড়েন, ঠিক সেই রকম করতেন, তাহলে, সত্যি কথা বলতে কি, এখানকার রাজা ও তাঁর সভাসদ্‌রা আমাকে নিয়ে যেরকম হাসাহাসি করলেন, ওঁদের দেখে আমার ঠিক সেই রকম হাসাহাসি করবারই ইচ্ছা হত!

রাণীমা যখন আমাকে তাঁর হাতে বসিয়ে আয়নার সামনে ধরতেন, তখন আয়নায় একসঙ্গে দুজনের ছায়া পড়ত আর নিজেকে দেখে নিজেই না হেসে পারতাম না ; একজন এত ছোট আর একজন এত বড় যে তার চেয়ে হাস্যকর আর কিছুই হতে পারে না। এর ফলে আমার কেমন মনে হত যে আসলে আমি যতটা বড়, এখন তার চেয়ে অনেক ছোট হয়ে গেছি!

রাণীমার পেয়ারের বেঁটে বামনটাকে দেখে আমার যতটা রাগ হত ও লজ্জা

পেতাম তেমন আর কিছুতে হত না। অত ছোট বামন ওদেশেও আর ছিল না, আমার মনে হয় যে বাস্তবিকই মাথায় ও ত্রিশ ফুটও হবে না। কাজেই ওর চেয়েও বেঁটে কাউকে দেখে ওর সাংঘাতিক বাড় বেড়ে যেত। রাণীমার বৈঠকখানায় হয়তো একটা টেবিলের উপরে দাঁড়িয়ে সভাসদদের বা রাজসভার কোনো মহিলার সঙ্গে আলাপ করছি, পাশ দিয়ে যাবার সময় বামনটা এমন চাল মারত, যেন সে কতই না লম্বা! তার উপর আমার বেঁটে চেহারা নিয়ে কিছু না কিছু মন্তব্য না করে সে ছাড়ত না। তার উত্তরে প্রতিশোধ নিতাম, শুধু তাকে ভাই বলে সম্বোধন করে, আমার সঙ্গে কুস্তি করতে ডেকে আর রাজসভার ছোকরা চাকররা যে ধরণের মস্করা করত সেই রকম করে।

একবার রাত্রে খেতে বসে সে হতভাগাকে কি একটা ঠাট্টা করেছি, তাতে সে এমনি চটে গেল যে নিশ্চিন্ত মনে আমি বসে আছি, অমনি আমার কোমরটা ধরে তুলে নিয়ে দিলে আমাকে ফেলে মস্ত একটা রূপোর বাটি ভরা দুধসর ছিল, তার মধ্যে! কান পর্যন্ত ডুবে গেলাম; যদি খুব ভালো সাঁতার না জানতাম সে যাত্রা আমার হয়েছিল আর কি! সেই সময় গ্লুমডালক্লিচ ঘটনাক্রমে ছিল ঘরের অন্য দিকে আর রাণীমা তো এমনি ভয় পেয়েছিলেন যে আমাকে বাঁচাবার মতো উপস্থিত বুদ্ধি ছিল না। কিন্তু আমার ছোট ধাইমা ছুটে এল আমাকে উদ্ধার করতে, তারপর আমি যখন প্রায় তিনপোটাক দুধ গিলে ফেলেছি তখন সে আমাকে তুলল। আমাকে বিছানায় শোয়ানো হল, তবে এক প্রস্থ পোষাক নষ্ট হওয়া ছাড়া আর আমার কোন ক্ষতি হয় নি; কাপড়চোপড়গুলো অবিশ্যি একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

বামনটাকে তো কষে বেত মারা হল, তার উপরে আরও সাজা দেওয়া হল, যে বাটিতে আমাকে ফেলেছিল তার সমস্ত দুধসর ওকে একা খেতে হল; তাছাড়া রাণীমার আদরও আর সে ফিরে পায় নি, কারণ এ ঘটনার অল্প দিন পরে রাণীমা ওকে একজন সম্ভ্রান্ত মহিলাকে দান করলেন।

এই ব্যবস্থায় আমি যারপরনাই সন্তুষ্ট হয়েছিলাম, কারণ চটেমটে আরও কি সর্বনাশ করত তাই বা কে জানে, যা বদ্‌বুদ্ধি ছিল ছোকরার।

এর আগেও একবার সে আমাকে মহা জব্দ করেছিল, তাতে রাণীমা খুব হাসলেও, সঙ্গে সঙ্গে ভারি বিরক্ত হয়েছিলেন আর তখুনই তাকে বরখাস্ত করে দিতেন, যদি না আমিই উদারতা দেখিয়ে ওর হয়ে ওকালতি করতাম

ব্যাপার হয়েছিল কি, রাণীমা পাতে একটা নলি হাড় নিয়েছিলেন; তারপর তার ভেতরকার শাঁসটুকু বের করে নিয়ে হাড়টাকে যেমন ছিল তেমনি আবার খাড়া করে পাত্রে তুলে দিয়েছিলেন। বেঁটে বামনটা তো এই রকম সুযোগই খুঁজছিল; গ্লুমডালক্লিচ গেছে ডুলি থেকে কি একটা আনতে, সেও অমনি করেছে কি, যে টুলের উপরে দাঁড়িয়ে গ্লুমডালক্লিচ আমার খাওয়ার তদারক করত, তার উপরে চড়ে আমাকে দু হাত ধরে তুলে, ঠ্যাং দুটোকে চিপে দিয়েছে গুঁজে হাড়টার ফুটোয় একেবারে আমার কোমর পর্যন্ত! সেই-ভাবেই খানিকক্ষণ আটকা থাকতে হল, দেখতে নিশ্চয়ই ভারি হাস্যকরও হয়েছিলাম। আমার বিশ্বাস প্রায় পুরো একটি মিনিট কেটে যাবার আগে কেউ আমার অবস্থাটা লক্ষ্যই করে নি, কারণ চ্যাঁচামেচি করাটাকে আমার অযোগ্য বলে মনে হয়েছিল। অবিশ্যি রাজা-রাজড়ারা ক্বচিৎ গরম খাবার পান, কাজেই আমার পায়ে ফোস্কা পড়ে যায় নি, শুধু মোজা আর পেন্টেলুনের দফারফা হয়েছিল! আমি অনুনয় করাতে বেত খাওয়া ছাড়া বামনটার আর কোনো সাজা হয়নি।

আমার ভয়-কাতুরে স্বভাবের জন্যে রাণীমা প্রায়ই আমাকে ঠাট্টা করতেন; তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন আমাদের দেশের সবাই আমারই মতো ভীতু কি না। এর একটা কারণ ছিল। ও দেশে গ্রীষ্মকালে মাছির বড় উৎপাত ছিল। যেই আমি খেতে বসতাম প্রায় এক একটা লার্কপাখির সমান বড় বিটকেল পোকাগুলো আমার কানের পাশে ক্রমাগত ভন্‌ভন্ করে আমাকে জ্বালিয়ে মারত। মাঝে মাঝে মাছিগুলো আমার খাবারের উপর বসত আর যত জঘন্য ময়লা আর ডিম ফেলে যেত। ও দেশের লোকেরা সে সব কিছুই দেখতে পেত না, ওদের বড় মাপের চোখ দিয়ে কোনো ছোট জিনিষ দেখা যেত না, কিন্তু আমি দেখতে পেতাম, কাজেই ময়লাগুলো আমার নজরে খুব সহজেই পড়ত। মাঝে মাঝে মাছি-গুলো আমার নাকে কিম্বা কপালে বসে হুল ফুটিয়ে দিত, তার যে কি যন্ত্রণা! তাছাড়া যা দুর্গন্ধ ওদের গায়ে সে আর কি বলব! তার উপরে স্পষ্ট টের পেতাম ওদের পায়ের তলায় এক রকম চটচটে রস লেগে থাকে, প্রাণীতত্ত্ববিদদের মতে তার সাহায্যে ওরা ছাদের সঙ্গে পা আটকে দিব্যি চলাফেরা করতে পারে। এদের কাছ থেকে যে কি করে আত্মরক্ষা করব

ভেবে পেতাম না, তাই মুখের কাছে এলেই আঁৎকে না উঠে পারতাম না। বামনটার আবার একটা বদ্ অভ্যাস ছিল। সে করত কি আমাদের দেশের স্কুলের ছেলেরা যে রকম মুঠোর মধ্যে মাছি ধরে, ঐ রকম এক মুঠো মাছি ধরে আমার নাকের তলায় ছেড়ে দিত, ভয়ে আমার পিলে চমকে উঠত আর রাণীমার খুব মজা লাগত!

আমার একমাত্র উপায় ছিল মাছিগুলো যখন উড়ে বেড়াচ্ছে সেই সময় ছুরি দিয়ে তাদের টুকরো করে কেটে ফেলা। এ বিষয়ে আমার দক্ষতা দেখে সবাই খুব প্রশংসা করত। এক দিন সকালের কথা মনে পড়ে। পরিষ্কার দিন হলে প্রায়ই গ্লুমডালক্লিচ আমাকে হাওয়া খাবার জন্যে বাক্স সুদ্ধ জানলায় বসিয়ে দিত, পাখির খাঁচার মতো জানলার বাইরে যে বাক্সটাকে আঁকড়ায় ঝুলিয়ে রাখবে, তাতে আমার সাহসে কুলোত না। সেদিনও ঐভাবে বাক্সটাকে জানলার উপর রেখেছে, আমি আমার ঘরের জানলা তুলে তার সামনে টেবিল পেতে বসেছি, এবার এক টুকরো মিষ্টি কেক খেয়ে প্রাতরাশ সারব।

এমন সময় গোটা কুড়ি বোলতা, কেকের গন্ধে লুব্ধ হয়ে, উড়ে এসে আমার ঘরে ঢুকেছে, তাদের সে কি গুঞ্জন, যেন কুড়িটা লোক সানাই বাজাচ্ছে! কয়েক জন মিলে আমার কেকটি ছিনিয়ে টুকরো টুকরো করে যে যার নিয়ে পালাল। বাকিরা আমার মাথার আর মুখের চার পাশে উড়ে বেড়াতে লাগল, শব্দে আমার কান ঝালাপালা আর আমি ভয়েই আধমরা, কখন হুল ফোটায় কে জানে! যাই হক, তলোয়ার বের করে উড়ন্ত অবস্থাতেই তাদের আক্রমণ করলাম। চারটেকে শেষ করলাম, বাকিরা পালিয়ে বাঁচল। তারপরে জানলাটাকে আবার বন্ধ করে দিলাম।

বোলতাগুলো ছিল আমাদের তিতির পাখির মতো বড়। তাদের হুলগুলো কেটে বের করে দেখি এক একটা দেড় ইঞ্চি করে লম্বা আর ছুঁচের মতো ধারালো। আমি যত্ন করে সেগুলো রেখে দিলাম, পরে ইউরোপের নানান জায়গায় আরও কতকগুলো অদ্ভুত জিনিসের সঙ্গে প্রদর্শনী করেছিলাম। ইংল্যাণ্ডে ফিরে গ্রেসাম কলেজে তিনটে দান করলাম, একটি নিজের কাছে রাখলাম।

চতুর্থ অধ্যায়

দেশের বিবরণ—আধুনিক মানচিত্র সংশোধনের প্রস্তাব—রাজপ্রাসাদ ও রাজধানীর আংশিক বর্ণনা—লেখকের ভ্রমণের নিয়ম—প্রধান মন্দিরের বর্ণনা।

ঐ দেশটার মধ্যে ভ্রমণ করে যেমন দেখেছিলাম এবার পাঠক মহাশয়কে তার একটি বিবরণী দেব। অবিশ্যি রাজধানী লোরব্রুলগ্রুদের চারদিকে হাজার দুই মাইলের বেশি আমি দেখি নি। তার কারণ হল সর্বদা রাণীমার সঙ্গে যেতাম, রাজার সঙ্গে যখন তিনি বেরুতেন ওর চেয়ে বেশি দূরে কখনও যেতেন না। রাজামহাশয় রাজ্যের সীমান্ত দেখে ফিরে আসা পর্যন্ত ঐখানে তিনি অপেক্ষা করতেন। গোটা রাজ্যটা আয়তনে হবে ছয় হাজার মাইল লম্বা আর তিন থেকে পাঁচ হাজার মাইল চওড়া। এর থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে পারলাম না যে ইউরোপের ভূগোলবিদ্‌রা যে বলেন জাপান আর ক্যালিফর্ণিয়ার মাঝখানে সমুদ্র ছাড়া আর কিছু নেই, কথাটা একেবারে ভুল।

চিরকাল আমার ধারণা যে তাতার দেশের ঐ বিশাল ভূখণ্ডের ভারসাম্য রক্ষা করতে হলে, পৃথিবীতে আরেকটা বিরাট মহাদেশ থাকতে বাধ্য। এখন বুঝতে পারলাম যে অ্যামেরিকার উত্তর-পশ্চিম অংশের সঙ্গে এই প্রকাণ্ড ভূখণ্ডটি জুড়ে দিয়ে, মানচিত্রের সংশোধন করা দরকার। এই কাজে সাহায্য করতে আমি সর্বদা প্রস্তুত।

রাজ্যটা একটা উপদ্বীপের মতো, উত্তর-পূর্ব সীমান্তে ত্রিশ মাইল উঁচু পর্বতের সারি; পর্বতের শিখরে সব আগ্নেয়গিরি; কাজেই তার উপর দিয়ে যাতায়াত অসম্ভব। ওদের সব চেয়ে বিজ্ঞ পণ্ডিতরাও জানেন না পাহাড়ের ওপারে কি ধরণের মানুষের বাস, এমন কি আদৌ কোনো অধিবাসী আছে কি না। বাকি তিনদিকেই সমুদ্র। সমস্ত রাজ্যের সমুদ্রতীরে একটিও বন্দর নেই। যেখানে যেখানে নদী গিয়ে সমুদ্রে পড়েছে, সেখানকার তীরে এত বেশি ছুঁচলো পাথর আর জলের ঢেউ আর স্রোতের টান যে খুব ছোট নৌকো নিয়েও কেউ বেরুতে সাহস পায় না। ফলে এ দেশটার সঙ্গে পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের যোগাযোগ নেই।

তবে বিশাল নদীগুলোতে মেলা নৌকা ও জাহাজ আর এন্তার অতি সুস্বাদু মাছ। কিন্তু সমুদ্রের মাছ ওরা কচিৎ ধরে, কারণ সমুদ্রের মাছগুলো মাপে ইউরোপের সাধারণ মাছের মতো ছোট, সে ধরে এদের কি লাভ! এতে প্রমাণ হচ্ছে যে প্রকৃতিদেবী এই সব বিপুলকায় গাছপালা, মানুষ, জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন কেবলমাত্র এই রাজ্যের সীমানার মধ্যে। তার কি কারণ হতে পারে সেটা পণ্ডিতরা নির্ধারণ করবেন বলে ছেড়ে দিলাম।

তবে মাঝে মাঝে এক একটা তিমিমাছ সমুদ্রতীরের পাথরের উপরে আছড়ে পড়ে, তখন ওরা সেটাকে ধরে আর সাধারণ লোকরা পেট ভরে তার মাংস খায়। এক-একটি তিমিমাছ এত বড় দেখেছি যে ওখানকার একটা লোক অতি কষ্টে তাকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যেতে পারে। মাঝে মাঝে ঝুড়ি করে এসব মাছ লোরব্রুলগ্রুদেও নিয়ে আসা হয়, সাধারণ মাছের চেয়ে অন্য রকম স্বাদ বলে। একবার রাজার টেবিলেও একটা পাত্রে ঐরকম তিমি মাছ দেখেছিলাম ; দেখলাম ওরা ওটাকে একটা দুষ্প্রাপ্য খাদ্য বলে মনে করে। তবে রাজার যে খুব ভালো লাগল তা মনে হল না, বরং অত বড় একটা মাছ দেখে তাঁর যেন খানিকটা অভক্তিই হচ্ছিল। কিন্তু গ্রীণল্যাণ্ডে আমি একবার ওর চেয়েও বড় তিমিমাছ দেখেছিলাম।

এ দেশে বহু লোকের বাস ; একান্নটি বড় সহর আছে, প্রায় একশোটি দেয়ালঘেরা ছোট সহর, অগুন্তি গ্রাম। কৌতূহলী পাঠকের তৃপ্তির জন্য লোরব্রুলগ্রুদের একটা বিবরণী দিচ্ছি। মাঝখান দিয়ে একটা নদী বয়ে গেছে, তার দুই তীরে সহরটি প্রায় সমানভাবে বিস্তৃত। সহরে আশী হাজার বাড়ি আছে। এই নগর তিন গ্লংগ্লুং লম্বা, অর্থাৎ আমাদের দেশের চুয়ান্ন মাইল আর চওড়ায় আড়াই গ্লংগ্লুং। রাজামহাশয়ের আদেশে রাজসভার ব্যবহারের একশো ফুট লম্বা মানচিত্রটি আমার জন্য ম্যাটিতে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এইসব মাপ আমি তাতেই পেয়েছিলাম। আমি বেশ কয়েকবার ব্যাস আর পরিধিটা খালি পায়ে মেপে মেপে ঘুরে দেখলাম, তারপর মানচিত্রের পরিমাপ অনুসারে এই হিসাব করলাম ; এ প্রায় নির্ভুল হতে বাধ্য।

ওখানকার রাজপ্রাসাদ বলতে একটা গোটা অট্টালিকা বোঝায় না, সাত মাইল জায়গা জুড়ে অনেকগুলো বাড়িঘর নিয়ে হল রাজপ্রাসাদ। প্রধান ঘরগুলো সাধারণতঃ দুশো চল্লিশ ফুট উঁচু আর সেই অনুপাতে

লম্বা চওড়া। গ্লুমডালক্লিচের আর আমার জন্যে একটা ঘোড়ার গাড়ি বরাদ্দ হল, তাতে করে তার মাষ্টারণী প্রায়ই তাকে সহর দেখাতে নিয়ে যেতেন, কিম্বা দোকানপাটে যেতেন, আমিও সর্বদা আমার বাক্সের মধ্যে বসে সঙ্গে যেতাম। অবিশ্যি অনেক সময় আমার নিজের অনুরোধে গ্লুমডালক্লিচ আমাকে বাক্স থেকে বের করে নিজের হাতে ধরে রাখত, যাতে পথ দিয়ে যাবার সময় আরো ভালো করে বাড়িঘর লোকজন দেখতে পাই।

আন্দাজে মনে হয় আমাদের ঐ গাড়িটা ছিল ওয়েষ্টমিন্সটার হলের একটা মহলের সমান বড়, অতটা উঁচু নয়, অবিশ্যি ঠিক করে কিছু বলা সম্ভব নয়। একদিন হয়েছে কি, মাষ্টারণীদিদি কোচম্যানকে কয়েকটা দোকানের সামনে থামতে বললেন। অনেকগুলো ভিখিরি এই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিল, এবার তারা চারিদিক থেকে গাড়িটাকে ছেঁকে ধরল। সে যা দেখলাম, কোনো ইউরোপীয় চোখ কখনো এরকম বীভৎস দৃশ্য দেখেছে বলে আমার মনে হয় না। একজন মেয়েমানুষের বুকে একটা বিশাল ফোড়া, তার মধ্যে মেলা গর্ত, সে গর্তের দুটো একটার মধ্যে আমি স্বচ্ছন্দে ঢুকে লুকিয়ে থাকতে পারতাম। আরেকটা লোকের গলায় একটা আব, সেটা পাঁচ গাঁটরি পশমের চেয়েও বড়।

আরো একটা লোক দেখলাম, তার দুটো ঠ্যাংই কাঠের তৈরী, এক একটা কুড়ি ফুট উঁচু! কিন্তু সবচেয়ে জঘন্য লাগল ওদের কাপড়চোপড়ে উকুন হেঁটে বেড়ানোর দৃশ্য। অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে আমাদের দেশের এক একটা উকুনকে যত ভালো করে দেখা যায়, এদের উকুনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আমি খালি চোখেই তার চেয়ে অনেক স্পষ্ট করে দেখতে পেলাম, ছুঁচলো মুখ দিয়ে ঠিক শূওরের মতো খুঁড়ে খাচ্ছে! এত বড় উকুন এই আমি প্রথম দেখলাম, উপযুক্ত যন্ত্রপাতি সঙ্গে থাকলে কেটে কুটে ওদের শরীর পরীক্ষা করে দেখতাম; যথেষ্ট কৌতূহল ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় যন্ত্রপাতি সবই জাহাজে পড়ে ছিল। এও সত্যি যে পোকাগুলোকে দেখেই আমার গা-বমি বমি করছিল।

যাতায়াতের সুবিধার জন্য আমার থাকবার বড় বাক্সটা ছাড়া রাণীমা আরেকটা ছোট বাক্স করালেন। এটা ছিল লম্বা চওড়ায় বারো ফুট করে আর উঁচুতে দশ ফুট। বড় বাক্সটাকে কোলে নিয়ে বসতে গ্লুমডালক্লিচের ভারি অসুবিধা হচ্ছিল, তাছাড়া গাড়ির মধ্যেও অত বড় বাক্স ঠিক মতো আনা

যাচ্ছিল না। ঐ একই কারিগর এ বাক্সটাকেও তৈরি করল আর এবারও আমিই কি ভাবে কি করতে হবে সব বলে দিলাম।

ঘরটি ছিল সমচতুষ্কোণ, তিনটি দেয়ালের মাঝখানে একটা করে জানলা, তাতে বাইরে থেকে লোহার জাল লাগানো, যাতে অনেক দূরেও যদি যেতে হয়, তবু দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকবে না। চতুর্থ দিকে জানলা ছিল না, সেদিকে দুটো খুব মজবুৎ আঁকড়া লাগানো। ঘোড়ায় করে কোথাও আমার যাবার ইচ্ছা হলে, যে আমাকে নিয়ে যাবে সে করত কি, ঐ আঁকড়ার মধ্যে দিয়ে একটা শক্ত চামড়ার বেল্ট চালিয়ে নিজের কোমরে এঁটে নিত। গ্লুমডালক্লিচ কাছে না থাকলে এ দায়িত্ব নিত সর্বদা কোনো ধীর প্রকৃতির বিশ্বাসী চাকর, যার কাছে সব কথা খুলে বলা যেত, তা সে রাজারাণীর শোভাযাত্রার সঙ্গে যাবার কথাই হক, কিম্বা বাগান দেখতে যাবার সখই হক, কিম্বা কোনো উচ্চবংশীয়া মহিলা কি কোনো রাজমন্ত্রীর বাড়িতে বেড়াতে যাবার ইচ্ছাই হক। বেশি দিন না যেতেই রাজসভার বড় বড় হোমরাচোমরাদের সঙ্গে আলাপও হল, খাতিরও হল, অবিশ্যি হতে পারে সেটা যত না আমার ব্যক্তিগত গুণের জন্যে, তার চেয়ে বেশি রাজারাণীর পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলাম বলে।

হয়তো গাড়ি চেপে কোথাও যেতে আর ভালো লাগছে না, তখন ওঁদের একজন চাকর আমার বাক্সে বকলস এঁটে, ঘোড়ার পিঠে নিজের সামনে একটা বালিশের উপরে বাক্সটা বসিয়ে নিয়ে চলত। সেখান থেকে আমার ঘরের তিন দিকের জানলা দিয়ে চারদিকের শোভা আমি চমৎকার দেখতে পেতাম। ছোট ঘরটাতে ছিল একটা ক্যাম্পখাট, ছাদ থেকে ঝোলানো একটা লম্বা দোলনা, দুটো চেয়ার আর একটা টেবিল। সবই ঘরের মেজের সঙ্গে স্ক্রু দিয়ে শক্ত করে আঁটা, যাতে গাড়ি ঘোড়া বেশি ঝাঁকানি দিলেও চাল-ঝাড়া হয়ে না যাই। তবে আমি তো লম্বা লম্বা সমুদ্রযাত্রায় অভ্যস্ত, কাজেই এ ধরণের ঝাঁকানি হাজার বেশি হলেও আমার বিশেষ অসুবিধা হত না।

সহর দেখবার সখ হলেই বাক্সে চড়া। তখন ওখানে যেমন ফ্যাসান ছিল, একটা খোলা পালকিই বলুন আর ডুলিই বলুন, তাতে আমার বাক্সটা কোলে নিয়ে গ্লুমডালক্লিচ বসত, চারটে লোক সেটা কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যেত আর দুটো লোক রাণীমার উর্দি পরে সঙ্গে যেত। প্রজারা আমার সম্বন্ধে নানান

কথা শুনেছিল, তারা সব কৌতূহলের চোটে ডুলির চারদিকে ভিড় করত। গ্লুমডালক্লিচের স্বভাবটি বড় অমায়িক, সে আমাকে বাক্স থেকে বের করে হাতে নিয়ে রাখত, যাতে আমাকে আরো ভালো করে দেখা যায়।

ও দেশের প্রধান মন্দির দেখবার আমার ভারি সখ, বিশেষতঃ মন্দিরের উঁচু চূড়োটি; লোকে বলে ওরকম উঁচু চূড়ো ওদেশে আর নেই। কাজেই একদিন ধাইমা আমাকে সেখানে নিয়ে গেল, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি ভারি নিরাশ হয়ে ফিরে এলাম, কারণ মাটি থেকে একেবারে ডগা অবধি মাপলেও ওটা তিন হাজার ফুটের বেশি হবে না। আমাদের দেশের লোকের মাপ আর ওদের মাপের কথাটা মনে রাখলে তিন হাজার ফুটে এমন কিছু একটা উচ্চতাই নয়; যদি আমার ঠিক মনে থাকে তো আমাদের সল্‌স্‌বারি গির্জার চূড়োটারও সমান নয়। তবু যে জাতির কাছে আমি নিজেকে অত্যন্ত ঋণী বলে সারাজীবন স্বীকার করব, তাকে তুচ্ছ করা আমার উদ্দেশ্য নয়; এই চূড়োর উচ্চতার দিক থেকে যত অভাবই থাকুক, সৌন্দর্য আর মজবুৎ গঠনের দিক থেকে সে অভাব পূরে যায়। দেয়ালগুলো নিরেট পাথর কুঁদে তৈরী, প্রায় একশো ফুট পুরু। প্রত্যেকটা পাথর চৌকোণা, লম্বা চওড়ায় চল্লিশ ফুট করে। চারদিকের দেয়ালে কুলুঙ্গির মতো করা, তার প্রত্যেকটাতে সত্যিকার মানুষের চেয়ে বড় বড় সব ঠাকুর দেবতা আর রাজারাজড়ার শ্বেত পাথরের মূর্তি সাজানো। একটা মূর্তির হাতের কড়ে আঙ্গুল ভেঙ্গে নিচে আবর্জনার মধ্যে পড়েছিল, কেউ লক্ষ্যই করে নি, সেটাকে মেপে দেখলাম ঠিক চার ফুট এক ইঞ্চি লম্বা! গ্লুমডালক্লিচ সেটাকে রুমালে জড়িয়ে পকেটে করে বাড়ি নিয়ে এল, ওর সব টুকিটাকি জিনিসের সঙ্গে রাখবে বলে। ও জিনিসগুলি ওর বড়ই প্রিয়, ও বয়সের ছেলেমেয়েদের যেমন হয়।

রাজবাড়ির পাকশালাটি একটা দেখবার জিনিষ, মস্ত খিলান দেওয়া ছাদ, উঁচুতে ছ'শো ফুট হবে। লণ্ডনের সেণ্ট পলের গির্জার গম্বুজের চেয়ে ওখানকার উনুনটি চওড়ায় হবে মাত্র দশ পদক্ষেপ কম।

দেশে ফিরে ইচ্ছা করেই গম্বুজটাকে মেপে দেখেছিলাম। কিন্তু এবার যদি উনুনের প্রকাণ্ড শিকগুলো, বিরাট সব হাঁড়িকুড়ি, বিশাল মাংসের চাংড়া কেমন শিখে গাঁথা হয়ে ঝলসানো হচ্ছে, আরও এই ধরণের খুঁটিনাটির বর্ণনা দিতে যাই, সম্ভবতঃ কেউই আমার কথা বিশ্বাস করবে না। নিদেন কড়া

সমালোচকরা হয়তো একথা ভাবতে পারেন যে খানিকটা বাড়িয়ে বলছি, পর্যটকরা প্রায়ই যা করেন বলে সকলের সন্দেহ হয়। এই অপবাদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে আমার মনে হয় আমি বরং একেবারে উল্টো কাজটি করে বসেছি এবং এই রচনা যদি কখনও ব্রবডিংনাগের ভাষায়—ও দেশটা ঐ নামেই পরিচিত—অনুবাদ করে ওদের দেশে পাঠানো হয়, তাহলে রাজার এবং তাঁর প্রজাদের এই অভিযোগ করবার যথেষ্ট কারণ থাকবে যে ভুল তথ্য দিয়ে সব কিছুকে খর্ব করে বর্ণনা দিয়েছি, তাতে ওঁদের ক্ষতি হয়েছে।

রাজা তাঁর ঘোড়াশালে ক্বচিৎ ছ'শোর বেশি ঘোড়া রাখেন। ঘোড়াগুলো সাধারণতঃ চুয়ান্ন থেকে ষাট ফুট উঁচু। তবে কোনো বিশেষ উপলক্ষ্যে যখন তিনি প্রকাশ্যে দর্শন দেন, তখন সঙ্গে থাকে পাঁচশো ঘোড়সওয়ারের রক্ষীদল। তাই দেখে প্রথমে আমি ভেবেছিলাম এর চেয়ে মহান দৃশ্য আর হতে পারে না, কিন্তু পরে যুদ্ধসজ্জায় তাঁর সেনাদলের একটা বিভাগ দেখেছিলাম, সে বিষয়ে যথাস্থানে আরও বলব।

পঞ্চম অধ্যায়

লেখকের জীবনের কয়েকটি অভিজ্ঞতা—অপরাধীর প্রাণদণ্ড—নৌচালনায় লেখকের দক্ষতা প্রদর্শন।

আমার ক্ষুদ্র আকারের জন্যে যদি আমাকে কয়েকটি হাস্যকর ও বিরক্তিকর দুর্ঘটনার মধ্যে জড়িত হতে না হত, তাহলে ওদেশে আমি বেশ সুখেই থাকতাম। এই রকম কয়েকটি ঘটনার কথা এবার সাহস করে বলেই ফেলি। অনেক সময় গ্লুমডালক্লিচ আমাকে ছোট বাক্সটিতে করে বাগানে নিয়ে যেত, সেখানে গিয়ে আমাকে বাক্স থেকে বের করে হয় নিজের হাতের মধ্যে রাখত, নয়তো হেঁটে বেড়াবার জন্য মাটিতে ছেড়ে দিত। একদিন হয়েছে কি, বেঁটে বামনটা, তখনও রাণীমার চাকরি ছেড়ে যায়নি, আমাদের পিছন পিছন বাগানে গিয়ে হাজির হয়েছে। ধাইমা আমাকে মাটিতে নামিয়ে দিয়েছে, কতকগুলো ছোট ছোট আপেল গাছের কাছে বেঁটে বামন আর আমি রয়েছি পরস্পরের খুব কাছাকাছি। আমার সে সময় কি খেয়াল হল খুদে গাছগুলোর সঙ্গে বেঁটে বামনের তুলনা করে বোকার মতো একটু ঠাট্টা করেছি, অবিশ্যি আমাদের ভাষাতে যেমন ওদের ভাষাতেও তেমনি ঠাট্টাটি জমেছিল ভালো। তার উত্তরে হিংসুটে ন্যাটা করেছে কি, যেই না আমি আপেল গাছের তলায় গেছি, ঠিক আমার মাথার উপরের গাছটি ধরে দিয়েছে কষে ঝাঁকানি। অমনি এক একটা ব্রিষ্টলের পিঁপের মতো বিরাট দশ বারোটা আপেল, ধুপধাপ করে আমার মাথা মুখের আশে পাশে পড়েছে। কোনো কারণে সে সময় নিচু হয়েছিলাম, ধপাস করে একটা পড়ল আমার পিঠে, গেলাম পড়ে মুখ থুবড়ে, তবে তার বেশি আর লাগেনি। আমার অনুরোধে বামনটাও ক্ষমা পেল, কারণ দোষ ছিল আমারই, আমিই তাকে খুঁচিয়েছিলাম।

আরেকদিন ধাইমা আমাকে একটু মোলায়েম ঘাসের জমিতে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতে ছেড়ে দিয়ে, একটু দূরে নিজের শিক্ষিকার সঙ্গে বেড়াচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ এমনি জোরে শীলা বৃষ্টি আরম্ভ হল যে তার চোটে আমি তো তক্ষুণি মাটিতে চিৎপাত! মাটিতে পড়বামাত্র শীলগুলোও ধুপধাপ করে

আমার সর্বাঙ্গে এমনি জোরে পড়তে লাগল যে কে যেন আমার গায়ে টেনিস্ খেলার বল ছুঁড়ে মারছে। যাই হক কোনোমতে হামাগুড়ি দিয়ে এক সারি সুগন্ধি পাতার ঝোপের আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। এর ফলে মাথা থেকে পা পর্যন্ত আমার এত ছড়ে ছেঁচে গিয়েছিল যে দশদিন আর ঘরের বার হতে পারি নি। এতে অবাক হবার কিছু নেই, কারণ এ দেশের প্রাকৃতিক সব কিছুর মাপই ঐ অনুপাতে বড়, ইউরোপে যে শীল পড়ে এখানকার শীল তার চেয়ে আঠোরো শো গুণ বড়, শীলগুলোকে মেপে, ওজন নিয়ে আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি।

আরেকবার কিন্তু এর চেয়েও অনেক সঙ্গীন অবস্থা হয়েছিল আমার। মাঝে মাঝে একা বসে চিন্তা করতে ভালো লাগত; আমার ছোট্ট ধাইমাকে তাই বলতাম একটা নিরাপদ জায়গা দেখে আমাকে একলা ছেড়ে দিতে, সেও তাই মনে করেই একদিন দিয়েছে আমাকে ছেড়ে। এদিকে বাক্স রেখে এসেছে বাড়িতে, নইলে সেটাকে আবার টেনে বেড়াতে হয়, আর নিজে গেছে শিক্ষিকা আর চেনা কয়েকজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে বাগানের অন্য ধারে। ও আমার ধারকাছে নেই, যেখানে আছে সেখান থেকে শোনাও যায় না কিছুই, এমন সময় সর্দার মালীদের একজনের পোষা ছোট্ট একটা স্প্যানিয়েল কুকুর কেমন করে বাগানের মধ্যে ঢুকে পড়ে, আমি যেখানে শুয়ে আছি তার খুব কাছে এসে পড়েছে। গন্ধ শুঁকে শুঁকে কুকুরটা সটাং আমার সামনে এসে, আমাকে মুখে করে তুলে নিয়ে, সোজা দৌড় মুনিবের কাছে! তারপর ল্যাজ নাড়তে নাড়তে আলতোভাবে আমাকে মাটিতে নামিয়ে দিয়েছে। ভাগ্যিস কুকুরটাকে এত ভালো শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল যে আমাকে দাঁতে কামড়ে ধরে নিয়ে গেল, অথচ আমার একটুও লাগল না, জামা-কাপড় পর্যন্ত ছিঁড়ল না।

এদিকে মালী বেচারা তো ভয়েই অস্থির, যথেষ্ট চেনে সে আমাকে, ভালোওবাসে। আস্তে আস্তে আমাকে হাতে করে তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগল আমি কেমন আছি। আমি কিন্তু এমনি হতভম্ব হয়ে গিয়েছি যে হাঁপ ধরে গেছে, কোনো কথা বেরুচ্ছে না!

কয়েক মিনিটের মধ্যেই অবিশ্যি প্রকৃতিস্থ হলাম, তখন সে আমাকে নিরাপদে ধাইমার কাছে পৌঁছে দিল। ধাইমাও ততক্ষণে যেখানে আমাকে

রেখে গিয়েছিল, সেখানে ফিরে এসে আমাকে দেখতে না পেয়ে ভেবেই সারা। দেখতেও পাচ্ছে না, ডাকলেও সাড়া দিচ্ছি না। কুকুরটার কাণ্ডের জন্য মালীকে তাই দিলে খুব এক চোট বকে। ব্যাপারটাকে অবিশ্যি চাপা দেওয়া হয়েছিল, রাজসভার কেউ জানতে পারে নি, কারণ মেয়েটার ভারি ভয় রাণীমা শুনলে যদি চটে যান; আর সত্যি কথা বলতে কি আমার নিজের দিক থেকেও মনে হয়েছিল যে এ ব্যাপারটার কথা রটে গেলে, আমার কিছু খ্যাতি বাড়বে না!

এই দুর্ঘটনার পর গ্লুমডালক্লিচ মনে মনে ঠিক করেছিল যে ভবিষ্যতে বাইরে কোথাও গেলে এক মুহূর্তের জন্যেও আমাকে চোখের আড়াল করবে না। অনেক দিন থেকেই আমি এটা আশঙ্কা করেছিলাম, তাই আমাকে একা ছেড়ে গেলে ছোটখাটো দুটো একটা দুর্ঘটনার কথা একেবারে চেপে যেতাম। একবার বাগানের উপরে চক্কর দিতে দিতে একটা চীল হঠাৎ আমার উপর ছোঁ মেরেছিল আর তৎক্ষণাৎ যদি মনের জোর করে তলোয়ার বের করে, একটা মজবুৎ মাচার তলায় ছুটে গিয়ে না ঢুকতাম, তা হলে নির্ঘাৎ আমাকে নখে করে তুলে নিয়ে উড়ে যেত।

আরেকবার নতুন একটা ছুঁচোর ঢিবির উপর দিয়ে হেঁটে যেতে গিয়ে, যে গর্তর মধ্যে থেকে ছুঁচোটা মাটি বের করেছিল, একেবারে গলা অবধি তার মধ্যে গেছি পড়ে। তারপর মাটিলাগা কাপড়চোপড়ের কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে কি যেন সব বানিয়ে বানিয়ে বলেছিলাম, সে এখন মনে রাখার মতন নয়। আরেকবার ঐ রকম একলা বেড়াতে গিয়ে দেশের কথা ভেবে মন খারাপ করছি, এমন সময় একটা গুগলির খোলার উপরে হোঁচট খেয়ে পড়ে ডান পায়ের বড় হাড়টাকে ভেঙ্গে ফেলেছিলাম।

এই রকম একলা বেড়াবার সময় যখন লক্ষ্য করতাম যে ছোট ছোট পাখি-গুলো আমাকে দেখে মোটে ভয় পায় না, তখন কিন্তু বেশি আনন্দ হত, না ক্ষোভ হত বলতে পারি না। পাখিগুলো পোকাটোকার খোঁজে লাফাতে লাফাতে আমার গজ খানেকের মধ্যে এসে পড়ত এমন নিশ্চিন্ত অবজ্ঞায়, যেন আমি কিম্বা কেউ নেই সেখানে। একবার মনে আছে প্রাতরাশের জন্যে আমার হাতে গ্লুমডালক্লিচ এক টুকরো কেক দিয়ে গেছে, অমনি একটা থ্রাস্ পাখি দিব্যি নিশ্চিন্তভাবে সেটি ঠোঁট দিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে উড়ে গেল! পাখি-

গুলোকে ধরতে চেষ্টা করেছি কি অমনি তারা তেজের সঙ্গে রুখে দাঁড়িয়ে আমার আঙ্গুলে ঠুকরে দিতে চাইত, ভয়ের চোটে ওদের নাগালের মধ্যে হাত আনতাম না। তখন তারা করত কি, লাফিয়ে লাফিয়ে পিছনে সরে গিয়ে আগের মতো পোকা গুগলি ইত্যাদি খুঁজে বেড়াত, যেন কিছুই হয় নি।

তবে একদিন এই মোটা একটা মুগুর নিয়ে গায়ের জোরে একটা লিনেট পাখির দিকে ছুঁড়ে মেরেছিলাম, কি ভাগ্যে সেটা তার গায়ে লাগতেই সে তো পড়ে গেল; আমিও দু হাতে তার গলাটা চেপে ধরে বিজয়গর্বে তাকে নিয়ে ছুটেছি ধাইমার দিকে। এদিকে পাখিটা অল্পক্ষণের জন্য অজ্ঞানের মতো হয়েছিল, যেই না চৈতন্য হয়েছে অমনি আমার গায়ে মাথায় দু দিক থেকে সে কি ডানার ঝাপটানি! আমি তো হাত লম্বা করে তাকে তফাতে ধরে রেখেছি যাতে নখের আঁচড় না পৌঁছয়, তবুও একশোবার ইচ্ছে হচ্ছিল দিই ওকে ছেড়ে।

অল্প সময়ের মধ্যেই অবিশ্যি চাকরদের একজন এসে পাখিটার ঘাড় মটকে দিয়ে আমাকে রেহাই দিলে। রাণীমার হুকুমে পরদিন রাত্রে আমাকে ওটা রেঁধে খাওয়ানো হল। যতদূর মনে পড়ে এই লিনেট পাখিটা ছিল আমাদের দেশের একটা রাজহাঁসের সমান বড়!

রাণীমার সখীরা প্রায়ই গ্লুমডালক্লিচকে তাদের মহলে ডেকে পাঠাত আর বলত আমাকে যেন সঙ্গে নিয়ে যায়, যাতে আমাকে দেখে ছুঁয়ে তারা আমোদ করতে পারে। অনেক সময় তারা আমার মাথা থেকে পা অবধি গা খালি করে আমাকে বুকের উপরে শুয়ে রাখত। আমি তো ঘেন্নায় মরি, কারণ, সত্যি কথা বলতে কি, ওদের গায়ে বড় বিশ্রী গন্ধ। অবিশ্যি ভদ্রমহিলাদের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে বলে তাদের নিন্দা করবার উদ্দেশ্যে কথাটা বলছি না। আমার ধারণা ওদের তুলনায় আমার আকৃতিটাও যেমন ছোট, ইন্দ্রিয়শক্তিগুলো তেমনি প্রখর আর আমাদের দেশের ঐরকম উচ্চবংশীয়া মহিলাদের বেলাতেও যেমন, তেমনি ওদেরও নিজেদের ভালোবাসার পাত্রদের কাছে কিম্বা পরস্পরের কাছে নিশ্চয়ই সেরকম কিছু দুর্গন্ধ মনে হয় না। তাছাড়া ওরা যেসব সুগন্ধী-দ্রব্য ব্যবহার করত, তার চেয়ে আমি বরং ওদের গায়ের গন্ধ সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলাম, সুগন্ধীর চোটে তো আমি তৎক্ষণাৎ ভির্মি যেতাম!

তবে একথাও আমি ভুলতে পারি না যে লিলিপুটে থাকার সময় একদিন বেশ গরম পড়েছে আর আমিও বেশ খানিকটা শারীরিক পরিশ্রম করেছি, এমন সময় আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু সাহস করে বলেছিল যে আমার গায়ে বড় গন্ধ! যদিও অধিকাংশ পুরুষ মানুষদের মতো সে বিষয় আমার একটু দুর্বলতা আছে, তবু আমার বিশ্বাস এদেশের লোকদের তুলনায় আমার ঘ্রাণশক্তিটি যেমন প্রখর, তেমনি আবার আমার তুলনায় লিলিপুটবাসীদের ঘ্রাণশক্তিও প্রখর। তবে এই প্রসঙ্গে আমার প্রভুপত্নী, রাণীমা ও আমার ধাইমার সম্বন্ধে একথা না বললে অন্যায় হবে যে তাদের শরীরে আমাদের দেশের মেয়েদের শরীরের মতো সুগন্ধ।

যখনি ধাইমা আমাকে সখীদের কাছে নিয়ে যেত, যাতে আমার সব চেয়ে অস্বস্তি বোধ হত সেটা হচ্ছে, আমাকে ওরা কেউ এতটুকু খাতির করত না। আমার সামনেই হয়তো একেবারে উলঙ্গ হয়ে কাপড়চোপড় ছাড়ল, আমাকে হয়তো তাদের নিরাবরণ দেহের ঠিক সামনে প্রসাধনের টেবিলের উপর বসিয়ে রাখল। বলা বাহুল্য সে দৃশ্য আমাকে প্রলুব্ধ করা দূরে থাকুক, দেখে শুধু ঘৃণা হত আর গা শিউরে উঠত। ওদের গায়ের চামড়া দারুণ কর্কশ ও অসমান, কাছে থেকে দেখলে নানা রঙের ছোপ দেখা যায়; এখানে ওখানে এক একটা থালার মতো বড় তিল, তার মধ্যে থেকে আবার টনসুতোর মতো মোটা চুল বেরিয়েছে আর দেহের অন্যান্য জায়গার কথা আর নাই বললাম।

তার উপরে, অনেক সময় আমার সামনেই, তিন পিঁপে জল ধরে এইরকম বিশাল একটা পাত্রে, খানিক আগে পান করা জল বের করে দিত।

সখীদের মধ্যে সবচেয়ে সুশ্রী ছিল ভারি হাসিখুসি ফূর্তিবাজ এক ষোড়শী। সে করত কি আমাকে ধরে ঘোড়ায় চড়ার মতো করে তার স্তনের চূড়োয় বসিয়ে দিত। আরো কত কি যে করত সে আর বিস্তারিত বলে কাজ নেই, পাঠক মহাশয় আমাকে মাপ করবেন। যাই হক, এ সব আমার এত খারাপ লাগত যে আমি গ্লুমডালক্লিচকে অনুনয় করে বলেছিলাম যে যা হয় একটা অছিলা করে, আমাকে যেন আর ঐ ষোড়শীটির কাছে না নিয়ে যায়।

একদিন গ্লুমডালক্লিচের শিক্ষিকার এক ভাইপো এসে উপস্থিত। সে ছোকরা তো ওদের দুজনকে ভারি পেড়াপিড়ি করতে লাগল একটা প্রাণদণ্ড দেখতে যাবার জন্যে। ওরই কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে খুন করার জন্য লোকটির গর্দান

নেওয়া হচ্ছে। গ্লুমডালক্লিচের মনটা ছিল বড় কোমল, তবু অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে সঙ্গে যেতে রাজী হয়ে গেল, আর আমি তো এইরকম দৃশ্য দু চক্ষে দেখতে পারি না, তবু এইরকম একটি অসাধারণ দৃশ্য দেখতে যেতে আমার নিজের মনের কৌতূহলই আমাকে বাধ্য করেছিল। একটা উঁচু মঞ্চ তৈরী হয়েছিল এই জন্যেই, তার উপরে একটা চেয়ারে অপরাধী বাঁধা রয়েছে, চল্লিশ ফুট লম্বা একটা তলোয়ারের এক কোপে তার মাথা কেটে ফেলা হল। ছিন্ন শিরা থেকে এমন প্রবল বেগে এত রক্ত বেরুতে লাগল যে ঐটুকু সময়ের জন্যে তার কাছে ভের্সাইয়ের ফোয়ারা লাগে কোথায়! মুণ্ডুটা মঞ্চের উপরে পড়ে এমনি লাফিয়ে উঠল যে আমাদের হিসাবে অন্ততঃপক্ষে এক মাইল দূরে দাঁড়িয়েও আমি একেবারে আঁৎকিয়ে উঠলাম।

রাণীমা প্রায়ই আমার সমুদ্রযাত্রার গল্প শুনতেন আর আমাকে বিষণ্ণ দেখলেই সর্বদা ভুলিয়ে রাখবার উপায় খুঁজতেন। একদিন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন নৌকোর পাল দাঁড় আগলাতে জানি কি না আর একটু নৌকো বাওয়া আমার স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভালো কি না। বললাম দুই কাজই খুব ভালো জানি, কারণ যদিও আমার পদ ছিল জাহাজের সার্জন বা ডাক্তারের, তবু তেমন অবস্থায় পড়লে আমাকেও সাধারণ নাবিকদের মতোই খাটতে হত। তবে ও দেশে নৌকো বাওয়াটা আমার পক্ষে কেমন করে সম্ভব হতে পারে সেটা ভেবে পেলাম না, এখানকার সবচেয়ে ছোট পান্সিই তো আমাদের সব চেয়ে বড় মানোয়ারি জাহাজের সমান! তাছাড়া যে ধরণের নৌকো আমি সামলাতে পারব সে এখানকার নদীতে টিকবে কেন!

রাণীমা বললেন, আমি যদি নৌকোর নক্সা তৈরী করে দিই, তাঁর ছুতোর নৌকো বানিয়ে দেবে, আর নৌকো চালাবার যোগ্য জায়গার ব্যবস্থা তিনি নিজে করে দেবেন। বাস্তবিকই লোকটা ছিল ওস্তাদ কারিগর, দশদিনের মধ্যে আমার নির্দেশমতো সমস্ত যন্ত্রপাতি সাজসজ্জা সুদ্ধ এত বড় একটা প্রমোদ-নৌকো বানিয়ে ফেলল যে তার মধ্যে আমাদের দেশের আটজন লোক অনায়াসে বসতে পারে।

নৌকো তৈরী হলে, আহ্লাদে আটখানা হয়ে নৌকো কোলে রাণীমা মহারাজের কাছে গেলেন ছুটে। রাজা হুকুম দিলেন পরীক্ষাস্বরূপ এক চৌবাচ্চা জলে আমাকে নৌকোর মধ্যে বসিয়ে ছেড়ে দেওয়া হক। সেখানে

কিন্তু জায়গার অভাবে হাল কিম্বা ছোট দাঁড় দুটোর কোনোটাই চালানো গেল না। রাণীমা এদিকে আগে থাকতেই একটা মৎলব ঠাউরে রেখেছিলেন। ছুতোরকে তিনি এবার ফরমায়েস করলেন তিনশো ফুট লম্বা, পঞ্চাশ ফুট চওড়া আর আট ফুট গভীর একটা কাঠের চাড়ি তৈরী করে দিতে। তারপরে তার জোড়াগুলোতে কষে আলকাতরা মাখানো হল যাতে জল না চুঁয়ায়; এবারে ওটাকে রাজবাড়ির বাইরের মহলে দেয়াল ঘেঁষে মেজের উপরে রাখা হল। চাড়ির তলায় একটা কল লাগানো ছিল, বাসি জল যাতে বের করে দেওয়া যায়। দুটো চাকর আধ ঘণ্টার মধ্যে চাড়িটাতে স্বচ্ছন্দে জলে ভরে ফেলতে পারত। এখানে আমি প্রায়ই নৌকো বেয়ে নিজের আর রাণীমা ও তাঁর সখীদের চিত্তবিনোদন করতাম। সখীরা তো আমার নৌকো চালাবার দক্ষতা আর কসরৎ দেখে মহা খুসি!

এক এক সময় পাল তুলে দিতাম, তখন আমার একমাত্র কাজ হত হাল ধরে বসে থাকা; সখীরা পাখা নেড়ে বাতাস তুলতেন; তাঁরা ক্লান্ত হয়ে গেলে ছোকরা চাকরগুলো ফুঁ দিয়ে পালে বাতাস লাগাত আর আমি ইচ্ছামতো ডাইনে বাঁয়ে নৌকো ফিরিয়ে কায়দা দেখাতাম। খেলা শেষ হলে গ্লুমডালক্লিচ সর্বদা নৌকোটাকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে, জল শুকোবার জন্যে পেরেকে টানিয়ে রাখত।

এই রকম নৌবিহার করতে গিয়ে একবার এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল যে আরেকটু হলেই প্রাণটা যেত। ছোকরাগুলোর একজন চাড়িতে নৌকো নামিয়েছে, এমন সময় গ্লুমডালক্লিচের মাষ্টারণী সর্দারি করে আমাকে হাতে করে তুলে নিয়েছেন, নৌকোতে বসিয়ে দেবেন বলে। দৈবাৎ কেমন করে আমি তাঁর আঙ্গুল থেকে ফস্কে গিয়েছি! আরেকটু হলেই পড়েছিলাম আর কি চল্লিশ ফুট নিচে একেবারে শানের উপরে, যদি না ভদ্রমহিলার কটিবন্ধে, একটা কাঁটায় আটকে ঝুলে থাকতাম! পিনের মাথাটা কি করে যেন আমার সার্ট আর পেণ্টেলুনের বেল্টের মাঝখান দিয়ে গলে গিয়েছিল। ঐরকম করে শূন্যে ঝুলেই থাকলাম, যতক্ষণ না গ্লুমডালক্লিচ দৌড়ে এসে আমাকে উদ্ধার করল।

একটা চাকরের কাজ ছিল তিন দিন অন্তর চাড়িতে তাজা জল ভরে দেওয়া। সে ব্যাটা এতই অসাবধান যে একবার একটা ব্যাঙ যে তার বাল্‌তি থেকে

লাফিয়ে জলের সঙ্গে পড়ল সেটা লক্ষ্যই করল না। যতক্ষণ না নৌকোয় বসিয়ে আমাকে জলে ছাড়া হল ব্যাঙটা লুকিয়ে ছিল, তারপর খাসা একটা বিশ্রামের জায়গা পেয়ে নৌকোর উপরে দিব্যি চড়ে বসল। অমনি নৌকোটা একদিকে এমনি কাৎ হয়ে গেল যে আমি আমার সমস্ত দেহের ওজন দিয়ে উল্টো দিকে চেপে বসে, টাল সামলাতে বাধ্য হলাম। নইলে যেত নৌকো উল্টিয়ে! ব্যাঙটা আবার চড়ে বসেই থপ থপ করে অর্ধেক নৌকো পার হয়ে এল, তারপর আমার মাথার উপর দিয়ে লাফিয়ে একবার এদিক থেকে ওদিক যায়, আবার ওদিক থেকে এদিকে আসে আর ওর সারা গা থেকে জঘন্য একটা আঠামতো জিনিষ ঝরে আমার মুখ, কাপড়চোপড় সব ভিজিয়ে দিতে লাগল! ব্যাঙটার মুখচোখ এমনি বিরাট যে ওর চেয়ে বিকট চেহারার কোনো জানোয়ার কল্পনাও করতে পারি না। আমি গ্লুমডালক্লিচকে অনুরোধ করলাম আমাকে যেন একাই ওটার দফা শেষ করবার অনুমতি দেওয়া হয়। তারপরে একটা দাঁড় দিয়ে বেশ খানিকক্ষণ পেটাবার পর ব্যাঙটা নৌকো থেকে লাফিয়ে পড়তে বাধ্য হল।

তবে ওদেশে আমার সবচেয়ে বড় বিপদের কারণ হয়েছিল রান্নাঘরের একজন কর্মচারীর পোষা বাঁদর। গ্লুমডালক্লিচ সেদিন আমাকে তার ঘরে বন্ধ করে রেখে কি একটা কাজে বাইরে গিয়েছে। দিনটা বেশ গরম, ঘরের জানলাও খোলা আর আমার বড় বাক্সের দরজা জানলা দুই-ই খোলা। এই বাক্সটা বেশ বড় ও আরামের হওয়াতে, এখানেই আমি বেশির ভাগ সময় কাটাই। জানলার কাছে বসে চুপচাপ কি যেন চিন্তা করছি, এমন সময় শুনি অন্য জানলা দিয়ে কি একটা ধুপ করে ভিতরে পড়ে ঘরের এধার থেকে ওধারে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। তাতেই আমার যথেষ্ট ভয় হয়েছিল, তবু জায়গা থেকে না নড়েই, সাহস করে জানলা দিয়ে বাইরে তাকালাম। দেখি কি না একটা বাঁদর মহা ফূর্তি করে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে। শেষটা সে একেবারে আমার বাক্সের কাছে এসে হাজির। বাক্স দেখে সে যেমনি খুসি, তেমনি তার কৌতূহল; দরজা দিয়ে, প্রত্যেকটা জানলা দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল।

আমিও আমার ঘরের, অর্থাৎ বাক্সের, একেবারে অন্য কোণায় সরে গেলাম, তবু বাঁদরটা চারদিক দিয়ে এমনি উঁকি মারতে লাগল যে ভয়ে

আমার প্রাণ উড়ে গেল। অতি সহজেই খাটের তলায় লুকোতে পারতাম, সে উপস্থিত বুদ্ধিটুকুও হল না। বাঁদরটা উঁকি মেরে, দাঁত দেখিয়ে, কিচির মিচির করে খানিকটা সময় কাটাল, তারপর আমার উপর চোখ পড়ল। অমনি ইঁদুর ধরবার সময় বেড়াল যেরকম করে, ঠিক সেইভাবে দরজা দিয়ে একটা হাত ঢুকিয়ে দিল। ওর হাত এড়াবার জন্যে আমি এদিক ওদিক সরে যেতে লাগলাম, শেষ পর্যন্ত আমার কোটের সামনেটা ধরে এক টানে আমাকে বের করে আনল, কোটটা ওদেশের রেশম দিয়ে তৈরী হওয়াতে ভারি মজবুৎ ছিল।

বাঁদরটা আমাকে ডান হাতে তুলে নিল, ধাত্রীরা ছোট ছেলেকে দুধ খাওয়াবার সময় যেমন করে কোলে নেয় ঠিক সেই ভাবে। দেশে আমি বাঁদরকে এইভাবে বেড়াল কোলে নিতে দেখেছি। একটু ছটফট করবার চেষ্টা করেছি কি অমনি আমাকে সে এমনি চেপে ধরে যে চুপ করে আত্মসমর্পণ করাই বুদ্ধির কাজ বলে মনে হল। কিন্তু ও যে ভাবে আস্তে আস্তে আমার মুখে অন্য হাতটা বুলোতে লাগল, তাই দেখে মনে হল যে আমাকে নিশ্চয় ওরই কোনো স্বজাতির ছানা বলে ঠাউরেছে!

এমন সময় ওর এই আনন্দে ব্যাঘাত পড়ল, দরজায় একটা শব্দ হল, কেউ বোধ হয় দরজাটা খুলছে। তাই শুনে হঠাৎ এক লাফে যে জানলা দিয়ে ঢুকে-ছিল, সেই জানলা দিয়েই বেরিয়ে একেবারে ছাদ থেকে জল পড়বার নর্দমার মাঝখানে! সেখান থেকে এক হাতে আমাকে ধরে, বাকি তিন হাতপায়ে একেবারে পাশের বাড়ির ছাদে! ঠিক যে মুহূর্তে বাঁদরটা আমাকে নিয়ে বেরুচ্ছে, গ্লুমডালক্লিচের চিৎকার শুনতে পেলাম। সে বেচারা তো প্রায় পাগল হয়ে যাবার জোগাড়। অমনি রাজবাড়ির ঐ মহলটাতে হুলস্থুল কাণ্ড লেগে গেল। চাকররা মই আনবার জন্য ছুটল; রাজসভার শত শত লোক দেখল বাঁদরটা আমাকে নিয়ে একটা বাড়ির চালে বসেছে, এক হাত দিয়ে আমাকে ধরেছে যেন আমি একটা ছোট খোকা, আর অন্য হাত নিজের গালের থলি থেকে খাবার চিপে বের করে আমার মুখে ঠুসতে চেষ্টা করছে; আমি সে খাবার কিছুতেই খাচ্ছি না দেখে আবার আমার পিঠ চাপড়াচ্ছে! নিচে একেবারে ভীড় জমে গিয়েছিল, তারা ব্যাপার দেখে আর হাসি চাপতে পারে না! দোষও দেওয়া যায় না, কারণ আমার নিজের

কাছে ছাড়া বাকি সকলের কাছে যে দৃশ্যটা অতিশয় হাস্যকর সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই।

কেউ কেউ আবার ঢিল ছুঁড়তে লাগল, ভাবল তাতে যদি বাঁদরটা নেমে আসে। কিন্তু ঢিল ছোঁড়া বিশেষ করে বারণ করে দেওয়া হল, তা না হলে খুব সম্ভব আমারই মাথায় লেগে ঘিলু বেরিয়ে যেত!

এতক্ষণ পরে মই লাগানো হল, মই বেয়ে অনেকগুলো লোকও উঠল। বাঁদরটা তাই দেখে যখন বুঝল যে তাকে প্রায় ঘিরে ফেলা হয়েছে, তাছাড়া তিনপায়ে বেশি তাড়াতাড়ি পালানোও সম্ভব নয়, তখন সে চালের মাথার একটা টালির উপরে আমাকে ফেলে চম্পট দিল। আমি সেখানে মাটি থেকে পাঁচশো গজ উঁচুতে খানিকক্ষণ বসে রইলাম। প্রতি মুহূর্তেই ভাবি এই বুঝি বাতাসে নিচে উড়ে পড়ি, নয়তো মাথা ঘুরে ঢালু ছাদ বেয়ে একেবারে কিনারায় গড়াই! যাই হক, গ্লুমডালক্লিচের এক ছোকরা চাকর—লোকটা বড় ভালো—হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উপরে উঠে এসে, আমাকে পেণ্টেলুনের পকেটে পুরে, দিব্যি নিরাপদে নিচে নামিয়ে আনল।

এদিকে বাঁদরটা যে জঘন্য জিনিস আমার মুখে ঠুসেছিল, তাতে আমার দম বন্ধ হবার জোগাড়! কিন্তু আমার স্নেহময়ী ধাইমা একটা ছোট্ট ছুঁচ দিয়ে খুঁটে খুঁটে সবগুলো আমার মুখ থেকে বের করে ফেলল। তারপর খুব খানিকটা বমি হয়ে গিয়ে ভারি আরাম বোধ করলাম। তবু এতই দুর্বল হয়ে গিয়েছিলাম আর হতভাগা জানোয়ারটা আমার পাঁজরার উপরে এমনি চাপ দিয়েছিল যে সে জায়গাটা দারুণ ছড়ে গিয়ে পনেরো দিন আর বিছানা ছেড়ে উঠবার জো ছিল না।

রোজ রাজা, রাণী আর সভাসদরা সকলে আমার কুশল জিজ্ঞাসা করে পাঠাতেন; রাণীমা তো আমার অসুখের মধ্যে অনেকবার নিজে এসে দেখেও গিয়েছিলেন। বাঁদরটাকে মেরে ফেলা হল আর হুকুম হয়ে গেল যে রাজবাড়ির আশেপাশে ঐরকম জানোয়ার কেউ পুষতে পারবে না।

সেরে উঠে যখন এত অনুগ্রহের জন্যে রাজাকে ধন্যবাদ দিতে গেলাম, তিনি এই দুর্ঘটনা নিয়ে আমার সঙ্গে একটু মস্করাও করলেন।

আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন বাঁদরের কোলে শুয়ে আমার মনে কি চিন্তা ও কোন জল্পনা কল্পনার উদয় হয়েছিল, যে খাবার খেতে দিয়েছিল তাই বা

আমার কেমন লাগল, খাওয়াবার পদ্ধতিটিই বা কেমন আর ছাদের ওপরের খোলা বাতাসে খিদেটাই বা কতখানি বেড়েছিল! আরো জানতে চাইলেন নিজের দেশে এমন অবস্থায় পড়লে কি করতাম। বললাম তাঁকে আমাদের দেশে বাঁদরই নেই যদি না মজা দেখাবার জন্য অন্য দেশ থেকে কেউ নিয়ে না আসে, আর যেগুলো আনা হয়, সেও এতই ছোট যে যদি আমাকে আক্রমণ করবার মতো তাদের আস্পর্ধা হয়ও, তা হলেও একাই গোটা বারোকে ঘায়েল করতে পারব। তাছাড়া যে বিরাটাকার জন্তুটার খপ্পরে পড়েছিলাম, যদি তার কথাই ধরা যায়—একটা হাতির চেয়ে মাপে সে একটুও ছোট নয়—প্রথম যখন আমার ঘরের মধ্যে থাবা গুঁজেছিল সেইসময় যদি ভয়ের চোটে চিন্তা শক্তি লোপ না পেত, তাহলে তলোয়ারটাকে কাজে লাগাতে পারতাম; এমনি এক খোঁচা মারতাম যে যত না বেগে হাত ঢুকিয়েছিল, তার চেয়েও তাড়াতাড়ি হাত বের করে নিত! এই না বলে খুব হিংস্র মুখের ভাব করে তলোয়ারের হাতলে সজোরে হাত বসালাম!

এই সব কথা বলেছিলাম খুব জোর গলায়, কারো সাহস নিয়ে প্রশ্ন উঠলে মানুষে যেমন বলে থাকে! কিন্তু ফলে খুব একটা হাসির রোল ওঠা ছাড়া আর কিছু হল না! মহারাজের প্রতি ওদের যতই শ্রদ্ধাভক্তি থাকুক না কেন, ও হাসিটা কেউ আর চাপতে পারে নি। তাই দেখে আমার মনে হতে লাগল যে যাদের সঙ্গে আকারে বা অবস্থায় কোনো তুলনাই হতে পারে না, তাদের সামনে নিজের সম্মান রক্ষা করবার চেষ্টা করাটাই বৃথা! তা সত্ত্বেও দেশে ফিরে আমার এই ব্যবহারের অনুরূপ আচরণ কতবার কত লোককে করতে দেখলাম। কোথাও হয়তো নগন্য একটা তুচ্ছ অনুচর, যার বংশমর্যাদা, ব্যক্তিত্ব, বিদ্যা বা সাধারণ বুদ্ধির এতটুকু দাবী নেই, তবে আছে খুব হামবড়া ভাব, সেও দেশের সবচেয়ে গণ্যমান্যদের মাঝখানে আসন পেতে চায়!

রোজই আমি সভাসদদের একটা না একটা হাসির খোরাক জোগাচ্ছিলাম। গ্লুমডালক্লিচ এদিকে যদিও আমাকে একটু বেশি রকমই ভালোবাসত, ওদিকে আবার এত চালাক ছিল যে যখনই আমি এমন কোনো বোকামি করে বসতাম যা রাণীমা শুনলে মজা পাবেন মনে হত, অমনি গিয়ে তাঁকে বলে আসত! একবার ওর শরীর ভালো নেই, তাই ওর শিক্ষিকা ওকে ধরে নিয়ে গেছেন

সহরের বাইরে ঘণ্টাখানেকের পথ, অর্থাৎ মাইল ত্রিশ দূরে, হাওয়া খাওয়াবার জন্যে। মাঠের মধ্যে পায়ে চলা পথ, সেখানে তারা গাড়ি থেকে নামল। গ্লুমডালক্লিচ আমার বেড়াতে যাবার বাক্সটি নিচে নামিয়ে রাখল আর আমিও বেরিয়ে একটু হাঁটতে বেরুলাম। পথের মাঝখানে দেখি এক ঢিঁপি গোবর আর আমারও যেন কি হল, এক লাফে ঢিঁপিটা ডিঙিয়ে নিজের ক্ষমতা পরীক্ষা করতে গেলাম! খানিকটা দৌড়েও এসেছিলাম, কিন্তু লাফটা যথেষ্ট লম্বা দিই নি, ফলে দেখি আমি গোবরের গাদার মাঝখানে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেছি! অনেক কষ্টে গোবর ভেঙ্গে তো বেরিয়ে এলাম, চাকরদের একজন রুমাল দিয়ে যতটা সম্ভব আমাকে পরিষ্কার করেও দিল, তবু গোবর মেখে আমি একাকার আর গ্লুমডালক্লিচ ফিরে এসে আমাকে অমনি বাক্সে বন্দী করে রাখল যতক্ষণ না বাড়ি পৌছলাম। সেখানে আবার ব্যাপারটা রাণীমার কানে তোলা হল, চাকরেরা সভাসদদের মধ্যে রটিয়ে দিল, কয়েকদিন ধরে যত হাসিঠাট্টা সবই চলল আমাকে উদ্দেশ্য করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাজারাণীর মনোরঞ্জনার্থে লেখকের বিচিত্র উদ্ভাবন—বাজন-পটুতা প্রদর্শন—ইউরোপের অবস্থা সম্পর্কে বাজাব জিজ্ঞাসা ও লেখকের বর্ণনা—রাজার মন্তব্য।

প্রতি সপ্তাহে দু একবাব বাজাব সভায় আমি উপস্থিত থাকতাম। তাছাড়া কচুবাব নাপিত এসে তাব দাড়ি চাঁচছে এও দেখবাব সুযোগ হয়েছিল। প্রথম প্রথম তো দারুণ ভয় লাগত, কাবণ ক্ষুবটা ছিল একটা প্রমাণ মাপেব কাস্তেব দ্বিগুণ লম্বা।

ওদেশেব নিয়ম মতো বাজামহাশয়ও সপ্তাহে মাত্র দুবাব দাড়ি কামাতেন। একবাব আমি নাপিতকে ফুসলিয়ে খানিকটা দাড়ি কামানো সাবানেব ফেনা আদায় কবেছিলাম। তাব থেকে চল্লিশ পঞ্চাশটি খুব মজবুৎ দেখে দাড়িব কুচি বেছে নিয়েছিলাম। তাবপবে একটুকবো মিহি কাঠেব ফালিকে চিরুণীব পিঠেব মতো কবে কেটে, তাতে সমান দূব দূব কয়েকটা ছ্যাদা কবে নিলাম। এব জন্য গ্লামডালক্লিচেব কাছ থেকে তাব সব চেয়ে সরু ছুঁচ চেয়ে নিতে হয়েছিল। তাবপবে ঐ ছ্যাঁদাব মধ্যে দাড়িব কুচিগুলোকে কায়দা কবে এঁটে বসিয়ে দিলাম। দাড়িব আগাগুলোকে ছুবিব সাহায্যে চেঁছেছুলে সরু কবে দিলাম, ব্যাস, খাসা একটা চিরুণী হয়ে গেল। এ জিনিসটাব আমাব তখন দবকাবও ছিল, পুবনো চিরুণীটাব দাঁত ভেঙ্গে প্রায় অকেজো হয়ে পড়েছিল। ওদেশে এমন সূক্ষ্ম কাবিগবেব কথাও শুনি নি যে আমাব যোগ্য একটা চিরুণী তৈবী কবতে বাজী হবে।

এ কথা বলতে গিয়ে একটা আমোদেব কথা মনে পড়ে গেল, যা নিয়ে আমি অনেক অবসব সময় কাটিয়েছিলাম। বাণীমাব দাসীকে বলেছিলাম চুল আঁচড়া-বাব সময় বাণীমাব মাথা থেকে চুল খসে যায়, তাব কিছুটা আমাব জন্যে জমিয়ে বাখতে, সময় কালে বেশ এক গোছা চুল পেয়ে গেলাম। আমাব ছুতোব বন্ধুটিকে বাণীমার বলাই ছিল সে আমাব ছোটখাটো ফবমায়েসী কাজ কবে দেবে, এবার তার সঙ্গে পরামর্শ কবলাম। তাকে বললাম আমাব বাক্সেব মধ্যে

যেরকম চেয়ার আছে, ঐ রকম দুটো চেয়ারের কাঠামো বানিয়ে, তার বসবার আর পিঠ রাখবার জায়গার চার ধারে মিহি যন্ত্র দিয়ে এক সারি ছোট ছোট ছ্যাঁদা করে দিতে। তারপরে ঠিক যেমন করে ইংল্যাণ্ডে বেত দিয়ে চেয়ারের আসন আর পিঠ বোনে, সেই রকম করে সবচেয়ে মজবুৎ চুলগুলোকে বেছে নিয়ে বুনে ফেললাম। চেয়ার দুটো তৈরী হলে পর রাণীমাকে উপহার দিলাম। উনি ওগুলো সিন্দুকে রেখে দিলেন আর কেউ এলে বের করে দেখাতেন কি অদ্ভুত জিনিস। যে দেখত সেই অবাক হয়ে যেত।

রাণীমা চাইতেন আমি ঐ চেয়ারের একটাতে বসি। আমি কিন্তু তাতে একেবারে নারাজ। বলতাম তার চেয়ে হাজারবার আমি বরং মরতে প্রস্তুত আছি, তবু যে অমূল্য চুল একদিন রাণীমার মাথায় শোভা পেত, তার উপরে আমার শরীরের একটা নিকৃষ্ট জায়গাবিশেষ রাখতে পারব না! জিনিস তৈরীর কৌশলে বরাবরই আমার মাথা আছে, ঐ চুল দিয়ে একটা পাঁচ ফুট লম্বা টাকার থলিও করেছিলাম ; তার উপরে সোনালী অক্ষরে রাণীমার নাম লেখা ছিল। এ জিনিসটা রাণীমার অনুমতি নিয়ে, গ্লুমডালক্লিচকে দিয়েছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি থলিটা কাজের চেয়ে বেশি বাহারের জন্যেই ছিল, কারণ বড় বড় মুদ্রার ভার সইবার মতো মজবুৎই ছিল না। কাজেই গ্লুমডালক্লিচ ওর মধ্যে মেয়েরা যেমন ভালোবাসে সেইরকম কয়েকটা ছোট টুকিটাকি সখের জিনিস রাখত।

রাজাবাহাদুর খুব গানবাজনা ভালোবাসেন, প্রায়ই রাজসভায় গান বাজনার আসর ডাকেন, মাঝে মাঝে সেখানে আমাকেও নিয়ে যাওয়া হয়, গান শোনবার জন্য একটা টেবিলের উপরে আমার বাক্সটা রাখা হয়। কিন্তু এমনি সাংঘাতিক জোরে সব গানবাজনা হয় যে আমার পক্ষে সুরগুলো চেনাই মুস্কিল হয়ে পড়ে। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি আপনাদের কানের কাছে আমাদের দেশের রাজার সেনা-বিভাগের যাবতীয় ঢাক আর তূরীভেরী এক সঙ্গে প্রাণপণে বাজানো হলেও অত আওয়াজ হবে না! আমি গাইয়ে বাজিয়েদের কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে আমার বাক্সটিকে সরাতে বলতাম। তারপর বাক্সর দরজা-জানলা বন্ধ করে, জানলার পর্দাগুলো টেনে দিতাম। এত করবার পর গানবাজনাটা তত খারাপ লাগত না।

যৌবনে একটু-আধটু স্পিনেট বাজাতে শিখেছিলাম। (স্পিনেট হল

পিয়ানোর মতো তার লাগানো একরকম বাদ্যযন্ত্র।) গ্লুমডালক্লিচের ঘরে এই রকম একটা যন্ত্র ছিল, সপ্তাহে দুদিন করে একজন মাষ্টারমশাই এসে ওকে শিখিয়ে যেতেন। ওটাকে স্পিনেটই বললাম, কারণ দেখতেও ঐ রকম আর একই নিয়মে বাজাতেও হয়। আমার সখ হল ঐ স্পিনেটে একটা ইংরিজি স্বর বাজিয়ে রাজারাণীর চিত্তবিনোদন করব। কিন্তু কাজটা দেখলাম বড়ই কঠিন। তার কারণ স্পিনেটটি প্রায় ষাট ফুট লম্বা, তার চাবিগুলো এক ফুট করে চওড়া, দুহাত দুদিকে বাড়ালেও পাঁচটার বেশি চাবিতে হাত পৌঁছয় না আর সেগুলোকে টিপে নামাতে হলে তো মুঠি পাকিয়ে খুব জোরে বাড়ি না দিলে কোনো ফলই হয় না। তাতে কষ্ট হয় অনেক, অথচ কোনো লাভ হয় না। ভেবেচিন্তে একটা উপায় ঠাওরালাম। সাধারণ মুগুরের মাপে দুটো গোল লাঠি বানিয়ে নিলাম, লাঠি দুটোর এক মাথা অন্যটার চেয়ে মোটা। মোটা দিকটাকে এক টুকরো ইঁদুরের চামড়া দিয়ে মুড়ে নিলাম, যাতে চাবির উপরে বাড়ি মারলে আঁচড় না পড়ে, কিম্বা স্বরের ব্যাঘাত না ঘটে।

স্পিনেটের সামনে, চাবিগুলোর চেয়ে চার ফুট নিচে একটা বেঞ্চি পেতে তার উপরে আমাকে ছেড়ে দেওয়া হল। আমিও দুই হাতে লাঠি নিয়ে, প্রয়োজন মতো চাবিগুলোতে দুমদাম বাড়ি মারতে মারতে, বেঞ্চিটার এ মাথা থেকে ও মাথা প্রাণপণে পাশ বাগে ছুটে বেড়াতে লাগলাম! এই রকম কৌশল করে দিব্যি একটা নাচের স্বর বাজিয়ে রাজরাণীকে অশেষ আনন্দ দিলাম, কিন্তু এইরকম সাংঘাতিক পরিশ্রম আমি জীবনে কখনও করি নি। তবু তো মাত্র ষোলটা চাবির বেশি ব্যবহারই করতে পারি নি, অন্য শিল্পীদের মতো এক সঙ্গে খাদে আর চড়ায় যাওয়া দূরের কথা। এসব অসুবিধার জন্য গৎ বাজানোর অনেক ত্রুটি হয়েছিল।

আগেই বলেছি রাজামহাশয় ছিলেন বড়ই বিচক্ষণ, প্রায়ই তিনি আদেশ করতেন যেন আমার বাক্সটাকে তাঁর নিজের ঘরের টেবিলের উপরে রাখা হয়। তারপরে হুকুম করতেন বাক্সর ভিতর থেকে একটা চেয়ার বের করে ওঁর কাছ থেকে তিন গজ দূরে টেবিলের উপরে বসতে। এর ফলে আমি একেবারে তাঁর মুখের সামনে এসে পড়তাম। এভাবে তাঁর সঙ্গে কত গল্প হয়েছে।

একবার সাহস করে তাঁকে বলেছিলাম যে ইউরোপ ও পৃথিবীর অন্যান্য

দেশের প্রতি তিনি যে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন, সেটা ঠিক তাঁর মনের উন্নত উদার ভাবের অনুযায়ী নয়। দেহের বৃদ্ধির সঙ্গে বুদ্ধির প্রসার হয় না। বরং আমাদের দেশে দেখা গেছে যারা মাথায় যত লম্বা, তাদের বুদ্ধি তত কম! প্রাণী জগতেও দেখা যায় মৌমাছিদের আর পিঁপড়েদের পরিশ্রম, শিল্পকৌশল ও বিচক্ষণতার খ্যাতি সব চেয়ে বেশি। এবং আমাকে তিনি যত অকিঞ্চিৎকর মনে করুন না কেন, তাঁর জন্যে কোনো একটা বিশেষ কাজ করবার উদ্দেশ্যে আমি জীবন ধারণ করে থাকব, এই আমার বড় আশা।

মহারাজ মন দিয়ে আমার কথাগুলো শুনেছিলেন আর তখন থেকে আমার সম্বন্ধে তাঁর অনেক ভালো ধারণা হয়ে গিয়েছিল।

ইংল্যাণ্ডের শাসন প্রণালীর যতটা বিশদ বিবরণ আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব তিনি শুনতে চাইলেন। বললেন তার কারণ হল যে সাধারণতঃ যদিও সব রাজারাই নিজেদের দেশের আচার নিয়মগুলোকে ভালোবেসে থাকেন, এর আগে আমিও যে রকম আলোচনা করেছি তা শুনে তাঁর সেইরকমই মনে হয়েছে, তবুও অনুকরণযোগ্য কিছু যদি কোথাও থাকে, তিনি সে বিষয় জানতে পারলে খুসি হবেন। সহৃদয় পাঠক, মনে মনে কল্পনা করুন তখন আমার কি প্রবল ইচ্ছা হচ্ছিল সেকালের বিখ্যাত বাগ্মী সিসেরো কিম্বা ডিমস্থেনিসের ভাষা আমার রসনায় পেতে, তবেই আমি যথাযোগ্যভাবে আমার প্রাণপ্রিয় জন্মভূমির নানান প্রতিভা ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের গুণগান করতে পারতাম।

আমার আলোচনা শুরু করেছিলাম এই বলে যে আমাদের রাজ্য গঠিত হয়েছে দুটি দ্বীপকে নিয়ে ; একই সম্রাটের আধিপত্যে রয়েছে তিনটি বিশাল রাজ্যে, তাছাড়া আমেরিকাতে আমাদের বাগবাগিচা আছে। বিস্তারিতভাবে আমাদের উর্বরা ভূমি আর নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার কথা বললাম। তারপরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ইংল্যাণ্ডের সংসদের সংবিধান কেমন হয় বললাম ; তার একটা বিভাগকে বলে 'হাউস অফ পিয়ার্স', সেখানে বসেন দেশের সবচেয়ে অভিজাত বংশের সভ্যরা, একথাও বললাম। তাঁরা সকলেই প্রচুর পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, সে কথাও বললাম। যাতে ভবিষ্যতে তাঁরা আমাদের সম্রাট ও তাঁর সাম্রাজ্যের যোগ্য মন্ত্রণাদাতা হয়ে উঠতে পারেন, সে জন্য কত যত্নের সঙ্গে কলাবিদ্যায় ও যুদ্ধবিদ্যায় তাঁদের

পারদর্শী করে তোলা হয় তার বিবরণ দিলাম ; এঁরা বিধানমণ্ডলে যোগ দিতে পারেন, দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়ের সভ্য হতে পারেন, যার উপরে আর আপীল চলে না ; সাহস, সদাচার ও বিশ্বস্ততা সহকারে এঁরা সদাই তাঁদের সম্রাট ও স্বদেশকে রক্ষা করতে বীরের মতো প্রস্তুত থাকেন। এঁরা যেমন দেশের শিরোভূষণ, তেমনি দেশকে রক্ষা করবার সময় একটা প্রাচীরের মতো। এঁরা নিজেদের স্বনামধন্য পূর্বপুরুষদের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী ; ঐ পূর্বপুরুষরাও একদা তাঁদের গুণের পুরস্কারস্বরূপ সম্মানলাভ করেছিলেন এবং এই উত্তরাধিকারীরাও সে গুণাবলী থেকে এতটুকু ভ্রষ্ট হন নি।

তাছাড়া ঐ সভার আরও অনেক সভ্য আছেন যাঁদের উপাধি হল 'বিশপ', তাঁরা হলেন ধার্মিক পুরুষ, তাঁদের নির্দিষ্ট কাজই হল ধর্ম-রক্ষা করা ও প্রজাদের ধর্ম-শিক্ষা দেওয়া। আমাদের দেশের পুরোহিতবর্গের মধ্যে যাঁরা পবিত্র জীবন যাপন আর গভীর বিদ্যা অর্জন করে উপযুক্ত খ্যাতি পেয়েছেন, তাঁদের সাহায্য নিয়ে আমাদের সম্রাট সমস্ত দেশময় খুঁজে তবে এঁদের বের করেন। বাস্তবিকই ঐ পুরোহিতবর্গকে প্রজাকুলের 'আধ্যাত্মিক পিতা' আখ্যা দেওয়া যায়।

রাজাকে আরও বললাম সংসদের অন্য অংশটিকে বলে হাউস অফ কমন্স্ বা সাধারণ সভা। এখানকার সভ্যরা সকলেই বিশিষ্ট ভদ্রলোক, যাঁদের অসাধারণ ক্ষমতা ও দেশপ্রেমের জন্যে প্রজারা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে থেকে অবাধে নির্বাচন করে নিয়েছে, সমগ্র দেশের মুখপাত্র হবার জন্যে। সম্রাটের সঙ্গে এঁরাই দেশের আইন তৈরী করেন।

তারপরে তো আমাদের দেশের বিচারালয়গুলির কথায় নেমে এলাম। এখানকার অধিকর্তা হলেন অভিজ্ঞ পণ্ডিত ও আইন ব্যাখ্যাতা বিচারপতিরা ; অধিকার কিম্বা সম্পত্তি নিয়ে কোনো বিবাদ উঠলে তাঁরা মীমাংসা করে দেন, অন্যায়ের দণ্ড বিধান ও নির্দোষকে রক্ষা করাও তাঁদেরই কাজ। রাজকোষের বিচক্ষণ ব্যবস্থার কথা বললাম ; জলে স্থলে আমাদের সৈন্যবাহিনীর বীরত্বময় কীর্তির কথাও বললাম।

আমাদের দেশের প্রত্যেকটি ধর্মসম্প্রদায় আর রাজনৈতিক দলের আনুমানিক সংখ্যা ধরে, আমাদের জনসংখ্যার একটা হিসাব করে দিলাম।

আমাদের দেশের খেলাধূলো আর চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থাদি, এমন কোনো

তথ্য বাদ দিলাম না, যাতে আমার মাতৃভূমির গৌরব বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকতে পারে বলে মনে হল। পরিশেষে ইংল্যাণ্ডের গত একশো বছরের যাবতীয় ঐতিহাসিক ঘটনার একটা বিবৃতি দিয়ে দিলাম।

এত কথা বলতে রাজার কাছে পাঁচবার দরবার করতে হয়েছিল; প্রত্যেকবার বেশ কয়েক ঘণ্টা বসতে হয়েছিল। গভীর মনোযোগ দিয়ে তিনি সব কথা শুনেছিলেন, মাঝে মাঝে আমার বক্তব্য সম্পর্কে নোট টুকে নিয়েছিলেন, তাছাড়া আমাকে তাঁর কি কি জিজ্ঞাসা করবার আছে, তারো একটা স্মারক-লিপি তৈরী করেছিলেন।

এই সব দীর্ঘ আলোচনা যখন আমি শেষ করলাম, মহারাজের সঙ্গে ষষ্ঠ দরবারে তিনি তাঁর নিজের লেখা নোটগুলো দেখে প্রত্যেকটি বিষয়ে অনেক সন্দেহ, প্রশ্ন ও আপত্তি তুললেন। তিনি জানতে চাইলেন অভিজাত বংশের যুবকদের শরীর ও মন সুগঠিত করবার জন্য আমরা কি ব্যবস্থা করেছি এবং জীবনের প্রথম বয়সটা, যেটা হল শিক্ষাগ্রহণের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত, সেই সময়টা তারা সাধারণতঃ কি করে কাটায়; কোনো অভিজাত পরিবার নির্বংশ হয়ে গেলে, সংসদে তাদের শূন্য স্থান কিভাবে পূর্ণ করা হয়; নতুন 'লর্ড' উপাধি পেতে হলে কোন কোন গুণের প্রয়োজন হয়; এই ধরণের উন্নতির জন্যে কোনো রাজারাজড়ার খামখেয়াল, কিম্বা রাজসভার কোনো মহিলাকে বা কোনো মন্ত্রীকে অর্থ উপহার দান, কিম্বা জনসাধারণের কল্যাণ-বিরোধী কোনো দলে যোগদান করার ইচ্ছা কখনো সক্রিয় হয় কি না; লর্ড উপাধি-ধারীদের দেশের আইন বিধান সম্পর্কে কতটা জ্ঞান থাকে এবং সে জ্ঞানটি তাঁরা পান কোথায় যে অন্য প্রজাদের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ উঠলে তাঁরাই তার চরম মীমাংসা করতে পারেন; তাঁরা সর্বদাই লোভ, পক্ষপাতিত্ব আর অভাব থেকে এতটা মুক্ত কি না, যে ঘুষ কিম্বা অন্য কোনো আপত্তিকর প্রস্তাব তাঁদের কাছে প্রশ্রয় পায় না। আর যে সব পূতচরিত্র পুরোহিতপ্রবরদের কথা বলেছিলাম, তাঁদের কি ধর্মতত্ত্বে গভীর জ্ঞান আর ব্যক্তিগত জীবনের পবিত্রতার জন্যই ওরকম উচ্চপদ দেওয়া হয়, সাধারণ পুরোহিতের পদে থাকাকালীন তাঁরা কি কখনো অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করেন না, কিম্বা এমন কোনো উচ্চপদস্থ পৃষ্ঠপোষকের পা-চেটো দাস হয়ে ওঠেন না, সংসদের সভ্য হয়েও যাঁদের মত অনুসারে তাঁদের চলতে হয়।

তারপরে মহারাজ জানতে চাইলেন 'হাউস অফ কমন্স্' যাকে বললাম, সেখানকার সভ্য নির্বাচনের সময়ই বা কি রকম ব্যবস্থা করা হয়; একজন অপরিচিত লোকের যদি টাকার জোর থাকে, সে কি প্রজাদের এভাবে প্রভাবিত করতে পারে না যে নিজেদের জমিদারকে কিম্বা ঐ অঞ্চলের কোনো অতিশয় গণ্যমান্য ব্যক্তিকে ভোট না দিয়ে তাকেই সবাই ভোট দিয়ে বসবে।

মহারাজ আরও জিজ্ঞেস করলেন যে এটাই বা কেমন করে হয় যে আমি নিজেই যখন বলছি সংসদের সভ্যদের কোনো বেতন বা বৃত্তি দেওয়া হয় না, তবুও এত প্রাণপণ চেষ্টা ও অসম্ভব খরচ করে, এমন কি নিজের পরিবারবর্গকে পথে বসিয়েও লোকে সংসদের সভ্য হবার জন্যে একেবারে হন্যে হয়ে ওঠে। আমি যদি বলি যে শুধু কর্তব্যবোধ আর জনকল্যাণের ইচ্ছাতেই এমন হয়, তাহলে কিন্তু মহারাজের মনে যথেষ্ট সন্দেহ হবে যে সে মনোভাবগুলো আদৌ যথার্থ এবং প্রকৃত কি না!

মহারাজ আরও জিজ্ঞাসা করলেন এইসব পরম উৎসাহী ভদ্রমহোদয়রা কি কখনো কোনো দুর্বল পাপিষ্ঠ রাজা ও দুর্নীতিপূর্ণ মন্ত্রিবর্গের সহযোগিতায় তাদের দুরভিসন্ধি সিদ্ধির জন্যে জনকল্যাণকে বরবাদ করে দিয়ে, এত পরিশ্রম ও ব্যয়ের বিনিময়ে নিজেদেরও খানিকটা সুবিধা করে নেন না।

মহারাজের প্রশ্নের সংখ্যা বেড়েই চলল; এই সুযোগে আলোচ্য বিষয়ের প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমাকে একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে দেখলেন। হাজার রকমের জিজ্ঞাসা, হাজার রকম আপত্তি তাঁর। সে সব কথা আর না তোলাই সমীচীন ও নিরাপদ বলে মনে করি।

তারপর আমাদের বিচারালয় সম্পর্কে যা বলেছিলাম, তার কয়েকটা প্রসঙ্গ সম্পর্কে রাজামহাশয়ের আরো জানবার ছিল। এ কাজটি ভালো-ভাবেই করতে পারলাম কারণ ইতঃপূর্বে সুদীর্ঘ এক চান্সারি মামলার অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমার, শেষ পর্যন্ত সেটাতে অবিশ্যি জিতেছিলাম, খরচও সব পেয়েছিলাম।

রাজা জিজ্ঞাসা করেছিলেন একটা মামলায় ন্যায় অন্যায় সাব্যস্ত করার জন্য কতখানি সময় দেওয়া হয়, কতই বা খরচ লাগে। যে সব পক্ষের কথা প্রকাশ্য ভাবেই অন্যায়, ক্ষতিকর, কিম্বা অন্যকে উৎপীড়ন করা যার উদ্দেশ্য সব জেনে শুনেও উকিল ব্যারিষ্টারদের কি সে পক্ষ সমর্থন করার অধিকার থাকে? ন্যায়

বিধানের সময়ও কি দলীয় নীতি কাজ করে, তা সে ধর্মসম্প্রদায় বা রাজনৈতিক দলই হক ? ঐ সব উকিলদের কি নিরপেক্ষ বিচার সম্পর্কে কোনো শিক্ষা দেওয়া হয় ? নাকি শুধু প্রাদেশিক, জাতীয় ও আঞ্চলিক নিয়মকানুন শেখে ? বিচারপতি ও উকিলরা যে সব আইনের ব্যাখ্যা ও টিকাটিপ্পনি দেবার অধিকার পান, তাঁদের নিজেদের কি ঐ আইন রচনায় কোনো অংশ থাকে ? তাঁরা কি কখনও, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, একই মামলার দুই বিবাদীর পক্ষ অবলম্বন করেন না ? এবং নানান নজীর দেখিয়ে কি তাঁরা কখনও দুই বিপরীত মতই সত্য বলে প্রমাণ করে দেন ? তাঁদের গোষ্ঠিটি ধনী না দরিদ্র ? তাঁদের মতামত পেশ করার জন্যে কি তাঁরা পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন ? আর সব চেয়ে বড় কথা এঁরা কি কখনও সাধারণ সভার সভ্য হতে পারেন ?

তারপরে মহারাজ আমাদের কোষাগারের ব্যবস্থা নিয়ে পড়লেন। বললেন তাঁর বিশ্বাস আমার স্মৃতিশক্তি লোপ পাচ্ছে, যেহেতু আমার হিসাব অনুসারে আমাদের দেশের মোট রাজকর দাঁড়ায় পঞ্চাশ থেকে ষাট লক্ষ টাকা, কিন্তু তার পরেই যখন কোন হারে কত টাকা খরচ হয় তার তালিকা দিলাম, তিনি লক্ষ্য করলেন সেগুলি জুড়লে ওর দ্বিগুণেরও বেশি হয়। এই বিষয় তিনি খুঁটিয়ে সব তথ্যগুলো লিখে রেখেছিলেন, কারণ তাঁর আশা ছিল আমাদের দেশের আচারনিয়ম জানতে পারলে তাঁর হয়তো কাজে লাগতে পারে, একথা তো তিনি আমাকে বলেইছিলেন। কিন্তু আমি তাঁকে যা যা বললাম সব যদি সত্যি হয়, তা হলে তিনি কিছুতেই ভেবে পেলেন না একটা সাধারণ মানুষের ব্যাপারে যেমন তেমনি গোটা দেশটার ব্যাপারেও কি করে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী হয়। তিনি জানতে চাইলেন—কারা আমাদের উত্তমর্ণ, তাদের ধার শোধ করবার টাকাই বা আমরা কোথায় পাই ?

আমাদের এত দীর্ঘকালব্যাপী ব্যয়সাপেক্ষ যুদ্ধের কথা শুনে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। বললেন হয় আমরা অতিশয় ঝগড়াটে জাতি, নয়তো অত্যন্ত মন্দ প্রতিবেশীদের মাঝখানে আমরা বাস করি আর নিশ্চয়ই আমাদের সেনাধ্যক্ষদের আমাদের রাজার চেয়ে পয়সা বেশি !

তিনি আরও জিজ্ঞাসা করলেন যে এক বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে, কিম্বা কোনো চুক্তির জন্যে, কিম্বা নৌবহরের সাহায্যে দেশের তীরভূমি রক্ষা করা ছাড়া আর কি উদ্দেশ্যে আমাদের নিজেদের দ্বীপ ছেড়ে বাইরে যাবার দরকার

থাকতে পারে? সব চেয়ে আশ্চর্য হলেন তিনি যখন শুনলেন যে স্বাধীন জাত আমরা, অথচ শান্তির সময়ও আমাদের একটা মাইনে করা স্থায়ী সৈন্য থাকে। তিনি বললেন, আমরা যদি নিজেদের নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা নিজেদের সম্মতিক্রমে শাসিত হয়ে থাকি, তবে আমাদের এত ভয়ই বা কিসের, আর যুদ্ধই বা করব কার সঙ্গে, এটা তিনি ভেবেই পাচ্ছেন না! একটা সাধারণ লোকের বাড়ি যদি রক্ষা করতে হয়, কে ভালো করে করবে, সে নিজে, তার ছেলেপিলে ও পরিবারের আর সকলে, না পথ থেকে কোন রকমে ধরে আনা সামান্য মাইনে দিয়ে রাখা কয়েকটা লক্ষীছাড়া লোকে? আরে, তারা তো মুনিব আর তার পরিবারের গলা কেটেই মাইনের একশো গুণ রোজগার করতে পারবে!

জনসংখ্যার হিসাব করতে হলে আমি করতাম কি, আমাদের দেশের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় ও রাজনৈতিক দলের সংখ্যা নিতাম। রাজার মতে ওটা ভারি অদ্ভুত নিয়ম, তাই নিয়ে খুব হাসলেনও তিনি। তিনি বললেন—যাদের মতামতগুলো জনসাধারণের অনুমোদিত নয়, তাদের মত বদলাতে বাধ্য করার, কিম্বা মতামত গোপন করতে বাধ্য না করার, কি কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে? তাছাড়া যে কোনো সরকারের পক্ষে প্রথম ব্যবস্থা যেমন অত্যাচরের মতো, তেমনি দ্বিতীয়টা না করা দুর্বলতার পরিচায়ক। নিজের ঘরে যে কেউ বিষ রাখতে পারে, তাই বলে সেগুলোকে বলকারক ওষুধ বলে বিক্রী করতে তো আর দেওয়া যায় না।

মহারাজ আরেকটা মন্তব্য করলেন। আমাদের অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত বংশের লোকদের চিত্তবিনোদনের কথা বলতে গিয়ে, আমি জুয়াখেলার উল্লেখ করেছিলাম। তিনি জানতে চাইলেন কোন বয়সে এই খেলা শুরু করা হয় আর কোন বয়সেই বা ছেড়ে দেওয়া হয়; এতে তাদের কতটা সময় চলে যায় আর এই খেলায় অতিরিক্ত বাজি ধরার জন্য কারো কখনও আর্থিক সর্বনাশ হয় কি না। তাছাড়া, হীন মন্দ লোকও কি এই খেলায় খুব দক্ষ হয়ে প্রভূত অর্থলাভ করতে পারে না? এমন কি তার জোরে কি তারা সম্ভ্রান্ত-বংশীয়দের পর্যন্ত নিজেদের তাঁবেতে রেখে, তাদের কুসঙ্গে অভ্যস্ত করিয়ে, নিজেদের ক্ষতিপূরণের আশায় ঐ রকম কৌশল শিখে অপরের উপরে সেটা খাটাতে বাধ্য করতে পারে না?

গত এক শতক ধরে ইংল্যাণ্ডের নানান ব্যাপারের ঐতিহাসিক বিবৃতি

শুনে রাজা একেবারে থ' হয়ে গেলেন ; বললেন এ তো শুধু রাশিকৃত ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ, খুন, হত্যাকাণ্ড, রাষ্ট্রবিপ্লব আর নির্বাসন ছাড়া আর কিছু নয়। লোভ, দলাদলি, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা, নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ, উন্মত্ততা, ঘৃণা, দ্বেষ, লালসা, বিদ্বেষ আর অতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফল এর চেয়ে খারাপ হতে পারত না।

আরেকবার দরবারে গিয়েছি, মহারাজ যত্নের সঙ্গে তাঁকে এতদিন যা যা বলেছি তার সবটার সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করলেন ; তাঁর নিজের প্রশ্নের সঙ্গে আমার উত্তরগুলো মিলিয়ে দেখলেন ; তারপরে আমাকে তুলে নিয়ে, সর্বাঙ্গে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে, যে কথাগুলি বললেন এবং যে ভাবে বললেন, সে আমি কখনো ভুলতে পারি না।—হে আমার খুদে বন্ধু গ্রিলড্রিগ্, তোমার মাতৃভূমির চমৎকার গুণগান করলে ! স্পষ্ট করে প্রমাণ করে দিলে যে মূর্খতা, আলস্য আর দুর্নীতিই হল আইন প্রবর্তকদের উপযুক্ত গুণ! আইন বিকৃত করে, লোকের চোখে ধুলো দিয়ে আইনের উদ্দেশ্য যাঁরা নস্যাৎ করে দিতে পারেন, তাঁরাই হলেন আইনের উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যাতা, টিপ্পনিকার ও প্রযোজক। তোমার কথা থেকে এমন একটা বিধানের আঁচ পাচ্ছি, যেটা শুরুতে হয়তো খানিকটা চলনসই ছিল, কিন্তু তার অর্ধেক এখন একেবারে মুছে গেছে আর বাকি যা আছে তাও অস্পষ্ট আর দুর্নীতির কালিমালিপ্ত। যা যা বললে তার থেকে একবারও মনে হল না যে তোমাদের দেশে কোনো পদলাভের জন্য যোগ্যতার দরকার হয় ; কিম্বা সদ্‌গুণের জন্যে কেউ কখনো সম্মানিত হয় ; কিম্বা সাধুতা আর বৈদগ্ধ্যের জন্যে পুরোহিতদের, সদাচরণ ও বীরত্বের জন্যে সৈনিকদের, ধর্মপরায়ণতার জন্যে বিচারপতিদের, দেশপ্রেমের জন্যে রাষ্ট্রনেতাদের আর বিচক্ষণতার জন্যে মন্ত্রীদের উন্নতি হয়।

রাজা আরো বললেন—তোমার নিজের কথাই যদি ধরা যায়, যেহেতু তুমি জীবনের বেশির ভাগটাই দেশবিদেশে ভ্রমণ করে কাটিয়েছ, আমার মনের মধ্যে অনেকখানি আশার সঞ্চার হচ্ছে যে তুমি হয়তো তোমাদের দুর্নীতিগুলোর অনেকখানি এড়িয়ে যেতে পেরেছ। কিন্তু তুমি নিজে যে বিবৃতি দিলে আর অনেক কষ্টে তোমাকে প্রশ্ন করে, তার উত্তর টেনে বের করে যা বুঝলাম, তাতে আমার এইরকম ধারণা হয়েছে যে এই পৃথিবীর মাটিতে যত জঘন্য কীটানুকীট প্রকৃতদেবীর দয়ায় বুকে হেঁটে বেড়ায়, তার মধ্যে তোমাদের দেশের অধিকাংশ অধিবাসীই হল সবচেয়ে নিকৃষ্ট !

সপ্তম অধ্যায়

লেখকের দেশপ্রেম—লেখক কর্তৃক রাজার পক্ষে লাভজনক প্রস্তাব—প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওন—রাজনীতি সম্পর্কে রাজার মূর্খতা—ওদেশের বিদ্যাশিক্ষার অসম্পূর্ণতা ও সঙ্কীর্ণতা—ওদেশের আইন, সামরিক ব্যাপার ও রাষ্ট্রীয় দলাদলি।

যদি সত্যের প্রতি এত বেশি অনুরক্ত না হতাম তাহলে আমার কাহিনীর এ অংশটা গোপন করে যেতাম, কোনো বারণ শুনতাম না। আমার মনের ক্ষোভ প্রকাশ করে কোনো লাভ ছিল না, ফলে শুধুই বিদ্রূপ শুনতে হত; তার উপরে আমার প্রাণপ্রিয় মহীয়সী জন্মভূমির অন্যায় নিন্দা শুনেও ধৈর্য ধরে চুপ করে থাকতে হত। এরকম একটা অবস্থা যে দাঁড়াল, সেজন্য আমার পাঠকবর্গরা যতখানি দুঃখিত হতেন, আমিও ঠিক ততটাই হয়েছিলাম।

এদিকে রাজার সব বিষয়ে খুঁটিনাটি জানবার এত ইচ্ছা, এত কৌতূহল যে কৃতজ্ঞতা ও সৌজন্যের খাতিরে আমার পক্ষে যতটা সম্ভব সদুত্তর দিতেই হত। তবে নিজের পক্ষ থেকে এইটুকু বলবার আমার অধিকার আছে যে কৌশল করে অনেক প্রশ্নের যথার্থ উত্তর এড়িয়ে যেতাম আর নিছক সত্যটাকে অনেকখানি সাজিয়ে গুছিয়েও বলতাম, কারণ ডায়োনিসিউস হ্যালিকার্নাসেন্সিস ঐতিহাসিকদের উদ্দেশে স্ব-দেশের সম্পর্কে যে প্রশংসনীয় পক্ষপাতিত্ব সম্বন্ধে যথার্থ উপদেশ দিয়েছিলেন, চিরদিনই আমি সেই নীতিই অনুসরণ করে থাকি। আমার রাষ্ট্রজননীর দুর্বলতা ও বিকৃতি গোপন করতে আর তাঁর রূপগুণের কথা যাতে সবচেয়ে উত্তমভাবে প্রকাশ পায়, সেই চেষ্টা করতেই আমার সর্বদা ইচ্ছা করে।

রাজার সঙ্গে এতবার যে কথাবার্তা হল, তার মধ্যেও বাস্তবিকই আমার এই চেষ্টাই ছিল; দুঃখের বিষয় আমি সফলকাম হতে পারি নি। তবে যে রাজা বাকি পৃথিবীটা থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবন কাটিয়েছেন, তাঁর পক্ষে অন্যান্য জাতির রীতিনীতি সম্বন্ধে কিছুই জানা সম্ভব নয়, কাজেই তাঁকে অনেকখানি ক্ষমা করতে হয়। এই জ্ঞানের অভাবের জন্যই চিরকাল তাঁর মনে অনেকগুলো ভুল ধারণা থেকে যাবেই, চিন্তার খানিকটা সঙ্কীর্ণতাও

থাকবে ; এ ধরণের দুর্বলতা থেকে আমরা এবং ইউরোপের অপেক্ষাকৃত সভ্য দেশগুলো একেবারে মুক্ত। তা ছাড়া ঐ রকম একজন সুদূরবাসী রাজার ভালোমন্দের মানদণ্ড দিয়ে সমস্ত মানবজাতিকে বিচার করতে হলে তো অবস্থাটা বড় শক্ত হয়ে দাঁড়াবে।

এখুনি যে কথা বললাম, সেটা সমর্থন করার জন্যে এবং সীমিত শিক্ষার কুফল প্রমাণ করবার জন্যেও বটে, এইখানে একটি বিবরণী দিচ্ছি যা বিশ্বাস করা কঠিন। মহারাজের আরও বেশি অনুগ্রহের পাত্র হবার আশায়, বারুদ তৈরী করবার তিন-চারশো বছরের পুরোনো একটা পদ্ধতির কথা বলেছিলাম। এই বারুদের মধ্যে এতটুকু আগুনের ফুলকি পড়েছে কি না পড়েছে, অমনি মুহূর্তের মধ্যে সমস্তটা একেবারে জলে ওঠে, যেন বিশাল একটা আগুনের পাহাড়, তারপর সমস্ত বারুদটা একসঙ্গে আকাশে ফেটে পড়ে, তার শব্দ আর বিস্ফোরণ বাজ পড়ার চেয়েও ভয়ঙ্কর। উপযুক্ত পরিমাণে এই বারুদ নিয়ে যদি ঠিক মাপের একটা পিতল কিম্বা লোহার ফাঁপা চোঙায় ভরে দেওয়া যায়, তাহলে তার সাহায্যে একটা লোহার কিম্বা সীসার গোলাকে এত জোরে আর বেগের সঙ্গে ছুঁড়ে মারা যায় যে তার সামনে কোনো কিছু দাঁড়াতে পারবে না।

এই ধরণের বৃহত্তম গোলাগুলো গোটা গোটা সৈন্যবিভাগ নির্মূল করে দিয়েও থামে না, সবচেয়ে মজবুত দেয়ালও ভেঙ্গে ফেলে, হাজার হাজার লোক সুদ্ধ জাহাজ একবারে সমুদ্রের নিচে তলিয়ে দেয়, একসঙ্গে চেন দিয়ে বাঁধা থাকলে মাস্তুল ভেঙ্গে দড়িদড়া ছিঁড়ে, মাঝখান থেকে শতাধিককে দু টুকরো করে কেটে সব ছারখার করে।

রাজাকে বললাম যে আমরা যখন কোনো নগর অবরোধ করি, তখন এই রকম খানিকটা বারুদ ফাঁপা লোহার গোলার মধ্যে পুরে, যন্ত্রের সাহায্যে নগরের উপরে ছুঁড়ে মারি। অমনি গোলাটা পড়ে সান বাঁধানো পথঘাট উপড়ে, বাড়িঘর ধূলিসাৎ করে, ফেটে, চারদিকে ধারালো লোহার টুকরো ছিটিয়ে, আশেপাশে যারা থাকে তাদের একবারে মুণ্ডু উড়িয়ে দেয়!

এইরকম গোলা তৈরী করতে যে উপকরণ লাগে, সে সমস্তই আমার জানা আছে, দামও তার বেশি নয়, সহজেই পাওয়াও যায়, কি ভাবে মশলাগুলো মেশাতে হয় তাও আমি জানি; মহারাজের রাজ্যে সব জিনিসের যেরকম

আয়তন, সেই মাপে চোঙা তৈরী করতে তাঁর কারিগরদের দেখিয়েও দিতে পারব। সবচেয়ে বড় চোঙাটাকে দুশো ফুটের বেশি লম্বা করবার দরকার নেই; এই রকম বিশ ত্রিশটা চোঙায় যথেষ্ট পরিমাণে গোলাবারুদ ভরে মহারাজের রাজ্যের সবচেয়ে মজবুৎ সহরের দেয়ালগুলোকেও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ভেঙে চুরমার করে দেওয়া যায়। এমন কি কখনও যদি কোনো নগর রাজার চরম আধিপত্য অমান্য করবার স্পর্ধা রাখে, তাকে একেবারে ধূলিসাৎ করে দেওয়া যাবে। মহারাজের কাছ থেকে অনেক দয়াদাক্ষিণ্য ও আশ্রয় লাভ করেছি, তার সামান্য স্বীকৃতি রূপেই এই প্রস্তাব করেছিলাম।

ঐ সব সাংঘাতিক যন্ত্রের বর্ণনা ও আমার প্রস্তাব শুনে রাজা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি এই ভেবে অবাক হয়ে গেলেন যে আমার মতো একটা অক্ষম হীন কীট কি করে এমন সব অমানুষিক পরিকল্পনা মনের মধ্যে পোষণ করতে পারে ও এমন অভ্যস্ত ভাবে সে কথা বলতে পারে, যেন আমার বর্ণনার ঐ মারণাস্ত্রের স্বাভাবিক পরিণামে যে সব রক্তপ্লাবন ও সর্বনাশের দৃশ্য দেখা যাবে, তাতে আমার বিন্দুমাত্র এসে যায় না। রাজা বললেন ওসব অস্ত্র উদ্ভাবন করেছিল নিশ্চয়ই সমগ্র মানবজাতির শত্রু কোনো দুষ্ট প্রতিভা!

তিনি নিজে শিল্পরাজ্যের কিম্বা প্রাকৃতিক জগতের কোনো নতুন আবিষ্কারে যত আনন্দলাভ করে থাকেন, অল্প জিনিসেই তেমন করেন, তবুও এমন সাংঘাতিক রহস্য শেখার চেয়ে, তিনি বরং তাঁর অর্ধেক রাজত্ব দিয়ে দিতে প্রস্তুত আছেন। তারপরে আমাকে আদেশ করলেন, যদি আমার প্রাণের মায়া থাকে, তবে যেন একথা আর কখনও উত্থাপন না করি।

সঙ্কীর্ণ নীতিবোধ আর অদূরদর্শিতার কি অদ্ভুত প্রতিফল! এমন একজন রাজা, শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসা অর্জন করতে হলে যে সব গুণের দরকার, তার প্রত্যেকটি যাঁর আছে, প্রচুর প্রতিভা, অশেষ বুদ্ধি ও গভীর বিদ্যাও রয়েছে, রাজ্য চালাতে হলে যে সব ক্ষমতার প্রয়োজন সে সবও আছে তাঁর, প্রজারা যাঁকে বলতে গেলে পুজা করে, তাঁর এই সূক্ষ্ম ও অযথা নীতিবোধ ইউরোপে কেউ কল্পনাও করতে পারে না। হাতের মুঠোয় তিনি এমন সুযোগ পেলেন, যার ফলে প্রজাদের ধন প্রাণ ও সব অধিকারের একছত্র অধিপতি হতে পারতেন, অথচ সে সুযোগ তিনি অনায়াসে ছেড়ে দিলেন!

অমন ভালো রাজার নানান গুণাবলীকে একটুও হেয় প্রতিপন্ন করবার

জন্যে এ কথা বলছি না; অবিশ্যি বেশ বুঝতে পারছি যে এইসব কারণেই ইংরেজ পাঠকদের কাছে তিনি অনেকখানি মর্যাদা হারাচ্ছেন; তবে আমি মনে করি ওদেশের লোকদের এ ধরণের দুর্বলতার কারণ হল অজ্ঞতা, ইউরোপের তীক্ষ্ণতর ধীমানদের মতো ওরা তো এখনো রাজনীতিকে একটা বিজ্ঞানে দাঁড় করায় নি।

আমার বেশ মনে আছে রাজার সঙ্গে আলোচনার মাঝখানে আমি একবার কথায় কথায় বলেছিলাম যে রাজ্যশাসনের পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের দেশে অনেক হাজার বই লেখা হয়েছে। এ কথার প্রতিক্রিয়ায় আমি যা চেয়েছিলাম ঠিক তার বিপরীতটি হল, আমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি সম্বন্ধে রাজার খুব খারাপ ধারণা হয়ে গেল। তিনি প্রকাশ করলেন যে রাজা কিম্বা মন্ত্রীদের মধ্যে গোপনীয়তা, অতিরিক্ত সূক্ষ্ম বিচার কিম্বা ষড়যন্ত্রের পরিচয় পেলে তাঁর মনে বিদ্বেষ ও ঘৃণার উদ্রেক হয়। যেখানে কোনো শত্রু কিম্বা প্রতিদ্বন্দ্বী জাতির কথা উঠছে না, সেখানে রাষ্ট্রনৈতিক গোপনীয়তা বলতে আমি কি বোঝাতে চাই সেটা আদৌ তাঁর বোধগম্য নয়। রাজ্যপরিচালনাকে তিনি বড় সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে বাঁধতে চাইতেন, অর্থাৎ সাধারণ বুদ্ধি, যুক্তি, ন্যায়বোধ, ক্ষমা, অপরাধ সংক্রান্ত কিম্বা দেওয়ানী মামলার দ্রুত মীমাংসা ইত্যাদির মধ্যে। এ ছাড়া আরো কতকগুলো এতই প্রত্যক্ষ বিষয়ও ছিল যে সে সব উল্লেখের যোগ্যই নয়।

তিনি আরও বলতেন যে কেউ যদি একটুখানি জমিতে শস্যের দুটি শীষ, ঘাসের দুটি পাতা ফলাতে পারে, যেখানে আগে একটিমাত্র শীষ কিম্বা একটিমাত্র পাতা গজাত, তাহলে সমস্ত রাজনৈতিক গোষ্ঠী মিলিয়ে দেশের যত কাজ করে তার চেয়ে ঢের বেশি কাজের কাজ হয় এবং তার মর্যাদাও দেওয়া উচিত অনেক বেশি।

এ দেশের লোকদের জ্ঞানবিদ্যা বড় কম; শুধু নীতিশিক্ষা, ইতিহাস, কাব্য আর গণিত; তবে এ বিষয়গুলোতে ওরা যে পারদর্শী সেটা মানতে হবে। কিন্তু শেষেরটার চর্চা হয় শুধু জীবনযাত্রায় কার্যকরীভাবে প্রয়োগের জন্য, কৃষি বিদ্যা কিম্বা যন্ত্রশিল্পের উন্নতির জন্য; কাজেই আমাদের দেশে ওরকম বিদ্যা খুব কমই সম্মান পেত। আর ধারণা, সত্তা, চিন্তন, তুরীয়, এ সবের কথা যদি বলা যায়, তো ওদের মাথায় তার এক কণাও ঢোকাতে পারি নি।

ওদের বর্ণমালায় যতগুলি অক্ষর, কোনো আইনের সূত্রে তার বেশি শব্দ ব্যবহারের নিয়ম নেই; এদিকে বর্ণমালায় মাত্র বাইশটি অক্ষর! কিন্তু বাস্তবিকই ওদের খুব কম আইনই অতখানি লম্বা! লেখাও সহজ সরল ভাষায়; ওদের বুদ্ধিও এত খেলে না যে তার একটার বেশি মানে করবে। তাছাড়া আইনের উপরে মন্তব্য লেখা হল দণ্ডার্হ বেআইনী কাজ। আর দেওয়ানী মামলাই হক, কিম্বা কোনো অপরাধসংক্রান্ত মামলাই হক, নজীর ওদের এত অল্প আছে যে তাই নিয়ে অসাধারণ কৌশলের বড়াই করবার কোনো সুযোগ ওঠে না।

ছাপার কৌশল আর চৈনিক প্রণালী অজানা কাল থেকে এদের রপ্ত, অথচ গ্রন্থাগারগুলো খুব বড় নয়। এমন কি স্বয়ং রাজার যে গ্রন্থাগার, শোনা যায় সেটাই সব চাইতে বৃহৎ, সেখানেও এক হাজারের বেশি বই নেই। বারো শো ফুট লম্বা একটা গ্যালারিতে বইগুলো সাজানো থাকে, সেখান থেকে খুসি-মতো বই নিয়ে পড়বার আমাকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল।

রাণীমার ছুতোরমিস্ত্রী গ্লুমডালক্লিচের একটা ঘরে পঁচিশ ফুট উঁচু একটা কাঠের কল তৈরী করে দিয়েছিল, অনেকটা একটা দাঁড় করানো মইএর মতো। তার এক একটা ধাপ ছিল পঞ্চাশ ফুট লম্বা। কলটাকে একটা সচল সিঁড়িও বলা চলে। সব চেয়ে নিচু ধাপটা ছিল দেয়াল থেকে দশ ফুট দূরে। যে বইটি আমার পড়ার ইচ্ছা, প্রথমে সেটিকে দেয়াল ঠেসে খাড়া করা হত। আমি করতাম কি মইএর সব চেয়ে উঁচু ধাপে চড়ে, বইএর দিকে মুখ ফিরিয়ে, প্রথম লাইন থেকে পড়তে শুরু করতাম। লাইনগুলো কতটা লম্বা সেই বুঝে আট দশ পা হাঁটতে হত, বাঁ থেকে ডাইনে, আর ডানদিকে থেকে বাঁয়ে এই-ভাবে পড়তে পড়তে যখন চোখ আর নিচে পৌঁছয় না, তখন এক ধাপ করে নেমে পড়তে থাকি যতক্ষণ না একেবারে সব চেয়ে নিচের ধাপে পৌঁছে যাই। তারপরে ঐ ভাবে পরের পাতাটাও পড়তাম। পাতা উল্টাবার দরকার হলে, দু হাত লাগিয়ে খুব সহজেই করতাম, কারণ সেগুলো পীজবোর্ডের মতো শক্ত, আর সব চেয়ে বড় বড় বইগুলিও আঠারো কুড়ি ফুটের বেশি উঁচু নয়।

রচনার আঙ্গিক স্পষ্ট, পুরুষোচিত, সাবলীল, কিন্তু আড়ম্বরশূন্য; অযথা কথা জড়ানো, কিম্বা একই কথা নানান ভাবে ব্যক্ত করাকে ওরা যেভাবে পরিহার করে চলে, তেমন আর কিছুকে করে না। মেলা বই পড়েছিলাম

ওদের, বিশেষ করে ইতিহাস আর নীতি সম্পর্কে। শেষোক্ত একটা বইয়ে একটা ছোট প্রাচীন প্রবন্ধ পড়েছিলাম; এই পুস্তিকাটি সর্বদা গ্লুমডালক্লিচের শোবার ঘরে পড়ে থাকত। বইটার মালিক হলেন গ্লুমডালক্লিচের শিক্ষিকা; প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা, স্বভাবটি ভারি গম্ভীর, তিনি ধর্ম ও নীতি সংক্রান্ত রচনার চর্চা করতেন।

এই পুস্তিকার বিষয়বস্তু ছিল মানবমনের দুর্বলতা। মেয়েরা আর অশিক্ষিত লোকরা ছাড়া কেউ এ বইয়ের ধার ধারত না। তবে আমার বড় কৌতূহল ছিল, এমন একটা বিষয়ে ওদেশের লেখক কি বলেছেন।

এই লেখকটি ইউরোপের নীতিজ্ঞদের মতো গোড়াতেই যত রকম নীতির কথা হতে পারে সব বললেন, যথা, স্বভাবতঃ মানুষ কি রকম ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, অসহায় প্রাণী, আবহাওয়ার দুর্যোগ কিম্বা হিংস্র পশুর আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে কত অক্ষম, কোনও কোনও জানোয়ারের শক্তি তার চেয়ে কত বেশি, কারও গতিবেগ বেশি, কারও দূরদৃষ্টি, আবার কারও বা কর্মক্ষমতা বেশি।

রচয়িতা আরও বলেছেন, পৃথিবীর এখন পড়তি সময়, প্রকৃতিরও কত অবনতি ঘটেছে, এখন যাদের জন্ম হচ্ছে প্রাচীনকালের তুলনায় তারা অকালজাত ভ্রূণের মতো। তাঁর মতে এ কথা মনে করা খুবই যুক্তিসঙ্গত যে শুধু যে মানবজাতিই সেকালে আরও বৃহদাকার ছিল তাই নয়, তখন নিশ্চয়ই রাক্ষসও ছিল। আজকালকার এই ক্ষীয়মান মানবজাতির চেয়ে আয়তনে তারা যে কত বড় ছিল, সে কথা প্রবাদ ও ইতিহাসেও যেমন শোনা যায়, তেমনি মাটি খুঁড়ে যে সব অস্থি আর নরকপাল পাওয়া গেছে, তা দেখেও প্রমাণ হয়।

লেখকের মতে প্রাকৃতিক নিয়মের একটা অপরিহার্য বিধি অনুসারেই প্রারম্ভে মানুষ আরও অনেক বড় ও বলিষ্ঠ ছিল, এ রকম সামান্য সব দুর্ঘটনায়, যেমন বাড়ির ছাদ থেকে একটা টালি পড়ল, কিম্বা একটা ছেলে একটা ঢিল ছুঁড়ল, কিম্বা খুদে একটা নদীতে ডুবল, ব্যস্ অমনি মৃত্যু, এ তখন হত না। এইভাবে যুক্তি দেখিয়ে লেখকমহাশয় কি ভাবে জীবনযাত্রা সম্পাদন করা উচিত, সে বিষয় অনেকগুলি নীতিশিক্ষা দিয়েছেন। সে প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপন করা বাহুল্যমাত্র।

আমার পক্ষ থেকে এ কথা না মনে করে পারলাম না যে প্রকৃতির বিরুদ্ধে আমাদের যা কিছু অভিযোগ থাকে, তাকে কেন্দ্র করে এ ধরণের নীতি শিক্ষা-দান, বরং যাকে বলা যায় অসন্তোষজ্ঞাপন বা ক্ষেদোক্তি করার গুণটি বড় ব্যাপক !

তারপর ওদের সামরিক ব্যবস্থাই ধরা যাক। ওরা গর্ব করে যে ওদের রাজসৈন্যে আছে এক লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার পদাতিক আর বত্রিশ হাজার অশ্বারোহী। একে 'সৈন্য' আখ্যা দেওয়া যায় কি না সেই হল প্রশ্ন। অনেক-গুলো সহর ঘেঁটে কিছু ব্যবসাদার, পাড়াগাঁ থেকে কিছু চাষীমজুর; আর সৈন্যাধ্যক্ষরা হলেন মাত্র কয়েকজন অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত বংশের পুরুষ; না পায় তারা বেতন, না পায় কোনো পুরস্কার! অবিশ্যি কুচকাওয়াজে তারা খুবই দক্ষ, তবে সে আর এমন একটা কি হল। আর তা হবে না-ই বা কেন, চাষা-গুলো সব যখন নিজের নিজের জমিদারের অধীনে থাকছে আর নগরবাসীরা নিজেদের সহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অধীনে। তাছাড়া এইসব সৈনাধ্যক্ষদেরও ওরাই ভোট দিয়ে নির্বাচন করেছে, ভেনিস্ সহরে যেমন করা হয়! লোরব্রুলগ্রুদ নগরের কাছে কুড়ি মাইল লম্বা, কুড়ি মাইল চওড়া একটা মাঠে ওখানকার সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজ আমি অনেকবার দেখেছি। সবসুদ্ধ পঁচিশ হাজার পদাতিক আর ছ' হাজার ঘোড়সোয়ারের বেশি হবে না। তবে সঠিক হিসাব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ ঐ বিরাট দেহ নিয়ে সব এস্তার জায়গা জুড়ে ছিল। ঘোড়ার পিঠে সোয়ারসুদ্ধ হয়তো মাটি থেকে নব্বুই ফুট উঁচু! একটি আদেশবাণীতে সমস্ত অশ্বারোহীদের এক সঙ্গে তলোয়ার টেনে বের করে আকাশে সঞ্চালন করতে দেখেছি। এ রকম চমকপ্রদ, এ রকম বিস্ময়কর দৃশ্য কল্পনাও করা যায় না। ঠিক মনে হল যেন এক লক্ষ তড়িৎ শিখা আকাশের দশ দিক থেকে এক সঙ্গে চমক দিচ্ছে।

অন্য কোনও দেশ থেকে যখন এ রাজ্যে আসবার প্রবেশ পথই নেই, তখন রাজা যে কেন সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত রাখা আর প্রজাদের সামরিক শিক্ষা নেবার কথা ভাবলেন এটা জানবার জন্যে আমার বড় কৌতূহল হয়েছিল। অনতিবিলম্বেই ওদের ইতিহাসের বই পড়ে আর আলাপ আলোচনার মধ্যে থেকে উত্তরটাও পেয়ে গেলাম। যে ব্যাধি সমস্ত মানবজাতিকে আক্রমণ করে থাকে, এদের যুগব্যাপী ইতিহাসে এরাও তার সম্মুখীন হয়েছে, যথা, জমিদার-

বর্গ ক্ষমতার জন্য, প্রজারা স্বাধীনতার জন্য আর রাজা সামগ্রিক আধিপত্যের জন্য বহুবার সংগ্রাম করেছে। এসব বিবাদ যদিও ওদেশের আইনের সাহায্যে অনেকখানি সীমিত, তবুও থেকে থেকে তিন পক্ষের মধ্যে কেউ না কেউ আইন ভঙ্গ করেছে, তার ফলে একাধিকবার গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়েছে। শেষ বারের গৃহযুদ্ধ সন্তোষজনকভাবে মিটমাট করে দিয়েছিলেন এই রাজার ঠাকুর-দাদা, সবাইকে ডেকে আপোষে মীমাংসা করে। সেই থেকে সর্ববাদীসম্মতি-ক্রমে এই সামরিক বিভাগের সৃষ্টি হয় আর আজ অবধি এরা নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্যপালন করে যাচ্ছে।

অষ্টম অধ্যায়

রাজারাণীর সীমান্ত যাত্রা—লেখকের সহগমন—লেখকের দেশত্যাগের নিখুঁৎ বিবরণ—ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাগমন।

আমার মনের মধ্যে সর্বদাই এই বিশ্বাস বলবতী ছিল যে এক দিন না এক দিন স্বাধীনতা লাভ করব। অবিশ্যি সেটা কি ভাবে সম্পন্ন হবে তা কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না, যাতে এতটুকু সাফল্যের আশা থাকতে পারে এমন কোনো পরিকল্পনা তৈরী করা তো দূরের কথা। আমি জাহাজে করে যখন এলাম, এখানকার তীরভূমি থেকে ঐ প্রথম জাহাজ দেখা গেল, তার আগে কখনও ঝড়েও কোনো জাহাজকে এখানে এনে ফেলে নি।

এদিকে রাজা কড়া হুকুম জারি করেছেন যে দৈবাৎ যদি আর একটা জাহাজ এদিকে এসে পড়ে, তা হলে তাকে যেন ডাঙ্গায় তোলা হয় আর নাবিক ও যাত্রীসুদ্ধ ঠেলাগাড়িতে চাপিয়ে লোরব্রুলগ্রুদে নিয়ে আসা হয়। রাজার বড় বাসনা আমার সমান মাপের একটি নারী জুটিয়ে দেবেন, যার দ্বারা আমার বংশ রক্ষা হবে। কিন্তু ক্যানারি পাখির মতো খাঁচায়-পোরা বংশধর রেখে যাওয়ার চেয়ে বরং মরণ ভালো, এই ছিল আমার নিজের মত। কে জানে তাহলে হয়তো তাদের কোনো সময় কৌতূহলের বস্তু বলে রাজ্যের বড়লোকদের কাছে বিক্রীও করা হত।

অবিশ্যি আমার সঙ্গে সকলে খুবই সদয় ব্যবহার করতেন। এখানকার প্রতাপশালী রাজা ও রাণীর প্রিয়পাত্র ছিলাম, সভাসুদ্ধ সকলে আমাকে দেখে আনন্দ পেত, কিন্তু সে এমন পরিস্থিতিতে যা মানবজন্মের মর্যাদার অযোগ্য। দেশে যে পরিবার বন্ধকের মতো রেখে এসেছি তাদের কথা আমি কখনও ভুলতে পারি নি। যাদের সঙ্গে সমানে সমানে আলাপ-আলোচনা করা যায়, এ রকম লোকের সান্নিধ্যের জন্য আমি ব্যাকুল ছিলাম। একটা ব্যাঙের কি ছোট কুকুর বাচ্চার মতো কে কখন আমাকে মাড়িয়ে মেরে ফেলবে, এই ভয় থেকে মুক্ত হয়ে পথে-ঘাটে চলতে ইচ্ছা করত। তবে আমি উদ্ধারও হয়েছিলাম অপ্রত্যাশিত রকমের শীঘ্র আর উদ্ধারের উপায়টাও

সচরাচর দেখা যায় না। কি ভাবে ব্যাপারটা ঘটেছিল তার সঠিক বিবরণ দিচ্ছি।

এদেশে আমার এতদিনে দু বছর কেটে গেছে। তৃতীয় বছরের গোড়ার দিকে গ্লুমডালক্লিচ আর আমি রাজারাণীর সঙ্গে রাজ্যের দক্ষিণ উপকূলে সফরে গেলাম। ভ্রমণকালে আমি যে বাক্সে করে যাই তার বর্ণনা আগেই দিয়েছি, বারো ফুট চওড়া বড় আরামের একটা খোপের মতো; অন্যান্যবারের মতো এবারও আমি এই বাক্সে করেই গেলাম। এবার একটা দোলনা ফরমায়েস করেছিলাম, আমার বাক্সের চার কোণে ছাদের কাছে চারটে রেশমি দড়ি দিয়ে সেটা ঝোলানো থাকবে। আমারই অনুরোধে কখনও কখনও চাকররা ঘোড়ায় চেপে আমার বাক্সটাকে সামনে নিয়ে বসে, তখন বড় ঝাঁকানি লাগে, দোলনায় বসলে ঝাঁকানিটা কমবে। যাত্রাপথে অনেক সময় দোলনায় শুয়েই ঘুমোতাম। গরম দিনে যাতে দোলনায় শুয়ে একটু হাওয়া পাই তাই ছুতোরমিস্ত্রীকে বলেছিলাম, বাক্সের ছাদে এক ফুট লম্বা চওড়া একটা চারকোণা ফুটো কেটে দিতে, তবে ফুটোটা যেন দোলনার মাঝখানটার উপরে না হয়। খাঁজে বসানো একটা তক্তা টেনে ইচ্ছামতো ফুটোটাকে খোলা আর বন্ধ করা যেত।

সমুদ্রের উপকূল থেকে ইংরিজি হিসাবে আঠারো মাইল দূরে ফ্লানফ্লাস্নিক বলে একটা সহরে, রাজার একটা প্রাসাদ আছে। যাত্রা শেষ হল এইখানে আর রাজার মনে হল এখানে দুচার দিন কাটিয়ে গেলে বেশ হয়।

গ্লুমডালক্লিচ আর আমি বড়ই ক্লান্ত, তার উপরে আমার একটু সর্দি লেগেছে আর গ্লুমডালক্লিচ এতই অসুস্থ হয়ে পড়েছে যে ঘর থেকে বেরুতে পারছে না। আমার বড় ইচ্ছা মহাসাগর দেখব; যদি কখনও এ দেশ থেকে পালাতে পারি, তবে এই মহাসাগরকেই হতে হবে আমার একমাত্র পথ। যত না অসুস্থ হয়েছিলাম, ভাব দেখালাম যেন তার চেয়ে অনেক বেশি অসুখ করেছে। একটা ছোকরা চাকরকে আমি বড় ভালোবাসতাম, এর আগেও মাঝে মাঝে বিশ্বাস করে তার হাতে আমাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, এখন আমি তার সঙ্গে একটু সমুদ্রের হাওয়া খাবার অনুমতি চাইলাম।

কত অনিচ্ছার সঙ্গেই যে গ্লুমডালক্লিচ সেই অনুমতি দিয়েছিল, এ আমি কখনও ভুলতে পারি না। চাকরটাকে কত করে সতর্ক করে দিয়েছিল যেন

আমাকে সাবধানে রাখে, সেই সঙ্গে খুব খানিকটা কেঁদেও ছিল, ঠিক যেন আসন্ন ঘটনাবলীর একটা পূর্বাভাস পেয়েছে।

ছোকরা তো বাক্সসুদ্ধ আমাকে নিয়ে, রাজবাড়ি থেকে আধঘণ্টার হাঁটা পথ, সমুদ্রতীরে কতকগুলো বড় বড় পাথরের দিকে বেড়াতে চলল। সেখানে তাকে বললাম আমাকে নামিয়ে দিতে, তারপর একটা জানলা তুলে সমুদ্রের দিকে ব্যাকুল বিষণ্ণ দৃষ্টিতে বারবার চাইতে লাগলাম। শরীরটাও ভালো লাগছিল না, ছোকরাকে বললাম দোলনায় শুয়ে একটু ঘুমিয়ে নিতে ইচ্ছা করছে, তাতে হয়তো একটু ভালো বোধ করতে পারি।

এই বলে আমি তো শুয়ে পড়লাম, ছেলেটাও জানলাটাকে এঁটে বন্ধ করে দিল, যাতে আমার ঠাণ্ডা না লাগে। দেখতে দেখতে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। আন্দাজে এইটুকু মনে হয় যে ছোকরা ভাবল আমি যখন ঘুমিয়েই আছি, কি আর এমন বিপদ ঘটতে পারে। এই মনে করে হয়তো সে পাথরের খাঁজে খাঁজে পাখির ডিমের সন্ধানে গিয়েছিল; এর আগেও আমার জানলা থেকে ওকে ডিম খুঁজে বেড়াতে দেখেছি, পাথরের ফাটলে কুড়িয়েওছে দুটো একটা।

সে যাই হক গে; নিয়ে বেড়াবার সুবিধার জন্যে আমার বাক্সের ঢাকনিতে একটা বড় আংটা লাগানো ছিল, হঠাৎ সেটাতে একটা হেঁচকা টান লাগল, ঝাঁকানির চোটে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। টের পেলাম বাক্সটাকে আকাশের উপরে অনেক উঁচুতে উঠিয়ে প্রচণ্ড বেগে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। প্রথম ঝাঁকানির চোটে আমি তো দোলনা থেকে পড়ে যাই আর কি! কিন্তু তারপরে গতিটা অনেক স্থির হয়ে এল। যতটা জোরে পারি অনেকবার চেঁচালাম, কিন্তু তাতে কোনো ফল হল না।

জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি শুধু মেঘ আর আকাশ ছাড়া কিছু নজরে আসে না। মাথার উপড়ে ডানা ঝাপটানির মতো একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম; এবার বুঝলাম আমার অবস্থা কত সঙ্গীন। একটা ঈগল পাখি আমার বাক্সের আংটা ঠোঁটে ধরে নিয়ে চলেছে, নিশ্চয়ই তার অভিপ্রায় পাথরের উপরে আমার বাক্সটা আছড়ে ফেলে, ভাঙ্গা টুকরোগুলোর মধ্যে থেকে আমাকে বেছে নিয়ে খাবে, খোলাসুদ্ধ কচ্ছপকে যেমন করে খায়। এই জাতের পাখির এত বুদ্ধি আর তীক্ষ্ণ ঘ্রাণ শক্তি যে অনেক দূর থেকে ওরা

শিকারের সন্ধান পায়, দু ইঞ্চি তক্তার খোলে আমি যে ভাবে লুকিয়ে ছিলাম, তার চেয়েও ভালো করে শিকার লুকিয়ে থাকলেও।

অনতিবিলম্বে লক্ষ্য করলাম পাখার শব্দ আর ঝাপটানি বেড়ে যাচ্ছে আর ঝড়ের মুখে সাইনবোর্ডের মতো আমার বাক্সটা দারুণ দুলছে। শুনলাম ঈগল পাখিটাকে কে বারবার থাপ্পড় কিম্বা বাড়ি মারছে। আমার বাক্সের আংটা যে ঠোঁটে ধরে নিয়ে চলেছিল, সে যে একটা ঈগল পাখি, এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। তারপরে হঠাৎ মিনিটখানেক সোজা নিচের দিকে পড়তে লাগলাম, এমন সাংঘাতিক সে পতনের বেগ যে আমার দম বন্ধ হয়ে আসবার জোগাড়। তারপর একটা ভীষণ ঝপাং করে জলে পড়ার শব্দ হয়ে পতনটা শেষ হল। আমার মনে হল শব্দটা নায়গারা জলপ্রপাতের গর্জনের চেয়েও বেশি। এক মিনিটের জন্যে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল, তারপর বাক্সটা এতখানি ভেসে উঠল যে জানলার উপরের অংশ দিয়ে আলো দেখতে পেলাম।

এতক্ষণে বুঝলাম আমি সমুদ্রের মধ্যে পড়েছি। আমার দেহের ওজন, আমার জিনিসপত্রের ওজন, বাক্সের উপরের ও নিচেকার চারটে কোণাকে মজবুৎ করবার জন্য চওড়া লোহার পাত লাগানো, তার ওজন, সব নিয়ে বাক্সটা পাঁচ ফুট জলের নিচে ভাসছে। তখনও এই কথাই মনে হয়েছিল এবং এখনও হয় যে ঈগল পাখিটা আমার বাক্স নিয়ে উড়ে যাচ্ছে দেখে আরো দু তিনটে ঈগল পাখি শিকারে ভাগ বসাবার আশায়, ওকে তাড়া করেছিল। শেষ পর্যন্ত ওদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করবার জন্যে আমাকে ফেলে দিতে পাখিটা বাধ্য হয়েছিল।

বাক্সের তলায় লোহার পাতগুলো ছিল সবচেয়ে শক্ত তাতেই বাক্স উল্টিয়ে না গিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করতে পেরেছিল, জলে পড়বার সময় ভেঙ্গেও যায় নি। প্রত্যেকটি জোড় খাঁজে খাঁজে এঁটে বসানো, দরজাতে কব্জা নেই, ইংল্যাণ্ডের জানলার মতো ওঠে নামে ; এ সবের ফলে বাক্সটা এত আঁটসাঁট হয়েছিল যে খুব সামান্য জলই ভিতরে ঢুকতে পেরেছিল।

অনেক কষ্টে দোলনা থেকে নামলাম। নামবার আগে ছাদের যে ফুটোর কথা এর আগে বলেছি, তার মুখের তক্তাটা সরিয়ে দিলাম যাতে বাতাস ঢুকতে পারে, বাতাসের অভাবে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

কতবার যে তখন মনে হয়েছিল আহা যদি আমার বড় ভালোবাসার গ্লুমডালক্লিচের কাছে থাকতাম, মাত্র একঘণ্টা কালের মধ্যে তার সঙ্গে কত বড় ব্যবধান হয়ে গেল ! তা ছাড়া, সত্যি বলছি, আমার নিজের এত বিপদের মধ্যেও আমার ধাত্রী বেচারার জন্য দুঃখ রাখবার জায়গা পাচ্ছিলাম না, আমার অভাবে তার কত না কষ্ট হবে, রাণীমা তার উপরে রুষ্ট হবেন, তার কপাল ভাঙবে। সেই মুহূর্তে আমি যে দুঃখ-বিপদের মধ্যে পড়েছিলাম, পর্যটকদের মধ্যে বিশেষ কাউকে তার চেয়ে বেশি কষ্ট পেতে হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। প্রতিটি মুহূর্তে আশঙ্কা ছিল এই বুঝি বাক্সটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল, নিদেন একটা দমকা বাতাসে কিম্বা একটা উত্তাল ঢেউএ গেল উল্টিয়ে ! জানলার একটা কাঁচ ভাঙা মানেই তৎক্ষণাৎ মৃত্যু। যাতায়াতের আপদ বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্যে যদি কাঁচের বাইরে শক্তি জালির আবরণ দেওয়া না থাকত, তা হলে কিছুতেই জানলাগুলো রক্ষা পেত না।

দেখলাম অনেক জায়গায় খাঁজের ভিতর দিয়ে জল চোঁয়াচ্ছে, যদিও জল ঢুকবার ফাটল বেশি ছিল না। যা ছিল সেগুলো বন্ধ করবার প্রাণপণ চেষ্টাও করছিলাম। বাক্সের ঢাকনিটা তুলবার আমার সাধ্য ছিল না, নইলে ঢাকনা তুলে বেরিয়ে তার উপরে চেপে বসতাম। তা হলে অন্ততঃ খোল-বন্দী হবার মতো ঘরের মধ্যে আটক থাকতে হত না। দু একদিনের মতো যদি বা এসব বিপদ ঠেকিয়েও রাখা যায়, তবু শীতের আর খিদের জ্বালায় অতি শোচনীয় মৃত্যু ছাড়া আর কি আমার আশা করবার ছিল ? এইভাবেই চার ঘণ্টা কাটিয়েছিলাম ; প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছি, এমন কি কামনাও করছি, এই বুঝি আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত।

এর আগেই বলেছি যে আমার বাক্সের একটা দেয়ালে কোনো জানলা ছিল না ; সেদিকে দুটো শক্ত আঁকড়া লাগানো ছিল, তার ভিতর দিয়ে চামড়ার বেল্ট চালিয়ে, বকলস্ দিয়ে নিজের কোমরে এঁটে, চাকররা আমাকে নিয়ে ঘোড়ায় চেপে বসত। এইরকম নৈরাশ্যময় অবস্থায় আছি, হঠাৎ শুনতে পেলাম, অন্ততঃ তাই যেন মনে হল, আঁকড়া লাগানো দেয়ালে কি রকম একটা আঁচড়ানোর শব্দ !

তার একটু পরেই মনে হল বাক্সটাকে যেন সমুদ্রের উপর দিয়ে টেনে কিম্বা ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কারণ থেকে থেকেই কেমন একটা হেঁচকা টান

টের পাচ্ছিলাম, যার ফলে মাঝে মাঝে ঢেউগুলো জানলার উপরে উঠে আমার ঘরখানিকে একেবারে অন্ধকার করে দিচ্ছিল।

এতে আমার মনে ক্ষীণ একটু আশাও হচ্ছিল হয়তো এবার উদ্ধার পাব, কিন্তু সেটা যে কি ভাবে সম্ভব হবে তা কল্পনা করতে পারছিলাম না। চেয়ারগুলো মেঝের সঙ্গে স্ক্রু দিয়ে আঁটা, সাহস করে একটাকে খুললাম। তারপর সেটাকে ছাদের খোলা ফাঁকটার ঠিক নিচে এনে অনেক কষ্টে আবার স্ক্রু দিয়ে এঁটে নিলাম। তারপর চেয়ারে চড়ে, ফুটোর যতটা কাছে সম্ভব মুখ নিয়ে, যতগুলো ভাষা আমার জানা, সব ভাষায় চিৎকার করে সাহায্য ভিক্ষা করতে লাগলাম। আমার সঙ্গে সচরাচর একটা লাঠি থাকত, তার আগায় রুমাল বেঁধে, ফুটো দিয়ে বাইরে বের করে খুব নাড়তে লাগলাম, যদি কাছাকাছি কোনো জাহাজ বা নৌকো থেকে থাকে, নাবিকরা বুঝতে পারবে বাক্সোটার মধ্যে একটা হতভাগ্য মানুষ বন্দী আছে।

এত করেও কিন্তু কোনো ফল হল না, যদিও স্পষ্ট টের পেলাম বাক্সটাকে কিসে যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ঘণ্টাখানেক কি তার চেয়েও বেশি পরে, যে দেয়ালে জানলা ছিল না কিন্তু আঁকড়া ছিল, সেই দেয়ালটা কোনো একটা শক্ত জিনিসের সঙ্গে ধাক্কা খেল। ভয় হল হয়তো বা একটা পাথর, সঙ্গে সঙ্গে এমনি ঝাঁকানি লাগল যে আর বলা যায় না। তার পরে টের পেলাম একটু একটু করে আগের চেয়ে অন্ততঃ তিন ফুট উঁচুতে উঠে গিয়েছি।

তখন রুমাল বাঁধা লাঠি আবার ফুটো দিয়ে বের করে এমন চেঁচিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করতে লাগলাম যে আমার গলা ভেঙ্গে যাবার মতো হয়ে এল। তার উত্তরে খুব একটা চিৎকার শুনলাম, পর পর তিনবার সেই চিৎকারটা শুনে যে কি রকম আহ্লাদে আটখানা হলাম, এমন অবস্থায় যে না পড়েছে সে ছাড়া কেউ বুঝবে না।

এবার শুনলাম মাথার উপরে পায়ের শব্দ, তারপর কে যেন ফুটোর ভিতর দিয়ে ডাকল ইংরিজি ভাষায়—কেউ যদি ভিতরে থাকো তা হলে কথা বল। আমি উত্তরে বললাম,—আমি একজন ইংরেজ, মন্দ ভাগ্যের জন্য এমন দুরবস্থায় পড়েছি যেমনটা কারো ভাগ্যে কখনো ঘটেনি! তার পরে কাতরস্বরে অনুনয় করতে লাগলাম এই অন্ধকূপ থেকে যেন আমাকে উদ্ধার করা হয়।

উত্তরে শুনলাম যে আমি নিরাপদেই আছি, কারণ আমার বাক্স ওদের জাহাজের সঙ্গে বাঁধা। এক্ষুনি জাহাজের ছুতোর মিস্ত্রী এসে বাক্সের ঢাকনায় করাত দিয়ে বড় একটা গর্ত কেটে দেবে, তার মধ্যে দিয়ে স্বচ্ছন্দে আমাকে টেনে বের করে আনা যাবে। আমি বললাম, অত শত কোনো দরকার নেই, সময়ও লাগবে ঢের। জাহাজের একজন নাবিক আংটার মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে বাক্স টেনে জল থেকে তুলে ক্যাপ্টেনের ক্যাবিনে নিয়ে যাক। তাহলেই যথেষ্ট।

ওদের মধ্যে কেউ কেউ এমন অদ্ভুত কথা শুনে আমাকে পাগল ঠাওরাল, বাকিরা হাসতে লাগল। বাস্তবিকই তখনও আমার মাথায় ঢোকেনি যে এখন যাদের মধ্যে এসে পড়েছি দেহের মাপে আর শক্তিতে তারা আমার সমান। ছুতোর এল, কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাক্সের উপরে করাত দিয়ে চার ফুট চৌকো একটা ফুটো কেটে দিল, তার ভিতর দিয়ে একটা ছোট মই নামানো হল, আমি মই চড়ে বেরিয়ে এলাম। সেখান থেকে অতি দুর্বল অবস্থায় আমাকে জাহাজের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হল।

নাবিকরা তো অবাক, হাজার রকম প্রশ্ন করতে লাগল তারা, যার উত্তর দিতে আমার ইচ্ছা করছিল না। আমিও এতগুলো বেঁটে বামন এক সঙ্গে দেখে ঠিক ওদের মতোই হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। এতকাল ধরে ব্রবডিংনাগের বিশালকায় মানুষ দেখে দেখে এদের বেঁটে বামনের মতোই লাগছিল। জাহাজের ক্যাপ্টেন হলেন মিষ্টার টমাস উইলকক্স, স্রপসায়ারে বাড়ি, মানুষটি ভারি ভাল—ইনি লক্ষ করলেন যে আমার ভির্মি যাবার অবস্থা। তিনি আমাকে তাঁর নিজের ক্যাবিনে নিয়ে গিয়ে একটা বলকারক ওষুধ খাইয়ে ঠাণ্ডা করলেন, তারপর তাঁর নিজের বিছানায় শুয়ে একটু বিশ্রাম নিতে বললেন, কারণ বিশ্রামেরই আমার তখন বড় প্রয়োজন।

ঘুমিয়ে পড়বার আগে তাঁকে বুঝিয়ে বললাম যে আমার বাক্সে কতকগুলি মূল্যবান আসবাব আছে, সেগুলো ফেলে দেওয়া উচিত হবে না; সুন্দর একটা দোলনা, একটা সুদৃশ্য ক্যাম্প খাট, দুটো চেয়ার, টেবিল, সিন্দুক। বাক্সের দেয়ালগুলো রেশমের আর সূতির চাদর দিয়ে ঢাকা এবং গদি দিয়ে মোড়াই বলা যায়। ক্যাপ্টেনকে অনুরোধ করলাম বাক্সটা যদি এই ক্যাবিনে আনেন তা হলে খুলে আমার জিনিসপত্রগুলো একবার তাঁকে দেখাই। আমার মুখে

এমন অদ্ভুত কথা শুনে ক্যাপ্টেন ভাবলেন আমি হয়তো ভুল বকছি। যাই হোক, হয়তো আমাকে শান্ত করবার উদ্দেশ্যেই তিনি আমার অনুরোধ মতো হুকুম দিতে স্বীকৃত হলেন।

তারপর জাহাজের ডেকে গিয়ে কয়েকজন নাবিককে পাঠালেন আমার বাক্সের ভিতরে। পরে শুনলাম তারা আমার যাবতীয় জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিল, দেয়াল থেকে গদিগুলোকেও খুলে এনেছিল। চেয়ার, খাট, সিন্দুক সব ছিল মেঝের সঙ্গে স্ক্রু দিয়ে আঁটা, আনাড়ি নাবিকরা সেগুলোকে গায়ের জোরে উপড়ে আনতে গিয়ে ভারি ক্ষতি করে দিয়েছিল। তারপর তক্তাগুলোর কিছু কিছু ঠুকে ঠুকে ছাড়িয়ে, জাহাজের কাজে লাগিয়েছিল আর বাক্সের খোলটাকে জলে ফেলে দিয়েছিল। ততক্ষণে বাক্সোটার তলা আর দেয়াল ফেটে-ফুটে চৌচির, তাই জলে ফেলবামাত্র টুপ করে সেটি ডুবে গেল। সত্যি বলতে কি এই ধ্বংসলীলা আমাকে চোখে দেখতে হয়নি বলে আমি খুসি; দেখলে নিশ্চয়ই আমার মনে বড় কষ্ট হত, অনেক যে সব পুরনো কথা আমি ভুলে যেতে চাই মনে পড়ে যেত।

কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়েছিলাম, কিন্তু যে জায়গা ছেড়ে এলাম, যে বিপদের কবল থেকে রক্ষা পেলাম তার দুঃস্বপ্ন বারবার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে লাগল।

তবু ঘুম ভাঙলে অনেকটা সুস্থ বোধ করলাম। তখন রাত আটটা হবে, ক্যাপ্টেন তাড়াতাড়ি খাবার দিতে বললেন, তাঁর মতে বড় বেশিক্ষণ আমি উপোসী আছি। বড় সহানুভূতির সঙ্গে আমার দেখাশুনা করতে লাগলেন, বললেন যেন অমন উদ্‌ভ্রান্তভাবে চারদিকে না তাকাই আর অমন যুক্তিশূন্য কথা না বলি। তারপরে যখন সবাই চলে গেল তখন আমার ভ্রমণ বৃত্তান্ত শুনতে চাইলেন, কোন দুর্বিপাকে পড়ে আমি ওরকম বিরাট একটা কাঠের বাক্সে বন্দী হয়ে সমুদ্রে ভেসে চলেছিলাম।

ক্যাপ্টেনের কাছে শুনলাম বেলা বারোটা নাগাদ দূরবীণ দিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ দূরে আমার বাক্সটা ওঁদের চোখে পড়েছিল। প্রথমে মনে হয়েছিল বুঝি একটা জাহাজের পাল, মনে মনে ভেবেছিলেন ওর কাছে গেলে হয়, খুব বিপথেও হবে না, জাহাজের বিস্কুটের পুঁজি প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, হয়তো কিছু কিনতেও পাওয়া যেতে পারে। তারপর কাছে এসে যখন নিজের ভুলটা বুঝলেন, তখন ল্যাংবোট পাঠালেন ব্যাপারটা কি দেখে আসতে। লোকগুলো

ভয়ের চোটে ফিরে এসে বলে কি না একটা বাড়িকে সাঁতার কাটতে দেখে এসেছে !

এমন বোকার মতো কথা শুনে খানিকটা হেসে নিয়ে শেষে নিজেই নৌকোতে চড়লেন, লোকদের বললেন সঙ্গে কিছু মোটা দড়ি নিতে। চার দিকে স্থির জল, ক্যাপ্টেন আমার বাক্সের চারদিকে ঘুরে নৌকো চালাতে লাগলেন, আমার জানলাগুলো লক্ষ করলেন, নিরাপত্তার জন্যে কেমন জালি লাগালো। তারপরে দেখলেন একধারের দেয়ালে আলো ঢুকবার পথ নেই, সমস্তটা তক্তার তৈরী, তাতে দুটি আঁকড়া লাগানো। তখন তিনি লোকদের হুকুম দিলেন ঐ দিক দিয়ে বাক্সটার কাছে যেতে। তারপর আঁকড়ার সঙ্গে দড়ি বেঁধে আমার সিন্দুকটাকে—উনি বাক্সটাকে সিন্দুক বললেন—টেনে জাহাজের কাছে নিয়ে যেতে আদেশ করলেন।

সেখানে পৌঁছে বাক্সের ছাদের উপরে আরেকটা মোটা দড়ি বেঁধে, কপিকলের সাহায্যে বাক্সটাকে তুলতে বললেন, কিন্তু সব নাবিকরা মিলেও দু তিন ফুটের বেশি তুলতে পারেনি। তারপর ওঁরা আমার লাঠি আর রুমাল দেখে অনুমান করেছিলেন খোলের ভিতরে কোনো দুর্ভাগা বন্দী আছে।

এবার আমি জানতে চাইলাম আমাকে যখন প্রথম দেখেছিলেন তখন মাথার উপরে আকাশে কোনো বিশাল পাখি দেখেছিলেন কি না। তার উত্তরে ক্যাপ্টেন বললেন আমি যখন ঘুমোচ্ছিলাম তখন নাবিকদের সঙ্গে এ বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে, একজন নাবিকের কাছে শুনেছিলেন যে সে নাকি তিনটে ঈগল পাখিকে উত্তর দিকে উড়ে যেতে দেখেছিল, কিন্তু সেগুলো যে সাধারণ ঈগলের চেয়ে বড় এমন কথা সে বলেনি। আমার নিজের মনে হল হয়তো পাখিগুলো এত উঁচুতে উড়ছিল যে তাদের আয়তন ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। ক্যাপ্টেন আমার এই প্রশ্নের উদ্দেশ্যটা তখন বুঝতে পারেননি।

এরপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম তাঁর মতে ডাঙা থেকে আমরা কতদূরে আছি ; উত্তরে তিনি বললেন যতদূর হিসাব করতে পারছেন তিন শো মাইল হবে। আমি তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললাম তিনি নিশ্চয়ই ভুল করছেন, দূরত্বটা হবে ওর ঠিক অর্ধেক, কারণ যেখান থেকে এলাম সে জায়গা ছেড়ে যাবার ঘণ্টা দুয়ের মধ্যেই জলে পড়েছিলাম। তাই শুনে ক্যাপ্টেন ভাবলেন

আমার মাথার গোলমাল হয়েছে, এই সন্দেহটা ইঙ্গিতে আমাকে জানিয়ে, আমাকে আবার শুয়ে পড়বার পরামর্শ দিলেন। আমার জন্য একটা ক্যাবিন তিনি ঠিক করে রেখেছেন বললেন।

উল্টিয়ে আমি তাঁকে আশ্বাস দিলাম যে তাঁর আদরযত্ন ও সঙ্গদানের ফলে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি, মাথাটাও জীবনে কখনও এর চেয়ে পরিষ্কার থাকেনি। তাই শুনে তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন আর এবার খোলাখুলি জানতে চাইলেন আমি কি কোনও গুরুতর অপরাধ করে মনে মনে অনুতপ্ত আছি, আর সেই অপরাধের শাস্তিস্বরূপ কি কোনো রাজাবাদশা আমাকে বাক্সে পুরে অকূলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। কোনো কোনো দেশের অপরাধীদের তো সঙ্গে খাবার দাবার না দিয়ে ফুটো নৌকোতে ভাসিয়ে দেবার রীতি আছে।

ক্যাপ্টেন আরও বললেন যে যদিও এরকম মন্দ লোককে জাহাজে তুলে নিতে তাঁর খুবই খারাপ লাগবে, তবুও আমাকে তিনি কথা দিচ্ছেন প্রথম যে বন্দরে জাহাজ লাগবে, সেখানে আমাকে নিরাপদে নামিয়ে দেবেন। তিনি তারপরে বললেন, গোড়াতেই নাবিকদের কাছে ও পরে তাঁর কাছেও আমার বাক্স বা সিন্দুক সম্পর্কে যে সব অদ্ভুত কথা বলেছিলাম, তাই শুনে তাঁর সন্দেহ আরও বেড়ে গিয়েছে; তাছাড়া খাবার সময় আমার মুখের ভাব ও আচরণ দুই-ই যেন কেমন অদ্ভুত মনে হয়েছিল।

তাঁকে অনুনয় করে বললাম একটু ধৈর্য ধরে সমস্ত ব্যাপারটা শুনতে। তারপর শেষবার ইংল্যাণ্ড ছেড়ে আসা থেকে শুরু করে, এই মুহূর্ত পর্যন্ত সমস্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিলাম। সত্যি কথা সর্বদা বুদ্ধিমানের মনে গিয়ে প্রবেশ করতে পারে। এই সাধু ও গুণবান ভদ্রলোকের কিছু শিক্ষাদীক্ষাও ছিল, আর ছিল তীক্ষ্ণ বিচারবোধ, তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝে নিলেন আমি সত্যি কথাই বলছি এবং কোনো কিছু গোপন করছি না। তবু আমার বক্তব্যের চাক্ষুস প্রমাণ দেবার উদ্দেশ্যে তাঁকে অনুরোধ করলাম আমার সিন্দুকটা সেই ঘরে আনিয়ে দিতে। তাঁর কাছে এর আগেই শুনেছিলাম নাবিকরা আমার বাক্সের কি অবস্থা করেছে; সিন্দুকের চাবিটা আমার কাছেই ছিল।

তাঁর সামনেই বাক্স খুলে, যে দেশ থেকে এমন আশ্চর্যভাবে উদ্ধার পেয়েছি, সেখানকার কয়েকটি অদ্ভুত জিনিসের সংগ্রহ দেখালাম। রাজার দাড়ির কুচি দিয়ে তৈরী চিরুণী; ঐ দাড়ির কুচির আরেকটা চিরুণী, এর

দাঁতগুলো আবার রাণীমার হাতের বুড়ো আঙ্গুলের নখের টুকরোয় বসানো। কতকগুলো ছুঁচ আর পিনের সংগ্রহ ছিল, তার এক একটা এক ফুট থেকে আধ গজ অবধি লম্বা। ছুতোরদের পেরেকের মতো বড় চারটে বোলতার হুল; চিরুণী থেকে নেওয়া রাণীমার এক গোছা চুল; একটা সোনার আংটি, রাণীমা অনুগ্রহ করে এটি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। এটিকে হাতের কড়ে আঙুল থেকে খুলে আমার গলায় কলারের মতো করে পরিয়ে দিয়েছিলেন।

এত সৌজন্যের পরিবর্তে আংটিটা গ্রহণ করতে ক্যাপ্টেনকে কত অনুরোধ করলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজী হলেন না। তারপর সখীদের একজনের পায়ের আঙুল থেকে একটা কড়া কেটে রেখেছিলাম, সেটি দেখালাম। এ জিনিসটা ছিল একটা কেণ্ট প্রদেশের আপেলের সমান বড় আর এমনি শক্ত যে দেশে ফিরে ভিতরটা কুরে বের করে দিয়ে, রূপোয় বাঁধানো খাসা একটা পেয়ালা বানিয়ে নিয়েছিলাম। সবার শেষে ক্যাপ্টেনকে বললাম আমার পরণে পেণ্টেলুনটি একবার দেখতে, এটি একটি ইঁদুরের চামড়া দিয়ে তৈরী।

চাকরের একটা দাঁত ছাড়া জোর করেও তাঁকে কিছু গছাতে পারলাম না। আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে এ জিনিসটিকে উনি খুব কৌতূহলের সঙ্গে নিরীক্ষণ করছেন আর শুনলাম এটি তাঁর ভারি পছন্দ। এত বেশি ধন্যবাদ জানিয়ে এই তুচ্ছ উপহার তিনি গ্রহণ করলেন, যার কোনো মানেই হয় না। গ্লুমডালক্লিচের একটা চাকরের একবার দাঁত ব্যথা হয়েছিল, আনাড়ি এক ডাক্তার খারাপ দাঁতটা না তুলে ভুল করে এই দাঁতটা তুলে দিয়েছিল, অথচ এ দাঁতটা ওর মুখের ভেতরকার অন্য ভালো দাঁতগুলোর মতোই সম্পূর্ণ সুস্থ! দাঁতটাকে পরিষ্কার করে নিয়ে আমার সিন্দুকে রেখেছিলাম; লম্বায় প্রায় এক ফুট আর ব্যাসের মাপ চার ইঞ্চি।

আমার সহজ সরল বিবৃতি শুনে ক্যাপ্টেন বড় খুসি হলেন; বললেন তিনি আশা করে আছেন যে দেশে ফিরে এসব কথা পত্রিকাতে ছেপে জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করব আর পৃথিবীকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করব। উত্তরে আমি বলেছিলাম যে এমনিতেই আমাদের দেশে ভ্রমণ-কাহিনীর সংখ্যা অতিরিক্ত বেশি অদ্ভুত; অদ্ভুত না হলে কোনো কিছুই আজকাল চলে না; তাছাড়া অনেক রচয়িতাই কতখানি সত্যের খাতিরে লেখেন আর কতখানি নিজেদের অহমিকাকে চরিতার্থ করতে আর মূর্খ

পাঠকদের মনোরঞ্জনের জন্য লিখে থাকেন, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাছাড়া আমার কাহিনীতে সাধারণ ঘটনার বিবৃতি ছাড়া বিশেষ কিছুই নেই, অন্য সাহিত্যিকদের রচনার মতো অদ্ভুত সব গাছপালা পাখি জন্তু জানোয়ারের ফলাও করে রংচঙে বর্ণনাও নেই, অসভ্য জাতির বর্বরোচিত রীতিনীতি কিম্বা পৌত্তলিক পূজাবিধির কথাও নেই। সে যাই হোক, তাঁর উত্তম মন্তব্যগুলির জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম কথাটা আমি ভেবে দেখব।

ক্যাপ্টেন বললেন, একটা বিষয়ে তাঁর ভারি আশ্চর্য লাগছে, কথা বলবার সময় আমি অত চেঁচাই কেন, ওদেশের রাজারাণী কি কানে খাটো। বুঝিয়ে বললাম যে গত দু বছর ধরে এই রকম চেঁচিয়ে কথা বলাই আমার অভ্যাস হয়ে গেছে, ক্যাপ্টেনের ও তাঁর নাবিকদের কথা আমার কানে ফিসফিসের মতো শোনাচ্ছে, অথচ সব কথা স্পষ্ট বুঝতে পারছি, এতে আমিও ভারি বিস্ময় বোধ করছি। ওরা যখন আমায় ওদের টেবিলে চড়িয়ে কিম্বা হাতে তুলে নিয়ে কথা বলত সে সময়টা ছাড়া, ওদেশের লোকের সংগে যখন কথা বলতাম, মনে হতো পথে দাঁড়িয়ে আমি যেন গির্জার চূড়োর সঙ্গে আলাপ করছি।

বললাম আমি আরেকটা জিনিসও লক্ষ্য করেছিলাম, প্রথম যখন এই জাহাজে চড়লাম আর নাবিকরা আমাকে ঘিরে দাঁড়াল, তখন আমার মনে হয়েছিল এরকম খুদে তুচ্ছ কীট আর কখনো দেখিনি! বাস্তবিক ওদেশে যখন ছিলাম আয়নায় নিজের চেহারার দিকে তাকাতে পারতাম না, কারণ বিশালায়তন সব কিছু দেখে দেখে চোখের এমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে নিজের ক্ষুদ্র দেহখানি দেখে মনে ঘৃণা ছাড়া আর কিছু হত না।

ক্যাপ্টেন বললেন খাবার সময় তিনি লক্ষ্য করে ছিলেন যে আমি যেন খানিকটা বিস্ময়ের সঙ্গে সব কিছু দেখছিলাম, মাঝে মাঝে যেন হাসি চাপতে পারছিলাম না; এ আচরণের কি অর্থ করবেন তাই তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না, শেষে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে আমার মাথাটি খারাপ হয়ে গিয়েছে। আমি উত্তরে বললাম, এ সবই সত্যি কথা, তবে যখন দেখলাম থালাগুলো এক একটা রূপোর সিকির সমান, এক একটা শূওরের ঠ্যাং যেন এক এক গ্রাস আর পেয়ালাগুলো বাদামের খোলার মতোও বড় নয়, তখন

হাসি চাপি কি করে ! এইভাবে ওঁদের ঘরকন্নার যাবতীয় আসবাব আর খাবার জিনিসকে আমার চোখে কেমন ঠেকছিল তার বর্ণনা দিলাম।

এর কারণ হল যে যদিও রাণীমা আমার যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসের এক প্রস্থ খুদে সংস্করণ ফরমায়েস দিয়ে করিয়ে দিয়েছিলেন, তবু আমার আশে পাশে যে সব বিশাল বিশাল জিনিস দেখতাম আমার মনের উপরে তাদের ছাপটাই বেশি করে পড়ত। লোকে যেমন নিজেদের দোষগুলি দেখেও দেখে না, আমার ক্ষুদ্রত্ব সম্পর্কে আমিও ঠিক তাই করতাম।

ক্যাপ্টেন আমার এই পরিহাসটি খুবই উপভোগ করলেন, উত্তরে তিনিও পরিহাস করে পুরোনো একটা ইংরিজি প্রবাদের দোহাই দিয়ে বললেন যে তাঁর সন্দেহ হচ্ছে হয়তো বা আমার পেটের চেয়ে চোখ দুটো বড়, কারণ সারাদিন উপোস করার পরেও তো আমার খাওয়ার খুব বাহাদুরি দেখা যায়নি। হাসির রেশটা টেনে আরও বললেন যে ঈগল পাখির ঠোঁটে আমার বাক্স চলেছে আর তার পরে অতখানি উঁচু থেকে ধপাস্ করে সমুদ্রের জলে পড়ছে, এ দৃশ্য দেখবার জন্যে তিনি খুসি হয়ে এক শো পাউণ্ড দর্শনী দিতে প্রস্তুত ! দৃশ্যখানি হয়েছিল নিশ্চয় অতীব বিস্ময়কর ও অনাগত ভবিষ্যতের জন্য তার বর্ণনাটিও লিপিবদ্ধ করে রাখার যোগ্য ! তারপর গ্রীক পুরাণের 'ফেটনের' সঙ্গে তুলনা করাও অনিবার্য হল, কথাটা যদিও আমার পক্ষে খুব উপভোগ্য হয়নি। (ঐ 'ফেটন' মোম দিয়ে নিজের কাঁধে মস্ত ডানা জুড়ে সূর্যের চেয়ে উঁচুতে উড়বার স্পর্ধা করেছিল , দুঃখের বিষয় সূর্যের তাপে মোম গলে ফেটনের পতন ও মৃত্যুও অনিবার্য হয়েছিল !)

টনকুইন থেকে ক্যাপ্টেন ইংল্যাণ্ডে ফিরছিলেন, পথে বাতাসের বেগ তাঁদের উত্তর-পুর্বদিকে ঠেলে অক্ষাংশ ৪৪° আর দ্রাঘিমা ১৪৩° পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল। তবে আমি জাহাজে উঠবার দিন দুই বাদেই আয়ন-বায়ুর সাক্ষাৎ মিলল আর আমরাও নির্বিঘ্নে দক্ষিণদিকে অনেক দূর এগোলাম, তারপর নিউ হল্যাণ্ডের তীর-রেখা ঘেঁষে প্রথমে দক্ষিণ-পশ্চিমের খানিকটা পশ্চিমদিকে, তারপরে তার থেকে আরেকটু দক্ষিণ অভিমুখে যাত্রা করে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে এলাম। আমাদের যাত্রা খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল, তার বিশদ্ বিবরণ দিয়ে পাঠকের বিরক্তি ঘটাব না। দু একটি বন্দরে ক্যাপ্টেন জাহাজ নোঙর করে নৌকো পাঠিয়ে খাবার ও পানীয় জল আনিয়েছিলেন ;

১৭০৬ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন ইংল্যাণ্ডের 'ডাউন্স' পর্যন্ত পৌঁছবার আগে আমি আর জাহাজ থেকে নামিনি। আমার নিষ্কৃতিলাভের পর ততদিনে নয় মাস কেটে গিয়েছে।

জাহাজ ভাড়ার পরিবর্তে আমার জিনিসপত্র বাঁধা রেখে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ক্যাপ্টেন একটি পয়সা নিতে রাজী হলেন না। প্রীতির সঙ্গে আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম; 'রেডরিফে' আমাদের বাড়িতে একদিন আসবেন বলে কথা দিতে ক্যাপ্টেনকে বাধ্য করলাম। তারপর তাঁর কাছ থেকেই পাঁচ সিলিং ধার নিয়ে একটা ঘোড়া আর সহিস ভাড়া করলাম।

পথে যেতে বাড়িঘর, গাছপালা, মানুষ, গোরু সবই এত ছোট ছোট মনে হচ্ছিল যে ভাবছিলাম আবার লিলিপুট দেশে ফিরে গেলাম নাকি! পথে যত যাত্রী দেখি, ভয় হয় এই বুঝি তাদের মাড়িয়ে দিলাম, অনেক সময় তাদের ডেকে সরে যেতেও বলেছিলাম। এ সব বেয়াদপির জন্য দু একবার মাথা ফাটাফাটির সম্ভাবনাও হয়েছিল। নিজের বাড়ির পথ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করে নিতে হয়েছিল; সেখানে পৌছলে পর, চাকর যেই দরজা খুলে দিয়েছে, আমি করেছি কি, ফটকের তলা দিয়ে হাঁসরা যে রকম নিচু হয়ে গলে যায়, সেই রকম নিচু হয়েছি, মনে বড় ভয় এই বুঝি দরজায় মাথা ঠুকে গেল।

আমার স্ত্রী যখন আমাকে আলিঙ্গন করবার জন্যে দৌড়ে এলেন, আমি তাঁর হাঁটুর চেয়েও নিচুতে ঝুঁকে পড়লাম, ভাবলাম তা না হলে তিনি আমার মুখের নাগাল পাবেন না! মেয়ে আশীর্বাদ নেবার জন্য আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল, কিন্তু সে উঠে না দাঁড়ানো পর্যন্ত আমি তাকে দেখতেই পেলাম না! এতকাল ধরে ষাট ফুট উঁচুতে মাথা আর চোখ তুলে দেখা অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। তার উপরে আবার এক হাত দিয়ে তার কোমরটি ধরে তাকে তুলতে চেষ্টা করেছিলাম।

দু-চারজন বন্ধুবান্ধব এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে, তাঁদের আর বাড়ির চাকরদের দিকে চোখ এতটা নিচু করে তাকাচ্ছিলাম, যেন তাঁরা সব বেঁটে বামন আর আমি একটা দৈত্যবিশেষ। স্ত্রীকে বলেছিলাম—বড় বেশি কিপ্টেমি করে, নিজেকে আর মেয়েকে না খাইয়ে খাইয়ে শরীরের আর কিছু রাখোনি! মোট কথা, সকলের সঙ্গে এমনি অদ্ভুত আচরণ করতে লাগলাম, যে আমাকে প্রথম দেখে ক্যাপ্টেন যেমন করেছিলেন, এরাও তেমনি

আমাকে পাগল ঠাউরেছিল। অভ্যাস আর সংস্কারের কি সাংঘাতিক প্রভাব তার উদাহরণ স্বরূপ এ কথা-র উল্লেখ করলাম।

অল্পকালের মধ্যেই পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মনের মিল হয়ে গেল। স্ত্রী বললেন আর আমাকে সমুদ্রযাত্রা করতে দেওয়া হবে না। কিন্তু আমার দুষ্ট শনি এমনি চক্রান্ত করল যে আমাকে বাধা দেবার তাঁর শক্তি রইল না, সেসব কাহিনী পাঠকমহাশয় পরে শুনবেন। এইখানে আমার অলুক্ষুণে সমুদ্র-যাত্রার কাহিনীর দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ করি।

তৃতীয় খণ্ড

লাপুটা ভ্রমণ

প্রথম অধ্যায়

লেখকের তৃতীয়বার সমুদ্রে যাত্রা—জলদস্যুদের হাতে গ্রেপ্তার হওন—জনৈক ওলন্দাজের বিদ্বেষ—একটি দ্বীপে আগমন—লাপুটায় অভ্যর্থনা।

দেশে পৌঁছবার পর দশ দিনের বেশি কাটেনি, এমন সময় হোপওয়েস জাহাজের অধিকর্তা ক্যাপ্টেন উইলিয়ম রবিন্সন আমাদের বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। লোকটির বাড়ি কর্ণওয়ালে আর জাহাজটিও ভারি মজবুত, ওজন হবে তিনশো টন। এর আগে আমি যখন আরেকটা জাহাজে ডাক্তারের পদে নিযুক্ত হয়ে লেভান্টে গিয়েছিলাম, ইনিই ছিলেন সেই জাহাজের অধিকর্তা আর সিকি ভাগের মালিক। আমার সঙ্গে অধস্তন কর্মচারীর মতো ব্যবহার না করে বরং সর্বদাই ইনি নিজের ভাইয়ের মতো ব্যবহার করতেন। আমি ফিরে এসেছি শুনে দেখা করে গেলেন। প্রথমে আমার মনে হয়েছিল বন্ধুত্ব ছাড়া তাঁর অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই; অনেকদিন পরে দেখা সাক্ষাৎ হলে যেরকম কথাবার্তা হয়ে থাকে তার বেশি কোনো আলোচনাও হয়নি।

কিন্তু এর পর তিনি বারবার আসতে লাগলেন। আমার শরীর ভালো আছে দেখে আনন্দ প্রকাশ করতেন, এবার বাড়িতে কায়েমী হয়ে বসব কিনা জিজ্ঞাসা করতেন, আরও বলতেন দু মাস বাদে তাঁর পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যাবার ইচ্ছা আছে। অবশেষে খানিকটা ভণিতা করবার পর ঐ জাহাজের ডাক্তার হয়ে যাবার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন। বললেন আমার অধীনে আরেকজন ডাক্তারও থাকবে, 'মেট'রা দু জন থাকবে আর সাধারণ ডাক্তারদের বেতনের দ্বিগুণ আমাকে দেওয়া হবে। তাছাড়া ক্যাপ্টেন এও বললেন যে যাবতীয় সামুদ্রিক ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা যে কম করেও তাঁর সমান সমান, এটা তিনি ভালো করেই জানেন, তাই সে রকম কোনো অবস্থায় পড়লে আমার পরামর্শ মেনে চলবেন বলে কথা দিচ্ছেন, ভাবখানা যেন জাহাজের কর্তৃত্বেও আমি অংশীদার।

এই ধরণের অনেক সৌজন্যের কথা তিনি বললেন, তা ছাড়া তাঁকে

ভালো লোক বলে আমি জানতাম, কাজেই শেষ অবধি তাঁর প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করতে পারলাম না। এত সব দুর্ঘটনার পরেও আমার মনে পৃথিবী পর্যটন করবার বাসনা আগের মতোই প্রবল ছিল। একমাত্র অসুবিধা হল আমার স্ত্রীকে রাজী করানো, অবশেষে তাও করা গেল। এসব সমুদ্র-যাত্রার ফলে ভবিষ্যতে তাঁর ছেলেমেয়েদের সুবিধা হতে পারে, এই আশাতেই তিনি মত দিলেন।

১৭০৬ সালের ৫ই আগষ্ট আমরা যাত্রা করে ১৭০৭ সালের ১১ই এপ্রিল ফোর্ট সেণ্ট জর্জে পৌছলাম। নাবিকদের অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তাদের বিশ্রাম দেবার জন্য সেখানে আমরা তিন সপ্তাহ থাকলাম।

সেখান থেকে গেলাম টঙ্কুইন। টঙ্কুইনে যে সব জিনিস কিনবার কথা ছিল তা তৈরী নেই দেখে ক্যাপ্টেন সেখানে কিছুদিন থাকা স্থির করলেন। বেশ কয়েকমাস কেটে যাবার আগে ওখান থেকে যে রওনা দিতে পারবেন এমন আশা ছিল না। কাজেই এত যে খরচ করে ফেলেছেন তার খানিকটা তুলবার অভিপ্রায়ে তিনি একটা ছোট জাহাজ কিনে ফেললেন। এ ধরণের জাহাজকে 'স্লুপ' বলে, এগুলোর মাত্র একটা করে পাল থাকে। তারপরে আশেপাশের দ্বীপগুলোর সঙ্গে টঙ্কুইনের লোকরা সাধারণতঃ যে ধরণের পণ্য নিয়ে বাণিজ্য করে, সেই রকম মাল দিয়ে জাহাজটিকে বোঝাই করে, চোদ্দজন নাবিক বহাল করা হল, তাদের মধ্যে তিনজন ছিল স্থানীয় লোক। ক্যাপ্টেন আমাকেই জাহাজের কর্তা করে দিলেন, ব্যবসাবাণিজ্য করার অধিকারও দিলেন। নিজে টঙ্কুইনে থেকে কাজকর্ম দেখাশোনা করতে লাগলেন।

যাত্রা করার পর তিন দিনের বেশি কাটেনি, এমন সময় প্রচণ্ড ঝড় উঠল, পাঁচ দিন ধরে সেই ঝড় আমাদের প্রথমে ক্রমাগত উত্তর—উত্তর-পূর্বে আর তারপরে পূব দিকে ঠেলে নিয়ে চলল। তারপরে ভালো দিন পেলেও, তখনও পশ্চিম থেকে জোরে বাতাস দিতে লাগল। দশদিনের দিন জলদস্যুদের দুটি জাহাজ আমাদের পিছু নিল এবং দেখতে দেখতে ধরেও ফেলল। আমার জাহাজে এত বেশি মাল যে ধীরে ধীরে এগোতে হয় আর আত্মরক্ষা করবার মতো কোনো ব্যবস্থাও নেই।

দুটো জাহাজ থেকে দুই দলপতি এক সঙ্গে আমাদের জাহাজে উঠে এল,

তাদের পিছনে তাদের লোকজনরা। দলপতিদের সে কি তেজ! উঠে কিন্তু দেখে আমরা সবাই ডেকের উপরে সাষ্টাঙ্গ প্রণত, সেই রকমই হুকুম দিয়েছিলাম কিনা। তাই দেখে মোটা মোটা দড়ি দিয়ে আমাদের বেঁধে রেখে, একজন পাহারাদার বসিয়ে, ওরা জাহাজে কি আছে সার্চ করতে চলল।

ওদের মধ্যে একজন ওলন্দাজকে লক্ষ্য করলাম, দলপতি না হলেও বেশ খানিকটা তার প্রতিপত্তি। সে তো আমাদের মুখ দেখেই ইংরেজ বলে চিনে নিল আর অমনি নিজের ভাষায় গজ গজ করে বলতে লাগল আমাদের দুজন দুজন করে পিঠোপিঠি বেঁধে জলে ডুবিয়ে দেওয়া উচিত! আমি ওলন্দাজ ভাষা বেশ ভালো বলতে পারি; নিজেদের পরিচয় দিয়ে তাকে অনেক অনুনয় করে বললাম আমরাও প্রটেস্টাণ্ট সমাজের খৃষ্টান, প্রতিবেশী দেশের অধিবাসী, আমাদের মধ্যে মৈত্রীর সম্পর্ক, সে যেন দলপতিদের বলে আমাদের উপরে দয়া করতে! এতে কিন্তু তার রাগ আরও বেড়ে গেল। আবার সে আমাদের শাসাতে আরম্ভ করল, সঙ্গীদের দিকে ফিরে মহা উত্তেজিতভাবে কি সব বলতে লাগল, মনে হল জাপানী ভাষায়; খৃষ্টান শব্দটি তো অনেকবার শুনলাম।

জলদস্যুদের বড় জাহাজটির ক্যাপ্টেন হলেন জাপানী, সামান্য ওলন্দাজ ভাষাও জানেন, তবে ভালো করে নয়। তিনি আমার কাছে এসে অনেক প্রশ্ন করলেন, আমিও অত্যন্ত বিনীতভাবে সব কথার উত্তর দিলাম; অবশেষে তিনি বললেন আমাদের প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে না। নিচু হয়ে তাঁকে নমস্কার করবার পর, ওলন্দাজটার দিকে ফিরে আমি বললাম যে আমাদের স্বধর্মী একজন খৃষ্টানের চেয়ে একজন বিধর্মীর কাছে বেশি দয়া পেলাম দেখে আমি বড়ই দুঃখিত। এই রকম বোকার মতো কথা বলার জন্য অনতিবিলম্বে আমাকে অনুতাপ করতে হল। সে পাপিষ্ঠ দুর্মতি আমাকে জলে ফেলে দেবার জন্য দুই ক্যাপ্টেনকে বারবার পেড়াপিড়ি করতে লাগল, কিন্তু তার সব চেষ্টাই বৃথা হল, যেহেতু তাঁরা কথা দিয়েছিলেন যে আমাকে প্রাণে মারা হবে না। তবু শেষ পর্যন্ত তার প্রভাবে পড়ে তাঁরা আমাকে যে শাস্তি দিলেন সে যে মৃত্যুর চেয়েও সাংঘাতিক, এ কথা মানুষমাত্রই বলবে।

আমার লোকজনদের সমান দুটি ভাগ করে জলদস্যুদের দুই জাহাজে চালান করা হল, আমার জাহাজে নতুন নাবিকের দল এল। আর আমি? স্থির হল যে ছোট একটি ক্যেম্বু নৌকোতে করে, দুটি দাঁড়, একটি পাল আর

চারদিনের খাবার দিয়ে আমাকে মাঝ সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হবে। জাপানী ক্যাপ্টেন দয়া করে তাঁর নিজের অংশ থেকে আরও চারদিনের খাবার দিয়ে দিলেন আর আমাকে সার্চ করতে কাউকে অনুমতি দিলেন না। নৌকোতে নেমে বসলাম আর সেই ওলন্দাজটা ডেকের উপর দাঁড়িয়ে নিজের ভাষায় যত পারে গালিমন্দ, অভিশাপ আর কটু কথা আমার মাথার উপর বর্ষাতে লাগল!

জলদস্যুদের সঙ্গে দেখা হবার ঘণ্টাখানেক আগে আমি লক্ষ্য করেছিলাম আমরা তখন আছি ৪৬° উত্তর অক্ষাংশে আর ১৮৩° দ্রাঘিমায়। জলদস্যুদের কাছ থেকে কিছু দূরে যাবার পর আমার পকেট-দূরবীণের সাহায্যে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কয়েকটা দ্বীপ দেখতে পেলাম। পাল তুলে দিলাম, অনুকূল বাতাসও পেয়ে গেলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল সব চেয়ে কাছের দ্বীপটি; তিন ঘণ্টায় কায়ক্লেশে সেখানে পৌঁছেও গেলাম।

দ্বীপটা খালি পাথরে ভর্তি, তবে অনেকগুলো পাখির ডিম পেলাম। বুনো ঘাস আর সমুদ্রের শুকনো আগাছা জড়ো করে আগুন জেলে ডিমগুলোকে রোস্ট করলাম। ব্যস্, আর কিছু খেলাম না, সঙ্গের খাবারদাবারগুলোকে যতটা সম্ভব বাঁচিয়ে রাখাই স্থির করলাম। একটা পাথরের আড়ালে রাত কাটালাম; নিচে কিছু বুনো ঘাস পেতে নিয়ে বেশ ভালোই ঘুম হল।

পরদিন আরেকটা দ্বীপে গেলাম, তারপর তৃতীয় ও চতুর্থটাতে। কখনো পাল তুলে দিই, আবার কখনো দাঁড় ব্যবহার করি। আমার দুঃখকষ্টের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে পাঠকমহাশয়কে বিরক্ত করতে চাই না, এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে পঞ্চমদিন যতগুলো দ্বীপ দেখতে পাচ্ছিলাম তার মধ্যে সবার শেষেরটাতে পৌঁছলাম, এটি আগেরটার খানিকটা দক্ষিণ-দক্ষিণ-পূবে অবস্থিত।

যতটা মনে করেছিলাম এ দ্বীপটা আসলে তার চেয়ে আরও খানিকটা দূরে, পাঁচ ঘণ্টার কমে সেখানে পৌঁছনো গেল না। নৌকো লাগাবার একটা ভালো জায়গা খুঁজে বের করতে গিয়ে দ্বীপটার প্রায় সবটা একবার ঘুরে আসতে হয়েছিল; তারপর একটা ছোট খাড়ি পেলাম, আমার নৌকোটার তিনগুণ চওড়া। দেখলাম দ্বীপটার সমস্তটা পাথরে ভরা, মাঝে মাঝে ঘাসের গোছা আর সুগন্ধী পাতার গাছ।

সঙ্গে সামান্য খাবার যা ছিল বের করে একটু খেলাম; চারদিকে মেলা

গুহা, বাকি খাবারটুকু তারি একটার মধ্যে নিরাপদে রেখে দিলাম। পাথরের মধ্যে থেকে প্রচুর ডিম সংগ্রহ করলাম, খানিকটা শুকনো সমুদ্রের আগাছা আর রোদে পোড়া ঘাসও জড়ো করে রাখলাম, ভাবলাম তাই দিয়ে পরদিন আগুন জ্বেলে, যে ভাবে পারি ডিমগুলোকে রোস্ট করা যাবে। সঙ্গে চকমকি, দেশলাই, আতসকাঁচ সবই ছিল।

যে গুহায় খাবার রেখেছিলাম সেখানেই সারারাত শুয়ে রইলাম। পরদিন উনুন ধরাবার জন্য যে শুকনো ঘাস-পাতা রেখেছিলাম সে সব পেতে হল আমার বিছানা। ঘুম হল যৎসামান্য, ক্লান্তির চেয়েও মনের দুশ্চিন্তা বেশি প্রবল, কিছুতেই আর ঘুম এল না। এমন জনমানবশূন্য জায়গায় প্রাণ ধারণ করা যে কত অসম্ভব সেই কথাই মনে হতে লাগল আর ভাবতে লাগলাম কি শোচনীয়ভাবে আমাকে মরতে হবে।

নৈরাশ্যে আর ক্লান্তিতে এতই অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম যে শেষ পর্যন্ত যখন গুহা থেকে কোনোরকমে হামা দিয়ে বেরোবার মতো মনের জোর সংগ্রহ করলাম, তখন বেলা বেড়ে গেছে। কিছুক্ষণ পাথরের মধ্যে ঘুরে বেড়ালাম, আকাশটা ঝকঝকে পরিষ্কার, সূর্যের এত বেশি তেজ যে বাধ্য হয়ে সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখতে হচ্ছিল। হঠাৎ সূর্যটা আড়াল হয়ে গেল, কিন্তু মেঘ হলে যেমন হয় আমার মনে হল এ একেবারেই তা নয়। ফিরে দেখি আমার দৃষ্টিপথ আর সূর্যের মাঝখানে বিরাট নিরেট একটা পদার্থ দ্বীপের দিকেই এগিয়ে আসছে। জিনিসটা মনে হল দু মাইল উঁচুতে রয়েছে আর বেশ ছয় সাত মিনিট ধরে সূর্যকে আড়াল করে রইল, অথচ একটা পাহাড়ের ছায়ায় দাঁড়ালে যতটা ঠাণ্ডা মনে হয় তার চেয়ে বেশি ঠাণ্ডাও মনে হল না, আকাশও অন্ধকার হয়ে এল না।

আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম জিনিসটা যখন তার কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে, দেখলাম শক্ত নিরেট পদার্থ, তার তলার দিকটা চ্যাপ্টা ও মোলায়েম, নিচে থেকে সমুদ্রের ছায়া পড়ে চকচক করছে। সমুদ্রের তীর থেকে দুশো গজ দূরে একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখলাম এই বিশাল বস্তুটি আমার সঙ্গে প্রায় সমান্তরালে আমার কাছ থেকে এক মাইলেরও কম দূরে নেমে এসেছে। পকেট-দূরবীণটা বের করে স্পষ্ট দেখতে পেলাম জিনিসটার গা বেয়ে অনেক লোক ওঠানামা করছে, কিন্তু কি যে তারা করছে সেটা ঠিক বোঝা

গেল না। মানুষের বাঁচবার ইচ্ছা এতই স্বাভাবিক যে মনে মনে খানিকটা আনন্দ হল, এইরকম একটা আশাও পোষণ করতে আরম্ভ করলাম যে হয়তো এই ব্যাপার থেকেই এই জনহীন জায়গা ও আমার বর্তমান দুর্দশা থেকে উদ্ধার পাবার কোনো ব্যবস্থা বা সাহায্য পেয়ে যাব। অবিশ্যি সেই সঙ্গে শূন্যে একটা দ্বীপে মানুষের বসবাস দেখে কি রকম আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম সেটা পাঠক-মহাশয়ের ধারণা করাও কঠিন। দেখে মনে হচ্ছিল মানুষগুলো ইচ্ছামতো দ্বীপটাকে ওঠাতে, নামাতে, কিম্বা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তবে ঠিক সেই সময়ে এই অদ্ভুত ব্যাপার নিয়ে দার্শনিক ব্যাখ্যানা করার মতো আমার মনের অবস্থা ছিল না; আমি মনোযোগের সঙ্গে দেখতে লাগলাম দ্বীপটা কোন দিকে যায়, মাঝে তো কিছুক্ষণের জন্য মনে হয়েছিল যেন একেবারে স্থির হয়ে রয়েছে।

যাই হক, শীঘ্রই দ্বীপটা কাছে এল, এবার তার ধারগুলো দেখতে পেলাম, চারদিকে ধাপে ধাপে মঞ্চের মতো করা রয়েছে, খানিক দূরে দূরে একটা থেকে আরেকটাতে নামবার জন্য সিঁড়িও রয়েছে। সবচেয়ে নিচের ধাপে দেখলাম কয়েকজন লোক লম্বা লম্বা ছিপ ফেলে মাছ ধরছে, কেউ কেউ দাঁড়িয়ে মাছধরা দেখছে। মাথার বড় টুপিটা অনেকদিন গেছে, তাই ছোটটাকেই তুলে ধরে দ্বীপের দিকে লক্ষ্য করে নাড়তে লাগলাম, রুমালও নাড়লাম। তারপর দ্বীপটা যখন খুব কাছে এসে গেল তখন প্রাণপণে চ্যাচাতে লাগলাম; শেষটা সতর্ক হয়ে চেয়ে দেখি দ্বীপের যে দিকটা একেবারে আমার চোখের সামনে পড়েছে, সেখানে মেলা লোক জমায়েৎ হয়েছে।

যে ভাবে ওরা আমার ও পরস্পরের দিকে আঙ্গুল দেখাচ্ছিল তাই দেখে বুঝেছিলাম যে আমাকে ওরা খুব স্পষ্ট করেই দেখতে পেয়েছে, যদিও আমার অত চ্যাচামেচির কেউ কোনো উত্তর দেয়নি। চার পাঁচটা লোককে দেখলাম সিঁড়ি বেয়ে তাড়াতাড়ি দ্বীপের সবচেয়ে উঁচু চুড়োয় উঠে গেল, তারপর আর তাদের দেখতে পেলাম না। আমি ঠিকই অনুমান করলাম যে ওরা গেল কোনো কর্তাব্যক্তির কাছ থেকে নির্দেশ আনতে।

ভিড় আরও বেড়ে গেল; আধ ঘণ্টা না যেতেই দ্বীপটাকে এমন ভাবে সরিয়ে আনা হল যাতে সবচেয়ে নিচের ধাপটি, আমি যে টিপির উপরে দাঁড়িয়েছিলাম সেখান থেকে সমান্তরালভাবে একশো গজের চেয়েও কাছে এসে

গেল। আমি তখন একান্ত প্রার্থীর মতো ভঙ্গী করে, অতিশয় বিনীত কণ্ঠে আবেদন করতে লাগলাম, কিন্তু কোনো উত্তর পেলাম না।

আমার সামনে সব চাইতে কাছে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁদের খুব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলে মনে হচ্ছিল, অন্ততঃ তাঁদের পোষাক দেখে সেইরকম ধারণা হল। তাঁরা নিজেদের মধ্যে খুব গম্ভীরভাবে আলোচনা করতে লাগলেন, আমার দিকেও বারবার তাকাতে লাগলেন। অবশেষে একজন স্পষ্ট, নম্র, মার্জিত ভাষায় ডেকে কি যেন বললেন, শুনতে অনেকটা ইটালীয় ভাষার মতো মনে হল। কাজেই আমি ইটালীয় ভাষাতেই উত্তর দিলাম, ভাবলাম ভাষার লালিত্যটা হয়তো তাঁদের কানে ভালো লাগবে। যদিও কেউ কারও ভাষা বুঝলাম না, তবু আমার ভাবার্থটি সহজেই ওঁরা ধরে নিলেন, আমার দুরবস্থা তো সকলেই দেখতে পাচ্ছিলেন।

তাঁরা ইসারা করে আমাকে পাথর থেকে নেমে সমুদ্র-তীরের কাছে যেতে বললেন, গেলামও তাই। তারপর উড়ন্ত দ্বীপটাকে এমন একটা সুবিধামতো জায়গায় সরিয়ে আনা হল, যাতে তার একটা ধার থাকে ঠিক আমার মাথার উপরে। তারপরে সব চেয়ে নিচের ধাপ থেকে একটা শিকল ঝুলিয়ে দেওয়া হল, শিকলের মাথায় একটা বসবার জায়গা বাঁধা রয়েছে, আমি সেখানে বসে পড়লে পর কপিকলের সাহায্যে আমাকে টেনে উপরে তোলা হল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

লাপুটিয়ানদের মনমেজাজ ও প্রকৃতির বর্ণনা—তাদের জ্ঞানবিদ্যার বিবরণী—রাজা ও রাজসভা বিষয়ক—লেখকের অভ্যর্থনা—দেশবাসীদের ভয়ভাবনা বিষয়ক—মেয়েদের কথা।

নামতেই মেলা লোকে আমাকে ঘিরে ফেলল, তাদের মধ্যে সবচেয়ে কাছে যারা তাদের বেশি অভিজাত বলে মনে হল। আমাকে দেখে তারা যারপরনাই বিস্ময় প্রকাশ করতে লাগল ; আমিও কিছু কম যাই না, কারণ এতাবৎকাল আমি কখনও এমন অদ্ভুত আকৃতি, অবয়ব বা আচরণের মানুষ দেখিনি। মাথাগুলো সব হয় বাঁ দিকে নয়তো ডাইনে হেলে পড়েছে, এক চোখে ভিতর দিকে চেয়ে রয়েছে, অন্য চোখ মাঝ আকাশে তাকিয়ে। বাইরের পোষাক পরিচ্ছদে চাঁদ, সূর্য, তারার নক্সা কাটা, তার সঙ্গে বেহালা, বাঁশি, বীণা, শিঙা ও অন্যান্য বহু বাদ্যযন্ত্র আঁকা, সে সব ইউরোপে কেউ চোখেও দেখে নি।

এখানে ওখানে চাকরের পোষাক পরা অনেকগুলো লোক দেখলাম, তাদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে বেঁটে লাঠি, তার আগায় বাতাসপোরা রবারের থলির মতো কি একটা জিনিস। পরে জেনেছিলাম এই থলিগুলোর মধ্যে এক মুঠো করে শুকনো মটর কিম্বা ছোট ছোট নুড়ি ভরা। থেকে থেকে ওরা এই থলি দিয়ে আশেপাশের লোকদের মুখে আর কানে টোকা মারছে, সে সময় আমি এর কোনো মানে খুঁজে পাইনি। পরে শুনেছিলাম যে এখানকার লোকদের মন সর্বদা নানান গভীর চিন্তায় এতই মগ্ন থাকে যে অন্য লোকে কি বলছে শুনতেও পায় না, নিজেরাও কিছু বলতে পারে না, যদি না বাইরে থেকে বাক্‌যন্ত্র আর শ্রবনেন্দ্রিয়কে প্রভাবিত করে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়। এই কারণে যাদেরই সঙ্গতিতে কুলোয় তারাই বাড়িতে অন্যান্য চাকরবাকরের সঙ্গে একটি করে 'টোকাদার' রাখে, তাকে ওরা বলে 'ক্লিমেনোলে'। এই লোকটিকে সঙ্গে না নিয়ে ওরা কোথাও বেড়াতে বা কারও সঙ্গে দেখা করতে যায় না।

এই কর্মচারীটির কাজই হল, যখনি দু-তিন জন একসঙ্গে কথাবার্তা বলতে বসে, তখন যে কথা বলবে তার মুখে আর যে বা যারা তার কথা শুনবে, তাদের ডান কানে ঐ থলি দিয়ে আস্তে আস্তে টোকা দেওয়া। এর আরেকটা কাজ হল মুনিব যখনি বাইরে বেরুবেন সঙ্গে থাকা আর মাঝে মাঝে তাঁর চোখে মৃদু একটা টোকা দেওয়া, কারণ সে ভদ্রলোক সর্বদাই এতই ভাবে বিভোর থাকেন যে খাড্ডা পেলেই তাতে পড়বেন, থাম্বা পেলেই তাতে মাথা, ঠুকবেন। আর পথে চলতে হয় অন্য লোকের সঙ্গে হবে ঠেলাঠেলি, নয় ঠেলা খেয়ে নিজে ঢুকবেন গিয়ে কারো কুকুর থাকবার ঘরে।

এই তথ্যগুলি নিতান্ত দরকারী বলেই পাঠকমহাশয়কে বললাম নইলে তিনি এদের কাণ্ডকারখানা কিছুই বুঝে উঠতে পারবেন না, যেমন আমার অবস্থাও হয়েছিল, এরা যখন সিঁড়ি বেয়ে আমাকে প্রথমে দ্বীপের চূড়োয় তার পর সেখান থেকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেল। এমন কি সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতেই বারকয়েক নিজেরা কোথায় যাচ্ছে না যাচ্ছে তাই ভুলে গিয়ে আমাকে দিলে একা ছেড়ে, যতক্ষণ না টোকাদাররা এসে আবার সব কথা মনে করিয়ে দিল। আমার বিদেশী পোষাক, অন্যরকম চেহারা আর জনসাধারণের চীৎকারেও তাদের উপরে কোনো প্রভাব হতে দেখলাম না। সাধারণ লোকদের চিন্তা আর মন কিন্তু অনেকখানি স্বাধীন।

শেষ পর্যন্ত প্রবেশ করলাম গিয়ে রাজপ্রাসাদে, তারপর একেবারে রাজ দরবারে। সেখানে দেখলাম সিংহাসনে বসে আছেন মহারাজ, তাঁর দুপাশে দেশের সবচেয়ে সম্মানিত রাজন্যবর্গ। সিংহাসনের ঠিক সামনে মস্ত একটা টেবিল, তার উপরটা কতরকম মণ্ডল, ভূগোলকের প্রতিকৃতি আর যত রকম গণিত শাস্ত্র সম্বন্ধীয় যন্ত্রপাতিতে বোঝাই। আমরা রাজসমীপে উপস্থিত হওয়াতে যথেষ্ট গোলযোগ হয়েছিল, এমনিতেই সভায় বিরাট জনতা, কিন্তু মহারাজ আমাদের দিকে এতটুকু দৃক্‌পাতও করলেন না। তখন তিনি এক মহা সমস্যায় নিমগ্ন, আমরা কম করে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করবার পর সমস্যার সমাধান হল।

রাজার দুপাশে দুটি ছোকরা অনুচর, তাদের হাতে দুটি টোকা দেবার লাঠি। এরা দুজনে যেই দেখল মহারাজের একটু অবকাশ হয়েছে, একজন আস্তে তাঁর মুখে আর অন্যজন তাঁর ডান কানে টোকা দিল। তিনি তখন ধড়মড় করে

উঠলেন, হঠাৎ জেগে গেলে লোকে যেমন করে। তারপর আমার আর আমার সাঙ্গোপাঙ্গদের দিকে তাকিয়ে আমাদের আগমনের হেতুটা তাঁর মনে পড়ে গেল, কারণ এ বিষয়ে তাঁকে আগেই সংবাদ দেওয়া হয়েছিল।'

তিনি কি যেন কটা কথা বললেন, অমনি লাঠি হাতে এক যুবক এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমার ডান কানে মৃদু টোকা দিল, আমি অবিশ্যি যতটা পারি ইসারায় বোঝাতে চেষ্টা করলাম এসবের কোনোই প্রয়োজন নেই। পরে শুনেছিলাম এতে নাকি আমার জ্ঞানবুদ্ধি সম্পর্কে রাজার ও সভাসদ্দের সকলের ভারি হীন ধারণা হয়েছিল। আন্দাজে মনে হল রাজা আমাকে অনেকগুলো প্রশ্ন করলেন আর আমি যতগুলো ভাষা আমার জানা আছে প্রত্যেকটাতে উত্তর দিলাম।

যখন দেখা গেল আমি ওদের কথাও বুঝি না, আমার নিজের কথাও বোঝাতে পারি না, তখন রাজার আদেশে প্রাসাদের অন্য একটা ঘরে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল। পূর্ববর্তী রাজাদের তুলনায় ইনি আতিথেয়তার জন্যে বিশেষভাবে খ্যাত ছিলেন। আমার দেখাশোনার জন্য দুজন চাকর নিযুক্ত হল। তারা আমার খাবার নিয়ে এল; চারজন বিশিষ্ট রাজপুরুষ, সভায় যাঁদের রাজার খুব কাছাকাছি বসতে দেখেছিলাম বলে মনে পড়ল, আমার সঙ্গে আহার করে আমাকে সম্মানিত করলেন।

দুই প্রস্থ খাবার এল, একেক প্রস্থে আবার তিনটি করে পদ। প্রথমে ভেড়ার কাঁধের মাংস, সমকোণ ত্রিভুজের আকারে কাটা, তারপর এল গোরুর মাংস, জ্যামিতির রম্বয়ডের আকারে কাটা, আর একটা সাইক্লয়ড আকারের পুডিং! দ্বিতীয় প্রস্থে ছিল দুটো হাঁস, বেহালার মতো আকারে বেঁধে রান্না করা, বাঁশি আর সানাই-এর মতো দেখতে সসেজ আর পুডিং আর বীণার আকারে কাটা খানিকটা বিশেষ রকমের মাংস। চাকররা আমাদের জন্য রুটি কেটে দিল নানারকম জ্যামিতিক আকারে।

খেতে বসে সাহস করে ওদের ভাষায় অনেকগুলি জিনিসের নাম জানতে চাইলাম, তাঁরাও মহাখুসি হয়ে টোকাদারদের সাহায্য নিয়ে সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তাঁদের মনে বড় আশা একবার তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে পারলে তাঁদের নানান অসাধারণ ক্ষমতা দেখে, তাঁদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধায় পূর্ণ

হয়ে যাব! অল্প সময়ের মধ্যেই রুটি কিম্বা কোনো পানীয় কিম্বা অন্য যা কিছু দরকার, ওদের ভাষাতে চাইতে শিখলাম।

খাবার পর অতিথিরা বিদায় নিলেন আর রাজার আদেশে টোকাদারসহ একজন লোককে আমার কাছে পাঠানো হল। ইনি সঙ্গে করে নিয়ে এলেন কালি, কলম, কাগজ আর তিন চারখানি বই এবং ইসারায় জানালেন যে ওঁদের ভাষাটা আমাকে শিখিয়ে দেবার জন্যে ওঁকে পাঠানো হয়েছে। চার ঘণ্টা এক সঙ্গে বসলাম, এই সময়ের মধ্যে একটার নিচে একটা কথার লম্বা তালিকা করে অনেক শব্দ আর তার পাশেই তাদের অনুবাদগুলো লিখে ফেললাম। তাছাড়া অনেকগুলো ছোট ছোট বাক্য শিখবার চেষ্টা করলাম। আমার শিক্ষক মহাশয় করতেন কি, একটা চাকরকে বলতেন কিছু একটা আনতে, কিম্বা ঘুরে দাঁড়াতে, নিচু হয়ে নমস্কার করতে, বসতে কিম্বা দাঁড়াতে, কিম্বা হাঁটতে, কিম্বা ঐ ধরণের কিছু করতে। সঙ্গে সঙ্গে আমিও ঐ আদেশটি লিখে নিতাম। শিক্ষক মহাশয় তাঁর একটা বই থেকে সূর্য, চাঁদ, তারা, রাশিচক্র, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল ও মেরুচক্র ইত্যাদির ছবি আর অনেকগুলি জ্যামিতিক সমতল ও ঘন ক্ষেত্রের নক্সা দেখালেন। যতরকম বাদ্যযন্ত্র হয় ওদেশে, সবকটির নাম ও বর্ণনা দিলেন; তাছাড়া ওগুলি বাজাতে গেলে যে সব শব্দের প্রয়োজন হয় তাও বলে দিলেন।

উনি চলে গেলে পর ঐ সব শব্দ আর তাদের ব্যাখ্যা বর্ণানুক্রমিক ভাবে সাজিয়ে ফেললাম। এইভাবে কয়েক দিনের মধ্যে আমার তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির সাহায্যে ওদের ভাষাটা মোটামুটি বুঝে নিতে পারলাম।

যে মূল নামের অনুবাদ করেছিলাম "উড়ন্ত কিম্বা ভাসমান দ্বীপ," সেটি হল "লাপুটা"। নামটার প্রকৃত ব্যাকরণ সূত্র কিন্তু কিছুতেই জানতে পারি নি। ওদের দেশের অধুনা অপ্রচলিত প্রাচীন ভাষায় 'লাপ' শব্দের অর্থ উচ্চ আর 'উন্টা' মানে রাষ্ট্রপাল। ওরা বলে এই 'লাপুন্টা' শব্দেরই অপভ্রংশ হল 'লাপুটা'। তবে এই ব্যাখ্যা আমার মনে ধরে না, যেন জোর করে করা বলে মনে হয়। পণ্ডিতদের কাছে আমার নিজের একটা অনুমান নিবেদন করেছিলাম— যথা লাপুটা শব্দ এসেছে 'লাপ' অর্থাৎ সমুদ্রের উপরে সূর্য-কিরণের খেলা এবং 'উটেড' অর্থাৎ ডানা—এই দুটি শব্দের মিলন থেকে।

অবিশ্যি একথা নিয়ে আমি কোনোরকম অন্যায় আবদার করছি না, বুদ্ধিমান পাঠকের বিচারের উপরেই ছেড়ে দিচ্ছি।

যাঁদের হাতে রাজা আমার দেখাশুনোর ভার দিয়েছিলেন, তাঁরা আমার পোষাক পরিচ্ছদের দুরবস্থা দেখে, পরদিন সকালে আমার নতুন পোষাকের জন্যে মাপ নিতে একজন দর্জিকে ডেকে পাঠালেন। ইউরোপের জাতভাইদের মতো করে কিন্তু এ ব্যক্তি কাজ সম্পন্ন করল না। ঐ একটা কোণমান যন্ত্র দিয়ে আমার দৈর্ঘ্য মাপল, তারপর রুল কম্পাস্ দিয়ে আমার সমস্ত শরীরের মাপযোখ, উঁচুনিচু আঁকাবাঁকার হিসাব করল। এ সমস্ত সে কাগজে লিখে নিল, তারপর ছ' দিন বাদে অতি বেঢক বদ্ ফিটের কাপড় চোপড় তৈরী করে নিয়ে এল, তার কারণ যে তার হিসেবের মধ্যে একটা অঙ্ক ভুল হয়ে গিয়েছিল! তবে এ রকম দুর্ঘটনা ওখানে প্রায়ই হয়ে থাকে, কেউ কিছু মনেও করে না, এই আমার একমাত্র সান্ত্বনা।

কিছুদিন ঘরে বন্ধ ছিলাম কাপড়চোপড়ের অভাবে, তারপরে শরীর খারাপ হওয়াতে আরও কিছুদিন; ইতিমধ্যে আরও অনেকগুলো শব্দ ও তাদের মানে শিখে নিজের ভাষা জ্ঞানটা বাড়িয়ে ফেললাম। তারপরে যখন রাজসভায় গেলাম রাজার অনেক কথারই মানে বুঝতে পারলাম, আর কিছু কিছু উত্তরও দিলাম। রাজা আদেশ করলেন দ্বীপটাকে উত্তরপুর্ব থেকে পুবে নিয়ে গিয়ে, নিচে শক্ত মাটিতে অবস্থিত ওঁদের দেশের রাজধানী লাগাদোর ঠিক মাথার উপরে রাখতে। সহরটা ওখান থেকে দুশো সত্তর মাইল দূরে, যেতে লাগল সাড়ে চার দিন। দ্বীপটা যে আকাশে ভ্রমণ করছে এ আমি একটুও টের পাচ্ছিলাম না। দ্বিতীয় দিন বেলা এগারোটার সময় স্বয়ং রাজা, তাঁর রাজন্য-বর্গ, সভাসদ্ ও অন্যান্য রাজপুরুষরা সকলে মিলে যে যার বাদ্যযন্ত্র গুছিয়ে নিয়ে এক নাগাড়ে তিন ঘণ্টা বাঁজিয়ে গেলেন, একবারও থামলেন না। ঐ রকম সাংঘাতিক আওয়াজ শুনে আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম; যতক্ষণ না আমার শিক্ষক মহাশয় সব বুঝিয়ে বললেন, ব্যাপারটার কোনো মানেই বুঝতে পারি নি।

তিনি বললেন ওঁদের দ্বীপবাসীদের সকলের কান মহাশূন্যের সঙ্গীত শুনবার জন্য প্রস্তুত, এই সঙ্গীত বিশেষ বিশেষ সময় ধ্বনিত হয় আর সভাসদ্‌রা সকলে, যে যে যন্ত্রে পারদর্শী, সেই যন্ত্রের সাহায্যে নিজেদের কর্তব্য পালনে এখন তৎপর।

রাজধানী লাগাদো যাবার পথে রাজা আদেশ করলেন কয়েকটি বিশেষ নগর ও গ্রামের উপরে থামতে হবে, যাতে ওখানকার প্রজাদের কাছ থেকে আবেদন নিবেদন গ্রহণ করা যায়। এই উদ্দেশ্যে অনেকগুলো টনসুতোর আগায় ছোট ছোট ওজন বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। এই টন সুতোর সঙ্গেই প্রজারাও তাদের আবেদনপত্র জড়িয়ে দিল। ছোট ছেলেদের ঘুড়ি যখন আকাশে উড়ছে, তখন তার সুতোর সঙ্গে কাগজের কুচি জড়িয়ে দিলে, সেগুলো যেমন দেখতে দেখতে সুতো বেয়ে উপরে উঠে যায়, এদের আবেদন-পত্রগুলোও ঠিক তেমনি করে সুতো বেয়ে উপরে উঠে এল। মাঝে মাঝে মদ ও খাবার আসতে লাগল নিচে থেকে, সেগুলোকে কপিকলের সাহায্যে তোলা হল।

এদের ভাষাবিন্যাস শেখার ব্যাপারে আমার গণিতবিদ্যা খুব কাজে এল, কারণ এদের ভাষার ভিত্তিই হল অঙ্ক ও সঙ্গীত শাস্ত্রের উপরে। আর শেষোল্লিখিত বিষয়েও আমি নিতান্ত অপটু ছিলাম না। মনের ভাব প্রকাশ করতে ওরা ক্রমাগত রেখা ও জ্যামিতিক চিত্রের শরণ নেয়, যেমন কোনো নারীর রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে রম্বস, বৃত্ত, সামন্তরিক, উপবৃত্ত ইত্যাদি নানান জ্যামিতিক শব্দ ব্যবহার করে, নয়তো সঙ্গীত শাস্ত্রে সাধারণত প্রচলিত সব পদ ব্যবহার করে; সেগুলি এখানে উল্লেখ করে কাজ নেই। রাজার পাকশালেও গণিত ও সঙ্গীত শাস্ত্রে ব্যবহৃত যন্ত্রাদি দেখলাম, এগুলির আকৃতি দেখে, মহারাজের টেবিলে পরিবেশন করবার জন্য মাংস কাটা হয়।

এঁদের বাড়ি-ঘর বড় বিশ্রীভাবে তৈরী, দেয়ালগুলো তেড়াবাঁকা, ঘরের মধ্যে কোথাও একটা সমকোণ নেই। এই খুঁতগুলির কারণ হল ব্যবহারিক জ্যামিতির প্রতি এঁদের দারুণ অশ্রদ্ধা। ব্যবহারিক জ্যামিতির নাকি কোনো আভিজাত্য নেই, নিতান্তই যান্ত্রিক ব্যাপার। ওঁরা নিজেরা যে সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপদেশ দেন সে সবই কারিগরদের বোঝার বাইরে! কাজেই ক্রমাগত কাজে ভুল হতে থাকে। যদিও কাগজে কলমে এঁরা ভারি বিজ্ঞ, তবু এটা লক্ষ্য করেছিলাম যে একটা রুল ধরতে, কি পেন্সিল চালাতে, কি একটা বিভাজক ব্যবহার করতে গিয়ে, কিম্বা দৈনিন্দিন জীবনের সাধারণ কাজকর্মে এদের মতো আনাড়ি, অকেজো লোক আমি কোথাও দেখিনি। আরও দেখলাম যে অঙ্ক আর সঙ্গীত ছাড়া অন্য সব বিষয়ে কিছু ধারণা করতে গেলেই এঁরা বিমূঢ় ও

হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। ভালো যুক্তি দেখিয়ে তর্ক করতে পারেন না, প্রবলভাবে আপত্তি জানান, এক যদি না কেউ উচিত মত প্রকাশ করে, কিন্তু সেটা হয় কালে ভদ্রে। কল্পনা, খেয়াল, উদ্ভাবন এসব বিষয়ে তাঁদের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই, এমন কি এসব প্রকাশ করবার মতো ওঁদের ভাষায় কোনও শব্দই নেই। পূর্বোল্লিখিত দুইটি বিষয়ের, যথা অঙ্ক ও সঙ্গীত শাস্ত্রের ক্ষেত্রের মধ্যে ওঁদের সমগ্র ভাবের ও চিন্তার ক্ষেত্র সীমিত।

ও দেশের অধিকাংশ লোকেরই, বিশেষ করে যাঁরা গ্রহবিজ্ঞান নিয়ে চর্চা করে থাকেন তাঁদের, জ্যোতিষ শাস্ত্রমতে গণনা ইত্যাদিতে গভীর বিশ্বাস, অবিশ্যি এ কথা তাঁরা সর্বজনসমক্ষে স্বীকার করতে লজ্জা পান। কিন্তু যা দেখে আমার সবচেয়ে বিস্ময়ের উদ্রেক হল এবং যেটা আমার কাছে একেবারে যুক্তিরহিত বলে মনে হত, সেটা হল সংবাদ ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে এঁদের প্রবল আকর্ষণ। সদাই জনসাধারণের সব ব্যাপারে নাক গলানো চাই, যাবতীয় রাষ্ট্রীয় বিষয় সম্পর্কে মন্তব্য করা চাই। ইউরোপেও যত গণিতশাস্ত্রবিদ্ দেখেছি তাদের মধ্যেও এই প্রবণতাটি সর্বদা লক্ষ্য করেছি, অথচ এই দুটি বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্কটা যে কোথায় তা কোনোদিনই আবিষ্কার করতে পারি নি। এক যদি এঁরা মনে করেন যে যেহেতু ক্ষুদ্রতম বৃত্তের কেন্দ্রেও যতগুলি ডিগ্রি, বৃহত্তম বৃত্তেরও তাই, অতএব ভূ-গোলক নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে যতখানি বিদ্যার প্রয়োজন পৃথিবীর আইনবিধান ও শাসনব্যাপারেও তার বেশি লাগতে পারে না। তবে আমার নিজের বরং এই মত যে এই প্রবণতার কারণ খুঁজতে হয় মানুষের একটা অতি সাধারণ দুর্বলতার মধ্যে, যথা যে-সমস্ত ব্যাপারের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই এবং যে-বিষয়ে আমাদের কোনো চর্চাও নেই, জন্মগত প্রতিভাও নেই, ঠিক সেই সব বিষয়েই আমাদের সব চেয়ে বেশি কৌতূহল ও অহমিকা দেখা যায়।

এখানকার লোকদের মানসিক অশান্তির আর অবধি নেই, এক মুহূর্তের জন্যেও এরা নিশ্চিন্তে থাকতে পারে না আর এই সব মানসিক অশান্তির কারণগুলোও এমন যাতে মানবজাতির ব্যক্তিদের সামান্যই এসে যায়। এদের দুর্ভাবনার কারণ হল পাছে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের নিয়মে হঠাৎ কোনো পরিবর্তন হয়। ওদের একটা ভয় হল যে সূর্য যদি ক্রমশঃ পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসতে থাকে, তাহলে এমন একদিন আসবে

যখন সূর্য পৃথিবীকে একেবারে আত্মসাৎ করে গিলে ফেলবে। আরেকটা ভয় হল যে সূর্য থেকে যে বাষ্প উদ্গত হয়, সেই বাষ্প যদি কখনও সূর্যকে আবৃত করে ফেলে তাহলে সূর্যের আলো আর পৃথিবীতে এসে পৌছবে না। শেষ যেবার পৃথিবীর কাছে একটা ধূমকেতু এসেছিল, তার ল্যাজের আঘাত থেকে পৃথিবীটা একটুর জন্যে বেঁচে গিয়েছিল নইলে আরেকটু হলেই পৃথিবী ভস্ম হয়ে যেত! ওদের হিসাব অনুসারে একত্রিশ বছর বাদে আবার একটা ধূমকেতু আসবে আর এবার সত্যি সত্যি পৃথিবীর ধ্বংস হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে।

এরা বলে অনুসূরের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ ধূমকেতুটা যখন সূর্যের সবচেয়ে কাছে আসে, তখন যদি একটা বিশেষ ডিগ্রির মধ্যে পৌছয়—এবং ওদের হিসাবে এবার ঠিক তাই হবার ভয় আছে—তাহলে ধূমকেতুটা আগুনে তেতে লাল হওয়া লোহার চেয়ে দশহাজার গুণ বেশি তাপ সঞ্চয় করে, আবার যখন সূর্যের কাছ থেকে সরে আসবে, তখন ওর জ্বলন্ত ল্যাজটার দৈর্ঘ্য হবে দশ লক্ষ চোদ্দ মাইল। পৃথিবীটা যদি ধূমকেতুর কেন্দ্র কিম্বা মূল দেহ থেকে এক লক্ষ মাইল দূর দিয়েও চলে, তাহলেও চলতে চলতে আগুন লেগে, গোটা পৃথিবী ছাই হয়ে যাবে।

আরও ভয় ওদের সূর্যটা যে কেবল কিরণ বিকীরণ করেই যাচ্ছে, তার বদলে ক্ষতিপূরণরূপে কিছু পাচ্ছে না, এর ফলে তো শেষ পর্যন্ত একদিন সূর্য একেবারে জ্বলে শেষ হয়ে যাবে; তার অবশ্যম্ভাবী ফল হবে পৃথিবী আর যত সব গ্রহ সূর্যের আলোর উপরে নির্ভর করে আছে, তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে।

এইসব এবং এই ধরণের আরও আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা কল্পনা করে ওরা সর্বদা এতই ত্রস্তশঙ্কিত যে না পারে বিছানায় শুয়ে আরামে একটু ঘুমোতে, না পারে জীবনের সাধারণ সুখ ও আনন্দ উপভোগ করতে। চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হলেই প্রথম প্রশ্ন হবে সূর্যের কি অবস্থা, উদয় এবং অস্তের সময় দেখতে কেমন হয়েছিল আর আসন্ন ধূমকেতুর তাপটা এড়িয়ে যাবার কতখানি আশা আছে।

এসব আলোচনায় ওরা কি রকম ভাব নিয়ে প্রবৃত্ত হয় বলছি, ঠিক যে রকম মনের ভাব নিয়ে ছোট ছেলেরা ভয়ঙ্কর সব ভূত-প্রেতের গল্প শোনে আর তার পরে রাত্রে ভয়ের চোটে শুতে যেতে চায় না!

দ্বীপের মেয়েদের মধ্যে খুব একটা প্রাণচাঞ্চল্য দেখলাম। নিজেদের স্বামীদের তারা অত্যন্ত ঘৃণা করে, কিন্তু অতিথি অভ্যাগতদের খুব ভালোবাসে। নিচের মহাদেশ থেকে সর্বদাই প্রচুর অতিথি সমাগম হয়; পৌরব্যবস্থার কাজে, বা অন্য কোন সংস্থার কাজে, কিম্বা হয় তো কোনও ব্যক্তিগত কারণেই তারা রাজসভায় হাজিরা দিতে আসে। স্বামীরাও এই সমস্ত সুবিধাগুলি পেতে চায় বলে তাদের প্রতি মেয়েদের যত ঘৃণা। অতিথিদের মধ্যে থেকে মহিলারা তাদের পছন্দমতো নাগর বেছে নেয়। তবে মুস্কিল হচ্ছে কি, এদের আচরণের মধ্যে বড় বেশি সহজ নিশ্চয়তার ভাব থাকে। তার কারণ স্বামী সর্বদাই এত গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকে যে স্ত্রী এবং তার নাগরটি চোখের সামনেই যতদূর সম্ভব বাড়াবাড়ি করে যাক না কেন, স্বামীর হাতে যদি কাগজ ও যন্ত্রপাতি থাকে আর সঙ্গে যদি টোকাদার না থাকে, তা হলে কিছুই তার চোখে পড়বে না।

এখানে অশেষ প্রাচুর্য আর জাঁকজমকের মধ্যে বাস করতে পারে, তাছাড়া যখন যা ইচ্ছা করতে পারে, তবু স্ত্রী-কন্যাদের দ্বীপের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হয় বলে সে কি দুঃখ! আমার কিন্তু মনে হত এমন চমৎকার জায়গা পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। স্ত্রী-কন্যাদের দুনিয়া দেখবার সখ, সহরের নানান আমোদ-প্রমোদে যোগ দেবার ইচ্ছা, অথচ রাজার কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি না পেলে কিছুই করবার জো নেই। অনুমতি পাওয়াও খুব সহজ নয়, কারণ অভিজাত বংশের পুরুষরা বহু অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছেন যে তাঁদের বাড়ির মেয়েরা একবার নিচের মাটিতে নামলে তাঁদের ফিরিয়ে আনা বড় শক্ত।

রাজসভার একজন সম্মানিত মহিলার গল্প শুনলাম। ভদ্রমহিলার অনেকগুলি ছেলেমেয়ে, তাঁর স্বামী হলেন প্রধান মন্ত্রী, এরাজ্যে তাঁর মতো ধনী কোনো প্রজা নেই, দেখতে শুনতেও চমৎকার, থাকেন দ্বীপের সব চাইতে সুন্দর প্রাসাদে। স্বাস্থ্যোদ্ধারের অছিলায় স্ত্রী গেলেন লাগাদোয়, তারপর অনেক মাস কেটে গেল স্ত্রীটি একেবারে গা ঢাকা দিয়ে রইলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে খুঁজে আনবার জন্যে রাজা ওয়ারেণ্ট জারি করলেন। পাওয়া গেল তাঁকে নগণ্য একটা সরাইখানায়, ছেঁড়া কাপড়-চোপড় পরনে, বুড়ো বিকৃত চেহারার একটা চাকরের খরচ জোগাবার জন্য দামী পোষাক সব বন্ধক দিয়েছেন,

উপরন্তু লোকটা রোজ তাঁকে ধরে পেটে, তারই সঙ্গে ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভদ্রমহিলাকে গ্রেপ্তার করা হল। তাঁর স্বামী অতি সদয়ভাবে তাঁকে আবার গ্রহণ করেছিলেন, একটি অনুযোগের কথাও মুখে আনেন নি, তা সত্ত্বেও অল্প দিনের মধ্যেই গয়নাগাঁটি নিয়ে ভদ্রমহিলা আবার তাঁর নাগরের কাছে লুকিয়ে পালালেন, আর তাঁর কোন খবর পাওয়া যায়নি।

পাঠক মহাশয়ের মনে হতে পারে এ ঘটনাটা অত দূর দেশের কাহিনী না হয়ে বরং ইউরোপ কিংস্বা ইংল্যাণ্ডের ব্যাপার! তবে তাঁকে একথা স্মরণ রাখতে অনুরোধ করি যে স্ত্রীজাতির খামখেয়াল কোনও দেশ বা জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না এবং আপাতদৃষ্টিতে আমরা যতটা মনে করি, আসলে তার চেয়ে তাদের আচরণের মধ্যে অনেক বেশি সমতা থাকে।

এক মাসের মধ্যে ওদের ভাষা শেখাতে প্রচুর উন্নতি করে ফেললাম, এবার যখন রাজসমীপে যাবার অনুমতি পেলাম, রাজার বেশির ভাগ প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারলাম। যে সব দেশ দেখেছি সেখানকার আইন, শাসনপ্রণালী, ইতিহাস, ধর্ম কিম্বা আচার-ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর এতটুকুও কৌতূহল ছিল না; তাঁর প্রশ্নগুলি কেবলমাত্র গণিতশাস্ত্রের ক্ষেত্রে সীমায়িত এবং সে বিষয়ে আমার বিবৃতি অত্যন্ত তাচ্ছিল্য এবং অবহেলার সঙ্গেই শুনলেন, যদিও দুপাশ থেকে টোকাদাররা বারে বারে তাঁকে সচেতন করে দিচ্ছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

আধুনিক দর্শন ও জ্যোতিবশাস্ত্রের সাহায্যে একটি প্রাকৃতিক ঘটনার সমাধান—শেষোল্লিখিত বিষয়ে লাপুটিয়ানদের বহুল উন্নতি—রাজার বিদ্রোহ দমনের নীতি।

দ্বীপের দ্রষ্টব্য বস্তু দেখবার জন্যে রাজার অনুমতি ভিক্ষা করলাম। তিনি অনুগ্রহ করে তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিলেন ও আমার শিক্ষক মহাশয়কে সঙ্গে যেতে আদেশ করলেন। আমার প্রধান জ্ঞাতব্য ছিল কোন প্রাকৃতিক শক্তিতে কিম্বা শিল্পকৌশলে দ্বীপটি নানান দিকে চলাফেরা করে। এবার তারই একটি যুক্তিসংগত বিবরণী পাঠক মহাশয়কে নিবেদন করছি।

এই ভাসমান কিম্বা উড্ডুক্কু দ্বীপটি আকৃতিতে একটি নিখুঁত বৃত্ত। এর ব্যাসের মাপ হল ৭৮৩৭ গজ, অর্থাৎ সাড়ে চার মাইল, তার মানে ক্ষেত্রফলটি হল দশ হাজার একর। দ্বীপটি তিন শো গজ পুরু। তলদেশটা অর্থাৎ যে অংশটা নিচে থেকে দেখা যায়, সেটি হল একটি সমান মসৃণ অ্যাডামাণ্ট পাথরের ফলক, এর পুরুত্ব হল দুশো গজ। এই পাতের উপরে আছে কয়েক পরত বিভিন্ন ধাতু, ঠিক যে ক্রমিক মানে প্রাকৃতিক জগতে দেখা যায় সেইভাবে সাজানো। সবচেয়ে উপরে দশ বারো ফুট গভীর উর্বরা মাটির পরত।

সমস্ত দ্বীপটা কিনারা থেকে ক্রমশঃ ঢালু হয়ে মাঝখানটাতে খোঁদল কাটা। এই কারণে দ্বীপে যত শিশির বা বৃষ্টির জল পড়ে সব ছোট ছোট নদীর আকার নিয়ে বয়ে এসে মাঝখানে চারটে বড় বড় পুকুরে জমা হয়। এই পুকুরগুলোর একেকটার চার ধার ঘুরে আসতে আটমাইল পথ, আর মধ্য বিন্দু থেকে পাড়ের দূরত্ব দুশো গজ। সারাদিন সূর্যের তাপে এই পুকুরগুলোর জল বাষ্প হয়ে উড়ে যায় বলে কখনো জল উপ্‌চিয়ে তীর ভেসে যায় না। তাছাড়া আকাশের যে স্তরে মেঘ আর জলীয় বাষ্প থাকে, দ্বীপটাকে তারও উর্ধ্বে নিয়ে যাবার ক্ষমতা আছে রাজার, কাজেই ইচ্ছা মতো তিনি শিশির ও বৃষ্টিপাত বন্ধ রাখতে পারেন। এখানকার প্রকৃতিবিদ্‌রা সকলেই এ বিষয়ে একমত যে মেঘ যত উপরেই উঠুক না কেন, দু মাইলের বেশি উঠতে পারে না, অন্ততঃ এদেশে কখনও উঠেছে বলে শোনা যায়নি।

দ্বীপের ঠিক মাঝখানে পঞ্চাশ গজ ব্যাসের একটা গর্ত আছে, এই গর্ত দিয়ে জ্যোতির্বিদ্‌রা নিচে একটা গম্বুজের মধ্যে নেমে যান। গম্বুজটার নাম 'ফ্লান্দোনা গানিওলে' অর্থাৎ 'জ্যোতিবিদের খাঁচা'। দ্বীপের নিচে যে অ্যাডামাণ্ট পাথরের স্তর আছে, গম্বুজটা তার মধ্যে একশো গজ নেমে গেছে। এই গুহাটার মধ্যে দিন রাত কুড়িটা আলো জ্বলে। অ্যাডামাণ্ট পাথরের দেয়াল থেকে সেই আলো বিচ্ছুরিত হয়ে সমস্ত জায়গাটাকে উজ্জ্বলভাবে আলো করে রাখে।

এখানে নানা রকম কোণ মাপার, দূরত্ব মাপার যন্ত্র, দূরবীণ, উচ্চতা নির্ণয়ের জন্য অ্যাস্ট্রোলেব ও জ্যোতিবিদ্‌ শাস্ত্রে ব্যবহৃত নানান যন্ত্র রাখা আছে। কিন্তু সব চাইতে কৌতূহলের যে বস্তু এবং যার উপর সমস্ত দ্বীপটির নিরাপত্তা নির্ভর করে আছে, সেটি হল বিশাল একটি চুম্বক পাথর, আকারে অনেকটা তাঁতের মাকুর মতো। লম্বায় এই পাথরটা হল ছয় গজ, সবচেয়ে মোটা জায়গার বেড় তিন গজেরও বেশি তো বটেই। চুম্বক পাথরটার মধ্যে দিয়ে অ্যাডামাণ্টের তৈরী একটা অক্ষ দণ্ড গিয়েছে, তারই উপরে পাথরটা ঘোরে আর এমনি নিখুঁত তার ভারসাম্য যে ক্ষীণতম ছোঁয়া লাগলেই নড়ে। চুম্বকের চারিদিকে ফাঁপা একটা অ্যাডামাণ্টের তৈরী গোল চোঙের মতো বেষ্টনী বা বেড় দেওয়া, সেটি চার ফুট পুরু, চার ফুট চওড়া আর বারো গজ তার ব্যাস। ছ গজ উঁচু আটটা অ্যাডামাণ্টের পায়ার উপরে এ জিনিসটি আড়ভাবে বসানো আছে। ভিতর দিকের ঠিক মাঝখানে বারো ইঞ্চি গভীর একটা খাঁজ কাটা আছে. তার মধ্যে অক্ষদণ্ডের মাথা দুটি বসানো আর প্রয়োজন মতো ঘোরানোও যায়।

এই পাথরটাকে গায়ের জোরেও জায়গা থেকে নড়ানো যায় না, কারণ যে অ্যাডামাণ্টের স্তর দিয়ে দ্বীপের তলার অংশটি তৈরী, চুম্বকের বেষ্টনী আর পায়াও সেই একই পাথরের গা কেটে অবিচ্ছিন্নভাবে তৈরী।

এই চুম্বক পাথরটির সাহায্যেই দ্বীপটাকে ওঠানো-নামানো ও এক জায়গা থেকে অন্য যায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়।

যে ভূমিখণ্ড মহারাজের আধিপত্যে তার সঙ্গে চুম্বকটির এক মাথার আকর্ষণী সম্পর্ক, অন্য মাথার বিকর্ষণী সম্পর্ক। আকর্ষণী প্রান্তটিকে নিচের দিকে রেখে চুম্বক পাথরটাকে অক্ষদণ্ডের উপরে খাড়া করলে দ্বীপ সোজা নিচে নেমে

আসে ; বিকর্ষণী প্রান্তটিকে নিচের দিকে রাখলে দ্বীপ সোজা উপরে উঠে যায়। চুম্বক পাথরটিকে ভূপৃষ্ঠের সমান্তরাল করে রাখলে, দ্বীপও সমান্তরাল ভাবে এগোয় পিছোয়। চুম্বকের দুই মুখ যেদিকে থাকবে, তার শক্তিরও বিকাশ হবে তার সঙ্গে সমান্তরালভাবে।

এই রকম সমান্তরাল গতির সাহায্যে দ্বীপটিকে রাজার রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়।

কিভাবে দ্বীপটিকে চালানো হয় তার একটা বিবৃতি দিচ্ছি।
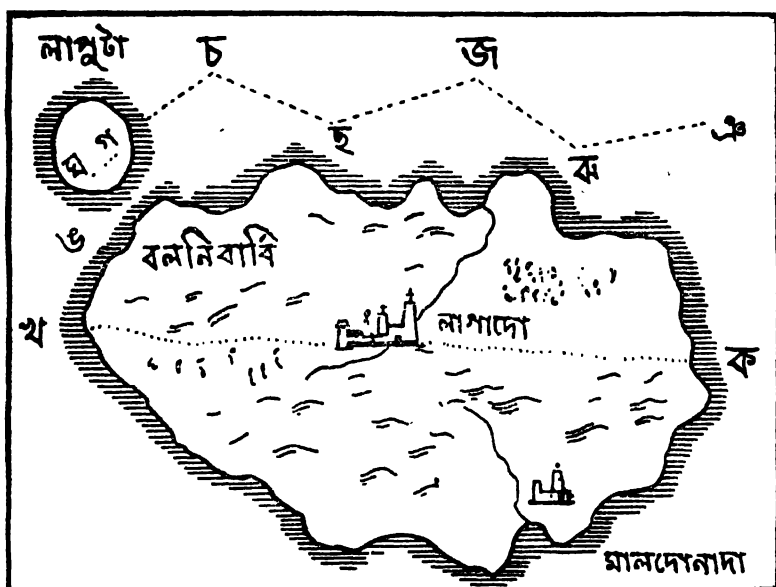
ক-খ যেন বলনিবার্বি রাজ্যের মধ্যে দিয়ে অঙ্কিত একটি সরল রেখা। গ-ঘ রেখা চুম্বক পাথরটিকে বোঝাচ্ছে, ঘ যেন বিকর্ষণী ও গ আকর্ষণী দিক। লাপুটা দ্বীপের অবস্থান এখন ঙ'র উপরে। চুম্বক পাথরটি যদি গ-ঘ স্থানে থাকে, অর্থাৎ বিকর্ষণী দিক নিচে থাকে, তাহলে দ্বীপ আড়ভাবে উপরে চ-য়ের দিকে উঠে যাবে। চ-এ পৌঁছে যদি আকর্ষণী মাথাটা ছ-এর দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়, দ্বীপ আড়ভাবে ছ-এ পৌঁছবে। সেখানে পৌঁছে যদি পাথরটাকে ঘুরিয়ে ছ-জ স্থানে বিকর্ষণী মাথা নিচের দিকে করা যায়, দ্বীপ আড়ভাবে জ-য়ে উঠে যাবে।

সেখান থেকে আকর্ষণী মাথা ঝ-এর দিকে ঘুরালে দ্বীপ ঝ-এও পৌছবে। তারপর ঝ থেকে ঞ-তে যাওয়া যায় পাথর ঘুরিয়ে বিকর্ষণী মাথা নিচের দিকে করলেই। এইভাবে যতবার প্রয়োজন পাথরের মাথার দিক বদল করে দ্বীপটাকে আড়ভাবে ওঠানো-নামানো সম্ভব হয় আর এইভাবে একবার উঠে একবার নেমে রাজ্যের যে কোনো জায়গার উপরে নিয়ে যাওয়া যায়। তির্যক গতির জন্য হিসাবের খুব অসুবিধা হয় না।

তবে এটা বুঝতে হবে যে নিচের সাম্রাজ্যের এলাকার বাইরে দ্বীপ যেতে পারে না, চার মাইলের বেশি উঠতে পারে না। জ্যোতিবিদ পণ্ডিতরা এই চুম্বক পাথর সম্বন্ধে বহু তথ্যবহুল গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁরা এর নিম্নলিখিত কারণ দেখিয়েছেন, যথাঃ (১) চুম্বকের শক্তি চার মাইলের বেশি কার্যকরী হয় না। (২) মাটির নিচে লুকোনো যে ধাতুর উপরে চুম্বক পাথরটির আকর্ষণ-বিকর্ষণ শক্তি কাজ করে, তার বিস্তার শুধু সাম্রাজ্যের সীমার মধ্যে আর তীরভূমি থেকে আঠারো মাইল দূর পর্যন্ত সমুদ্রের তলাতে। সমস্ত পৃথিবীময় এ ধাতুর ক্ষেত্র প্রসারিত না হয়ে মহারাজের রাজ্যটুকুর মধ্যেই আবদ্ধ আছে। প্রাকৃতিক অবস্থানের এই সুবিধার জন্যে, চুম্বকের আকর্ষণ ক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত যতগুলি দেশ আছে, সবকটির উপরে অতি সহজেই রাজা আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছেন।

দিকচক্রবালের সঙ্গে পাথরটিকে সমান্তরাল করে রাখলে দ্বীপটি স্থির হয়ে দাঁড়ায়, কারণ তখন তার দুই মাথা পৃথিবী থেকে সমান দূরত্বে থাকায়, সমান শক্তি বিস্তার করে, অর্থাৎ একদিক যত জোরে নিচে নামাতে চায়, অপর দিক ঠিক ততটা জোরে উপরে তুলতে চায়, ফলে দ্বীপ নিশ্চল হয়ে থাকে।

এই চুম্বক পাথরের ভার থাকে কয়েকজন জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতের উপরে, তাঁরা রাজার আদেশ অনুসারে দিক নির্ণয় করেন। এঁদের জীবনের বেশির ভাগ সময়ই কেটে যায় দূরবীণের সাহায্যে মহাকাশের গ্রহতারা নিরীক্ষণ করে, এদের দূরবীণগুলিও আমাদের দেশের দূরবীণের চেয়ে অনেক ভালো। এঁদের বৃহত্তম দূরবীণ মাত্র তিন ফুটের বেশি লম্বা না হলেও, তাই দিয়ে আমাদের একশো ফুট দূরবীণের চেয়েও তারাগুলোকে অনেক বড় ও স্পষ্ট দেখা যায়। এই সুবিধা থাকার জন্যে আমাদের ইউরোপীয় জ্যোতির্বিদদের থেকে এ দেশের লোকরা অনেক বেশি অগ্রসর হয়েছে। এদের তালিকায়

দশ হাজার স্থির তারকার কথা আছে, যেখানে আমাদের শ্রেষ্ঠ তালিকাতে তার তিন ভাগের এক ভাগের বেশি নেই।

এরা দুটি ছোট তারা বা উপগ্রহের সন্ধান পেয়েছে, যারা মঙ্গল গ্রহের চারিদিকে বৃত্তাকারে ঘুরছে। এ দুটির মধ্যে কাছেরটি কেন্দ্রীয় ব্যাসের তিনগুণ দূরত্ব রেখে আর দূরেরটি পাচগুণ দূরত্ব রেখে নিজেদের কক্ষপথে ঘোরে। প্রথমটির একবার ঘুরে আসতে দশ ঘণ্টা ও দ্বিতীয়টির সাড়ে একুশ ঘণ্টা সময় লাগে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে এই দুটি কক্ষের বর্গ হিসাব করলে তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ আর মঙ্গলগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু থেকে তাদের ব্যবধানের ঘনত্বের পারস্পারিক সম্বন্ধ আনুপাতিক সমান দাঁড়ায়।

ওই হিসাবের অঙ্ক থেকে বোঝা যাচ্ছে অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রদের মতো একই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এক্ষেত্রেও কাজ করছে।

এরা তিরানব্বইটি বিভিন্ন ধূমকেতুর সন্ধান পেয়েছে, আর তাদের দর্শনের কাল নির্ভুলভাবে নির্ণয় করে দিয়েছে। একথা যদি সত্যি হয়— ওরা তো পরম নিশ্চয়তার সঙ্গে তাই বলে—তাহলে ওদের নিরীক্ষার ফল সবজনসমক্ষে প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ ধূমকেতুর সম্বন্ধে এখনও খুব বেশি জানা যায়নি আর এই তথ্য প্রকাশিত হলে জ্যোতিষ শাস্ত্রের অন্যান্য বিভাগের অগ্রগতির সঙ্গে এ বিষয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা হবে।

রাজা যদি মন্ত্রিসভার সমর্থন পেতেন তাহলে তিনি পৃথিবীর একছত্র অধিপতি হতে পারতেন। মুস্কিল হল যে এঁদের সকলেরই বাড়ি নিচের মহাদেশে, আর রাজানুগ্রহ এতই অস্থায়ী ব্যাপার যে তার পাববতে কেউই নিজের দেশের পরাভব ও দাসত্ব কামনা করেন না।

কোনো সহরে যদি অরাজকতা কিম্বা বিদ্রোহ হয়, কিম্বা কোনো রকম গৃহবিবাদ দেখা যায়, কিম্বা ন্যায্য রাজকর দিতে অস্বীকার করে, রাজার দুটি নিয়ম আছে যার সাহায্যে তাদের আবার বশ্যতায় আনা হয়। প্রথম উপায়টি খুবই মৃদু, সেটি হল এসব ক্ষেত্রে দ্বীপটিকে সহরের ঠিক উপরে এনে থামিয়ে রাখা হয়, তার ফলে নগরবাসীরা সূর্যকিরণ ও বৃষ্টি, উভয় থেকেই বঞ্চিত হয়ে খাদ্যাভাব ও রোগ যন্ত্রণায় আক্রান্ত হয়। আর তেমন তেমন অপরাধ হলে এ ছাড়া উপর থেকে বড় বড় পাথর ছোঁড়া হয়, যার কাছ থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে গুহাগহ্বর কিম্বা মাটির নিচের ঘরে সেঁধোনো ছাড়া

নগরবাসীদের কোনো উপায় থাকে না, কারণ বাড়িঘরের ছাদ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

তবু যদি ওদের মত না বদলায়, কিম্বা যদি ওরা রাজদ্রোহিতার ভয় দেখায়, তাহলে রাজা তাঁর শেষ উপায় অবলম্বন করে দ্বীপটাকে একেবারে ওদের ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দেন, তখন বাড়িঘর লোকজন যা যেখানে আছে সব এক সঙ্গে ধ্বংস হয়ে যায়। অবিশ্যি এ চরম পন্থা রাজা ক্বচিৎ অবলম্বন করেন। এতে তাঁর নিজের মনও সায় দেয় না, মন্ত্রীরাও কখনও তাঁকে এমন কোনো কাজের পরামর্শ দিতে সাহস পান না, যার ফলে শুধু যে তাঁরা সমস্ত প্রজাবর্গের বিদ্বেষের পাত্র হয়ে উঠবেন তা নয়, উপরন্তু তাঁদের নিজেদের জমিজমা সবই তো নিচে, সেগুলিরও সমূহ ক্ষতি হবে। দ্বীপটি হল রাজার ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

এদেশের রাজারা কেন যে এই মর্মান্তিক পন্থা অবলম্বনে অনিচ্ছুক, চরম প্রয়োজন না হওয়া পর্যন্ত, তার আরেকটা গুরুতর কারণ আছে। যে সহরটিকে ধ্বংস করা হবে, তার মধ্যে যদি কোনো উঁচু পাথর বা টিলা থাকে আর তেমন বড় সহর হলে অনেক সময়ই তা থাকেও এবং সম্ভবতঃ এই আশঙ্কার কথা ভেবেই নগর পত্তন করবার সময় উপযুক্ত জায়গা বেছে নেওয়া হয়, অথবা যদি পাথরের তৈরী উঁচু উঁচু চূড়ো বা স্তম্ভ থাকে, তার উপরে হঠাৎ দ্বীপটা এসে পড়লে দ্বীপের তলাটার অনিষ্টের ভয় আছে। কারণ যদিও এর আগেই বলা হয়েছে যে দ্বীপের তলদেশটি দুশো গজ পুরু একটি অখণ্ড অ্যাডামাণ্ট পাথর দিয়ে তৈরী, তবু অত উঁচু থেকে পড়ার ধাক্কায় সেটি চিড় খেয়ে যেতে পারে, নয়তো নিচের বাড়িগুলোর উনুনের আগুনের বড় বেশি কাছে আসাতে ফেটেও যেতে পারে, আমাদের দেশের লোহার কিম্বা পাথরের তৈরী চুল্লির পিছন দিকটার যেমন অনেক সময় হয়ে থাকে।

দেশের লোকেরাও এসব কথা ভালো করেই জানে, কাজেই তাদের স্বাধীনতা কিম্বা সম্পত্তি সম্পর্কে কত দূর পর্যন্ত একগুঁয়েমি করা যেতে পারে তাও তারা খুব বোঝে। রাজা যখন অত্যধিক কুপিত হয়ে কোনো সহরকে গুঁড়িয়ে ধূলিসাৎ করে দিতে মনস্থির করে ফেলেন, তখন তিনি দ্বীপটাকে খুব ধীরে ধীরে নামাবার আদেশ দেন, যেন প্রজাদের উপর তাঁর কতই না দরদ; আসলে কিন্তু পাছে দ্বীপের তলা ভাঙ্গে এই ভয়েই। ওখানকার পণ্ডিতদের

মতে তলাটি যদি সত্যিই একবার ভেঙ্গে যায়, চুম্বক পাথরের সাধ্যও হবে না যে দ্বীপটাকে শূন্যে ধরে রাখে, তখন সব সুদ্ধ হুড়মুড় করে নিচের মাটিতে পড়তে বাধ্য।

ওদেশের একটি প্রাথমিক নিয়ম অনুসারে রাজার কিম্বা তাঁর প্রথম দুই ছেলের দ্বীপ ছেড়ে কোথাও যাবার অধিকার নেই আর যতদিন না তাঁর সন্তান ধারণের বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে রাণীরও নেই।

চতুর্থ অধ্যায়

লেখকের লাপুটা ত্যাগ—বলনিবার্বি যাত্রা—রাজধানীতে আগমন—রাজধানী ও তাহার পরিবেশের বিবরণী—সম্মানিত রাজপুরুষদ্বারা সাদর অভ্যর্থনা—তাঁহার সহিত কথোপকথন।

যদিও আমার এ কথা বলা সাজে না যে ঐ দ্বীপে কেউ আমার সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করেছিল, তবু এটুকু স্বীকার করতেই হবে যে আমার মনে হত আমাকে বড় বেশি অবহেলা করা হচ্ছে এবং তার মধ্যে যে একটু তাচ্ছিল্যের ভাবও ছিল না তাও বলা যায় না। তার কারণ, রাজাই বলুন কি প্রজাই বলুন অঙ্ক আর সঙ্গীত ছাড়া কোনো বিষয় কারও এতটুকু কৌতূহল ছিল না। এদিকে অঙ্কে আর সঙ্গীতে আমার বিদ্যা তাদের ধারে কাছেও পৌছয় না, কাজেই খাতির পেতাম যৎসামান্য।

অপরপক্ষে, দ্বীপের দ্রষ্টব্য সব কিছু দেখা হয়ে গেলে, দ্বীপ ছেড়ে চলে যাবার ইচ্ছাটা প্রবল হয়ে উঠেছিল, কারণ লোকগুলোর উপরেও দারুণ বিরক্তি ধরে গিয়েছিল। যে দুটি বিদ্যায় ওরা ছিল পারদর্শী, সে দুটির প্রতি আমার অশেষ শ্রদ্ধাও ছিল আর নিজেও একেবারে অনভিজ্ঞ ছিলাম না।

কিন্তু সেই সঙ্গে সবাই এতই অন্যমনস্ক আর গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকত যে এরকম অপ্রিয় সঙ্গী আমি জন্মে কখনও দেখিনি। যে দু মাস ওখানে ছিলাম, কথা বলতাম শুধু মেয়েদের, ব্যবসাদারদের, টোকাদারদের আর রাজসভার ছোকরা চাকরদের সঙ্গে। তার ফলে শেষ পর্যন্ত সকলের ভারি অশ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেছিলাম, অথচ শুধু এইসব লোকদের কাছ থেকেই কোনো কথার একটা যুক্তিসঙ্গত উত্তর পাওয়া যেত।

অনেক অধ্যয়নের ফলে ওদের ভাষা সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেছিলাম। যে দ্বীপে আমার মর্যাদা এতই কম, সেখানে বন্দী হয়ে থাকা আমার পক্ষে ক্লেশকর হয়ে উঠেছিল, কাজেই সঙ্কল্প করেছিলাম যে সুযোগ পেলেই দ্বীপ ছেড়ে চলে যাব।

রাজসভায় একজন মহাসম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন, রাজার নিকট আত্মীয় তিনি এবং শুধু সেই কারণে ভারি খাতির তাঁর। মূর্খতায় আর মূঢ়তায় যে

তাঁর মতো আর একজনও ছিল না একথা সকলেই বলত। বহু বিশিষ্ট রাজকার্য তিনি সম্পাদন করেছিলেন, প্রকৃতিদত্ত ও স্বোপার্জিত নানান গুণের তিনি অধিকারী, সততা ও ধর্মপরায়ণতা ছিল তাঁর ভূষণ, কিন্তু এত কম সুর বোধ যে নিন্দুকরা বলত নাকি সঙ্গীতের সঙ্গে তিনি ঠিক করে তাল দিতেও পারেন না আর তাঁর শিক্ষকমহাশয়ের তো তাঁকে গণিতশাস্ত্রের একটা অতি সরল উপস্থাপনার সমাধান করতে শেখাতে গিয়ে প্রাণ বেরিয়ে যেত!

আমার প্রতি এই ভদ্রলোকের প্রীতির অনেক প্রমাণ পেয়েছিলাম। প্রায়ই আমার বাসায় এসে আমাকে সম্মানিত করতেন, ইউরোপ সম্পর্কে নানান তথ্য জানতে চাইতেন, অন্য যে সব দেশে আমি গিয়েছি সেখানকার আইন-কানুন রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতেন। খুব মনোযোগ দিয়ে আমার উত্তরগুলি শুনতেন, আমার সব কথার উপর ভারি বিচক্ষণ মন্তব্য প্রকাশ করতেন। নিয়মরক্ষার জন্যে তাঁর সঙ্গেও দুজন টোকাদার থাকত, কিন্তু রাজসভায় কিম্বা কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে ছাড়া তাদের কখনও কাজে লাগাতেন না আর আমরা দুজনে যখন একলা আলাপ করতাম তখন তাদের সেখান থেকে সরে যেতে বলতেন।

রাজাকে বলে কয়ে আমার দ্বীপ ছেড়ে যাবার অনুমতি করিয়ে দেবার জন্যে আমি এই মহামান্য ব্যক্তিকে ধরলাম। রাজা অনুমতি দিলেন, তবে বড়ই দুঃখের সঙ্গে দিলেন, একথা তিনি নিজেই আমাকে বললেন। সত্য কথা বলতে কি আমাকে তিনি অনেকগুলি লাভজনক পদ দিতে চাইলেন কিন্তু সুগভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বিনীতভাবে সে সবই প্রত্যাখ্যান করলাম।

১৬ই ফেব্রয়ারী রাজা ও রাজসভার কাছে বিদায় নিলাম। রাজা আমাকে যে উপহার দিলেন ইংল্যাণ্ডের মুদ্রায় তার দাম হবে দুশো পাউণ্ড; তাঁর আত্মীয় অর্থাৎ আমার পৃষ্ঠপোষক দিলেন আরও দুশো পাউণ্ড; তাছাড়া রাজধানী লাগাদোতে তাঁর এক বন্ধুর কাছে আমার হাতে একটি পরিচয়পত্রও দিলেন। দ্বীপটি তখন লাগাদো থেকে দু মাইল দূরে একটা পাহাড়ের উপরে আকাশে ভেসে ছিল; সেইখানেই দ্বীপের সবচেয়ে নিচের গ্যালারি থেকে ঠিক যে ভাবে আমাকে তোলা হয়েছিল, সেই ভাবেই নামিয়ে দেওয়া হল। ভাসমান দ্বীপের রাজার অধীনস্থ মহাদেশের নাম হল বল্‌নিবার্বি; আগেই বলেছি রাজধানীর নাম লাগাদো। আবার শক্ত মাটিতে পা রেখে ভারি স্বস্তি বোধ

করলাম। নিশ্চিন্ত মনে সহর অবধি হেঁটে গেলাম, পরনে আমার ওদেরই মতো পোষাক, ওদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার মতো বিদ্যাও আছে। যাঁর সুপারিশের জন্য আমার কাছে চিঠি ছিল, অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর বাড়ি খুঁজে পেলাম এবং তাঁর বন্ধু দ্বীপবাসী রাজপুরুষের চিঠি দিলাম, তিনিও আমাকে অতি সদয় অভ্যর্থনা জানালেন।

এই গণ্যমান্য ব্যক্তিটির নাম মুনোদি। তিনি তাঁর নিজের বাড়িতেই আমার থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন, যতদিন ছিলাম ওঁর বাড়িতেই ছিলাম, ওঁদের আদরযত্নে বড়ই আপ্যায়িত হয়েছিলাম। আমি গিয়ে পৌছবার পরদিন সকালে তিনি আমাকে তাঁর গাড়ি করে সহর দেখাতে নিয়ে গেলেন, সহরটা লণ্ডনের মতোই বড় হবে। বাড়িগুলো কিন্তু অদ্ভুতভাবে তৈরী আর বেশির ভাগেরই মেরামতের দরকার। রাস্তার লোকগুলো সব যেন ছুটছে, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, স্থির চোখ আর বেশির ভাগেরই ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়-চোপড়। সহরের একটি প্রবেশদ্বার দিয়ে বেরিয়ে মাইল তিনেক পাড়াগাঁয়ের পথে ঘুরলাম, দেখলাম বহু সংখ্যক মজুর হাতিয়ার নিয়ে জমিতে কাজ করছে, কিন্তু কি যে করছে তা বুঝে উঠলাম না। তাছাড়া মাটিটাকে দেখে উর্বরা মনে হলেও, ঘাস কিম্বা শস্যের কোনো সম্ভাবনা দেখলাম না। সহরের আর পাড়াগাঁর দু জায়গারই এমন অদ্ভুত চেহারা দেখে অবাক না হয়ে পারলাম না। সাহস করে আমার পথপ্রদর্শককে ব্যাপারটার অর্থ জিজ্ঞাসা করলাম। তাকে বললাম এই যে এতগুলো মাথা, হাত, মুখ পথঘাটে ক্ষেতে মাঠে কতই না কাজে ব্যস্ত, অথচ কোনো ফল দেখা যাচ্ছে না, এর মানেটা যেন দয়া করে আমাকে বুঝিয়ে দেন। এমন নিষ্ফল জমির চাষ, এমন আনাড়িভাবে তৈরী ভাঙ্গাচোরা বাড়িঘর, লোকজনের কাপড়চোপড়ে আর মুখের ভাবে এমন দুঃখ দৈন্যের ছাপ আমি তো এর আগে কখনও দেখিনি।

মুনোদিমহাশয় দেশের অভিজাতকুলের মধ্যে সব চেয়ে উচ্চপদস্থের একজন; কয়েক বছর ইনি লাগাদোর রাষ্ট্রপালের আসন ভূষিত করেছিলেন, কিন্তু কয়েকজন মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে অক্ষমতার অপবাদে পদচ্যুত হন। রাজা তাঁর সঙ্গে সস্নেহ ব্যবহার করেন, তবে তাঁর ধারণা যে মুনোদির মনটা ভালো হলেও, বুদ্ধিসুদ্ধি একেবারে নেই বললেই হয়। আমি যখন ওদের দেশ ও দেশবাসীদের খোলাখুলি নিন্দা করতে লাগলাম, তিনি

তার কোনো উত্তর না দিয়ে শুধু বললেন যে অত অল্প সময় ওখানে বাস করে কোনো মন্তব্য করাটা ঠিক নয়, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন রীতিনীতি ; এই ধরণের আরও কয়েকটি সাধারণ মামুলী কথাও বললেন। কিন্তু ওঁর নিজের প্রাসাদে ফিরবার পর উনি জানতে চাইলেন এ বাড়িটা আমার কেমন লাগছে, এখানে অদ্ভুত কিছু চোখে পড়ছে কি না, ওঁর চাকরবাকরদের কাপড়চোপড় কিম্বা চেহারার মধ্যে আপত্তি করবার মতো কিছু দেখছি কি না। এ ধরণের প্রশ্ন স্বচ্ছন্দে উনি আমাকে করতে পারতেন কারণ ওঁর চারদিকে যা দেখলাম সবই চমৎকার, সুনিয়ন্ত্রিত ও সুরুচিপূর্ণ। আমি উত্তর দিলাম যে মহাশয়ের নিজের সুবুদ্ধি, বংশমর্যাদা ও বিত্তের কারণে, মূঢ়তা ও দৈন্য-জনিত যে সব দোষ বিচ্যুতি অন্যদের মধ্যে দেখা যায় তাঁর মধ্যে যায় না।

তখন তিনি বললেন যে কুড়ি মাইল দূরে তাঁর জমিজমা যেখানে, সেখানে যদি তাঁর পল্লীগৃহে তাঁর সঙ্গে একবার যাই, তাহলে এ ধরণের আলাপ আলোচনার আরও সুযোগ পাওয়া যায়। আমি বললাম তিনি যে ব্যবস্থা করেন আমি তাতেই রাজী ; অতএব পরদিন সকালেই আমরা রওনা হলাম।

যাবার পথে, ওখানকার চাষীরা কতরকম নিয়মে জমির ব্যবস্থা করে সেদিকে তিনি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করলেন ; আমি কিন্তু তার কোনো সার্থকতাই খুঁজে পেলাম না, কারণ দু এক জায়গায় ছাড়া কোথাও একটা শস্যের শিষ কি ঘাসের পাতা অবধি দেখতে পেলাম না। কিন্তু তিনঘণ্টার পথ পার হতেই দৃশ্যটা একেবারে বদলে গেল ; অতি অপরূপ পল্লীঅঞ্চলে এসে পড়লাম। একটু দূরে দূরে পরিপাটিভাবে তৈরী গোলাবাড়ি, মাঠের চারদিকে বেড়া দেওয়া, তার ভিতরে আঙুরের চাষ, শস্যক্ষেত আর খোলা ঘাস জমি। এমন সুন্দর দৃশ্য আর কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ল না।

ভদ্রলোক লক্ষ্য করলেন আমার মুখখানি কেমন প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন যে এইখান থেকেই তাঁর জমি শুরু আর তাঁর বাড়ি অবধি এই ভাবেই চলবে। তাঁর স্বদেশবাসীরা নাকি এইরকম আনাড়ি ব্যবস্থা করা আর রাজ্যের সকলের সামনে এমন মন্দ দৃষ্টান্ত দেখানোর জন্য তাঁকে বিদ্রূপ ও অবজ্ঞা করে। অবিশ্যি এরকম মন্দ দৃষ্টান্ত দেখে তাঁরই মতো বৃদ্ধ, একগুঁয়ে ও দুর্বল গুটিকতক লোক ছাড়া আর কেউ প্রভাবিত-ও হয়নি।

অবশেষে ওঁর বাড়িতে এসে পৌছলাম ; বাস্তবিকই চমৎকার অট্টালিকাটি, প্রাচীন স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নির্দেশ অনুসরণ করে তৈরী। চারদিকে ফোয়ারা, বাগান, পথ, বীথিকা, কুঞ্জবন, অতি উন্নত বিচার ও রুচি অনুযায়ী সাজানো। যা দেখলাম তারই যথাযোগ্য প্রশংসা করতে লাগলাম, গৃহস্বামী কিন্তু রাতের খাওয়াদাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো কথাতেই কর্ণপাত করলেন না। খাওয়ার পরে কাছে কোনো তৃতীয় ব্যক্তি না থাকাতে তিনি ভারি বিষণ্ণ-ভাবে বললেন যে তাঁর ভয় হচ্ছে তাঁর সহরের আর পল্লীর দুই বাড়িই হয়তো ভেঙ্গে ফেলে ওখানকার আধুনিক রীতিতে আবার নতুন বাড়ি করতে তিনি বাধ্য হবেন। ক্ষেত বাগান উপড়ে ফেলে বর্তমান নিয়মে আবার গাছপালা লাগাতে হবে। তাঁর প্রজাদেরও সেইরকম করবার আদেশ দিতে হবে, নইলে লোকে তাঁকে এই বলে নিন্দা করবে যে তিনি ভারি অহংকারি, ইচ্ছা করে অন্য সকলের চেয়ে আলাদা রকমে চলেন, যতসব লোকদেখানি ঢং, একেবারে কিছুই জানেন না, অতিরিক্ত খামখেয়ালি ইত্যাদি ; কে জানে হয়তো রাজা পর্যন্ত তাঁর উপরে অসন্তুষ্ট হবেন।

তিনি আরও বললেন যে এসব শুনে আমি যেন ভারি আশ্চর্য হচ্ছি মনে হচ্ছে, কিন্তু তাঁর কাছে যদি আমি এমন কতকগুলি ব্যাপারের কথা শুনি যে বিষয়ে রাজসভার কেউ আমাকে কিছু বলেনি, কারণ সেখানকার লোকেরা নিজেদের ভাব নিয়েই মশগুল, নিচে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, তাহলে আমার আর তত আশ্চর্য লাগবে না।

তারপর তিনি যা বললেন তার সারমর্ম এই : বছর চল্লিশেক আগে কয়েকজন লোক লাপুটাতে গিয়েছিল, হয় কাজে নয়তো মজা দেখবার জন্যে। সেখানে পাঁচ মাস থাকবার পর এরা ফিরে এসেছিল সামান্য একটু গণিতশাস্ত্রের ছিটেফোঁটা আর ঐরকম হাওয়ার দেশের প্রচুর উড়ু উড়ু ভাব নিয়ে। ফিরে এসে নিচের কোনো ব্যবস্থাই আর তাদের পছন্দ হয় না ; তখন তারা এখানকার শিল্প, বিজ্ঞান, ভাষা ও যন্ত্রশিল্প সব কিছুতেই একটা নব কলেবর দেবার নানান পরিকল্পনা করতে লাগল।

এই উদ্দেশ্যে একটা পরিকল্পনা-ভবন বা মহা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে রাজার কাছ থেকে এরা বিশেষ অধিকার পত্র আনাল। তারপরে দেশের লোকদেরও এমনি সখ চেপে গেল যে এ রাজ্যে এখন এমন কোনো

বড় সহর নেই যেখানে একটা করে পরিকল্পনা-ভবন নেই। এইসব ভবনের অধ্যাপকরা কৃষিকাজ ও স্থাপত্যের নিত্য নতুন উপায় উদ্ভাবন করেন ; ব্যবসা ও কারিগরি শিল্পে যত রকম যন্ত্রপাতির দরকার হয় তার নতুন নতুন আকার প্রকার ভেবে স্থির করেন। তাঁরা বলেন এইসব যন্ত্রের সাহায্যে একজন লোক দশজনের কাজ করতে পারবে, এক সপ্তাহে নাকি একটা প্রাসাদ তৈরী করা যাবে, তবে যেসব মালমশলা দেওয়া হবে সে এমনি মজবুৎ যে চিরকাল টিকবে, মেরামতেরও দরকার হবে না।

তারপরে পৃথিবীর যাবতীয় ফলপাকুড় আমাদের যে ঋতুতে ইচ্ছা তখনই পাকানো সম্ভব হবে আর এখানকার চেয়ে একশোগুণ বেশি ফসল পাওয়া যাবে ; এইরকম কত যে সুখের পরিকল্পনায় তাঁরা ডুবে থাকেন তার ইয়ত্তা নেই। একমাত্র অসুবিধা হচ্ছে যে আজ পর্যন্ত একটিও পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হয় নি, ইত্যবসরে সমস্ত দেশটা একটা দুঃখময় মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে, বাড়িঘর ভেঙ্গেচুরে একাকার, লোকে খেতে পরতে পায় না। কিন্তু এর ফলে নিরুৎসাহ হওয়া দূরে থাকুক, পঞ্চাশগুণ আগ্রহের সঙ্গে এঁরা পরিকল্পনা চালিয়ে যাচ্ছেন, মনের মধ্যে যতখানি আশা ঠিক ততখানি নিরাশা।

নিজের বিষয়ও বললেন ভদ্রলোক, ওঁর সেরকম নতুন কিছু করবার উদ্যম নেই, কাজেই পুরোনো নিয়মে চলতে পারলেই উনি খুসি। উনি চান পূর্বপুরুষদের তৈরী বাড়িতে বাস করতে এবং তাঁরা সবদিক দিয়ে যে ভাবে জীবন যাপন করে গেছেন, নতুন কিছু না করে, সেই ভাবেই জীবন কাটাতে। অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের আরও কয়েকজন এই রকম করছেন, কিন্তু সবাই তাঁদেরও ঘৃণা ও বিদ্বেষের চক্ষে দেখে, তাঁরা নাকি শিল্পের শত্রু, মূর্খ, নাগরিক-কর্তব্য-জ্ঞানশূন্য, দেশের উন্নতির চেয়ে তাঁদের কাছে নাকি নিজেদের আরাম ও আলস্যটাই বড।

তিনি আরও বললেন যে ঐ চমৎকার পরিকল্পনা ভবনটি আমাকে দেখাতে তিনি সঙ্কল্প করেছেন, কাজেই পাঁচরকম কথা বলে সেটি দেখার আনন্দ তিনি নষ্ট করতে চান না। তিনি শুধু এইটুকু অনুরোধ করছেন যে তিন মাইল দূরে পাহাড়ের গায়ে একটা ভাঙ্গা বাড়ি আছে, সেটিকে যেন আমি লক্ষ্য করি। ঐ বাড়ি সম্পর্কে তিনি আমাকে এই কাহিনীটি বললেন। তাঁর নিজের বাড়ি থেকে আধমাইল দূরে তাঁর একটি ভারি ভালো গমপেষার কল ছিল,

সেখানে যে গম পেষা হত তাতে তাঁর নিজের ও প্রজাদের অনেকেরই কুলিয়ে যেত। বছর সাতেক আগে পরিকল্পকদের একজন এসে প্রস্তাব করলেন যে ঐ কলটা ওখান থেকে তুলে দিয়ে, পাহাড়ের গায়ে নতুন করে তৈরী করতে হবে। পাহাড়ের লম্বা চড়াইয়ের উপরে লম্বা করে একটা খাল কাটতে হবে, সেখানে যাতে জল ধরে রাখা যায়। সেই জল নল দিয়ে এঞ্জিনের সাহায্যে গমপেষা কলে পৌঁছে দেওয়া হবে। এর কারণ হল পাহাড়ের উপরকার খোলা বাতাস আর হাওয়াতে জলটা আন্দোলিত হয়ে সহজেই গতিশীল হয়ে উঠবে। তাছাড়া সমতল জায়গার নদীতে যতখানি স্রোতের দরকার হয়, ঢালু জায়গা দিয়ে জল নামালে তার অর্ধেকেই গমপেষার কাজ চলে যাবে।

এদিকে রাজসভাতে ভদ্রলোকের তেমন খাতির নেই, ওদিকে বন্ধুবান্ধবরা কয়েকজনেও খুব পেড়াপেড়ি করতে লাগলেন, কাজেই শেষ পর্যন্ত তিনি রাজী হয়ে গেলেন। তারপর দুইবছর ধরে একশো লোক খাটিয়েও শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনা কার্যকরী হল না ; তখন তাঁর ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে পরিকল্পকরা সরে পড়লেন। এখন পর্যন্ত তাঁরা তাঁর উপর রাগ দেখান, ঐ ধরণের আরও পরীক্ষা করে দেখতে অন্যদের উৎসাহিত করেন, ঐ ভাবে সাফল্যের আশা দেন আর ঐ রকমেরই বিফলতা দিয়ে ব্যাপারটা শেষ হয়।

কয়েকদিন পরেই আমরা সহরে ফিরে এলাম। নিজের অখ্যাতির কথা মনে করে মুনোদি করলেন কি, মহা বিদ্যালয় দেখতে আমার সঙ্গে নিজে না গিয়ে, এক বন্ধুকে অনুরোধ করলেন। বন্ধুটির কাছে ইচ্ছা করেই ভদ্রলোক এমন ভাব দেখালেন যেন আমি পরিকল্পনাগুলির ভারি ভক্ত, ভারি কৌতূহলী আর যা বলা যায় তাই বিশ্বাস করি। অবিশ্যি কথাটা একেবারে মিথ্যাও নয়, কারণ অল্প বয়সে আমিও বলতে গেলে এক ধরণের পরিকল্পক ছিলাম।

পঞ্চম অধ্যায়

লাগাদোর মহাবিদ্যালয় দেখিতে লেখকের অনুমতি লাভ—বিদ্যালয়ের বিশদ বিবরণী—যে সকল বিদ্যার সাধনায় অধ্যাপকগণ ব্যাপৃত থাকেন তদ্‌বিষয়ক।

মহাবিদ্যালয় বলতে গোটা একটা আস্ত বাড়ি বোঝায় না; পথের দুধারে আলাদা আলাদা বাড়ির সারি অব্যবহারে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, সেইগুলিকে কিনে নিয়ে এখন মহাবিদ্যালয়ের কাজে লাগানো হয়েছে। প্রধান কর্মচারী আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন এবং এর পরেও অনেকদিন ধরে মহাবিদ্যালয়ে আমি যাওয়া আসা করেছিলাম। প্রত্যেক ঘরে একজন বা আরও বেশি পরিকল্পক বসেন; আমার বিশ্বাস সবসুদ্ধ পাঁচশোর কম ঘর দেখিনি।

প্রথম যে পরিকল্পককে দেখলাম তাঁর বেজায় রোগা চেহারা, কুচকুচে কালো হাতমুখ, লম্বা লম্বা চুলদাড়ি, ছেঁড়া কাপড় পরনে, এখানে ওখানে মেলা পোড়া দাগ। কাপড়, কামিজ, গায়ের চামড়া সব এক রঙ। আট বছর ধরে এই ভদ্রলোক শশা থেকে সূর্যরশ্মি বের করবার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছেন। তারপর ঐ সূর্যকর শিশিতে ভরে, শিশি থেকে সমস্ত হাওয়া বের করে দিয়ে, শিশির মুখ এঁটে সীল করে রেখে দিতে হবে। তারপরে শীত বর্ষার দুর্দিনে সেগুলোকে ছেড়ে বাতাস গরম করা হবে। তাঁর কাছে শুনলাম যে আর বছর আষ্টেকের মধ্যেই যে তিনি রাজ্যপালদের বাগানের জন্য ভালো দরে সূর্যালোক জোগাতে পারবেন, এ বিষয়ে তাঁর মনে কোনো সন্দেহ নেই। তবে তাঁর অভিযোগ হল যে বেশি মাল মজুৎ রাখতে পারছেন না, তারপর তিনি আমাকে অনুনয় করে বললেন যে উদ্ভাবন ক্রিয়াকে উৎসাহিত করবার জন্যে যদি তাঁকে যৎসামান্য কিছু দিই তো বড় ভালো হয়, বিশেষ করে যখন এ সময় শশার দাম এবার বড় বেশি বেড়ে গেছে। তাঁকে সামান্য কিছু উপহার দিলাম। যারা বিদ্যালয় দেখতে যায় তাদের কাছে এঁদের এরকম করে ভিক্ষা চাওয়ার কথা আমার পৃষ্ঠপোষক মহাশয় জানতেন এবং এই উদ্দেশ্যেই আমার সঙ্গে কিছু টাকা-কড়ি দিয়েছিলেন।

আরেকটা ঘরে গেলাম, কিন্তু সেখানে ঢুকেই আবার পালাতে পারলে

বাঁচি, এমনি দারুণ দুর্গন্ধ যে টেকা দায়। আমার পথপ্রদর্শকটি কিন্তু আমাকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে চললেন এবং কানে কানে সাবধান করে দিলেন যেন কোনোরকম অসৌজন্য না করি, তা হলে এঁরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হবেন। ভয়ের চোটে নিজের নাকটা পর্যন্ত টিপে ধরতে পারলাম না। এই ঘরের পরিকল্পক বিদ্যালয়ের সবচেয়ে বয়স্ক ছাত্র। তাঁর মুখের আর দাড়ির রঙ ফিকে হলুদ, হাতে আর কাপড়চোপড়ে জঘন্য ময়লা লাগা। যেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়া, অমনি একেবারে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলেন; এ আদরটি অবিশ্যি না করলেও পারতেন।

যেদিন থেকে মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন, সেদিন থেকেই এঁর চেষ্টা হল মানুষের বিষ্ঠা বিশ্লেষণ করে পিত্তজনিত রঙ দূর করে, দুর্গন্ধ তাড়িয়ে, খাবার সময়ে যে লালা মিশে গিয়েছিল সেটুকুকে ছেঁকে তুলে, তাকে আবার মূল খাদ্যে পরিণত করা। পরিকল্পনা সঙ্ঘ থেকে প্রতি সপ্তাহে ব্রিষ্টলের পিপের মতো বড় একটা পাত্র ভর্তি মানুষের বিষ্ঠা এঁর বরাদ্দ।

আরেকজনকে দেখলাম তিনি উত্তাপ লাগিয়ে বরফ গুঁড়িয়ে বারুদ তৈরী করতে চেষ্টা করছেন। আগুনের ঘাতসহতা সম্বন্ধে ইনি একটি প্রবন্ধরচনা করেছেন, সেটি আমাকে দেখালেন। প্রবন্ধটি ওঁর ছাপাবার ইচ্ছা।

একজন স্থপতির সঙ্গে আলাপ হল, অদ্ভুত তাঁর উদ্ভাবনশক্তি, বাড়ি তৈরীর এক নতুন কৌশল বের করেছেন, তাতে ছাদ থেকে শুরু করে, নিচের দিকে এগিয়ে ভিত্তি পর্যন্ত পৌঁছতে হয়। মৌমাছি আর মাকড়সা, এই দুটি বিচক্ষণ প্রাণীর নজির দেখিয়ে তিনি এই নতুন নিয়মের যুক্তি-যৌক্তিকতা প্রমাণ করে দিলেন।

দেখলাম একজন জন্মান্ধের কাছে আরও কয়েকজন জন্মান্ধ শিক্ষানবিশি করছেন। এঁদের কাজ হল চিত্রকরদের জন্য রঙ গুলে দেওয়া; মাস্টার মশাই এঁদের শিখিয়ে দিচ্ছেন কেমন করে হাত দিয়ে ছুঁয়ে আর নাক দিয়ে শুঁকে রঙ চিনতে হয়। আমারই দুর্ভাগ্য যে ঠিক ঐ সময়ে এঁদের কাজে খুব দক্ষতা দেখলাম না, এমন কি মাস্টারমশাইটি নিজেই প্রায় সবই ভুল করছিলেন। তবে এই ওস্তাদটিকে দেখলাম অধ্যাপক-সঙ্ঘের পক্ষ থেকে খুব উৎসাহ ও সম্মান দেওয়া হয়।

আরেকটা ঘরে একজন পরিকল্পককে দেখে ভারি খুসি হয়েছিলাম। লাঙ্গল, গোরু আর শ্রমিকের খরচ বাঁচিয়ে কিভাবে শূওর দিয়ে চাষের জমি তৈরী করা যায়, তার একটি কৌশল ইনি বের করেছেন।

প্রণালীটি হল এই—তিন বিঘে জমিতে ছয় ইঞ্চি দূরে দূরে, আট ইঞ্চি মাটির নিচে একর্ণ, খেজুর, বাদাম, বীচ্ গাছের ফল ও শূওরের প্রিয় অন্যান্য তরিতরকারি, এই সব পুঁতে রাখতে হবে। তারপর ছয় শো কিম্বা তারও বেশি শূওর তাড়িয়ে এনে ঐ ক্ষেতের মধ্যে পুরে দিতে হবে। কয়েক দিনের মধ্যেই খাবার খুঁজে খুঁজে শূওরগুলো সমস্ত জমিটাকে খুঁড়ে ফেলবে, তাতে তখন বীজ লাগানো যাবে; আর সেই সঙ্গে শূওরের ময়লাতে জমিতে সার দেওয়াও হয়ে থাকবে। অবিশ্যি এটা সত্যি যে পরীক্ষা করবার সময়ে দেখা গেছে যে এতে খরচ আর হাঙ্গামা বড় বেশি আর ফসল বড় কম হয় কিম্বা হয়তো হলই না, তবু এটাও অনস্বীকার্য যে এই উদ্ভাবনে যথেষ্ট উন্নতির ক্ষেত্র আছে।

আরেকটা ঘরে গেলাম, সেখানকার দেয়াল ছাদ সব মাকড়সার জালে ঢাকা, বাদ আছে শুধু শিল্পীর যাওয়াআসার জন্যে সরু একটা পথ। আমি যেই ঘরে ঢুকলাম তিনি ডেকে বললেন যেন জালগুলোকে না নাড়াই। ভারি দুঃখ করতে লাগলেন তিনি এই বলে যে পৃথিবীর লোকে এতকাল কি মর্মান্তিক ভুলই না করেছে, রেশম করতে গুটিপোকার শরণ নিয়েছে, অথচ হাতের কাছে এমন ভালো গৃহপালিত পোকা রয়েছে, যারা গুটিপোকার চেয়ে অনেক বেশি গুণী, কারণ তারা শুধু রেশমি সুতো কাটে না, রেশমি কাপড়ও বুনে দেয়।

তিনি প্রস্তাব করছেন যে মাকড়সাদের কাজে লাগানো হক, তাহলে রেশমি কাপড় রঙ করার খরচটিও বেঁচে যাবে। এরপর যখন তিনি আমাকে এক রাশি সুন্দর রঙিন মাছি দেখালেন, তখন আমার আর কোনো সংশয়ই রইল না। এই মাছিগুলোকে উনি মাকড়সাদের খেতে দেন। তাহলে মাছির রঙ থেকে মাকড়সার জালেও চমৎকার রঙ ধরবে, এই বলে আমাদের আশ্বাস দিলেন। বললেন সব রকম রঙেরই মাছি আছে ওঁর কাছে, কাজেই যেই না মাছিদের উপযুক্ত খাবারের আর কতকগুলো গাছের আঠা, তেল আর অন্যান্য চটচটে উপকরণের ব্যবস্থা করতে

পাববেন, অমনি সকলের পছন্দমতো সুতো জোগাতে পারবেন। ওগুলো দিয়ে সুতোটাকে শক্ত ও মজবুত করতে হবে।

ওখানকার বাস্তুবিভাগের বাড়ির চূড়োয় যে বিরাট বায়ু নির্ণয় যন্ত্র বসানো আছে, যার সাহায্যে বোঝা যায় কোন দিক থেকে বাতাস আসছে, তার মাথার উপরে একটা সূর্য-ঘড়ি বসাবার ভার নিয়েছেন একজন জ্যোতির্বিদ। বাতাসের দৈবাৎ দিক পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে, পৃথিবীর ও সূর্যের দৈনিক ও বার্ষিক গতির হিসাব করে এই ঘড়ি তৈরী করা হবে।

সামান্য একটু শূলের ব্যথার মতো মনে হচ্ছিল, সে কথা বলাতেই আমার পথপ্রদর্শক আমাকে অন্য একটা ঘরে নিয়ে গেলেন, সেখানে একজন বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন, একই যন্ত্রের বিপরীত ক্রিয়া দিয়ে রোগ সারাবার জন্যে এঁর খুব খ্যাতি। তাঁর কাছে মস্ত এক হাপর দেখলাম, তার সঙ্গে সরু লম্বা একটা হাতির দাঁতের নল লাগানো। উনি বললেন যে উনি নাকি এই নলটাকে মলদ্বার দিয়ে ইঞ্চি আষ্টেক ঢুকিয়ে দিয়ে বাতাস টেনে বের করে, নাড়িভূঁড়িগুলোকে একটা জলশূন্য থলির মতো নরম করে দিতে পারেন। রোগটার যদি বাড়াবাড়ি হয় আর সহজে না সারে, তখন উনি নল দিয়ে হাপরের সমস্ত বাতাস রুগীর শরীরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে নলটা বের করে নেন। তারপর বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে হাওয়া বেরিয়ে যাবার পথ ভালো করে বন্ধ করে রেখে, হাপরে আবার বাতাস ভরে নেন। তিনচার বার এরকম করলে পর বাইরের বাতাসটা বেগে বেরিয়ে আসে, সঙ্গে সঙ্গে পেটের ভিতরকার বিষাক্ত বায়ুটাকেও টেনে নিয়ে আসে, পাম্পের জলে যেমন হয়। অমনি রুগীও সেরে ওঠে।

একটা কুকুরের উপরে ডাক্তারকে এই দুটি পরীক্ষাই করতে দেখলাম; প্রথম পরীক্ষাটাতে বিশেষ কোনো ফল দেখা গেল না। দ্বিতীয় পরীক্ষার পর কুকুরটা ফেটে মরে আর কি; তারপর এমন প্রবল বেগে বাতাস বেরিয়ে গেল যে আমি এবং আমার সঙ্গীরা কেউ সেখানে টিকতে পারি না। কুকুরটা তো তক্ষুণি মরে গেল, ডাক্তার ঐ একই উপায়ে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগলেন আর আমরা সরে পড়লাম।

আরও অনেকগুলো ঘরে গিয়েছিলাম, কিন্তু কথা বাড়াতে চাই না বলে আরও যে সব অদ্ভুত জিনিস দেখেছিলাম তার বর্ণনা দিলাম না।

এতক্ষণ ধরে আমি মহাবিদ্যালয়ের মাত্র একটা বিভাগ দেখছিলাম : অপর বিভাগটিকে মনন বিদ্যার উন্নয়নকারীরা অধিকার করে আছেন।

আগে 'সার্বজনীন শিল্পী' বলে একজন মহিমান্বিত ব্যক্তির কথা বলে, তারপরে অন্যদের বিষয়ও কিছু বলব। এই ভদ্রলোক আমাদের বললেন যে মানবজীবনের উন্নতির জন্যে ভেবে ভেবে উনি ত্রিশ বছর কাটিয়েছেন। নানান আশ্চর্য দ্রষ্টব্য জিনিসে ভরা দুটি বড় ঘর আর পঞ্চাশ জন কর্মী আছে তাঁর। কয়েকজন বসে বাতাস ঘনীভূত করে একরকম শুকনো পদার্থ তৈরী করছিলেন, যেটা হাতে ছোঁয়া যায়; এটা করতে বায়ু থেকে যবক্ষারের অংশ বের করে নিয়ে, সিক্ত অর্থাৎ জলীয় অংশটাকে চুঁইয়ে বেরিয়ে যেতে দিতে হয়। আর কয়েকজন শ্বেতপাথর নরম করে বালিশ কিম্বা আলপিন রাখবার কুশন তৈরী করছিলেন; আরও কেউ কেউ একটা জ্যান্ত ঘোড়ার পায়ের খুরগুলোকে প্রস্তরীভূত করে দিচ্ছিলেন, যাতে পড়ে আছাড় না খায়।

শিল্পী নিজে সেই সময় দুটি বৃহৎ পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত; একটি হল মাটিতে তুষ পোঁতা, কারণ এঁর মতে তুষের মধ্যেই প্রজনন শক্তি থাকে। অনেকগুলো পরীক্ষা দিয়ে এ কথা তিনি প্রমাণও করে দিলেন, তবে সেসব বোঝা আমার কর্ম নয়। অন্য পরিকল্পনাটি হল দুটো ভেড়ার ছানার গায়ে আঠা, কয়েক রকম খনিজ ও বৃক্ষজ পদার্থ ইত্যাদি মিশিয়ে একরকম মলম তৈরী করে লাগিয়ে দেওয়া, যাতে লোম না গজায়। ওঁর বড় আশা যে সময় কালে এ দেশে এক জাতের ন্যাড়া ভেড়া চালু করবেন।

খানিকটা পথ পার হয়ে মহাবিদ্যালয়ের অন্য দিকে গেলাম। আগেই বলেছি এদিকে মনন-বিদ্যার পরিকল্পকরা থাকেন।

প্রথমেই যে অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা হল, চল্লিশজন ছাত্র দিয়ে পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি একটা বিশাল ঘরে রয়েছেন। নমস্কারাদির পর তিনি হঠাৎ লক্ষ্য করলেন যে ঘরের লম্বা ও চওড়া দিকের বেশির ভাগটি জুড়ে যে বিরাট ফ্রেমখানা রয়েছে, আমি খুব নজর করে সেটিকে দেখছি। তাই দেখে তিনি বললেন যে কার্যকরী ও যান্ত্রিক উপায়ে মনন-বিদ্যার উন্নতি পরিকল্পনায় তাঁকে নিয়োজিত থাকতে দেখে হয়তো আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু শীঘ্রই সমস্ত পৃথিবীর লোকে এর উপকারিতা সম্বন্ধে সচেতন হবে এবং তাঁর শুধু

এইটুকু গর্ব যে এমন একটা উঁচুদরের চিন্তা অন্য কোনো লোকের মাথায় গজায়নি।

শিল্প ও বিজ্ঞান বিষয়ে বিদ্যা অর্জন যে কি কষ্টসাধ্য ব্যাপার সে কথা সকলেই জানেন। কিন্তু তাঁর এই উদ্ভাবনের সাহায্যে একজন আকাট মূর্খ যৎসামান্য ন্যায্য খরচে প্রতিভা কিম্বা অনুশীলনের ধার কাছে না গিয়ে অল্প একটু শারীরিক পরিশ্রম করেই দর্শন, কাব্য, রাজনীতি, আইন, গণিত ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে এন্তার বই লিখতে পারবে।

এবার অধ্যাপক মহাশয় আমাকে ফ্রেমটার কাছে নিয়ে গেলেন আর তার ছাত্ররা ফ্রেমের পাশে সারি সারি দাঁড়িয়ে গেল। ফ্রেমটা ঘরের মাঝখানে রাখা, লম্বায় কুড়ি ফুট, চওড়ায় কুড়ি ফুট। বাইরের দিকটা আগা-গোড়া ছোট ছোট কাঠের টুকরো দিয়ে তৈরী; টুকরোগুলো পাশাখেলার ঘুঁটির মতো বড় হবে, কয়েকটা আরও বড়। প্রত্যেক ঘুঁটির পিঠে ছোট ছোট কাগজের কুচি আঠা দিয়ে আটকানো আছে; এই সব কাগজে ওদের ভাষার যাবতীয় শব্দ লেখা আছে; শব্দগুলির কারক, বিভক্তি, কাল, শব্দরূপ ইত্যাদি দেওয়া আছে, কিন্তু সবই এলোমেলোভাবে সাজানো।

অধ্যাপক মহাশয় আমাকে অবহিত হতে বললেন, কারণ এবার যন্ত্রটিকে চালানো হবে। ফ্রেমের চার ধারে চল্লিশটা লোহার হাতল লাগানো, অধ্যাপকের আদেশে এক একজন ছাত্র এক একটা হাতল ধরল, তারপরে হঠাৎ হাতল ঘুরিয়ে দিতেই ফ্রেমের গায়ের ঘুঁটির পিঠে লেখা কথাগুলো সব পাল্টে গেল। তখন তিনি ছত্রিশটি ছেলেকে বললেন ঘুঁটির উপরে লেখা লাইনগুলি আস্তে আস্তে পড়ে যেতে, যেই পরপর তিন চারটি কথা পাওয়া গেল যা দিয়ে একটা বাক্যাংশ হতে পারে, অমনি সেই কথাগুলি বাকি চারজন ছেলেকে পড়ে শোনানো হল, তারা হল মুন্সি, কথাগুলি তখুনই তারা টুকে নিল।

এই ক্রিয়াটির তিন চারবার পুনরভিনয় হল। যন্ত্রটি এমনভাবে তৈরী যে একবার হাতল ঘোরালেই সব কাঠের টুকরো উল্টে যায় আর নতুন নতুন কথা দেখা যায়। প্রতিদিন ছ'ঘণ্টা ধরে ছাত্ররা এই কাজ করে; অধ্যাপক মহাশয় আমাকে অনেকগুলি বড় বড় গ্রন্থ দেখালেন বাক্যাংশের ভাঙ্গা টুকরো দিয়ে ভর্তি; এগুলিকে একত্র করাই তাঁর অভিপ্রায় এবং এই অমূল্য উপাদান

থেকে শিল্প ও বিজ্ঞানের যাবতীয় তথ্যে পূর্ণ গ্রন্থমালা পৃথিবীর লোক
উপহার দেবেন, এই তাঁর সঙ্কল্প। তবে লাগাদোর জনসাধারণ যদি চাঁদা তু
এরকম পাঁচশো যন্ত্র তৈরী ও চালু করে এবং কর্মীরা যদি তাঁদের আলা
আলাদা সংগ্রহগুলিকে এক জায়গায় জমা করতে বাধ্য হন, তাহলে
প্রস্তাবটির প্রচুর উন্নতিও হবে এবং আরও তাড়াতাড়ি কাজে লাগানে
যাবে।

অধ্যাপক মহাশয় দৃঢ়স্বরে বললেন যে এই উদ্ভাবনের জন্যে যৌবন থেকে
তাঁর সব চিন্তা নিয়োজিত হয়েছে। ফ্রেমের মধ্যে ওঁদের দেশের গো
শব্দকোষ পোরা হয়েছে; তাছাড়া বই দেখে তিনি নিখুঁৎ হিসাব করেছে
লিখিত ভাষায় কি অনুপাতে অব্যয় পদ, বিশেষ্য, ক্রিয়া এবং অন্য
পদবিভাগ ব্যবহার হয়ে থাকে।

এই বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তাঁর এমন অন্তরঙ্গ আলাপের জন্য বিনীতভাবে
ধন্যবাদ জানলাম; এইরকম কথাও দিলাম যে যদি কখনো দেশে ফিরব
সৌভাগ্য হয়, এই বিস্ময়কর যন্ত্রের একমাত্র উদ্ভাবনকারী বলে তাঁকে যথাযোগ্য
স্বীকৃতি দেব। যন্ত্রটির আকার ও ব্যবহারপদ্ধতির নক্সা এঁকে নেবা
অনুমতিও চেয়ে নিলাম; নক্সাটি এইখানে প্রদত্ত হল। তাঁকে বললাম
যদিও ইউরোপের জ্ঞানীসমাজের একটা অভ্যাস আছে পরস্পরের উদ্ভাবন
চুরি করা এবং তার একটা ফল হয় যে কে যে আসল অধিকারী তাই নিয়ে
ঘোর বিতর্কের সৃষ্টি হয়, তবু এই যন্ত্রটি উদ্ভাবনের সমস্ত সম্মান যাতে তাঁর
একার প্রাপ্য হয়, সে বিষয়ে আমি বিশেষ সতর্ক থাকব।

তারপরে গেলাম ভাষা-ভবনে, সেখানে তিনজন অধ্যাপক বসে পরামর্শ
করছেন কি উপায়ে ওদেশের ভাষার উন্নতি হতে পারে। প্রথম প্রস্তাব হল স
আলোচনাকে সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে একাধিক শব্দাংশবিশিষ্ট শব্দগুলোকে
ছেঁটে একটি শব্দাংশ রাখা এবং ক্রিয়া ও ক্রিদন্ত পদ সব বাদ দিয়ে দেওয়া
কারণ বাস্তব জগতে যা কিছু কল্পিত সবই বিশেষ্যপদ।

দ্বিতীয় প্রস্তাব হল শব্দের ব্যবহার তুলে দেওয়া। এই প্রস্তাব সমর্থন
করে পণ্ডিতরা বলছেন যে এতে শুধু ভাষা সংক্ষিপ্ত হবে না স্বাস্থ্যেরও উন্নতি
হবে। কারণ এ তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে একটি করে শব্দ উচ্চারণ করা
সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ফুসফুসেরও একটু করে ক্ষয় হচ্ছে, অর্থাৎ আয়ুও এক

করে কমে যাচ্ছে। এর প্রতিকারের একটা উপায়ও দেখানো হল। কথা যানেই যখন কোনো জিনিসের নাম, তখন অনেক বেশি সুবিধা হয় না কি যদি কথা না বলে, যে প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হবে, তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ঘাড়ে নিয়ে বেড়ানো হয় ?

এই উদ্ভাবনটিকে বহুকাল আগেই কার্যকরী করে তোলা যেত এবং লোকের কত আরাম হত, স্বাস্থ্যের উন্নতি হত, যদি মহিলারা সবাই যত রাজ্যের অশিক্ষিত ছোটলোকদের সঙ্গে একজোট হয়ে না শাসাতেন যে বাপঠাকুরদাদের মতো জিভ দিয়ে কথা বলবার অধিকার না পেলে সবাই মিলে বিদ্রোহ করবেন। সর্বদাই সাধারণ লোকেরা বিজ্ঞানের এমন প্রবল শত্রু হয় যে তাদের সঙ্গে কোনো প্রশ্ন আপোযে মেটাবারও উপায় থাকে না। তবে সবচেয়ে যাঁরা বিদ্বান ও বুদ্ধিমান, তাঁদের অধিকাংশই জিনিসপত্রের মাধ্যমে নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করার প্রস্তাবটিতে সম্মতি জানিয়েছেন।

এই প্রস্তাবের একমাত্র অসুবিধা যে কারও বক্তব্যের পরিমাণ যদি খুব বেশি ও নানাবিষয়ক হয়, তাহলে তাকে সেই অনুপাতে বিরাট জিনিসের গাদা পিঠে করে বয়ে বেড়াতে হবে, যদি না দু একটি বলিষ্ঠ চাকর সঙ্গে নিয়ে বেড়াবার সঙ্গতি থাকে।

অনেক সময় দেখেছি দুজন পণ্ডিত চলেছেন ফেরিওয়ালাদের মতো পিঠের বোঝার ভারে নিচু হয়ে। পরস্পরের সঙ্গে পথে দেখা হল তো বোঝা নামিয়ে থলির মুখ খুলে ঘণ্টাখানেক নানান দ্রব্যাদির সাহায্যে আলাপ চলল, তারপর সরঞ্জাম গুটিয়ে দুজনে দুজনার বোঝা তুলতে সাহায্য করে, যে যার পথ নিলেন।

তবে অল্পক্ষণের কথাবার্তার জন্যে প্রয়োজনী সামগ্রী পকেটে পুরে কিম্বা বগলদাবাই করে স্বচ্ছন্দে নিয়ে যাওয়া যায় আর নিজের বাড়িতে হলে তো কোনো অসুবিধাই নেই। যাঁরা এই নিয়ম পালন করেন, তাঁদের বাড়িতে যে ঘরে অতিথিরা বসেন সে ঘরে এইরকম কৃত্রিম উপায়ে আলোচনা চালাবার জন্য যত সামগ্রীর দরকার হতে পারে, সব হাতের কাছে মজুত থাকে।

এই পরিকল্পনার আরেকটা মস্ত বড় সুবিধা হল যে-সব সভ্য দেশের সাধারণ ব্যবহারের বাসনপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী একই ধরণের হয়, কিম্বা

এতটা সাদৃশ্য থাকে যে দেখলেই চেনা যায়, সে সমস্ত দেশের জিনিসপত্র একটি সার্বজনীন ভাষার মতো ব্যবহার করা যায়। কাজেই রাজদূতরা যে সব দেশের ভাষা আদৌ জানেন না, সেখানকার রাজারাজড়া ও মন্ত্রীদের সঙ্গেও স্বচ্ছন্দে আলাপ করতে পারবেন।

এর পরে গণিত-ভবনে গিয়ে দেখি মাস্টার মশাই ছাত্রদের যে নিয়মে অঙ্ক শেখাচ্ছেন ইউরোপে কেউ তা কল্পনাও করতে পারে না। অঙ্কের প্রতিপাদ্য ও প্রমাণ দুই-ই লিখে রাখতে হয় পাতলা একটা বিস্কুটের উপরে। যে কালি দিয়ে লিখতে হয় সেটি হল মস্তিষ্কের উপযোগী এক রকম আরক। বিস্কুটটা ছাত্রকে খালিপেটে গিলে খেতে হয়; তারপরে তিনদিন একটু জল আর রুটি ছাড়া আর কিছু খাওয়া নয়। যেমন হজম হতে থাকে, আরকটিও মস্তিষ্কের দিকে উঠতে থাকে এবং আরকের সঙ্গে অঙ্কও মাথায় ওঠা উচিত। এই প্রক্রিয়ার এখনো কোনো নির্ভরযোগ্য ফল পাওয়া যায়নি; তার খানিকটা কারণ হচ্ছে বিস্কুট রচনায় উপকরণের পরিমাণে ভুল হয়, আর খানিকটা কারণ হচ্ছে ছেলেগুলো বড় বেয়াড়া। বিস্কুটের বড়ি খেতে তাদের বমি আসে, তাই তারা ওষুধের গুণ ধরবার আগেই লুকিয়ে সবটাকে বমি করে তুলে দেয়। তাছাড়া ওষুধের নিয়ম অনুসারে অত দিন খাওয়াদাওয়ার কড়াকড়ি মেনে চলতে আজ অবধি তাদের রাজী করানো যায়নি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মহাবিদ্যালয়ের আরও বর্ণনা—লেখক দ্বারা কতিপয় উন্নতির প্রস্তাব—শ্রদ্ধার সহিত প্রস্তাব গ্রহণ।

রাষ্ট্রনৈতিক পরিকল্পকদের বিদ্যালয়ে গিয়ে আমার ভালো লাগেনি। আমার মতে ওখানকার অধ্যাপকদের কারো মাথার ঠিক নেই। এরকম দৃশ্য দেখলে আমি সর্বদাই বড় বিষণ্ণ হয়ে পড়ি। এই হতভাগারা এমন সব পরিকল্পনার প্রস্তাব করছিলেন, যার ফলে বুদ্ধি, ক্ষমতা ও সততা দেখে রাজারা তাঁদের প্রিয়পাত্র নির্বাচন করতে প্ররোচিত হবেন, মন্ত্রীরা জনসাধারণের মঙ্গল বিধানের কথা চিন্তা করতে শিখবেন, যোগ্যতা, অসাধারণ ক্ষমতা কিম্বা বিশিষ্ট দেশসেবা পুরস্কৃত হবে, দেশের লোকের স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের স্বার্থকে এক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে রাজবংশীয়রাও আপনাদের প্রকৃতরূপে লাভবান মনে করতে শিখবেন; চাকরির জন্যে কর্মক্ষম লোকেরা নির্বাচিত হবে আরও এমনিধারা বহু অসম্ভব খামখেয়ালি কাণ্ড হবে মানুষ যা কোনো কালে কল্পনাও করতে পারেনি। এই সব দেখে আমার মনে পুরোনো একটা প্রবাদ আরও বদ্ধমূল হল, সেটি হচ্ছে যে এমন কোনো যুক্তিশূন্য আতিশয্যের কথা ভাবা যায় না, যেটা কোনো না কোনো দার্শনিক পণ্ডিত সত্য বলে সমর্থন না করবেন।

তবে মহাবিদ্যালয়ের এই বিভাগের প্রতি সুবিচার করতে হলে আমাকে এটা-ও মানতে হবে যে ওখানকার সকলেই এতটা স্বপ্নবিলাসী নন। একজন বিচক্ষণ উপাধিধারী পণ্ডিত আছেন, যিনি শাসনপ্রণালীর প্রকৃতি ও নিয়মাবলী নির্ভুল ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানেন। যাঁদের হাতে রাজ্যশাসনের ভার থাকে তাঁদের দোষ-দুর্বলতা আর যাঁরা শাসিত হবেন তাঁদের ব্যাভিচারের দরুণ ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রীয় বিভাগে যত রকম ব্যাধি ও দুষ্টতা দেখা যায়, তার অব্যর্থ প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন করবার জন্যে এই শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি তাঁর সমস্ত অনুশীলন যোগ্যরূপে নিয়োজিত করেছেন। যথা, যেহেতু পৃথিবীর যাবতীয় লেখক ও যুক্তিবাদীরা এবিষয়ে একমত যে প্রাকৃতিক ও রাষ্ট্রীয় দেহের মধ্যে

সর্বত্র একটা সর্বাঙ্গীন সাদৃশ্য দেখা যায়, অতএব এর চেয়ে প্রত্যক্ষ ও সপ্রমাণ আর কি হতে পারে যে একই চিকিৎসা দিয়ে উভয়ের স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ-নিবারণও হয়? সকলেই জানেন যে বিধানসভা ও অন্যান্য বড় বড় মন্ত্রণাসভায় অনেক সময় অতিরিক্ত উত্তপ্ত ও দুষ্ট রসের প্রভাব দেখা যায়। বহু মাথার রোগ আর ততোধিক হৃদ্‌রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। সেই সঙ্গে দেখা যায় প্রবল স্নায়বিক আক্ষেপ, দুই হাতের আর বিশেষ করে ডান হাতের স্নায়ু ও পেশীর অতিশয় সঙ্কুচন; তাছাড়া পিলের রোগ, বায়ু, মাথা ঘোরা, ভুল বকা তো আছেই; আর আছে পচা পুঁজে ভরা গলগণ্ড, চোঁয়া ঢেকুর ও গ্যাঁজ ওঠা, কুকুরের মতো ক্ষিদে আর বদ্ হজম, আরও যে কত রোগ তার নাম করে কাজ নেই।

এই পণ্ডিতের প্রস্তাব হল যে বিধানসভার অধিবেশনের প্রথম তিন দিন কয়েকজন চিকিৎসক সভাস্থলে উপস্থিত থাকবেন। প্রত্যেক দিনের বিতর্কের শেষে এঁরা প্রত্যেক সভ্যের নাড়ি টিপে দেখবেন। তারপর এঁদের নানান ব্যাধির প্রকৃতি ও চিকিৎসার পদ্ধতি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা ও পরামর্শ করে, চতুর্থ দিনে তাঁরা একেবারে ওষুধের বাক্স সুদ্ধ কম্পাউণ্ডার নিয়ে উপস্থিত হবেন। সভার কাজ আরম্ভ হবার আগেই সভ্যদের প্রত্যেককে যার যা ব্যামো সেই বুঝে ওষুধ দেওয়া হবে, জ্বালা কমাবার ওষুধ, হাল্কা জোলাপ, বা পরিষ্কার করবার প্রলেপ, ক্ষয়কারক ওষুধ, দমন করার ওষুধ, যন্ত্রণা উপশমের ওষুধ, কড়া জোলাপ, মাথা ব্যথা সারাবার ওষুধ, ন্যাবার ওষুধ, শ্লেষ্মার ওষুধ, কানের দোষের ওষুধ—যার যেমন দরকার মনে হবে। তারপরে এসব ওষুধের ফলাফল বিচার করে, পরের অধিবেশনে হয় তো আরেকবার ঐ ওষুধই দেওয়া হবে, নয় তো বদলিয়ে অন্য ওষুধ দেওয়া হবে, নয়তো ওষুধ বন্ধ করে দেওয়া হবে।

এই পরিকল্পনাটি জনসাধারণের পক্ষে এমন কিছু ব্যয়সাধ্য ব্যাপারও নয় আর আমার বিনীত মত হল, সব দেশেই যখন রাষ্ট্রসভাগুলির আইন প্রণয়ন করার অধিকার আছে, সব জায়গাতেই এই প্রস্তাবের ফলে অনেক উপকার হবে; একমতের প্রবর্তন হবে, বিতর্ক সংক্ষিপ্ত হয়ে যাবে, বন্ধ মুখ খুলে যাবে আর খোলা মুখ বন্ধ হবে, যাদের বয়স কম তাদের অধৈর্য কমবে, যাদের বয়স বেশি তাদের নিজেদের মতের নির্ভুলতা সম্বন্ধে নিশ্চয়তা সংশোধিত হবে, বোকারা সচেতন হয়ে উঠবে আর বেয়াদবরা নম্র হবে।

এই পণ্ডিতের আরেকটি প্রস্তাব হল, যেহেতু রাজন্যবর্গের প্রিয়পাত্রদের স্মৃতিশক্তি দুর্বল ও ক্ষণস্থায়ী হয়, যে কোনো ব্যক্তি প্রথম শ্রেণীর মন্ত্রীর কাছে দরবার করতে গেলে প্রথমে নিজের বক্তব্যটি অতি সরল ভাষায় এবং যথাসম্ভব সংক্ষেপে নিবেদন করে, যাবার সময় হয় মন্ত্রী মহাশয়ের নাক ধরে এক টান দেবে, নয় তো পেটে এক লাথি কষে দেবে, কিম্বা পায়ের কড়াতে মাড়িয়ে দেবে, কিম্বা দুই কান বার তিনেক মলে দেবে, নয় তো ইজেরে আলপিন ফুটিয়ে দেবে, কিম্বা চিমটি কেটে কেটে হাতে কালসিটে পড়িয়ে দেবে। এসবই হল বিস্মৃতির প্রতিবন্ধক। তারপরে প্রত্যেক দরবারে এই ব্যাপারের পুনরভিনয় চলতে থাকবে, যতদিন না কাজটি সমাধান হয়, কিম্বা স্পষ্টভাবে অস্বীকৃত হয়।

এই পণ্ডিত আরও নির্দেশ দিয়েছেন যে জাতীয় মহাসভার প্রত্যেকটি সভ্যকে নিজের অভিমত পেশ করে তার পক্ষ সমর্থন করে তর্ক করবার পর বিপরীত দলের পক্ষে ভোট দিতে হবে। এরকম করলে পরিণামে যে ফল পাওয়া যাবে তাতে জনসাধারণের মঙ্গল হবে।

কোনো দেশের রাজনৈতিক দলগুলি যখন মারমুখো হয়ে ওঠে, তখন বিবাদ মিটিয়ে দেবার জন্যে ইনি খাসা একটি উপায় ঠাউরেছেন। উপায়টি হল এই—প্রত্যেক দল থেকে একশো জন করে সভ্য বেছে নিতে হবে; তারপর এদের সকলকে জোড়া জোড়া করে ভাগ করে নিতে হবে। এমন ভাবে ভাগ করতে হবে যাতে ভিন্নদলীয় দুটি করে সমান মাপের মাথাওয়ালা লোক একসঙ্গে পড়ে। তারপর দুজন দক্ষ অস্ত্রবিদ্ একই সময় করাত দিয়ে দুজনার মাথা এমনভাবে কেটে নেবে যে পিছন দিকটা আলাদা হয়ে আসে আর মস্তিষ্কটা দুটি সমান ভাগে বিভক্ত হয়। তারপর এর মাথার অর্ধেক বিপক্ষদলের লোকের মাথায়, আর ওর মাথার অর্ধেক এর মাথায় জুড়ে দিলেই হল। কাজটিতে অবিশ্যি খুব নিপুণতার প্রয়োজন, তবে পণ্ডিত মহাশয় আশ্বাস দিচ্ছেন যে তেমন দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন হলে রোগ দূর হতে বাধ্য।

তাঁর যুক্তি হল এই—একই খুলির ভিতরে দুটি আধা মস্তিষ্ক যদি ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করে, অল্পক্ষণের মধ্যেই পরস্পরের সঙ্গে তারা মিটমাট করে নেবে, তার ফলে চিন্তাধারাও হয়ে উঠবে মিতাচারী আর সুনিয়ন্ত্রিত। যাঁদের এরকম ধারণা যে তাঁরা পৃথিবীতে এসেছেন শুধু সব কিছু লক্ষ্য করতে আর

সমস্ত ক্রিয়াদি পরিচালনা করতে, এরকম লোকদের পক্ষে এ ধরণের চিন্তাধারা অতিশয় বাঞ্ছনীয়। দলাদলীর পাণ্ডাদের মস্তিষ্কের পরিমাণ কিম্বা প্রকার-ভেদের কথাই যদি তোলা যায়, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে পণ্ডিত মহাশয় বলেন যে ব্যাপারটা এতই তুচ্ছ যে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

যারা টাকা দেবে তাদের কষ্ট না দিয়ে, টাকা তোলার সবচেয়ে সুবিধাজনক ও সফল উপায় সম্পর্কে দুজন অধ্যাপকের মধ্যে ভারি উত্তেজিত একটা তর্ক শুনলাম। প্রথম জন বললেন সবচেয়ে ন্যায়সঙ্গত উপায় হল পাপ ও মূঢ়তার উপরে ট্যাক্স বসানো। কাকে কত টাকা দিতে হবে সেটা উচিতরূপে ঠিক করে দেবেন প্রত্যেকের প্রতিবেশীর দল। দ্বিতীয় অধ্যাপকের মতটি ঠিক এর উল্টো। তিনি বললেন নিজেদের দেহ মনের যেসব গুণের জন্য লোকে গৌরব বোধ করে থাকে, তার উপরে ট্যাক্স বসানো উচিত। গুণের বেশি কম অনুসারে ট্যাক্সের হারটিও বাড়বে কমবে, এবং এক্ষেত্রে মীমাংসা করবে পাত্রের নিজের বিবেক।

সবচেয়ে বেশি কর দেবেন সেই সব পুরুষমানুষরা যাঁরা মহিলাদের কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়পাত্র। করের হার নির্ধারিত হবে এঁরা মহিলাদের কাছ থেকে তাঁদের প্রীতির কতগুলি এবং কি ধরণের চিহ্ন লাভ করেছেন তাই বুঝে। এক্ষেত্রে তাঁদের নিজেদের কথাই প্রমাণ বলে গ্রাহ্য হবে। সরসতা, বিক্রম, সৌজন্য এসব গুণকেও বেশি করে ট্যাক্স করার প্রস্তাব আছে; এ করও ঐ একই উপায়ে সংগৃহীত হবে, অর্থাৎ নিজেরাই নিজেদের গুণপনার হিসাব দেবেন। তবে ধর্ম, ন্যায়বোধ, বিদ্যাবুদ্ধির উপর কোনো কর বসানো উচিত হবে না, কারণ এগুলি এমন বিশেষ ধরণের গুণ যা কেউই অপরের মধ্যে দেখতে পাচ্ছে বলে স্বীকার করে না, আর নিজের মধ্যে থাকার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না।

মহিলাদের রূপ আর সাজসজ্জার নিপুণতা বিচার করে ট্যাক্স বসাবার প্রস্তাব আছে। এক্ষেত্রে পুরুষদের মতো নিজেদের বিচার নিজেরাই করবেন এই অধিকার দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু একনিষ্ঠতা, সতীত্ব, সুবুদ্ধি বা অমায়িক স্বভাবের উপরে কোনো কর বসানো হবে না, কারণ তা হলে ট্যাক্স তুলবার খরচটুকুও যে উঠবে না সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

সভ্যরা সকলেই যাতে রাজসরকারের প্রতি নিষ্ঠাবান হয়, সেইজন্য

এইরকম একটা পরিকল্পনা আছে যে কোনো পদ খালি হলেই, সভ্যদের মধ্যে লটারি করা হবে। অবিশ্যি তাঁদের প্রত্যেককেই শপথ নিতে হবে আর জামিন দিতে হবে যে লটারিতে হারুন জিতুন সভার পক্ষে ভোট দেবেন। যাঁরা একটা লটারিতে হারলেন, তাঁরা আবার সুযোগ পাবেন যেই আরেকটি পদ খালি হবে। এইভাবে আশা আর প্রত্যাশাকে বাঁচিয়ে রাখা হবে ; কথা দিয়ে কথা ভাঙ্গার অপবাদ কেউ কাউকে দিতে পারবে না, ব্যর্থতাকে সম্পূর্ণ ভাগ্যের দোষ বলে মেনে নিতে হবে আর কে না জানে যে মন্ত্রীসভার চেয়ে ভাগ্যের কাঁধটি অনেক বেশি চওড়া, অনেক বেশি বলিষ্ঠ, অনেক দায়ই সে বহন করতে পারে।

আরেকজন অধ্যাপক লম্বা একটা খসড়া দেখালেন সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চক্রান্ত কেমন করে ধরতে হয় এই বিষয়ে।

রাজনীতিজ্ঞদের তিনি উপদেশ দিচ্ছেন যে সন্দেহজনক ব্যক্তিদের ভোজন-তালিকাটি একবার দেখতে ; কোন সময় তাঁরা খান, খাটের কোন ধারে শোন, কোন হাতে পশ্চাতভাগ মোছেন ; তাঁদের মলের রঙ, গন্ধ, আস্বাদ, অজীর্ণতা কিম্বা উত্তম হজমগুণ, এইসব থেকে তাঁদের চিন্তাধারা ও অভিসন্ধির একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। তিনি অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন যে মল ত্যাগের সময়ই মানুষ সব চাইতে গম্ভীর, চিন্তামগ্ন ও নিবিষ্ট থাকে। এইরূপ অবস্থায় পাত্র যদি রাজাকে কি উপায়ে হত্যা করা প্রশস্ত, এই বিষয়ে চিন্তা করতে থাকেন, মলের রঙে সবুজের আভা থাকবে। তবে শুধু যদি একটা বিদ্রোহ পাকানো কি রাজধানী পোড়ানোর কথা ভাবেন রঙ হবে একেবারে অন্য প্রকার।

সমস্ত প্রবন্ধটি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে লেখা, এর মধ্যে বহু মন্তব্য আছে যাতে রাজনীতিজ্ঞদের কৌতূহলও হবে, কাজেও লাগবে, তবে আমার মনে হল রচনাটি খানিকটা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। সাহস করে এ কথা রচয়িতাকে বলেওছিলাম, এবং এও বলেছিলাম যে তাঁর যদি কোনো আপত্তি না থাকে তো আমি আরও কিছু তথ্য জুড়ে দিতে পারি। লেখকদের, বিশেষতঃ যাঁরা পরিকল্পক লেখক, তাঁদের পক্ষে যতটা স্বাভাবিক, ইনি তার চাইতে অনেক বেশি শিষ্টতার সঙ্গে আমার প্রস্তাবটি গ্রহণ করলেন। এমন কি তিনি আরও পরামর্শ শুনলে খুসি হবেন এও বললেন।

তাঁকে বললাম যে ত্রিবনিয়াতে—ওখানকার লোকেরা নিজেদের দেশের নাম বলে 'লাংদেন'—আমি অনেকদিন ছিলাম। সেখানকার বেশির ভাগ অধিবাসীই আবিষ্কারক কিম্বা প্রত্যক্ষদর্শী কিম্বা গুপ্তচর, কিম্বা ফরিয়াদী, নয়তো অভিযোক্তা, নয়তো সাক্ষী, নয়তো শপথকারী ; এদের সঙ্গে আছেন মেলা চেলা চামুণ্ডা আর আজ্ঞাবাহী কর্মচারী ; এঁরা সকলেই মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের অধীনে বাস করেন, বিধান মেনে চলেন ও মাইনে খেয়ে থাকেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে যাঁরা বিশেষ উন্নতি করতে চান, ওদেশের অধিকাংশ ষড়যন্ত্রই তাঁদের কীর্তি। তাঁরা চান একটা খ্যাপা শাসনব্যবস্থায় নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করতে, সাধারণ লোকের অসন্তোষ হয় দমন করতে, নিদেন তার মোড় ঘুরিয়ে দিতে, জরিমানা আদায় করে নিজেদের সিন্দুক বোঝাই করতে আর নিজেদের ব্যক্তিগত সুখসুবিধা অনুসারে জনমত উঠিয়ে-নামিয়ে গঠন করতে।

এঁরা প্রথমেই নিজেদের মধ্যে স্থির করেন কোন কোন সন্দেহজনক ব্যক্তির নামে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনতে হবে। তারপরে তাদের সমস্ত চিঠি ও কাগজপত্র হস্তগত করবার জন্যে যত্নবান থাকেন, অবশেষে তাদের গ্রেপ্তার করে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। তাঁদের কাগজপত্রগুলিকে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ শিল্পীর হাতে দেওয়া হয়, এঁরা বাক্য, বাক্যাংশ ও অক্ষরের গূঢ় রহস্যময় অর্থ বের করতে ওস্তাদ। যথা :—এঁরা কোষ্ঠবদ্ধতার অর্থ হয়তো করবেন প্রিভি-কৌন্সিল, রাজার খাস মন্ত্রণাসভা ; এক পাল হাঁসের মানে করবেন প্রতিনিধি সভা, খোঁড়া কুকুরের অর্থ বিদেশী আক্রমণকারী ; মহামারি মানে স্থায়ী সৈন্যবাহিনী, বাজ-পাখি হল মন্ত্রী ; পায়ে গোদ মানে প্রধান পুরোহিত, ফাঁসিকাঠ হল রাজসচীব ; পাইখানার পট হল জমিদার সভা, ছাঁকনা মানে রাজসভার মহিলা ; ঝাড়ু হল বিদ্রোহ ; ইঁদুর ধরবার কল মানে চাকরি, অতল গহ্বর হল রাজকোষ, নর্দমা মানে রাজসভা ; সঙের ঘন্টি টুপি মানে কারো প্রিয়পাত্র ; মচকানো বেত মানে বিচারালয় ; শূন্য কলসি মানে সৈন্যাধ্যক্ষ ; পুঁজ ভরা ঘা মানে শাসনব্যবস্থা।

এ উপায় যদি বিফল হয়, আরও ফলবান দুটি প্রণালী আছে, বিদ্বানরা এ দুটি নিয়মকে বলেন 'অ্যাক্রস্টিক' ও 'অ্যানাগ্রাম'। অ্যাক্রস্টিক একরকম কথার খেলা, যাতে প্রত্যেক শব্দের আদি বা শেষ অক্ষর দিয়ে নতুন একটা শব্দ তৈরী করা যায়। আর অ্যানাগ্রাম খেলায় প্রয়োজনীয় কথার অক্ষরগুলি ওলটপালট করে সাজাতে হয়।

প্রথম খেলায় প্রত্যেকটি মূল অক্ষরের একটি করে রাজনৈতিক মানে দিতে হবে। যথা ন হল ষড়যন্ত্র, ব হল অশ্বারোহী সৈন্য, ল হল সমুদ্রগামী নৌ-বহর। দ্বিতীয় খেলায় যে কোনো সন্দেহজনক কাগজের কথার অক্ষরগুলি উলটিয়ে পালটিয়ে এঁরা কোনো অসন্তুষ্ট দলের নিগূঢ়তম ষড়যন্ত্র প্রকাশ করে দিতে পারেন। যথা, আমি হয়তো বন্ধুকে চিঠি লিখলাম—'আমার ভাই টম এবার অর্শে ভুগিতেছে।' এই কথাগুলি ইংরিজিতে লিখলে, সেই অক্ষরগুলিকে ভেঙ্গে এমন করে সাজানো যায়, যার মানে হয়—'প্রতিরোধ কর—ষড়যন্ত্র ধরা পড়িয়াছে—বিদেশ যাত্রা!'—এই হল অ্যানাগ্রামের প্রণালী।

এই সব মন্তব্য প্রকাশ করার জন্য অধ্যাপক মহাশয় আমার কাছে অনেক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করলেন আর বললেন তাঁর প্রবন্ধে শ্রদ্ধার সঙ্গে আমার বিষয় উল্লেখ করবেন।

এদেশে আর এমন কিছু দেখলাম না যাতে আমার বেশি দিন থাকার লোভ হতে পারে, কাজেই এবার দেশে ফেরার কথা চিন্তা করতে লাগলাম।

সপ্তম অধ্যায়

লেখকের লাগাদো ত্যাগ—মালদোনাদায় আগমন—জাহাজ প্রস্তুত নয়—গ্লুবডুবড্রিবে কয়েকদিন ভ্রমণ—রাজ্যপালের অভ্যর্থনা

এরকম মনে করবার আমার যথেষ্ট কারণ ছিল যে এই রাজ্য যে মহাদেশের অংশবিশেষ, সেই মহাদেশটি পূর্বদিকে বিস্তৃত হয়ে ক্যালিফর্ণিয়ার পশ্চিমে অ্যামেরিকার অজ্ঞাত অঞ্চল অবধি গিয়েছে ; উত্তরে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত এর বিস্তার ; লাগাদো থেকে প্রশান্ত মহাসাগর দেড়শো মাইলের বেশি দূরে হবে না। সেখানে একটি চমৎকার বন্দর আছে ; বিশাল লুগনাগ দ্বীপের সঙ্গে প্রচুর বাণিজ্যাদি হয় ; লুগনাগ এদেশের উত্তর-পশ্চিমে, তার অবস্থান হল ২৯ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশে, দ্রাঘিমা ১৪০।

লুগনাগ দ্বীপ জাপানের পূর্ব-দক্ষিণে একশো মাইল দূরে অবস্থিত। জাপানের সম্রাট আর লুগনাগের রাজার মধ্যে গভীর মৈত্রী, তার ফলে তুই দ্বীপের মধ্যে জাহাজে গমনাগমনের সুবিধা আছে। কাজেই আমি স্থির করলাম যে ইউরোপে ফিরতে হলে, এই দিক দিয়ে যাওয়াই ভালো। তুটি খচ্চর সহ একজন গাইড্ ভাড়া করলাম, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, জিনিসপত্র বইবে। তারপর আমার মহামান্য পৃষ্ঠপোষক মহাশয়ের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করলাম, তিনি সর্বদাই তাঁর প্রীতির বহু নিদর্শন দিয়েছিলেন, আজ বিদায়কালেও উদার হস্তে উপহার দিলেন।

পথে বলবার মতো কোনো আকস্মিক বা তুঃসাহসিক ব্যাপার ঘটেনি। বন্দরের নাম মালদোনাদা, সেখানে যখন পৌঁছলাম পোতাশ্রয়ে লুগনাগগামী কোনো জাহাজ ছিলও না, খুব শীঘ্র কোনো জাহাজ যাবার সম্ভাবনাও ছিল না। সহরটি ইংল্যাণ্ডের পোর্টস্মাথ সহরের মতো বড়। অল্প সময়ের মধ্যেই দিব্যি আলাপ জমিয়ে নিলাম আর চমৎকার আতিথ্যও পেলাম।

একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক বললেন, লুগনাগগামী কোনো জাহাজই যখন মাসখানেকের মধ্যে প্রস্তুত হবে না, তখন এখান থেকে পাঁচ মাইল পূর্ব-দক্ষিণে গ্লুবডুবড্রিব নামের ছোট দ্বীপটিতে বেড়িয়ে এলে হয় তো মন্দ লাগবে না।

তিনি নিজে একজন বন্ধুকে নিয়ে আমার সঙ্গে যাবার প্রস্তাব করলেন আর বললেন ওখানে যাবার জন্য ভারি সুবিধের একটি ছোট জাহাজের ব্যবস্থাও করা যায়।

আমি যতটা বুঝলাম 'গ্লুবতুবড্রিব' শব্দটির অর্থ হল 'ইন্দ্রজালের বা জাদুকরদের দেশ'। ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণে যে ওয়াইট দ্বীপ আছে, এ দ্বীপটির আয়তন হবে তার এক তৃতীয়াংশ ; জায়গাটি ভারি উর্বরা। এখানকার অধিবাসীরা সবাই জাদুকর ; এদের দলের পাণ্ডার হাতে এখানকার শাসনভার। এদের বিবাহাদি হয় নিজেদের মধ্যে, উত্তরাধিকার সূত্রে বয়োজ্যেষ্ঠ হয় রাজা বা রাজ্যপাল। রাজার চমৎকার প্রাসাদ,, নয় হাজার বিঘে জুড়ে বিশাল উদ্যান, তার চারদিকে পাথর কুঁদে তৈরী কুড়ি ফুট উঁচু দেয়াল। উদ্যানের মধ্যে ছোট ছোট ঘেরা জায়গায় গোয়াল, শস্যক্ষেত আর ফুলবাগান।

রাজ্যপাল আর তাঁর পরিবারের সেবাযত্ন করে যে চাকরবাকররা, তারা সকলেই একটু অদ্ভুত রকমের। মন্ত্রতন্ত্রে তাঁর এমনি দক্ষতা যে পরলোক থেকে যাকে খুসি ডেকে এনে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য তাকে দিয়ে চাকরের কাজ করিয়ে নিতে পারেন, কিন্তু তার বেশি নয়। বিশেষ কারণ না হলে অবিশ্যি একবার যাকে ডেকেছেন তিনমাসের মধ্যে আর তাকে ডাকার কথা নয়।

আমরা যখন দ্বীপে গিয়ে পৌছলাম, তখন বেলা এগারোটা হবে। আমাদের দলের একজন ভদ্রলোক রাজ্যপালের কাছে গিয়ে দর্শনপ্রার্থী একজন আগন্তুকের জন্য প্রবেশপত্র চাইলেন। তখুনি অনুমতি পাওয়া গেল আর আমরা তিনজন রাজপ্রাসাদের প্রবেশদ্বার দিয়ে ভিতরে গেলাম। দু'পাশে খুব সেকেলে পোষাক ও অস্ত্রশস্ত্র পরা দুই সারি রক্ষক, তাদের মুখে কি রকম একটা ভাব যে দেখেই আতঙ্কে আমার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। অনেকগুলি ঘর পার হয়ে গেলাম, সব জায়গাতেই ঐরকম দু'সারি চাকর দাঁড়িয়ে ; অবশেষে রাজসমীপে গিয়ে পৌছলাম। তিনবার নিচু হয়ে কুর্ণিশ করে, তারপর সাধারণ কয়েকটা মামুলী প্রশ্নাদি হল, তারপরে মহারাজের সিংহাসনের সবচেয়ে নিচু ধাপের কাছে তিনটি টুলে আমরা বসবার অনুমতি পেলাম।

বলনিবার্বির ভাষা এঁদের ভাষার মতো না হলেও রাজা সে ভাষাও ভালোই বুঝতে পারেন ; তিনি আমার দেশ ভ্রমণের কথা কিছু কিছু শুনবার ইচ্ছা

প্রকাশ করলেন। তারপরে আমার সঙ্গে তাঁর যে কোনো লৌকিকতার সম্পর্ক নেই এটা প্রমাণ করবার জন্যে আঙ্গুল নেড়ে অনুচরদের সব বিদায় করে দিলেন। দেখে তো আমি থ', একবারটি আঙ্গুল নাড়তেই মুহূর্তের মধ্যে তারা সবাই অদৃশ্য হয়ে গেল, হঠাৎ চমকে ঘুম ভেঙ্গে গেলে স্বপ্নে দেখা দৃশ্য যেমন অদৃশ্য হয়ে যায়। খানিকক্ষণ ধরে আমি ঠিক প্রকৃতিস্থ হতে পারছিলাম না, শেষটা রাজ্যপাল সাহস দিয়ে বললেন কেউ আমার কোনো অনিষ্ট করবে না। তারপর যখন দেখলাম আমার সঙ্গীরা দুজন একটুও বিচলিত হচ্ছে না, কারণ তারা বহুবার এই দৃশ্য দেখে আনন্দলাভ করেছে, তখন আমিও মনে বল পেলাম।

আমি তাঁকে আমার বিবিধ অভিজ্ঞতার কথা বললাম; মনে একেবারে যে কোনো দ্বিধাই ছিল না এমন নয়; প্রেত চাকরগুলোকে যে জায়গায় দেখেছিলাম, গল্প বলতে গিয়ে বার বার পিছন ফিরে সেদিকে তাকাচ্ছিলাম। দুপুরে রাজ্যপালের সঙ্গে আহার করবার সম্মান লাভ করেছিলাম; আরেক প্রস্থ ভূতপ্রেত টেবিলে খাবার নিয়ে এসে পরিবেশন করল। দেখলাম সকালের চেয়ে এখন অনেক কম ভয় করছে। সূর্যাস্ত পর্যন্ত রইলাম ওখানে, তবে রাজপ্রাসাদে রাত কাটাবার নিমন্ত্রণটি বিনীতভাবে ক্ষমা চেয়ে অস্বীকার করলাম। পাশেই সহর, সেখানে আমার দুই বন্ধুর সংগে একজন লোকের বাড়িতে রাত্রে ঘুমোলাম। এই সহরটি হল ঐ দ্বীপের রাজধানী। পরদিন সকালে রাজ্যপালের আদেশ মতো আবার তাঁর কাছে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গেলাম।

এইভাবে ঐ দ্বীপে দশদিন কাটালাম, দিনের বেলায় বেশির ভাগ রাজ্যপালের সঙ্গে আর রাত্রে আমাদের বাসাতে। দেখতে দেখতে ভূতপ্রেত দেখে এতই অভ্যস্ত হয়ে গেলাম, যে তিন চার বার দেখার পর আর কিছুই মনে হত না, নিদেন ভয়ের যদি একটুও বাকি থেকে থাকে, তার চেয়ে কৌতূহল ছিল অনেক বেশি। রাজ্যপাল আমাকে আদেশ করলেন সৃষ্টির আরম্ভ থেকে আজ পর্যন্ত যত লোক পরলোকে গেছে, তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে বা যতজনকে ইচ্ছে, যা খুসি প্রশ্ন করে উত্তর চাইতে। তবে একটা সর্ত ছিল যে যে সময়কার মানুষ সেই সময়ের উপযোগী প্রশ্ন করতে হবে। রাজ্যপাল বললেন একটা বিষয় আমি যেন নিশ্চিন্ত থাকি, সেটি হল যে ওরা সর্বদাই সত্যি

কথা বলবে, কারণ পরলোকে মিথ্যা কথা বলার প্রতিভার কোনো চল নেই।

এতটা দাক্ষিণ্যের জন্য তাঁকে বিনীতভাবে ধন্যবাদ জানালাম। আমরা যে ঘরে বসেছিলাম সেখান থেকে উদ্যানের দৃশ্যটি সুন্দর দেখা যাচ্ছিল আর যেহেতু প্রথমেই খুব জাঁকজমকের দৃশ্য দেখার শখ হল, তাই আর্বালার যুদ্ধের ঠিক পরেই সৈন্যদলের মাথায় দাঁড়িয়ে সেকান্দর সাকে দেখতে চাইলাম। অমনি রাজ্যপালের অঙ্গুলি সঙ্কেতে আমাদের সামনে জানলার নিচে বিশাল প্রাঙ্গণে সেই দৃশ্য দেখা গেল। সেকান্দরকে ঘরে ডেকে আনা হল, অনেক কষ্টে তাঁর গ্রীক ভাষা বুঝতে পারলাম, নিজের বিদ্যার দৌড় তো খুব বেশি নয়। তিনি ধর্মসাক্ষী করে বললেন কেউ তাঁকে বিষ খাইয়ে মারে নি, অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে জ্বর হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

তারপরে দেখলাম হ্যানিবল আল্‌প্‌স্ পার হচ্ছেন। তিনি আমাকে বললেন যে তাঁর শিবিরে নাকি এক ফোঁটাও ভিনিগার নেই। দেখলাম জুলিয়াস সীজর আর পম্পে নিজেদের সৈন্যদলের অগ্রভাগে দাঁড়িয়ে, এখুনি যুদ্ধ আরম্ভ করতে প্রস্তুত। আমার ইচ্ছা হল রোমের প্রতিনিধি সভা আমার সামনে একটা বড় ঘরে এসে বসুক, আর তারই সঙ্গে তুলনার উদ্দেশ্যে আরেকটা ঘরে বর্তমানকালের একটি প্রতিনিধি সভাও বসুক। প্রথম সভাটিতে মনে হল বীর এবং দেবতুল্য ব্যক্তিরা বসেছেন আর দ্বিতীয় সভায় এক দঙ্গল ফেরিওয়ালা, পকেটমার, ডাকাত আর গুণ্ডা!

আমার অনুরোধে রাজ্যপাল সীজর আর ব্রুটাসকে আমাদের কাছে এগিয়ে আসতে ইসারা করলেন। ব্রুটাসকে দেখবামাত্র আমার হৃদয় তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় পূর্ণ হল। তাঁর মুখের প্রত্যেকটি অবয়ব থেকে যেন পরিপূর্ণ ধর্মভাব, অতিশয় নির্ভীক চরিত্র, মনের বল, প্রকৃষ্ট দেশপ্রেম আর গভীর মানবপ্রীতি প্রকাশ পাচ্ছে। বড় আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম যে এই দুই ব্যক্তির পরস্পরের প্রতি কত গভীর অন্তরঙ্গতা। সীজর খোলাখুলিভাবে স্বীকার করলেন যে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলির একটিও তাঁর প্রাণ বিসর্জনের গৌরবের ধার কাছেও আসে না। ব্রুটাসের সঙ্গেও অনেক আলাপ করে সম্মানিত বোধ করলাম। তিনি আমাকে বললেন যে তাঁর পূর্বপুরুষ জুনিয়স, সক্রেটিস, এপামিনণ্ডাস, ছোট কেটো, স্যার টমাস মোর আর তিনি নিজে সর্বদা

এক সঙ্গে থাকেন। এই ছয়জনের এমন সমষ্টির সঙ্গে পৃথিবীর যুগ-যুগান্তরের ইতিহাস খুঁজেও সপ্তম কাউকে জুড়ে দেওয়া যায় না।

কত যে অসংখ্য বিখ্যাত লোককে পরলোক থেকে ডেকে আনা হল, প্রাচীনকালের যুগে যুগে পৃথিবীর অবস্থা কেমন ছিল সে বিষয় আমার অভাবনীয় কৌতূহলকে চরিতার্থ করবার জন্যে, তার তালিকা দিয়ে পাঠক-মহাশয়কে বিরক্ত করার কোনো মানে হয় না। বিশেষ করে যাঁরা অত্যাচার করতেন, যাঁরা বিনা অধিকারে ক্ষমতা দখল করতেন, তাঁদের নিধনকারীদের আর প্রপীড়িত আহত জাতিদের যাঁরা উদ্ধার করতেন তাঁদের দেখে আমার চোখ দুটিকে সার্থক করেছিলাম। কিন্তু নিজের মনে যে গভীর তৃপ্তি বোধ করেছিলাম, বাইরে সেটিকে প্রকাশ করে পাঠকমহাশয়কেও আনন্দ দেবার সাধ্য আমার নেই।

অষ্টম অধ্যায়

(গ্লবডুবড্রিবের আরো বিবরণী—প্রাচীন ও বর্তমান ইতিহাস সংশোধন।)

প্রাচীনকালে যে পণ্ডিতরা সরসতা ও জ্ঞানের জন্যে সব চাইতে খ্যাতিমান ছিলেন, তাঁদের দেখবার ইচ্ছা হওয়াতে একটা গোটা দিন সেই উদ্দেশ্যে নিবেদন করেছিলাম। আমি প্রস্তাব করেছিলাম যে হোমার আর অ্যারিস্টটল্ তাঁদের যাবতীয় টিকাকার ও ব্যাখ্যাতাদের দলের অগ্রণী হয়ে দেখা দিন। কিন্তু এঁদের সংখ্যা এত বেশি যে বহু শত টিকাকারকে বাইরের প্রাঙ্গণে ও প্রতীক্ষাগারে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। আমি কিন্তু নেতৃদ্বয়কে দেখেই ভিড়ের মধ্যেও চিনেছিলাম আর তাঁদের দুজনকেও আলাদা করে চিনতে পেরেছিলাম। দুজনার মধ্যে হোমার মাথায়ও লম্বা আর দেখতেও বেশি সুন্দর, বয়সের তুলনায় খুব সোজা হয়ে চলেন, আর এমন দ্রুত তীক্ষ্ণ চোখ আমি কখনও দেখি নি। অ্যারিস্টট্ল্ খুব কুঁজো হয়ে পড়েছেন, লাঠির সাহায্যে চলাফেরা করেন। তাঁর মুখখানি শীর্ণ, চুল পাতলা হয়ে ঝুলে পড়েছে, গলার স্বর যেন কত গভীর থেকে আসছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই এও আবিষ্কার করলাম বাকি সকলের কাছে এঁরা দুজনেই সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং এঁরা ওদের কাউকে কখনো চোখেও দেখেন নি, নামও শোনেন নি।

একজন অশরীরী আমার কানে কানে বললেন যে পাতালে এই সব টিকাকাররা মূল রচয়িতাদের কাছ থেকে যতটা সম্ভব তফাৎ রেখে চলেন, তার কারণ হল লজ্জাবোধ ও বিবেকের দংশন, যেহেতু ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে মূল রচয়িতাদের ভাষণের তাঁরা এমনি সাংঘাতিক ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন। টিকাকারদের মধ্যে থেকে ডিডিমাস আর ইউস্টেথিয়ুসের সঙ্গে হোমারের আলাপ করিয়ে দিলাম এবং তাঁদের যতটা খাতির করা উচিত ছিল, হয়তো তার চেয়ে বেশি খাতির করতেই তাঁকে উৎসাহিত করেছিলাম, কারণ অনতিবিলম্বেই হোমার বুঝে ফেললেন যে কবির মন বুঝবার গুণের এঁদের নিতান্তই অভাব। কিন্তু স্কটুস আর রামুসের সঙ্গে অ্যারিস্টট্লের পরিচয় করিয়ে দেবার সময় তাঁদের

বিষয় যা বলেছিলাম তাতে তাঁর ধৈর্যচ্যুতি হয়েছিল। তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন তাঁদের দলের বাকিরাও তাঁদেরই মতো আকাট মূর্খ কি না। এবারে রাজ্যপালকে অনুরোধ করলাম ডেকার্টেস আর গাসেণ্ডিকে ডাকতে; তারপর তাঁদের রাজী করালাম অ্যারিস্টট্‌ল্‌কে তাঁদের পদ্ধতি বুঝিয়ে দিতে। তখন সেই মহাদার্শনিক প্রকৃতিবিজ্ঞান সম্পর্কে নিজের ভুলগুলি প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করলেন, বললেন তিনি অনুমানের উপরে বড় বেশি নির্ভর করেছিলেন, যেমন বেশির ভাগ লোকেই করে থাকে। তাঁর মতে এপিকিউরাসের মতবাদকে গ্যাসেণ্ডি যে এত মুখরোচক করে সাজিয়েছিলেন আর ডেকার্টেসের আবর্ত সম্বন্ধে ধারণা দুই-ই সমান ভুল বলে প্রমাণিত হয়ে গেছে। তাছাড়া আকর্ষণ নিয়ে যে আজকালকার পণ্ডিতরা এত মাতামাতি করছেন, এর ভাগ্যেও তাই আছে। তাঁর মতে প্রাকৃতিক জ্ঞানের এক একটি নতুন পদ্ধতি এক একটি নতুন ফ্যাসানের মতো, যুগে যুগে তাদের পরিবর্তন হয়। এমন কি যাঁরা তাঁদের মতামতগুলিকে গণিতের তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে প্রচার করেন, তাঁদের সাফল্যও দুদিনের ব্যাপার, সে দুদিন কেটে গেলেই তাদের দিনও ফুরিয়ে যায়।

সেকালের পণ্ডিতদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় পাঁচ দিন কাটালাম। প্রথম দিককার রোমক সম্রাটদের প্রায় সবাইকেই দেখলাম। এলিও গাবেলাসের পাচকদের ডেকে পাঠাতে রাজী করালাম রাজ্যপালকে, আমাদের একদিন রেঁধে খাওয়াক; কিন্তু উপাদানের অভাবে তারা তাদের নিপুণতার বিশেষ প্রমাণ দিতে পারে নি। আগেসিলাউসের একজন ক্রীতদাস সেকালের স্পার্টার বিখ্যাত সুরুয়া রেঁধে দিল, কিন্তু সে এক চামচ গিলে আর দ্বিতীয় চামচ গলা দিয়ে নামতে চায় না!

যে দুজন ভদ্রলোক আমাকে ঐ দ্বীপে নিয়ে গিয়েছিলেন, নিজেদের কাজে তাঁদের তিন দিনের জন্যে বাড়ি ফিরে যেতে হয়েছিল, আর আমি ঐ তিনটি দিন কাটালাম, গত দু তিনশো বছরের মধ্যে আমাদের ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের যে সব পরলোকগতরা আধুনিককালে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। চিরকাল আমি নামকরা প্রাচীন পরিবারগুলির ভক্ত, কাজেই রাজ্যপালকে বললাম ডজন দুই রাজাকে তাঁদের আট নয় ঊর্ধ্বতন পুরুষ সুদ্ধ ডেকে আনতে। কিন্তু তাঁদের দেখে আমার সে কি নিদারুণ

এবং অপ্রত্যাশিত হতাশা! কোথায় দেখব সারি সারি মুকুটধারী, তা নয়; একটা রাজপরিবারের পূর্বপুরুষদের মধ্যে দেখলাম দুটি বেহালা বাজিয়ে, তিনটি কায়দাদুরস্ত সভাসদ, আর একজন ইতালীয় ধর্মযাজক। আরেকটা রাজপরিবারে দেখলাম একটা নাপিত, তিনটি ধর্মগুরু, অর্থাৎ একজন অ্যাবট, দুজন কার্ডিনেল।

এরকম একটা বিষয়ে খুব বেশি বলতে চাই না কারণ রাজারাজড়াদের উপরে আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা; তবে অন্যান্য উচ্চবংশীয়দের, যথা কাউণ্ট, মার্কুইস, ডিউক কিম্বা আর্লদের সম্বন্ধে আমার সে রকম কোনো দুর্বলতা নেই। কতকগুলি অভিজাত পরিবারের চেহারার মধ্যে এক একটি বিশেষত্ব আছে, সে বিশেষত্বগুলি কোথা থেকে এসেছে তার একটা হদিস পাওয়া গেল; এতে যে আমি একেবারেই আমোদ পাই নি এমন নয়।

স্পষ্ট দেখলাম একটি বিশেষ পরিবার তাদের লম্বা থুতনি কোথায় পেল; আরেকটা পরিবারে দুইপুরুষ ধরে এত বদমাইসের প্রাদুর্ভাব কেন এবং আরও দুইপুরুষে এত বেশি আহাম্মুকই বা কেন; তৃতীয় পরিবারের এতজনের মাথার গোল কেন, চতুর্থতে এত জুয়াচোরই বা কেন। বুঝলাম কি ভাবে কোনো কোনো পরিবারকে তাদের বংশের চিহ্নিত চিত্র দিয়ে যতটা চেনা যায়, নিষ্ঠুরতা, মিথ্যাচার আর কাপুরুষতা দিয়েও ঠিক ততখানি চেনা যায়। দেখলাম একটি বিশিষ্ট অভিজাত পরিবারে কে প্রথম একটা জঘন্য রোগের বীজ আমদানি করেছিল, যার জন্য বংশপরম্পরায় তারা ভুগছে। এত সব লক্ষ্য করেও আমি বিন্দুমাত্র আশ্চর্য হই নি, কারণ সঙ্গে সঙ্গে এও দেখলাম যে বড় বড় পরিবারের রক্তের ধারার সঙ্গে মিশে আছে যত সব অনুচর, গোলাম, শখের চাকর, গাড়োয়ান, জুয়াচোর, বাদ্যকর, সৈনিক ও পকেটমারের রক্ত।

বর্তমান কালের ইতিহাস পরীক্ষা করে আমার ভারি ঘৃণা হল। একশো বছর ধরে রাজারাজড়াদের সভার খ্যাতিমান ব্যক্তিদের পরীক্ষা করে দেখলাম, টাকা খেয়ে লেখকরা পৃথিবীর চোখে কি ধুলোটাই দিয়েছেন, যুদ্ধের শ্রেষ্ঠ বীরত্বের কীর্তিগুলি লিখেছেন কাপুরুষদের নামে, বুদ্ধিহীনদের মধ্যে দেখিয়েছেন বিচক্ষণতা, খোসামুদেদের মধ্যে দেখিয়েছেন সততা, স্বদেশের প্রতি যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাদের মধ্যে দেখিয়েছেন রোমানদের

যোগ্য নিষ্ঠা, নাস্তিকদের মধ্যে দেখিয়েছেন ভগবৎ ভক্তি, অসতীদের মধ্যে সতীত্ব, গুপ্তচরদের মধ্যে সত্যনিষ্ঠা।

দলাদলির বিদ্বেষ আর বিচারপতিদের অসাধুতার সুযোগ নিয়ে ক্ষমতাশালী মন্ত্রীরা চক্রান্ত করে কত নির্দোষ ও সাধু ব্যক্তির প্রাণদণ্ড কিম্বা নির্বাসনের আদেশ করিয়েছেন। কত দুষ্ট পামরকে উচ্চতম বিশ্বস্ত পদের মর্যাদা, ক্ষমতা, সম্মান, ও স্বার্থের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। রাজসভা, মন্ত্রণাসভা ও প্রতিনিধি সভার যত কাজ ও ব্যবস্থার জন্যে দায়ী হচ্ছে কারা, না বেশ্যা ও পাপব্যবসায়ী পরান্নভোজী চাটুকার ও বিদূষকরা!

পৃথিবীর বৃহত্তম অভিযান ও আন্দোলনের মূল এবং আসল উদ্দেশ্য যে কি এবং কি ঘৃণ্য সব আকস্মিক ঘটনার উপরে তাদের সাফল্যের নির্ভর, সে কথা যখন জানলাম তখন মানবজাতির বুদ্ধি ও ধর্মবোধ সম্পর্কে কি হীন ধারণা যে আমার হল সে আর কি বলব!

যাঁরা ঐতিহাসিক ঘটনা ও গোপন ইতিহাস লেখার স্পর্ধা রাখেন, যাঁরা এক পেয়ালা বিষ খাইয়ে কত রাজাকে পরলোকে পাঠান, কিম্বা কোনো রাজা ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে গোপন আলোচনার বিবরণী দেন—যদিও সেখানে কোনো সাক্ষী উপস্থিত থাকে না—যাঁরা রাজদূত ও রাজসচিবদের মনের কথা ও হৃদয়ের রহস্য উদ্ঘাটন করেন এবং দুর্ভাগ্যক্রমে সর্বদাই ভুল করেন,—বর্তমান ইতিহাস পরীক্ষা করতে গিয়ে এঁদের সকলের চাতুরি ও মূর্খতা আমার কাছে ধরা পড়ে গেল। যে সব বিখ্যাত ঐতিহাসিক ঘটনা সমস্ত পৃথিবীর লোককে বিস্মিত করে দিয়েছে এবারে তার আসল কারণ খুঁজে পেলাম, যথা, কি ভাবে একজন বেশ্যা কাউকে খিড়কিদোর দিয়ে প্রভাবিত করে, খিড়কিদোর মন্ত্রণা সভাকে প্রভাবিত করে আর মন্ত্রণাসভা সরকারকে প্রভাবিত করে। একজন জেনারেল আমার কাছে স্বীকার করলেন যে কেবলমাত্র কাপুরুষতা আর দুর্ব্যবহারের কারণেই তিনি একবার যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন। একজন অ্যাডমিরেল বললেন কেবল বুদ্ধিহীনতার জন্যে যে শত্রুর কাছে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করে নৌবহর সমর্পণ করবেন বলে স্থির করেছিলেন, তাকেই যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন।

তিনজন রাজা বললেন যে তাঁদের সমস্ত রাজত্বকালে কখনও তাঁরা কোনো গুণী লোককে পুরস্কৃত করেন নি, এক যদি ভুল করে করে থাকেন, কিম্বা কোনো পেয়ারের মন্ত্রী বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকে। তাঁরা আরও বললেন যে আবার

যদি জীবন ফিরে পেতেন তাহলে পুনরায় ঐরকম করতেন। অকাট্য যুক্তি দিয়ে তাঁরা প্রমাণ করে দিলেন যে দুর্নীতি ছাড়া রাজশক্তি টিকতে পারে না, কারণ ধর্মবোধ থাকলে মানুষের স্বভাবের মধ্যে যে নিশ্চয়তা, আত্মপ্রত্যয় ও স্থিরবুদ্ধির জন্ম হয়, তাতে সরকারি কাজে চিরকাল বহু বাধার সৃষ্টি হবে।

এমনি আমার কৌতূহলী স্বভাব যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবর নিলাম এত লোক কি উপায় অবলম্বন করে এত সব বড় বড় উপাধিও বিশাল সম্পত্তি আয়ত্ত করেছিলেন। এসব অনুসন্ধান নিতান্ত বর্তমানকালের মধ্যেই আবদ্ধ রেখেছিলাম। বর্তমানকালের উপরে অবিশ্যি আমি অতিরিক্ত দোষারোপ করতেও চাই না আর নিশ্চয়ই বিদেশের লোকদের অসন্তোষের কারণও হতে চাই না। আশা করি একথা বলাই বাহুল্য যে এ প্রসঙ্গে আমি যা কিছু বলব তার কোনোটাই আমার নিজের দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বহু লোককে ডাকা হল এবং সামান্য একটু অনুসন্ধান করতেই এমন সব লজ্জাকর ব্যাপার বেরিয়ে পড়ল যে সে কথা মনে করলেও মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। মিথ্যা প্রতিজ্ঞা, অত্যাচার, উৎকোচ, বঞ্চনা, আরেকজনকে খুসি করবার উদ্দেশ্যে অন্যায় কাজে লিপ্ত হওয়া ইত্যাদি তো তারা যা যা বলল তার মধ্যে সব চাইতে ক্ষমার্হ দুর্বলতা। এসব ক্ষেত্রে খানিকটা রাস আল্গা করাই আমি যুক্তিসঙ্গত বলে বিবেচনা করলাম।

কিন্তু কেউ কেউ স্বীকার করলেন যে তাঁদের সম্পদ ও সম্মানের মূলে আছে অত্যাচার ও বিকৃত ব্যাভিচার; কেউ কেউ আবার বললেন তাঁদের স্ত্রী-কন্যার ধর্ম বিক্রয় করেছেন, কিম্বা রাজা বা স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, কাউকে বিষ খাইয়েছেন, অথবা নিরপরাধকে ধ্বংস করবার জন্য ন্যায়বিচারকে বিপথগামী করেছেন। যে সকল উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের বংশমর্যাদার জন্যে আমাদের মতো নিম্নস্তরের লোকদের সর্বদা শ্রদ্ধা দেখানো উচিত এবং সে রকম শ্রদ্ধা দেখানোই আমার স্বভাব, এসব কথা শুনে যদি তাঁদের প্রতি আমার গভীর ভক্তি খানিকটা চটে গিয়ে থাকে, তাহলে আশা করি আমাকে ক্ষমা করা হবে।

রাজা ও রাজসরকারের জন্য অনেক বড় বড় কাজ করেছেন বলে যাঁদের কথা শুনেছি, এই রকম কর্মীদের দেখবার আমার বড় শখ ছিল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করে জানলাম ইতিহাসে নাকি এঁদের নাম লেখা হয়নি, দু'এক ক্ষেত্রে যদি

বা হয়ে থাকে সেখানে তাঁদের অতি নীচ বদমায়েস বা বিশ্বাসঘাতক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এঁরা ছাড়া, বাদবাকিদের কখনও নাম পর্যন্ত শুনিনি। তাঁদের সকলের দেখলাম বিষণ্ণ মুখ, মলিন বসন, কেউ বললেন দারিদ্র্য ও অপমানের মধ্যে তাঁদের মৃত্যু হয়েছেন, কেউ মরেছেন ফাঁসিকাঠে!

অন্য সকলের মধ্যে একজনকে দেখলাম, যাঁর কাহিনীটি একটু অসাধারণ বলে মনে হল। তাঁর পাশে বছর আঠারোর একটি যুবক দাঁড়িয়েছিল। তিনি বললেন যে বহু বছর ধরে তিনি একটা জাহাজের অধ্যক্ষ ছিলেন। অ্যাক্টিয়ামের সমুদ্রযুদ্ধে সৌভাগ্যক্রমে তিনি শত্রুপক্ষের প্রধান ব্যূহ ভেদ করে গিয়েছিলেন, তাদের তিনটি বড় জাহাজকে জলমগ্ন ও চতুর্থটিকে বন্দী করেছিলেন। অ্যান্টনির রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়নের ও ফলতঃ যুদ্ধে জয়লাভের এই ছিল একমাত্র কারণ। তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিল যে যুবক সে হল তাঁর একমাত্র পুত্র, ঐ যুদ্ধে সে প্রাণ দিয়েছিল।

তিনি আরও বললেন কিছু পুরস্কার পাবেন এই ভরসায়, যুদ্ধ শেষ হলে তিনি রোমে গিয়ে সম্রাট অগাস্টাসের সভায় দরবার করেছিলেন, যাতে তাঁকে আরও বড় একটি জাহাজের আধিপত্য দেওয়া হয়; ঐ জাহাজের অধ্যক্ষের মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু তাঁর যোগ্যতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে একজন ছোকরাকে সেই পদ দেওয়া হল, এমন এক ছোকরা যে কখনও সমুদ্রযাত্রা করে নি, কিন্তু যার মা ছিলেন সম্রাটের কোনো প্রেয়সীর শিথিল চরিত্রের সখী। নিজের জাহাজে ফিরে আসতেই তাঁর বিরুদ্ধে কর্তব্য অবহেলা করার অভিযোগ আনা হয় এবং সে জাহাজের কর্তৃত্ব দিয়ে দেওয়া হয় ভাইস্-অ্যাডমিরেল পাব্লিকোলার একজন প্রিয় অনুচরকে। শেষ পর্যন্ত তিনি রোম থেকে বহুদূরে অনুর্বরা এক গোলাবাড়িতে অবসর যাপন করতে লাগলেন; সেইখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

এ কাহিনী কতখানি সত্য জানবার আমার এত কৌতূহল হল যে আমি অনুরোধ করলাম যেন অ্যাগ্রিপাকে একবার ডাকা হয়, ঐ যুদ্ধের সময় তিনিই ছিলেন অ্যাডমিরেল। অ্যাগ্রিপা এসে সমস্ত বিবৃতি সমর্থন করলেন, উপরন্তু জাহাজের ক্যাপ্টেনের ভূরি ভূরি প্রশংসা করলেন, ক্যাপ্টেনের এতই বিনয়ী স্বভাব যে নিজের গুণের কথা অনেকখানি কমিয়ে কিম্বা গোপন রেখে, ব্যাপারটার বিবরণ দিয়েছিলেন।

ঐ সাম্রাজ্যে দুর্নীতির এত দ্রুত ও ব্যাপক বৃদ্ধির কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, তার কারণ সম্প্রতি ওদেশে বড় বেশি বিলাসিতার সূচনা হয়েছিল। এ কথা মনে করে অন্যান্য দেশের অনুরূপ অবস্থা দেখে ততটা বিস্ময় বোধ করিনি। সে সব দেশে বিচিত্র পাপের রাজত্ব আরও বেশি দিন ধরে চলে আসছে, সেখানকার প্রধান অধিনায়ক সমস্ত যশ এবং লুটের মালকে একচেটিয়া করে নিয়েছেন, যদিও খুব সম্ভব উভয় দিকেই তাঁর যোগ্যতা সবচেয়ে কম।

পৃথিবীতে যার যেরকম চেহারা ছিল, অবিকল সেই চেহারা নিয়েই এঁরা সকলে দেখা দিয়েছিলেন, তাই দেখে আমার মন বড় বিষণ্ন হয়ে পড়েছিল এই ভেবে যে গত একশো বছরের মধ্যে মানবজাতির কতটা অধোগতি হয়েছে। লক্ষ্য করলাম যে নানারকম দুষ্ট ব্যাধি ও তার ফলাফলের জন্য ইংরেজ জাতির চেহারার ও প্রত্যেকটি অবয়বের কি পরিবর্তন ঘটেছে; মাথায় বেঁটে হয়ে গেছে, স্নায়ু শিথিল, পেশী দুর্বল, গায়ের রঙে পাণ্ডুরতা দেখা দিয়েছে, গায়ের মাংস ঢিলা ও দুর্গন্ধযুক্ত।

এসব দেখে আমার মনটা এতদূর বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল যে সেকালের কয়েকজন ইংরেজ জোতদার দেখতে চাইলাম। এককালে এরা নিজেদের আচরণের, আহার-বিহারের ও পোষাক-পরিচ্ছদের সরলতা, ব্যবহারে ন্যায়-নিষ্ঠা, প্রকৃত স্বাধীনতাপ্রীতি, সাহসিকতা ও দেশপ্রেম ইত্যাদির জন্যে বিখ্যাত ছিল। জীবিতদের সঙ্গে এই পরলোকগতদের তুলনা করে দেখে যখনই মনে হয়েছে কেমন করে সেকালের মানুষদের এই সব জন্মলব্ধ গুণগুলি তাঁদের নাতিনাতনীরা সামান্য টাকার জন্যে বিকিয়ে দিয়েছে, তখন আর অবিচলিত থাকতে পারিনি। ভোট বিক্রী করতে আর নির্বাচনের সময় নানান চাতুরি করতে গিয়ে রাজসভায় যত রকম পাপাচার ও নষ্টামি শেখা সম্ভব, সমস্তই এদের নাতিনাতনীরা আয়ত্ত করে ফেলেছে!

নবম অধ্যায়

লেখকের মালদোনাদায় প্রত্যাবর্তন—সমুদ্রপথে লুগনাগ যাত্রা—কারারুদ্ধ হওন—সভায় আনয়ন—প্রবেশের প্রণালী—প্রজাদিগের সহিত রাজার সদয় ব্যবহার।

আমার ফিরবার দিন আসন্ন দেখে, গ্লুবডুবড্রিবের মহামান্য রাজ্যপাল মহাশয়ের কাজ থেকে বিদায় গ্রহণ করে আমার দুই সঙ্গীর সঙ্গে মালদোনাদা ফিরে এলাম; সেখানে দুই সপ্তাহ অপেক্ষা করার পর একটি লুগনাগগামী জাহাজ প্রস্তুত হল। ঐ দুই ভদ্রলোক এবং আরও কয়েকজন বন্ধু এত উদার ও সদয় ব্যবহার করলেন যে কি বলব, পথের জন্য খাবার-দাবার দিয়ে আমাকে একেবারে জাহাজে তুলে দিলেন। এক মাস সমুদ্র পথে দিয়ে চললাম।

একবার এমন প্রচণ্ড ঝড় উঠেছিল যে আয়নবায়ু পাবার আশায় আমরা পশ্চিম মুখে যাত্রা করতে বাধ্য হয়েছিলাম, একশো আশী মাইল ধরে এই আয়নবায়ু পাওয়া যায়। ১৭০৮ সালের ২১শে এপ্রিল আমরা ক্লুমেগনিগের নদীতে প্রবেশ করলাম। ক্লুমেগনিগ হল লুগনাগের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি সমুদ্র বন্দর।

সহর থেকে তিন মাইল দূরে আমরা নোঙর ফেলে পাইলটের জন্যে সিগন্যাল করলাম। আধঘণ্টার মধ্যে তারা দুজন এসে জাহাজে উঠল। নদীপথে কয়েকটি অত্যন্ত বিপজ্জনক জলমগ্ন চড়া আর পাথরের চাঁই আছে, সেগুলিকে বাঁচিয়ে পাইলটরা আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল সহরের প্রাচীরের ছ'শো ফুটের মধ্যে, নদীটা যেখানে বিশাল একটা জলাধারের মতো রূপ ধরেছে। সেখানে একটা গোটা নৌবহর নিরাপদে ভেসে থাকতে পারে।

বিশ্বাসঘাতকতা করেই হক কিম্বা বুদ্ধির দোষেই হক, আমাদের নাবিকদের মধ্যে কেউ কেউ পাইলটদের কাছে বলেছিল আমি নাকি একজন অচেনা আগন্তুক। পাইলটরা সে কথা ওখানকার শুল্ক আপিশে জানিয়েছিল; আমি মাটিতে পদার্পণ করতেই তারা আমাকে অতিশয় কড়াভাবে পরীক্ষা করতে লাগল। শুল্ক আপিসের কর্মচারিটি আমার সঙ্গে বলনিবাবির ভাষায় কথা

বললেন ; এদের মধ্যে এত বেশি বাণিজ্য চলে যে এই সহরের প্রায় সকলেই, বিশেষ করে নাবিকরা আর শুল্ক বিভাগের কর্মচারিরা, বলনিবার্বির ভাষা বুঝতে পারে।

আমি কিছু কিছু খুঁটিনাটি দিয়ে সংক্ষিপ্ত একটা বিবরণী দিলাম, সেটিকে যথাসম্ভব বিশ্বাসযোগ্য ও যুক্তিসঙ্গত করবার চেষ্টাও করলাম, তবে আমার মনে হয়েছিল আমার দেশের নামটি গোপন করাই ভালো, কাজেই নিজেকে ওলন্দাজ বলে পরিচয় দিলাম। আমার গন্তব্যস্থান হচ্ছে জাপান, সে-দেশে ওলন্দাজরা ছাড়া অন্য কোনো ইউরোপবাসীর প্রবেশাধিকার নেই। কাজেই কর্মচারিটিকে বললাম, বলনিবার্বির তীরে জাহাজডুবি হয়ে একটা পাথরের উপরে পড়েছিলাম, সেখান থেকে লাপুটা বা উড়ুক্কুদ্বীপে আমাকে তুলে নেওয়া হয়, এ দ্বীপের কথা উনি অনেক শুনেছেন—এখন আমি জাপান যেতে চেষ্টা করছি, কারণ জাপান থেকে দেশে ফেরার একটা ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে।

কর্মচারি বললেন, তিনি তখুনি রাজসভায় চিঠি দিচ্ছেন, চিঠির উত্তর আসতে দিন পনেরো লাগবে, কাজেই সেখান থেকে হুকুম না আসা পর্যন্ত আমাকে বন্দী অবস্থায় থাকতে হবে। সুবিধামতো একটা বাসস্থানে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল, দরজায় পাহারা বসানো হল। কিন্তু মস্ত বাগান ছিল, সেখানে আমি ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াতে পারতাম আর যথেষ্ট সদয় ব্যবহারও পেয়েছিলাম, রাজার খরচেই আগাগোড়া ছিলাম। বহুলোকের কাছ থেকে এই সময় নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম, অধিকাংশই শুধু কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যে, কারণ সবাই শুনেছিল আমি বহু দূর দেশ থেকে এসেছি, যে দেশের নামও এখানে কেউ শোনেনি।

আমার সঙ্গে ঐ জাহাজে একজন যুবক এসেছিল, তাকে দোভাষীর কাজ করবার জন্যে ভাড়া করলাম। ছেলেটির বাড়ি লুগনাগে, তবে অনেক বছর মালদোনাদাতে বাস করার ফলে দুই ভাষাতেই সে ছিল ওস্তাদ। তার সাহায্যে যারা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত, তাদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতাম। তবে কথাবার্তা মানে তাদের প্রশ্ন ও আমার উত্তর, এইমাত্র।

যেমন আমরা আশা করেছিলাম, সেই সময়ই রাজসভা থেকে হুকুম এল।

হুকুম মানে একটা পরোয়ানা এল যে আমাকে সাঙ্গোপাঙ্গে ত্রালড্রাগডুভ কিম্বা ত্রিলড্রোগড্রিব—যতদূর মনে পড়ে দুই রকম উচ্চারণই চলে—যেতে হবে, সঙ্গে যাবে দশজন অশ্বারোহী। আমার সাঙ্গোপাঙ্গের মধ্যে তো ঐ এক বেচারি দোভাষী, তাকেই বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমার অনুচর করে নিলাম।

আমার বিনীত প্রার্থনায় দুজনকে দুটি খচ্চর দেওয়া হল, পিঠে চেপে যাবার জন্য। আমাদের আধ দিনের পথ আগে আগে একজন বার্তাবহ পাঠানো হল, রাজাকে আমাদের আগমনের সংবাদ দেবার জন্য এবং তাঁকে অনুরোধ করতে যেন তিনি দয়া করে জানান কবে ও কোন সময় তাঁর পরম অনুগ্রহের পাত্র হয়ে আমি গিয়ে তাঁর পাদপীঠের সম্মুখে ধূলি লেহন করবার সম্মানলাভ করব। রাজসভার এই ছিল নিয়ম এবং আমি গিয়ে দেখলাম এটা নিতান্ত কথার কথা নয়। আমি সেখানে পৌঁছবার দুদিন পরেই হুকুম হল হামা দিয়ে মাটি চাটতে চাটতে আমাকে রাজসমীপে উপস্থিত হতে হবে। অবিশ্যি আমি বিদেশ থেকে এসেছি বলে যথেষ্ট যত্ন নেওয়া হল যে মাটিটা যেন এত অপরিষ্কার না থাকে যাতে ধূলো চাটতে আমার খুব খারাপ লাগবে। এই বিশেষ অনুগ্রহ দেখানো হয় কেবলমাত্র অতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা যখন দর্শন-প্রার্থী হয়ে আসেন। এমন কি মাঝে মাঝে মেঝের উপরে ইচ্ছা করে ধূলো ছড়িয়ে রাখা হয়, রাজসভায় যদি দর্শনপ্রার্থীর কোনো ক্ষমতাশালী শত্রু থাকে। আমি নিজে দেখেছি একজন অতিশয় গণ্যমান্য ব্যক্তিকে এমনি একমুখ ধূলো নিয়ে সিংহাসনের কাছে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছতে যে কথা বলবার আর জো ছিল না তাঁর। এর কোনো প্রতিকারেরও উপায় নেই, কারণ রাজার সামনে দর্শনপ্রার্থীর থুতু ফেলা মুখ মোছা গুরুতর অপরাধ, তার গুরুতর দণ্ড।

ওদের আরেকটি নিয়মও আছে যেটি আমি সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করতে পারলাম না। রাজন্যবর্গের মধ্যে কাউকে যদি কোমল ও মৃদুভাবে প্রাণদণ্ড দিতে রাজা ইচ্ছা করেন, তিনি মেঝের উপরে একটা মেটে রঙের গুঁড়ো ছড়িয়ে রাখবার হুকুম দেন, সে এমনি সাংঘাতিক বিষাক্ত যে চেটে খেলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নির্ঘাৎ মৃত্যু। কিন্তু রাজার কোমল চরিত্রের ও সযত্ন প্রজা-পালনের প্রতি সুবিচার করতে হলে, এও বলতে হয় যে দণ্ডবিধান হয়ে গেলে পর কড়া হুকুম হয় যেন মেঝের বিষাক্ত জায়গাগুলি খুব ভালো করে ধুয়ে ফেলা

হয়। এ বিষয় চাকররা যদি গাফিলতি করে তাহলে রাজা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। এ বিষয়ে ইউরোপের রাজারা তাঁর অনুকরণ করলে বড় ভালো হয়।

যে চাকরের মেঝে ধোয়ার কাজ সে একবার বিদ্বেষের কারণে কর্তব্যের অবহেলা করেছিল বলে রাজা আদেশ করলেন চাকরটাকে যেন কষে বেত মারা হয়, এ আমার নিজের কানে শোনা। চাকরটার কাজে অবহেলার জন্য একজন অভিজাত পরিবারের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎসম্পন্ন যুবক অকালে মারা গেল, অথচ সে সময় রাজার আদৌ সেরকম কোনো অভিপ্রায় ছিল না। রাজা কিন্তু এতই হৃদয়বান যে চাকরটা যখন প্রতিজ্ঞা করল যে বিশেষ আদেশ না পেলে আর কখনও এমন কাজ করবে না, তিনি তখুনি তাকে বেত খাওয়া থেকে অব্যাহতি দিলেন।

অবান্তর কথা ছেড়ে এবার আসল ব্যাপারে ফেরা যাক। হামা দিয়ে সিংহাসনের চার গজের মধ্যে এসে আস্তে আস্তে উঠে হাঁটু গেড়ে বসলাম; তারপর সাতবার মাটিতে মাথা ঠুকে আগের দিন রাত্রে যেমন আমাকে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এই কথাগুলি উচ্চারণ করলাম—'ইক্প্লিং গ্লফ্থ্রব্ স্কুটসেরুম ব্লিয়প্ ম্লাস্নাল্ট জ্বদ্বাক্ক গুফ্ স্লিওফদ্ গুরদ্লুভ্ আস্ট্।' ও দেশের আইন মতে রাজসমীপে যে যাবে এইভাবে তাকে রাজার বন্দনা করতে হবে। কথাটার মানে হল—মহামান্য দেবতুল্য মহারাজ যেন সূর্য ও সাড়ে এগারো চন্দ্রের চেয়েও দীর্ঘজীবী হয়েন।

এ কথা শুনে রাজা কি যেন উত্তর করলেন, তার মানে না বুঝলেও আমাকে যেমন শেখানো হয়েছিল সেইভাবে প্রত্যুত্তর করলাম—ফ্লুফ্ত ড্রিন্ ইয়ালেরিক্ দ্বুলডুম প্রাস্ত্রাদ্ মিরপ্লুস্।' তার মানে হল, আমার জিভ রয়েছে আমার বন্ধুর মুখে। অর্থাৎ আমি একজন দোভাষী আনবার অনুমতি চাই। তার ফলে যে যুবকটির কথা আগেই উল্লেখ করেছি, তাকে ডেকে আনা হল। এক ঘণ্টার বেশি সময় ধরে রাজা আমাকে যতগুলি প্রশ্ন করলেন দোভাষী মারফৎ সবগুলির উত্তর দিলাম। আমি কথা বললাম বলনিবার্বি ভাষায়, দোভাষী আমার বক্তব্যটি লুগনাগের ভাষায় অনুবাদ করে দিল।

রাজা তো আমার সঙ্গ পেয়ে মহাখুসি। তখুনি তাঁর 'ব্লিফমারক্লুব' অর্থাৎ প্রধান গৃহাধ্যক্ষকে আদেশ করলেন রাজবাড়িতেই যেন আমার আর আমার দোভাষীর থাকবার জায়গার ব্যবস্থা হয়, আমার খোরাকি বাবদ রোজ কিছু

টাকাও মঞ্জুর হয়, তাছাড়া আমার অন্যান্য সাধারণ খরচের জন্যে যেন আমাকে বড় একথলি মোহর দেওয়া হয়।

এই দেশে রাজার আজ্ঞাধীন হয়ে তিন মাস বাস করেছিলাম; রাজা আমাকে অনেক খাতির করেছিলেন এবং নানান সম্মানসূচক প্রস্তাবও করে-ছিলেন, কিন্তু আমার মনে হল সুবুদ্ধি ও ন্যায়ের দিক থেকে দেখতে গেলে বাকি জীবনটা স্ত্রীপুত্রপরিবারের সঙ্গে কাটানোই বাঞ্ছনীয়।

দশম অধ্যায়

লুগনাগবাসীদের প্রশংসা—ষ্ট্রুল্ডব্রুগদের বিশেষ বিবৃতি—এ বিষয়ে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে লেখকের আলোচনা।

লুগনাগের লোকেরা ভারি ভদ্র ও উদার এবং যদিও সব প্রাচ্য দেশে যে গর্বিত ভাব দেখা যায়, এদের মধ্যেও তার খানিকটা আছে, তবুও তারা বিদেশী আগন্তুকদের প্রতি ভারি সৌজন্য দেখায়, বিশেষ করে বিদেশীটি যদি রাজসভার নেকনজরে থাকে। ওখানকার সবচেয়ে অভিজাতদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, সঙ্গে সব সময় দোভাষী থাকাতে আলাপ আলোচনাগুলো মন্দ জমত না।

একদিন এই রকম সৎসঙ্গে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন ওঁদের ষ্ট্রুল্ডব্রুগ্ বা অমরদের কারও সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে কি না? আমি বললাম তা হয়নি; তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম মর জগতের অধিবাসীকে ওরকম আখ্যা দেবার কারণটি কি। উত্তরে তিনি বললেন, মাঝে মাঝে, অবিশ্যি খুবই ক্বচিৎ, ওঁদের দেশের কোনো পরিবারে এমন একটি শিশু জন্মায় যার কপালে বাঁ দিকের ভুরুর ঠিক উপরে গোল একটি লাল দাগ থাকে। এই দাগ থাকার অব্যর্থ মানে শিশুটি কখনও মারা যাবে না। গোল দাগটি একটা রূপোর তিনপেনির মতো বড়, কিন্তু কালে কালে আরও বড হয় ও রঙ বদলায়। বারো বছর বয়সে দাগের রঙ হয় সবুজ, পঁচিশ অবধি তাই থাকে, তারপরে রঙ হয়ে যায় গাঢ় নীল। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে দাগের রঙ হয় কয়লার মতো কালো আর মাপে হয় ইংল্যাণ্ডের সিলিং-এর মতো; এর পর আর কোনো পরিবর্তন হয় না।

তিনি আরও বললেন যে এরকম শিশুর জন্ম এতই বিরল যে গোটা রাজ্যে মেয়ে পুরুষ নিয়ে এগারো শো'র বেশি ষ্ট্রুল্ডব্রুগ আছে বলে তাঁর মনে হয় না। তাঁর হিসাবে এদের মধ্যে জনা পঞ্চাশ এই রাজধানীতেই আছে; বাকিদের মধ্যে আছে একটি ছোট মেয়ে, সে তিন বছর আগে জন্মেছিল। এরা কোনো বিশেষ পরিবারে জন্মায় না, সবই ভাগ্যের হাতে; এদের সন্তানরাও অন্যান্য সাধারণ লোকের মতোই মরণশীল।

এই বিবৃতি শুনে আমি যে অবর্ণনীয় আনন্দে অভিভূত হয়েছিলাম তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি। যাঁর কাছে খবরটা শুনলাম তিনি বলনিবার্বির ভাষা বুঝতেন, আমিও সে ভাষা ভালো বলি, কাজেই খানিকটা অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস প্রকাশ না করে পারলাম না। মুগ্ধকণ্ঠে বলে উঠলাম—কি সুখী এই জাতি, যাদের প্রত্যেকটি শিশু অমরত্বের অন্ততঃ খানিকটা সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কি সুখী এ দেশের লোকেরা যারা প্রাচীন গুণের এতগুলি জীবন্ত দৃষ্টান্তের সঙ্গসুধা লাভ করার সুযোগ পাচ্ছে এবং প্রাচীনকালের জ্ঞানবিদ্যা দান করবার জন্য যাদের এতজন গুরু প্রস্তুত রয়েছেন। আর অতুলনীয়ভাবে সুখী এই নরশ্রেষ্ঠ স্ট্রুল্ডব্রুগরা যাঁরা মানবজীবনের সাধারণ মর্মান্তিক পরিণাম থেকে মুক্ত হওয়াতে, তাঁদের চিত্তও স্বাধীন ও নিষ্কাম। নিয়ত মৃত্যুভয়জনিত ভারাক্রান্ত হৃদয়বৃত্তি ও বিষণ্ণতা থেকেও তাঁরা মুক্ত।

এই মহামান্য ব্যক্তিদের কাউকে রাজসভায় উপস্থিত না দেখে আমি বিস্ময় প্রকাশ করলাম, কপালে একটি কালো দাগ চোখে পড়বার মতো চিহ্ন, কাজেই সেরকম কেউ উপস্থিত থাকলে সহজে আমার নজর এড়িয়ে যেতেন না। কিন্তু এও তো সম্ভব নয় যে এখানকার রাজার মতো একজন বিচক্ষণ শাসনকর্তা নিজের চারিপাশে বেশ কয়েকজন এই রকম বিচক্ষণ ও কর্মক্ষম মন্ত্রণাদাতা সংগ্রহ করবেন না। তবে এমনও হতে পারে যে এই প্রাচীন ঋষিদের ধর্মজ্ঞান এতই কঠোর যে রাজসভার দুষ্ট ও উচ্ছৃঙ্খল আচারব্যবহার তাঁরা সইতে পারেন না। আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে তো প্রায়ই দেখা যায় যুবকরা নিজেদের মত এত ভালোবাসে এবং তাদের চিত্ত এতই চঞ্চল যে বয়োজ্যেষ্ঠদের সু-চিন্তিত নির্দেশ মেনে চলা তাদের স্বভাব নয়। সে যাই হক, রাজা যখন দয়া করে আমাকে তাঁর কাছে যাবার অনুমতি দিয়েছেন, আমি স্থির করলাম যে সুযোগ পেলেই এই বিষয় তাঁকে আমার বিস্তারিত মতামত দোভাষীর সাহায্য নিয়ে অকপটভাবে জানাব, আমার পরামর্শ তিনি গ্রহণ করুন কিম্বা নাই করুন। আরেকটি বিষয় আমি মনস্থির করেছিলাম, রাজা তো বার বার আমাকে এ দেশে কোনো পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন, এবারে আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর এই অনুগ্রহের প্রস্তাব গ্রহণ করব এবং স্ট্রুল্ডব্রুগরা যদি অনুমতি করেন তো তাঁদের মতো উন্নত প্রাণীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব।

যে ভদ্রলোকের কাছে এই বক্তৃতাটি দিলাম, আগেই বলেছি তিনি বলনিবার্বির ভাষা জানতেন, তিনি আমার দিকে চেয়ে কি রকম একটু হাসলেন, যেমন করে লোকে অবোধজনকে অনুকম্পা করে হাসে আর সেই সঙ্গে বললেন, যে কারণেই হক আমি তাঁদের দেশে থেকে গেলে তিনি খুবই খুসি হবেন। তারপর উপস্থিত সকলের কাছে আমার বক্তব্যটি বুঝিয়ে বলবার অনুমতি চাইলেন। তাই করলেন তিনি, কিছুক্ষণ তাঁরা নিজেদের মধ্যে নিজেদের ভাষায় যে সব কথাবার্তা বললেন, আমি তার এক বর্ণ বুঝলামও না আর তাঁদের মুখের ভাব দেখে টেরও পেলাম না যে আমার কথাগুলি তাঁরা কি ভাবে গ্রহণ করলেন।

অল্পক্ষণ নীরব থেকে তারপর সেই ভদ্রলোক আমাকে বললেন যে তাঁর এবং আমার—কথাগুলি তাঁর নিজের—বন্ধুরা অমর জীবনের সুখ সুবিধা সম্পর্কে আমি যা যা বললাম সে সব সুচিন্তিত মতামত শুনে যারপরনাই খুসি হয়েছেন এবং তাঁরা এই কথাই বিশদ্‌ভাবে জানতে ইচ্ছুক যে ভাগ্যক্রমে আমি নিজে যদি ষ্ট্রুল্‌ডব্রুগ হয়ে জন্মাতাম তাহলে আমি কি ভাবে জীবন কাটাতাম।

আমি বললাম, এমন একটা ব্যাপক ও আনন্দদায়ক বিষয়ে মুখর হয়ে ওঠা খুবই সহজ, বিশেষ করে আমার পক্ষে, যেহেতু প্রায়ই আমি এই কল্পনা করে চিত্তবিনোদন করতাম যে যদি রাজা হতাম, কিম্বা সেনানায়ক, কিম্বা কোনো উচ্চবংশীয় জমিদার হতাম, তাহলে আমি কি করতাম। তাছাড়া উপস্থিত প্রসঙ্গে তো আমি অনেক সময়ই মনে মনে একটা সম্পূর্ণ খস্‌ড়া তৈরী করেছি যে যদি এটা নিশ্চিত জানা থাকত যে আমি চিরকাল বেঁচে থাকব, তাহলে কোন কোন কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখব এবং কি ভাবে সময় কাটাব।

যদি আমি এই পৃথিবীতে একজন ষ্ট্রুল্‌ডব্রুগ হয়ে জন্মাবার সৌভাগ্য লাভ করতাম, তাহলে জীবন ও মৃত্যুর প্রভেদ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে যেই নিজের সুখময় অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হতাম, অমনি আমি সবার আগে সঙ্কল্প করতাম যে যাবতীয় কৌশল ও উপায় অবলম্বন করে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। এই ভাবে মিতব্যয়িতা ও সুব্যবস্থার গুণে দুশো বছরের মধ্যে দেশের ভিতর আমি যে সর্বাপেক্ষা ধনী হয়ে উঠতাম এমন আশা করা খুবই যুক্তিসঙ্গত।

দ্বিতীয়তঃ, প্রথম যৌবন থেকেই আমি জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলনে নিজেকে নিয়োজিত করতাম, তার ফলে সময়কালে বিদ্যার ক্ষেত্রে আমি সকলের শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠতাম। সবার শেষে দেশের জনসাধারণের প্রত্যেকটি কীর্তি এবং অভিজ্ঞতা সযত্নে লিপিবদ্ধ করে রাখতাম ; বংশপরম্পরায় রাজাদের ও দেশের শ্রেষ্ঠ মন্ত্রীদের চরিত্রের বর্ণনা পক্ষপাতশূন্যভাবে লিখে রাখতাম ; এ বিষয়ে নিজের মন্তব্যগুলিও লিখতাম। দেশের আচার-নিয়ম, ভাষা, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস ও চিত্তবিনোদন যখনই যেটার কোনো পরিবর্তন দেখতাম, তখনই সেটা লিপিবদ্ধ করতাম। এইভাবে আমি বিদ্যাবুদ্ধির একটা জীবন্ত কোষাগার হয়ে উঠতাম এবং দেশের লোক যে আমার কথাকে দৈববাণীর মতো গ্রহণ করত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ষাট বছর বয়সের পরে আর বিয়ে থা' করতাম না, বাড়িতে অতিথি অভ্যাগতদের সর্বদা আপ্যায়ন করতাম, কিন্তু বেহিসাবীভাবে নয়। নিজের স্মৃতিকথা লিখে অভিজ্ঞতা ও নিরীক্ষা থেকে বহু দৃষ্টান্ত দিয়ে, সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে সৎপথে থাকার কার্যকারিতা সম্বন্ধে গুণী যুবকদের আস্থাবান করে তাদের মন তৈরী করতাম, মনের গতি নির্ণয় করতাম এবং নিজেও আনন্দ পেতাম। সবদাই আমার সঙ্গে মনের মতো সঙ্গী থাকতেন আমারই মতো অমরবৃন্দ ; তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন থেকে আরম্ভ করে আমার সমসাময়িকদের মধ্যে জনা বারোকে আমি বেছে নিতাম। এঁদের কারও অর্থের প্রয়োজন হলে, আমার নিজের জমিজমার আশেপাশে সুবিধামতো থাকবার জায়গা দিতাম, খাবার সময় সর্বদা তাঁদের কয়েকজনকে নিয়ে বসতাম, তাঁদের সঙ্গে আপনাদের মতো মরণশীল মানুষদের মধ্যে অতিশয় গুণী দেখে কয়েকজনকে রাখতাম। কিন্তু কালের প্রকোপে এঁদের যখন হারাতে হত তখন আমার মনে সামান্যই খেদ হত, কিম্বা হয়তো কিছুই হত না। আপনাদের বংশধররাও আমার কাছ থেকে ঐরকম ব্যবহার পেত, মানুষ যেমন বছরে বছরে বাগানে মৌসুমী ফুল লাগিয়ে আনন্দ পায়, কিন্তু গত বছর যে ফুল শুকিয়ে গেছে, তার জন্যে এতটুকু দুঃখ করে না।

কালের যাত্রার সঙ্গে এই ষ্ট্রল্ডব্রুগরা ও আমি পরস্পরের মন্তব্য ও স্মৃতির আদানপ্রদান করতাম ; লক্ষ্য করতাম কি ভাবে ধাপে ধাপে পাপ এসে জগতে প্রবেশ করে, পদে পদে পাপের প্রতিরোধ করতাম, মানবজাতিকে সর্বদা সতর্ক

করে দিতাম, সৎ পরামর্শদান করতাম। সেই সঙ্গে আমাদের উন্নত দৃষ্টান্ত দেখে হয়তো মানবচরিত্রের এই উত্তরোত্তর অবনতি, যার সম্বন্ধে যুগ যুগ ধরে এত আক্ষেপ শোনা যায়, এই অবনতি হয় তো বা বন্ধ হয়ে যেত।

এই সঙ্গে যত রাজ্যের ও সাম্রাজ্যের বিপ্লব, সমাজের উচ্চ নীচ স্তরের পরিবর্তন, প্রাচীন নগরের ধ্বংস, কত অখ্যাত গ্রামের রাজধানীতে পরিণতি, সব মিলিয়ে বিচার করা যেত। দেখতাম কত বিখ্যাত নদী শুকিয়ে নালার মতো হয়ে যাচ্ছে; কত মহাসাগর এক দিকের তীরকে শুকনো ডাঙায় পরিণত করে, অপর তীরকে ভাসিয়ে নিচ্ছে, কত অজানা দেশ আবিষ্কৃত হচ্ছে; সুসভ্য কত জাতিকে আবার বর্বরতা গ্রাস করছে, সব চাইতে বর্বর জাতি পরম সভ্য হয়ে উঠছে। দ্রাঘিমার আবিষ্কার, অনন্ত গতিশীলতা, সর্বরোগহর ওষুধ এবং আরও কত বিস্ময়কর উদ্ভাবনের চরম উন্নতি দেখতে পেতাম।

গ্রহবিজ্ঞানে কতই না নতুন নতুন আবিষ্কার সম্ভব হতে পারত, নিজেদের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হল কিনা নিজেরাই বেঁচে থেকে দেখা যেত; ধূমকেতু কি ভাবে চলে ফেরে, সূর্য চন্দ্র তারাদের গতির কতখানি পরিবর্তন হয়, সব প্রত্যক্ষ করা যেত।

এইভাবে অনন্ত জীবন ও পার্থিব সুখের স্বাভাবিক বাসনা থেকে উদ্বুদ্ধ আরও বহু বিষয়ে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করলাম। আমার কথা শেষ হলে আগের মতো এবারও আমার বক্তব্যের সারাংশ উপস্থিত সকলের কাছে বিবৃত করা হল, নিজেদের ভাষায় তাঁরা তাই নিয়ে প্রচুর আলোচনা করলেন, আমাকে লক্ষ্য করে খানিকটা হাসাহাসিও বাদ গেল না।

অবশেষে যে ভদ্রলোক আমার দোভাষীর কাজ করছিলেন তিনি বললেন যে ওঁরা তাঁকে অনুরোধ করেছেন আমার কতগুলো ভুল ধারণা শুধরে দিতে। অবিশ্যি মানবচিত্তের সাধারণ মূঢ়তার জন্যেই এই ভুলগুলি করেছিলাম, সেজন্যে আমাকে খুব বেশি দায়ী করা যায় না। এখন ব্যাপার হচ্ছে যে এই ষ্ট্রাল্‌ডব্রুগ্‌রা হল এই দেশেরই বিশেষত্ব, বলনিবার্বি কিম্বা জাপানে তাদের দেখা যায় না। বক্তা নিজে এদেশের দূত হয়ে জাপানে যাবার সম্মানলাভ করে-ছিলেন; তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে ষ্ট্রাল্‌ডব্রুগদের অস্তিত্বের কথা তাদের পক্ষে বিশ্বাস করাই শক্ত। আর তাই যদি বলা যায় তো আমাকেও যখন প্রথমে

এ বিষয়ে বলা হয়েছিল, তখন আমার ভাব দেখেও মনে হয়েছিল এমন আজব কথা আগে কখনও শুনিওনি, বিশ্বাসযোগ্য বলেও মনে হচ্ছে না। উল্লিখিত দুই দেশে বাস করবার সময় বহুলোকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তাঁর মনে হয়েছিল যে দীর্ঘজীবন মানবসাধারণের কাম্য ও বাঞ্ছিত। কবরে যারই এক পা পড়েছে, প্রাণপণে সে অন্য পাটিকে সরিয়ে রাখতে চায়। সবচেয়ে যে বৃদ্ধ, সেও আরও একটি দিন বাঁচতে চায়, মৃত্যুকে তার মনে হয় বৃহত্তম অভিশাপ, যার কাছ থেকে প্রকৃতিই তাকে সরে দাঁড়াতে উপদেশ দেয়। এক মাত্র এই লুগনাগ দ্বীপেই চোখের সামনে সব সময় ষ্ট্রাল্ডব্রুগদের দেখে মানুষের বেঁচে থাকার বাসনা তত তীব্র নয়।

ভদ্রলোক আরও বললেন যে আমি যে ধরণের জীবনযাত্রার পরিকল্পনা করেছি, সেটা যুক্তিযুক্তও নয়, ন্যায়সঙ্গতও নয়, কারণ তাতে এই কথা ধরে নেওয়া হয়েছে যে জীবনের সঙ্গে যৌবন, স্বাস্থ্য ও সামর্থ্যও চিরকাল থাকবে; কিন্তু মানুষের দুরাশা যতই মাত্রা ছাড়িয়ে যাক না কেন, এমন আশা পোষণ করা নিতান্ত মূঢ়তা। এমন কোনো কথা নেই যে মানুষ নিজের ইচ্ছায় চিরকাল পূর্ণ যৌবন, সুখসাফল্য ও স্বাস্থ্য উপভোগ করবে বরং প্রশ্ন হল বৃদ্ধবয়সের সঙ্গে সঙ্গে যে সব অসুবিধা সাধারণতঃ দেখা দেয়, সেই সমস্ত নিয়ে কি করে অনন্ত জীবন কাটানো যাবে।

অবিশ্যি খুব কম লোকেই স্বীকার করবে যে এই অবস্থাতেও তারা চিরকাল বেঁচে থাকতে চায়, তবু বলনিবার্বি ও জাপান উভয় দেশেই তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে যত বিলম্বেই মৃত্যু আসুক না কেন, সবাই তাকে আরও কিছুক্ষণের জন্যে ঠেকিয়ে রাখতে চায়। দুঃখে অত্যাচারে জর্জরিত না হলে স্বেচ্ছায় কেউ মৃত্যু বরণ করেছে, এমন কথা বড় একটা শোনা যায় না। তারপর ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে আমার স্বদেশে এবং এই যে নানান দেশে আমি ভ্রমণ করে বেড়িয়েছি, সর্বত্রই আমিও এই মনোভাব লক্ষ্য করেছি কি না।

এইরকম ভূমিকা করে তিনি আমাকে ওঁদের দেশের ষ্ট্রাল্ডব্রুগদের বিস্তারিত বিবরণী দিলেন। তিনি বললেন ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত সাধারণতঃ তারা আর পাঁচজনের মতোই আচরণ করে, কিন্তু তার পর থেকে ক্রমশঃ কি রকম বিমর্ষ ও নিরুৎসাহ হয়ে পড়তে থাকে এবং আশী বছর পর্যন্ত এই দুটি ভাবই বাড়তে থাকে। একথা তাদের নিজেদের মুখ থেকেই শোনা। এক পুরুষে

ঐরকম লোক দু'তিনজনের বেশি জন্মায় না, তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কোনো সাধারণ তথ্য আবিষ্কার করা যায় না। যখন এদের বয়স হয় চার কুড়ি —এদেশের হিসাব মতে ঐ হল দীর্ঘ জীবনের চরম প্রত্যাশা—তখন দেখা যায় ঐ বয়সের অন্যান্য বুড়োদের যত বোকামি আর দুর্বলতা সব তো এদের মধ্যে আছেই, উপরন্তু কোনো দিনও মরতে না পারার বীভৎস প্রত্যাশার ফলে আরও অনেকগুলো দোষ দেখা যায়। শুধু যে তারা একগুঁয়ে, খিটখিটে, লোভী, বিমর্ষ, অহঙ্কারী হয় আর অতিরিক্ত কথা বলে তা নয়, তাদের মনে সৌহার্দ বা কোনো স্বাভাবিক স্নেহ-প্রীতি বলে কিছু থাকে না ; নিজেদের নাতি পর্যন্তই ওদের ভালোবাসার দৌড়।

ওদের মনের প্রধান প্রবৃত্তি হল পরশ্রীকাতরতা আর নিষ্ফল কামনা। আর কিসের জন্য সাধারণতঃ ঐ পরশ্রীকাতরতা, না তরুণদের পাপাচার আর বৃদ্ধদের মরণ। তরুণদের পাপের কথা ভাবলেই তাদের মনে হয় নিজেদের কোনো সুখভোগের আর সম্ভাবনা নেই আর শবযাত্রা দেখলেই তারা এই বলে বিলাপ আর আক্ষেপ করে যে অন্যরা এমন একটি শান্তিময় আশ্রয়ে যেতে পারছে, যেখানে তাদের যাবার কোনো আশাই নেই।

যৌবনে ও মধ্যবয়সে যেটুকু শিখতে পেরেছিল তার বেশি কিছু মনে রাখবার এদের ক্ষমতা নেই আর তাও মনে রাখে খুব অস্পষ্টভাবে। কোনো একটা ঘটনার বা তথ্যের যাথার্থ্যের কথা উঠলে ওদের স্পষ্টতম স্মৃতির চেয়ে কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করা ঢের ভালো। ষ্ট্রুল্ডব্রুগদের মধ্যে তারাই সব-চেয়ে কম দুঃখী যারা জরাগ্রস্ত হয়ে স্মৃতিশক্তি একেবারে হারিয়ে ফেলে। এরা অনেক বেশি পরিমাণে সাহায্য ও সহানুভূতি পেয়ে থাকে, কারণ অন্যদের মধ্যে অনেকগুলি দোষ প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়, যা এদের মধ্যে থাকে না।

একজন ষ্ট্রুল্ডব্রুগ যদি আরেকজন ষ্ট্রল্ডব্রুগকে বিবাহ করে, দেশের নিয়ম অনুসারে দুজনের মধ্যে বয়সে যে ছোট, তার যেই আশী বছর পূর্ণ হয় অমনি বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। এর কারণ হল, আইনের চক্ষে যারা বিনা দোষে চিরকাল পৃথিবীতে বাস করার দণ্ড পেয়েছে, তাদের প্রতি এইটুকু কৃপা করা উচিত যেন তার উপরে আবার একটা স্ত্রীর ভার চাপিয়ে তাদের দুঃখের পরিমাণ দ্বিগুণিত না করা হয়।

আশী বছর বয়স পূর্ণ হলেই আইনের চোখে তাদের মৃত্যু হয়, উত্তরাধি-

কারীরা তক্ষুণি তাদের সম্পত্তি দখল করে এবং তাদের ভরণপোষণের জন্য যৎ-সামান্য ধার্য করা হয়; গরীবদের খরচ চলে সাধারণের চাঁদায়। এই বয়সের পর তাদের কোনো বিশ্বাসের বা লাভের পদ অধিকার করার যোগ্যতা আছে বলে মনে করা হয় না। তারা জমিজমা কিনতে বা ইজারা নিতে পারে না; কোনো দেওয়ানী বা ফৌজদারি মামলায় এমন কি জমির সীমানা সম্পর্কে বিবাদেও, তাদের সাক্ষী দেবার অধিকার থাকে না।

নব্বই বছর বয়সে এদের দাঁত ও চুল পড়ে যায়; খাদ্যের আস্বাদ বিচারের ক্ষমতাও হারায়, যা দেওয়া হয় খেয়ে নেয় ও পান করে, কিন্তু সেগুলি উপভোগ করে আনন্দ বা তৃপ্তি লাভ করে না। আগে যে সব রোগে তারা ভুগত, এখনও তেমনি ভোগে, সে সব বাড়েও না কমেও না। কথা বলতে গিয়ে জিনিসের নাম মানুষের নাম ভুলে যায়, এমন কি অতি নিকট প্রিয়জনদেরও। এই একই কারণে বই পড়েও এরা কোনো আনন্দ পায় না, কারণ তাদের এতটুকু স্মৃতির জোর থাকে না যে একটা বাক্য শেষ হওয়া পর্যন্ত তার আরম্ভটি মনে রাখবে! এই দুর্বলতার কারণে চিত্তবিনোদনের যে একটিমাত্র উপায় তাদের থাকতে পারত, সেটি থেকেও তারা বঞ্চিত হয়।

এদেশের ভাষার ক্রমাগত পরিবর্তন হতে থাকায়, এক যুগের ষ্ট্রুল্ডব্রুগরা অন্য যুগের ষ্ট্রুল্ডব্রুগদের কথা বুঝতে পারে না, আর দুশো বছর বয়স হলে পর তাদের প্রতিবেশী সাধারণ মানুষদের সঙ্গেও আর আলাপ-আলোচনা চালাতে পারে না; তার ফলে নিজেদের দেশেই বিদেশীর মতো বাস করার দুঃখ ভোগ করতে হয়।

যতদূর মনে পড়ে সেই ভদ্রলোক ষ্ট্রুল্ডব্রুগদের এই রকম বিবরণী দিয়েছিলেন। পরে নানাবয়সী পাঁচ ছয় জন ষ্ট্রুল্ডব্রুগ দেখেওছিলাম, কনিষ্ঠটির বয়স দুশোর বেশি নয়; বন্ধুবান্ধবরাই মাঝে মাঝে তাদের এনে দেখিয়েছিলেন। কিন্তু যদিও তাদের বলা হয়েছিল আমি বহু দেশ দেখেছি, গোটা পৃথিবী ঘুরে এসেছি, তবু তাদের এতটুকু কৌতূহল হল না যে আমাকে এক আধটা প্রশ্ন করে! খালি আমার কাছে 'স্লামকুদাস্ক' অর্থাৎ স্মৃতিচিহ্ন চাইল তারা, অর্থাৎ কি না ভদ্রভাষার ভিক্ষা চাইল, কারণ ভিক্ষার বিরুদ্ধে ওদের কড়া আইন আছে, যেহেতু সরকারি তহবিল থেকে ওদের জন্য ব্যবস্থা করা আছে, ব্যবস্থাটি যদিও নিতান্তই অপ্রচুর।

সব রকম লোক এই ষ্ট্রুল্ডব্রুগদের বিদ্বেষ ও ঘৃণার চোখে দেখে। একজন ষ্ট্রুল্ডব্রুগের জন্মগ্রহণকে ওরা অশুভ লক্ষণ বলে মনে করে। জন্মবৃত্তান্ত বিশদ্‌ভাবে খাতায় লিখে রাখা হয়, যাতে ঐ রেজিষ্টার দেখলেই ওদের বয়স জানা যায়। অবিশ্যি এক হাজার বছর আগেকার কথা রেজিষ্টারে নেই, যদি কখনো থেকে থাকত তাও কালের প্রকোপে কিম্বা জনগণের আন্দোলনে গেছে নষ্ট হয়ে। এদের বয়স হিসাব করার সহজ উপায় হল ওদের জিজ্ঞাসা করা কোন কোন রাজা বা মহাপুরুষের কথা ওদের মনে পড়ে, তারপরে ইতিহাস ঘাঁটা। তবে এ বিষয় কোনো সন্দেহ নেই যে শেষ যে রাজার কথা ওদের মনে পড়ে, তিনি নিশ্চয়ই ওদের আশী বছর বয়স হবার আগেই রাজত্ব করতে আরম্ভ করেছিলেন, কারণ তার পরের কথা ওরা ভুলে যায়।

এমন হতাশার প্রতিমূর্তি আমি আর দেখিনি, পুরুষদের চেয়ে মহিলারা যেন আরো বেশি। অতি প্রাচীন বয়সের সাধারণ বিকৃতিগুলি তো আছেই, তার উপরে যার যত বেশি বয়স তার তত বেশি বাড়তি বীভৎসতা, তার বর্ণনা দেওয়াও সম্ভব নয়। ওদের দেখে অল্প সময়ের মধ্যেই জনা ছয়কে সবচেয়ে বৃদ্ধ বলে চিনতে পারলাম, যদিও তাদের মধ্যে বয়সের তফাৎটি দু'একশো বছরের বেশি হবে না।

পাঠক মহাশয় সহজেই বুঝতে পারবেন যে এইসব দেখেশুনে আমারও দীর্ঘজীবন লাভের তীব্র বাসনা অনেকখানি কমে গেল। যে সব আনন্দময় কল্পনা আমার মনে উদ্ভাসিত হয়েছিল তার জন্যে আমি বিশেষ লজ্জিত হয়ে পড়লাম। আমার মনে হতে লাগল যে পৃথিবীতে কোনো অত্যাচারী শাসক এমন কোনো নিষ্ঠুর মৃত্যুর কথা ভাবতে পারেনি, যা আমার কাছে এইরকম জীবনের চেয়ে বাঞ্ছনীয় নয়। বন্ধুদের সঙ্গে এই বিষয়ে আমার যে কথাবার্তা হয়েছিল তা রাজার কানে পৌছেছিল। তিনি মজা করে আমাকে তাই নিয়ে ঠাট্টাও করেছিলেন। বলেছিলেন তাঁর ভারি ইচ্ছা হয় যে আমি গুটি দুই ষ্ট্রুল্ডব্রুগ আমাদের দেশে পাঠাই, যাতে সেখানকার লোকদের মৃত্যুভয় কমে যায়। তবে এটা নাকি ও দেশের মৌলিক আইনবিরুদ্ধ, নইলে ওদের নিয়ে আসবার খরচ ও হাঙ্গামা আমি প্রফুল্লচিত্তেই বহন করতাম।

ষ্ট্রুল্ডব্রুগদের সম্পর্কে এদেশের আইনগুলি যে যুক্তির উপরে দৃঢ়মূল এটা না মেনে পারলাম না। এরকম অবস্থায় পড়লে যে কোনো দেশ এই ধরণের

আইন প্রণয়ন করতে বাধ্য হত। নইলে বৃদ্ধ বয়সের অবশ্যম্ভাবী ফলই যখন ধনলিপ্সা, তখন কালে কালে এই অমরের দলই সমস্ত দেশের ঐশ্বর্যের মালিক হয়ে উঠত, সমস্ত রাষ্ট্রীয় শক্তিও থাকত তাদেরই হাতে। কিন্তু কর্তব্য সমাধান করবার ক্ষমতা তাদের থাকত না, কাজেই জনসাধারণের সর্বনাশ হত।

একাদশ অধ্যায়

লেখকের লুগনাগ ত্যাগ ও সমুদ্রপথে জাপান যাত্রা—তথা হইতে ওলন্দাজ জাহাজে আমষ্টারডাম নগরে আগমন এবং আমষ্টারডাম হইতে ইংল্যাণ্ড গমন।

আমার মনে হল ষ্ট্রুল্ডব্রুগদের বিবৃতিটি সচরাচরের কিঞ্চিৎ বাইরে বলে পাঠক মহাশয়ের ভালো লাগতে পারে। অন্ততঃ আমার হাতে যত ভ্রমণ কাহিনীর বই এসেছে, তার মধ্যে কোথাও এ ধরণের কথা পাইনি। আর যদি আমার এই ধারণা ভুলই হয়ে থাকে, তবে আমি এই ওজর দেখাব যে একই জায়গার বিবরণী দিতে গিয়ে ভূপর্যটকরা যদি কতকগুলি সাধারণ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বলতে বাধ্য হন, তাতে তাঁরা পূর্ববর্তীদের লেখা থেকে ধার করেছেন বা টুকেছেন এ অপবাদ দেওয়া চলে না।

বাস্তবিক এই রাজ্যের সঙ্গে জাপানের বিশাল সাম্রাজ্যের ক্রমাগত বাণিজ্যাদি চলে এবং খুব সম্ভব জাপানী লেখকরাও ষ্ট্রুল্ডব্রুগদের সম্পর্কে কিছু কিছু লিখেছেন, তবে আমি জাপানে এত অল্প দিন ছিলাম আর সেখানকার ভাষাও একবর্ণ জানি না, কাজেই এ বিষয়ে কোনো অনুসন্ধান করবার উপায় ছিল না। তবে আশা করি ওলন্দাজরা এই কাহিনী পড়ে আমি যা বাদ দিয়েছি সেটুকু পূরণ করে দেবে।

রাজা আমাকে প্রায়ই তাঁর রাজসভায় কোনো পদ গ্রহণ করতে পেড়াপিড়ি করতেন, কিন্তু যখন তিনি দেখলেন যে আমি দেশে ফিরতে দৃঢ়সঙ্কল্প, তখন আমাকে দয়া করে যাবার অনুমতি দিলেন। উপরন্তু জাপানের সম্রাটকে নিজের হাতে আমার পরিচয় দিয়ে একটি চিঠি লিখে দিলেন। তাছাড়া তিনি আমাকে চারশো চুয়াল্লিশটি মোহর দিলেন—এঁরা জোড় সংখ্যাই পছন্দ করেন আর দিলেন একটা রক্তমুখী হীরে ; ইংল্যাণ্ডে ফিরে সেটি আমি এগারো-শো পাউণ্ডে বিক্রী করেছিলাম।

১৭০৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে আমি রাজা ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করলাম। রাজার এতই অনুগ্রহ যে আমাকে গ্লাঙ্গুয়েনষ্টাল্ড পৌছে

দেবার জন্য সঙ্গে রক্ষক দিলেন ; গ্লাঙ্গুয়েনস্টাল্ড হল দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমের একটি রাজবন্দর। ছয় দিনের মধ্যে একটা জাপানগামী জাহাজে যাত্রা করবার ব্যবস্থা হয়ে গেল ; সেখানে পৌঁছতে লাগল পনেরো দিন। জাপানের দক্ষিণ-পূর্বে সামোশ্চি বলে একটা ছোট বন্দরে আমরা জাহাজ থেকে নামলাম। সহরটা হল পশ্চিম দিকে, তার উত্তরে সরু প্রণালী দিয়ে একটা লম্বা উপসাগরে পৌঁছনো যায়, তারই উত্তর-পশ্চিমে রাজধানী ইয়েদো অবস্থিত।

জাহাজ থেকে নেমেই শুল্ক আপিশে সম্রাটকে লেখা লুগনাগের রাজার চিঠি দেখালাম। সীলমোহর তাদের খুবই পরিচিত, সেটি মাপে আমার হাতের তেলোর মতো বড়, তার উপরের নক্সাতে একজন রাজা একটি খোঁড়া ভিখারিকে মাটি থেকে তুলে নিচ্ছেন। সহরের রাজকর্মচারীরা চিঠির কথা শুনে আমাকে রাজমন্ত্রীর যোগ্য অভ্যর্থনা করলেন। আমাকে গাড়ি দিলেন, চাকর-বাকর দিলেন আর ইয়েদো যাবার সমস্ত ব্যয় বহন করলেন। সেখানে পৌঁছে সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার অনুমতি পেলাম, গিয়ে চিঠিখানি দিলাম, আনুষ্ঠানিকভাবে সে চিঠি খোলা হল, দোভাষী সম্রাটকে চিঠির বিষয়বস্তু বুঝিয়ে দিল, তারপর দোভাষী আমাকে বলল সম্রাটের আদেশ আমার কি প্রার্থনা তা জানাতে, লুগনাগের রাজভ্রাতার প্রতি সম্রাটের প্রীতির কারণে যে প্রার্থনাই করি না কেন, তিনি তাই মঞ্জুর করবেন।

এই দোভাষীটি ওলন্দাজদের সঙ্গেও কারবার করত, সে আমার মুখ দেখে অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝে নিয়েছিল যে আমি ইউরোপের লোক। কাজেই সম্রাটের আদেশটি সে আমাকে লো-ডাচে অনুবাদ করে বলল, এ ভাষা তার ভালো জানা ছিল। আগেই যেমন স্থির করে রেখেছিলাম, আমি বললাম আমি একজন ওলন্দাজ বণিক, বহু দূর দেশে জাহাজডুবি হয়ে পড়েছিলাম, সেখান থেকে কিছুটা সমুদ্রপথে, কিছুটা ডাঙার উপর দিয়ে লুগনাগ পৌঁছই। লুগনাগ থেকে জাহাজে জাপানে এসেছি, কারণ আমি জানতাম যে দেশের লোকেরা প্রায়ই এখানে বাণিজ্য করতে আসে, আমার মনে বড় আশা এদেরই কারো সঙ্গে দেশে ফিরবার সুযোগ পেয়ে যাব। অতএব সম্রাটের কাছে আমার বিনীত প্রার্থনা আমাকে যেন নিরাপদে নাঙ্গাসাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

এই সঙ্গে আমি আরেকটি প্রার্থনাও জুড়ে দিলাম, আমার পৃষ্টপোষক

লুগনাগের রাজার খাতিরে সম্রাট যেন আমাকে একটি দায় থেকে মুক্তি দেন ; সেটি হল আমাদের দেশের অন্য ভ্রমণকারীদের ক্রুশের উপরে পা দিতে যেমন বাধ্য করা হয়, আমাকে যেন তা না করা হয়, কারণ নিতান্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ এখানে এসে পড়েছি, বাণিজ্য করা আমার অভিপ্রায় নয়।

শেষের প্রার্থনাটি শুনে সম্রাট খানিকটা অবাক হয়ে গেলেন মনে হল। তিনি বললেন যে তাঁর বিশ্বাস আমার স্বদেশবাসীদের মধ্যে আমিই প্রথম এ বিষয় আপত্তি জানালাম, তাই তাঁর সন্দেহ হচ্ছে আমি আদৌ সত্যিকার ওলন্দাজ কিনা, তাঁর মনে হচ্ছে হয়তো আমি একজন খৃষ্টান। সে যাই হক, কতকটা আমি যে সব কারণ দেখিয়েছি সেইজন্য আর বিশেষ করে লুগনাগের রাজার খাতিরে তিনি আমার এই অদ্ভুত অনুরোধ রক্ষা করবেন। তবে ব্যাপারটাকে খুব কৌশল করে সম্পন্ন করতে হবে আর কর্মচারীদেরও এইরকম নির্দেশ দেওয়া হবে যেন নিতান্ত ভুল করেই আমাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। সম্রাট আরো বললেন যে আমার ওলন্দাজ স্বদেশবাসীরা যদি এই গোপন কথাটি জানতে পারে, পথেই তারা আমার গলায় ছুরি বসাবে। এরকম অসাধারণ পক্ষপাতিত্বের জন্য দোভাষীর মাধ্যমে আমিও ধন্যবাদ জানালাম। সেই সময় কিছু সৈন্য নাঙ্গাসাকে মার্চ করে যাচ্ছিল, সৈন্যধ্যক্ষকে আদেশ করা হল আমাকে নিরাপদে যেন সেখানে পৌছে দেওয়া হয়। ক্রুশের ব্যাপারটা সম্বন্ধেও তাঁকে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হল।

১৭০৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন সুদীর্ঘ ও কষ্টকর পথ শেষ করে নাঙ্গাসাকে পৌছলাম। অল্পকালের মধ্যেই আমষ্টারডামের ‘আম্বয়না’ জাহাজের কয়েকজন ওলন্দাজ নাবিকের সঙ্গে আলাপ হল ; ‘আম্বয়না’ হল ৪৫০ টনের মজবুৎ একটা জাহাজ। লেডেনে পড়াশুনা করবার সময় দীর্ঘকাল হল্যাণ্ডে বাস করেছি, ভালো ডাচ্ বলি। দুদিন না যেতে নাবিকরা জেনে ফেলল শেষ কোন জায়গা থেকে এসেছি ; কিন্তু তার আগে কোথায় কোথায় ভ্রমণ করেছি, কি ভাবে জীবন কাটিয়েছি, এসব জানবার জন্যে তাদের ভারি কৌতূহল। আমি অধিকাংশ ব্যাপার গোপন করে, যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত আর বিশ্বাসযোগ্য এক গল্প ফেঁদে বসলাম। হল্যাণ্ডে অনেককে চিনতাম ; নিজের বাপ-মার নাম তৈরী করতে পারলাম, এই রকম ভাব দেখালাম যেন তাঁরা গেল্ডারল্যাণ্ড অঞ্চলের অখ্যাত অধিবাসী।

ক্যাপ্টেনের নাম থিয়োডরাস ভ্যানগ্রুন্ট, হল্যাণ্ড যাবার খরচ তিনি যা চাইতেন আমি তাই দিতে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু আমি একজন চিকিৎসক, এ কথা শুনে তিনি আসল ভাড়ার অর্ধেক নিয়েই খুসি, এই সর্তে যে আমার যা পেশা জাহাজেও আমি সারা পথ সেই কাজই করব।

জাহাজ ছাড়বার আগে নাবিকরা কেউ কেউ আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করত পূর্বোল্লিখিত অনুষ্ঠানটি আমি পালন করেছি কি না। আমিও কথা ঘুরিয়ে আসল প্রশ্নটি এড়িয়ে বলতাম যে সম্রাট ও তাঁর সভাসদ্দের সব বিষয়ই সন্তুষ্ট করে এসেছি। কিন্তু এক ব্যাটা দুষ্টুবুদ্ধি মাঝি একজন অফিসারের কাছে গিয়ে আমার দিকে দেখিয়ে বলে কি না আমি এতদিনেও ক্রুশ মাড়াইনি! অবিশ্যি অফিসারকে নির্দেশ দেওয়া ছিল আমাকে বিরক্ত না করতে, সে করলে কি, হতভাগাকে ধরে কাঁধের উপরে কুড়ি ঘা বাঁশ লাগাল! এর পর আর কেউ এ ধরণের প্রশ্ন নিয়ে আমাকে জ্বালায়নি।

সারা পথ উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনাই ঘটল না। অনুকূল বাতাস পেয়ে আমরা উত্তমাশা অন্তরীপ পৌছলাম, সেখানে শুধু পানীয় জলের জন্যে যেটুকু সময় দরকার সেটুকু থামলাম। ১৬ই এপ্রিল আমরা নিরাপদে আমষ্টারডাম পৌছলাম। পথে মাত্র তিনজন লোক অসুখে মরেছিল আর গিনির তীরের কাছাকাছি চতুর্থ একজন সামনের মাস্তুল থেকে জলে পড়ে মরেছিল। অনতিবিলম্বে আমষ্টারডাম থেকে ওখানকার একটি ছোট জাহাজে করে ইংল্যাণ্ডের দিকে রওনা হলাম।

১৭১০ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল আমরা ডাউন্সে এসে নোঙর করলাম। পরদিন সকালে জাহাজ থেকে নেমে পুরো পাঁচ বছর ছয় মাসের ছাড়াছাড়ির পর আবার আমার মাতৃভূমিকে চোখে দেখলাম। সোজা চলে গেলাম রেডরিফে; সেইদিনই বেলা দুটো নাগাদ বাড়ি পৌছে দেখি স্ত্রী-পুত্র পরিবার সবাই কুশলে আছে।

চতুর্থ খণ্ড

হুইনম্‌দের দেশে ভ্রমণ

প্রথম অধ্যায়

জাহাজের ক্যাপ্টেনের পদে লেখকের সমুদ্রযাত্রা—নাবিকদের ষড়যন্ত্রে দীর্ঘকাল নিজের ক্যাবিনে বন্দী অবস্থায় যাপন—অজানা দেশের উপকূলে পরিত্যক্ত হওয়া—দেশের অভ্যন্তরে যাত্রা—অদ্ভুত জীব ইয়াহুদের বিবরণ—দুটি হুইনমের সহিত সাক্ষাৎ লাভ।

স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের সঙ্গে পাঁচ মাস নিজের বাড়িতে বড় সুখে কাটালাম। কিন্তু সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়, কাজেই আসন্নপ্রসবা স্ত্রীকে রেখে 'অ্যাডভেঞ্চার' জাহাজের ক্যাপ্টেনের পদ গ্রহণ করে ফেললাম; জাহাজটি সাড়ে তিন শো টনের একটি বাণিজ্যপোত। জাহাজ চালনার কাজ আমি খুব ভালো করেই বুঝি আর দরকার হলে জাহাজের ডাক্তারের কাজ-ও আমি সর্বদাই করতে প্রস্তুত, তবু ঐ করে করে আমার বিরক্তি ধরে গিয়েছিল, কাজেই রবার্ট পিওরফয় বলে একজন অল্পবয়সী সুদক্ষ ডাক্তারকে ঐ পদে বহাল করে নিলাম।

১৭১০ খৃষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর আমরা পোর্টস্মাথ থেকে যাত্রা করলাম। ১৪ই সেপ্টেম্বর টেনেরিফে 'ব্রিস্টল' জাহাজের ক্যাপ্টেন পোককের সঙ্গে দেখা হল, তিনি লগউড কাঠ কেটে আনতে চলেছেন ক্যাম্পিচির উপসাগরে। ১৬ই সেপ্টেম্বর ঝড়ের দাপটে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। পরে দেশে ফিরে শুনেছিলাম যে ওঁদের জাহাজটি ডুবে যায় এবং একটিমাত্র ক্যাবিন বয় ছাড়া কেউ প্রাণে বাঁচেনি। ক্যাপ্টেন পোকক লোক ছিলেন বড় ভালো, দক্ষ নাবিকও বটে; তবে নিজের মতামতের উপরে বড় বেশি বিশ্বাস ছিল, তার ফলেই তাঁর এমন সর্বনাশটি হল, অনেকেরই যেমন হয়ে থাকে। যদি তিনি তখন আমার পরামর্শ মতো চলতেন, তাহলে আমারই মতো আজ পর্যন্ত স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে নিরাপদে নিজের বাড়িতে বাস করতে পারতেন।

আমার জাহাজে অনেকগুলি লোক রোগে মারা গেল, কাজেই বার্বাডস আর লিওয়ার্ড দ্বীপ থেকে আনকোরা নতুন লোক নিতে বাধ্য হলাম। ঐ দুটি জায়গায় যে বণিকরা আমাকে কাজে নিয়োজিত করেছিলেন, তাঁদের নির্দেশ অনুসারে জাহাজ লাগাতে হয়েছিল। এর জন্যে আমাকে পরে

অনুতাপ করতে হয়েছিল, কারণ ক্রমে ক্রমে জানতে পারলাম যে নতুন নাবিকদের অধিকাংশই আগে জলদস্যু ছিল। আমার জাহাজে পঞ্চাশজন নাবিক ছিল ; আমার কাজ হল দক্ষিণ সাগরের ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে ব্যবসা করা আর যতখানি সম্ভব নতুন জায়গা আবিষ্কার করা।

এখন এই যে বদমাইসগুলোকে বহাল করলাম, এরা করল কি, আমার অন্য নাবিকদের কানে কুমন্ত্রণা দিয়ে, সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করে স্থির করল জাহাজ অধিকার করে আমাকে বন্দী করবে। করলও তাই তারা একদিন সকালে ; হুড়মুড় করে আমার ক্যাবিনে ঢুকে পড়ে আমার হাত-পা বেঁধে আমাকে শাসাতে লাগল যে এতটুকু নড়বার চেষ্টা করেছি কি আমাকে জলে ফেলে দেবে! আমি বললাম, আমি তাদের হাতে বন্দী, তারা যা বলে তাই মেনে নেব।

এই কথাটি তারা আমাকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিল, তারপর অন্য সব বাঁধন খুলে দিল, শুধু একটা পা শিকল দিয়ে খাটের সঙ্গে বেঁধে রাখল। আমার ক্যাবিনের দরজায় বন্দুক নিয়ে তৈরী এক পাহারাদার রেখে, তাকে হুকুম দিল আমি পালাবার চেষ্টা করলেই যেন আমাকে গুলি করে মেরে ফেলে। তারপর তারা আমার জন্যে আহার আর পানীয় পাঠিয়ে নিজেরাই জাহাজ পরিচালনার ভার নিল। তাদের মৎলব ছিল বোম্বেটেগিরি করে স্পেনের জাহাজ লুট করবে, কিন্তু নিজেদের দলটি আরেকটু বাড়াতে না পারলে সেটা সম্ভব হচ্ছিল না।

তারা তখন স্থির করল প্রথমে জাহাজে যা কিছু পণ্যদ্রব্য আছে সেগুলি বিক্রী করে মাদাগাস্কারে গিয়ে নতুন লোক নেবে ; আমাকে বন্দী করার পর ওদের অনেকগুলি লোক মারাও গিয়েছিল। বহু সপ্তাহ ধরে জাহাজ চলল, দক্ষিণ সাগরের ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে বেচাকেনা হল ; তবে আমি তো নিজের ক্যাবিনে বন্দী, কোন দিক দিয়ে যে যাওয়া হচ্ছে কিছুই জানতে পারিনি। এদের হাতে খুন হব, এর বেশি কিছু আমি আশাই করতে পারিনি আর অনবরত সেই ভয়ই দেখাত ওরা।

১৭১১ সালের ৯ই মে জেম্‌স্ ওয়েলস্ বলে একজন লোক আমার ক্যাবিনে নেমে এল এবং এসেই বলল যে ক্যাপ্টেন তাকে হুকুম করেছেন আমাকে তীরে নামিয়ে দিতে হবে।

আমি আপত্তি করলাম, কিন্তু সবই বৃথা। লোকটা আমাকে এটুকুও বলল না যে ওদের নতুন ক্যাপ্টেনটি কে। জোর করে আমাকে লং-বোটে নামিয়ে দিল, তবে আমার সব চেয়ে ভালো স্যুটটি পরতে দিল আর সঙ্গে ছোট একটা পুঁটলি করে কয়েকটা গেঞ্জি ইত্যাদি নিতে দিল, কিন্তু একমাত্র তলোয়ারটি ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্রশস্ত্র দিল না। অবিশ্যি তারা এইটুকু ভদ্রতাও করল যে আমার পকেট সার্চ করল না। সঙ্গে যা পয়সা কড়ি ছিল আর সামান্য কয়েকটি দরকারি জিনিস আমি পকেটে ভরে নিয়েছিলাম।

মাইল তিনেক নৌকো বেয়ে এসে আমাকে তারা সমুদ্রতীরে নামিয়ে দিল। অনেক অনুরোধ করলাম এটা কোন দেশ নিদেন সেটুকু বলে দিক। তারা শপথ করে বললে যে সে বিষয় আমি যতটুকু জানি তারা তার চেয়ে বেশি কিছুই জানে না। ওদের তথাকথিত ক্যাপ্টেন নাকি সংকল্প করেছিলেন যে জিনিস-পত্রগুলো বিক্রী হয়ে গেলে পর প্রথম যেখানে ডাঙ্গা দেখা যাবে, সেখানেই আমাকে নামানো হবে। এই বলেই তারা নৌকো নিয়ে সরে পড়ল, যাবার আগে আমাকে তাড়া দিয়ে গেল, জোয়ার আসছে শেষটা তাতে না ধরা পড়ি! বিদায় নিয়ে তারা চলে গেল।

এই রকম অসহায় অবস্থায় আমি অগ্রসর হতে লাগলাম, একটু পরেই শুকনো ডাঙা পেলাম। সেখানেই পাড়ের উপর বসে পড়লাম। বিশ্রাম করতে হবে, এরপর কি কর্তব্য ভাবতে হবে। একটু সুস্থ হলে পর, আরও ভিতর দিকে এগিয়ে চললাম। মনে মনে সংকল্প করেছিলাম প্রথমে যে অসভ্য অধিবাসীদের সঙ্গে দেখা হবে তাদের কাছেই আত্মসমর্পণ করব। এই ধরনের সমুদ্রযাত্রার সময় নাবিকেরা যেসব কাঁচের চুড়ি, আংটি আর অন্যান্য খেলনা সাধারণতঃ সঙ্গে নিয়ে যায়, আমার সঙ্গেও সেইরকম কিছু ছিল, ভাবলাম তার বদলে নিজের প্রাণটি ভিক্ষা করে নেব।

লম্বা লম্বা গাছের সারি দিয়ে জমিটা ভাগ করা। এ সব গাছ কেউ ইচ্ছা করে লাগায়নি, আপনি হয়েছে। অনেক ঘাস জমি রয়েছে আর প্রচুর জইয়ের ক্ষেত। খুব সতর্ক হয়ে এগোচ্ছি, মনে ভয়—হঠাৎ কে বুঝি আক্রমণ করে, কিম্বা পিছন থেকে বা পাশ থেকে তীর ছোঁড়ে। একটা হাঁটা পথে গিয়ে পড়লাম, সেখানে দেখি অনেক মানুষের আর কয়েকটা গরুর পায়ের দাগ আর তার চেয়েও বেশি ঘোড়ার খুরের দাগ। অবশেষে একটা

মাঠে অনেকগুলি জানোয়ার দেখতে পেলাম, তাদের দু'একটা গাছে চড়ে রয়েছে।

এদের শরীরের গঠন এতই অদ্ভুত আর কদাকার যে খানিকটা ঘাবড়ে গিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে শুয়ে পড়লাম, যাতে আরো নজর করে দেখতে পারি। আমি যেখানে শুয়েছিলাম, কয়েকজন দেখি সেই দিকেই এগিয়ে আসছে, কাজেই খুব স্পষ্ট করে ওদের চেহারা দেখবার সুযোগ পেয়ে গেলাম।

ওদের মাথায় আর বুকে ঘন চুল, কারও কোঁকড়া, কারও সোজা। ছাগলের মতো দাড়ি, পিঠের মাঝখান দিয়েও লম্বা একটি চুলের সারি নেমে গেছে, উরুতে আর পায়ের সামনের দিকেও লোম। কিন্তু শরীরের বাকি অংশ ন্যাড়া, গায়ের চামড়া যা দেখতে পাচ্ছিলাম, পাটকিলে মেটে রঙ। ল্যাজ নেই, পশ্চাদভাগে কোনো চুল নেই গুহ্যদেশে ছাড়া; হয়তো মাটিতে বসার সময়ে নিরাপত্তার জন্যই প্রকৃতির এই ব্যবস্থা। এইভাবে বসেও ওরা, নয়তো শোয়, কিম্বা পিছনের পায়ে ভর করে উঠে দাঁড়ায়। কাঠবেড়ালের মতো চটপট উঁচু গাছে উঠে পড়ে এরা; সামনের আর পিছনের পায়ে লম্বা লম্বা নখ বেরিয়ে রয়েছে, তার আগাগুলো ছুঁচলো আর বাঁকা। দেখলাম তারা প্রায়ই লাফায়, ঝাঁপায়, ছোটে আর সাংঘাতিক ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এতখানি উঁচুতে ফাল দেয়।

মেয়েগুলো পুরুষদের মতো অতটা বড় নয়। মাথায় তাদের সোজা সোজা লম্বা চুল আর সর্বাঙ্গ সূক্ষ্ম লোমে ঢাকা। সামনের দুই পায়ের মাঝখানে স্তনদুটি ঝুলছে, হাঁটবার সময় প্রায় মাটি ছোঁয়। মেয়ে ও পুরুষ উভয়ের চুল নানা রঙের, মেটে, লাল, কালো আর হলদে। মোট কথা, এত দেশ ঘুরলাম কিন্তু এমন কদাকার জানোয়ার আর কোথাও দেখলাম না আর কাউকে দেখেই আপনা থেকে মনটা এমন বিরূপ হয়েও উঠল না।

এবার মনে হল যথেষ্ট দেখা হয়েছে, কাজেই ঘৃণা আর বিদ্বেষে ভরা মন নিয়ে উঠে পড়ে সেই পায়ে চলা পথটি ধরেই এগোতে লাগলাম। মনে এই আশা যে পথটি হয়তো আমাকে কোনো পূর্বভারতীয় অধিবাসীর কুটিরে পৌঁছে দেবে।

বেশি দূর যাইনি, এমন সময় ঠিক পথের মাঝখানে ঐরকম আরেকটি জন্তুর সঙ্গে দেখা, সোজা আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। আমাকে দেখেই

কদাকার জীবটা মুখের এক একটা অঙ্গ এক এক দিকে বেঁকিয়ে এমন করে তাকিয়ে রইল যেন এ হেন চিজ আগে কখনো দেখেনি। তারপর আরও কাছে এসে সামনের একটা থাবা তুলে ধরল, তা সে কৌতূহলের কারণে না কি বদমাইসি করে সেটা বলতে পারলাম না। কিন্তু আমি করলাম কি, আমার তলোয়ারটি বের করে তার চ্যাপ্টা দিকটা দিয়ে দিলাম কষে এক বাড়ি। ধারাল দিকটা দিয়ে মারবার সাহস হল না, শেষটা যদি জানতে পেরে দেশবাসীরা আমার উপর চটে যায়, এই বলে যে আমি ওদের গৃহপালিত পশু মেরেছি কিম্বা জখম করেছি!

ব্যথা পেয়ে জানোয়ারটা পিছু হটে এমনি চ্যাঁচাতে লাগল যে পাশের মাঠ থেকে এক পাল জানোয়ার, কম পক্ষে গোটা চল্লিশ, চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে আর মুখ ভ্যাঙ্গাতে ভ্যাঙ্গাতে আমাকে একেবারে ঘিরে ফেলল। আমিও ছুটে গিয়ে একটা গাছের গুঁড়িতে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে তলোয়ার ঘুরিয়ে ওদের ঠেকাতে লাগলাম। লক্ষ্মীছাড়া জন্তুগুলোর কয়েকটা তখন অন্য দিক দিয়ে গাছের ডাল ধরে উপরে চড়ে গেল আর সেখান থেকে আমার গায়ে মাথায় মলত্যাগ করতে লাগল। আমি কিন্তু গাছের গুঁড়িটিকে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে অনেকখানি রক্ষা পেলাম। ময়লাগুলো আমার চার পাশে পড়তে লাগল, গন্ধে আমার তো দম বন্ধ হবার জোগাড়!

এই সঙ্কটের মাঝখানে হঠাৎ তারা সবাই প্রাণপণে ছুট দিল। আমিও সাহস করে গাছ ছেড়ে আবার পথ ধরলাম আর মনে মনে ভাবতে লাগলাম কিসের জন্যে জন্তুগুলো এত ভয় পেল। বাঁ দিকে ফিরে দেখি মাঠের মধ্যে একটা ঘোড়া আস্তে আস্তে হেঁটে বেড়াচ্ছে, তাহলে তাকেই আগে থেকে দেখতে পেয়ে আমার আক্রমণকারীরা পালিয়েছে! ঘোড়াটা আমার কাছে এসে প্রথমে খানিকটা চমকে উঠল, কিন্তু তার পরেই সামলে নিয়ে নানান বিস্ময়ের লক্ষণ প্রকাশ করে সোজা আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। আমার চারদিকে অনেকবার ঘুরে আশ্চর্য হয়ে সে আমার হাত আর পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। আমি এগিয়ে যেতাম, কিন্তু ঘোড়াটা আমার পথ রোধ করে দাঁড়াল, অথচ মুখে তার অতিশয় অমায়িক ভাব, আর এতটুকু অনিষ্ট করবার চেষ্টা নেই।

কিছুক্ষণ আমরা দাঁড়িয়ে পরস্পরকে দেখতে লাগলাম, তারপর সাহস

করে হাত বুলিয়ে দেবার অভিপ্রায়ে ওর গলার দিকে হাত বাড়ালাম। অচেনা ঘোড়া বাগে আনবার সময়ে সহিসরা যে রকম কায়দা করে হাত বাড়ায় আর শিষ্ দেয় আমিও তাই করলাম। কিন্তু এই জানোয়ারটি আমার সে সব সৌজন্য ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করল ; মাথা নেড়ে ভুরু কুঁচকে, আস্তে, আস্তে সামনের দিকের বাঁ পা তুলে আমার হাতটি সরিয়ে দিল। তারপরে ঘোড়াটা তিনচার বার ডাক দিল, কিন্তু এমনি বিচিত্র স্বরে, যে আমি প্রায় ভাবতে শুরু করেছিলাম যে ও নিজের ভাষায় স্বগতোক্তি করছে।

ও আর আমি তো এই সব করছি, এমন সময় আরেকটা ঘোড়া এসে উপস্থিত। প্রথমটার সঙ্গে এর যেন খুব একটা ভদ্রতার আদান-প্রদান হল। প্রথমে তারা পরস্পরের ডান দিকের খুরে মৃদু আঘাত করল, তারপর পালা করে ডাক ছাড়ল, তার স্বরের এতই রকমফের যেন কথা বলছে। তারপর তারা যেন নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করবার জন্যে কয়েক পা সরে গেল। পাশাপাশি দুজনে পাইচারি করতে লাগল, যেন কতই না গুরুতর বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে ; আবার মাঝে মাঝে আমার দিকে চোখ ফেরাচ্ছে, যেন আমি যাতে না পালাই সে দিকেও নজর রাখছে।

বন্যপশুর এরকম হাবভাব দেখে আমি তো অবাক এবং মনে মনে এই সিদ্ধান্ত করলাম যে এদেশের মানুষদেরও যদি এই তুলনায় বুদ্ধি হয় তা হলে নিঃসন্দেহে তারা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান জাতি। এই চিন্তায় মনে এতটা সান্ত্বনা পেলাম যে স্থির করে ফেললাম আরও এগিয়ে যাব যতক্ষণ না কোনও বাড়ি বা গ্রাম দেখতে পাই, কিম্বা এখানকার অধিবাসীদের কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, ঘোড়া দুটি ততক্ষণ মনের সুখে আলাপ করতে থাকুক। প্রথম ঘোড়াটার গায়ের রং ছাইয়ের উপরে ফুট ফুট চিহ্ন করা ; সে কিন্তু যেই দেখল আমি গুটি গুটি সরে পড়বার তালে আছি, অমনি এমন একটা তিরস্কার-সূচক ডাক দিল, যে আমার ঠিক মনে হল তার কথার মানে বুঝতে পারছি। তখুনি আরও কিছু আদেশের অপেক্ষায় আমি ফিরে তার কাছে গেলাম। তবে যথাসাধ্য মনের ভয়টা গোপন করলাম, কারণ ততক্ষণে আমার মনে বেশ ভাবনা ধরে গিয়েছে ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কি রকম দাঁড়াবে। আমার বর্তমান অবস্থাটি যে আমার পক্ষে কতটুকু প্রীতিকর সে কথা পাঠক মহাশয় সহজেই অনুমান করতে পারেন।

ঘোড়াদুটি আমার খুব কাছে এগিয়ে এসে, ভারি মনোযোগের সঙ্গে আমার মুখ আর হাত দুখানি দেখতে লাগল। ছাই রঙের ঘোড়াটি আমার টুপিটার চারদিকে সামনের ডান পায়ের খুর বুলিয়ে সেটাকে এমনি দুমড়িয়ে দিল যে মাথা থেকে খুলে, ঠিক করে নিয়ে তবে তাকে আবার মাথায় দিতে বাধ্য হলাম। অন্য ঘোড়াটি মেটে রঙের, এ জাতের ঘোড়ারা খুব দৌড়তে পারে ; এরা দুজনে আমাকে টুপি খুলে আবার পরতে দেখে বেজায় অবাক হয়ে গেছে মনে হল। মেটে ঘোড়াটি আমার কোটের সামনের দিকটাকে ছুঁয়ে দেখল। সেটাকে আল্গা হয়ে ঝুলতে দেখে দুজনেরই নতুন করে আশ্চর্য হবার লক্ষণ দেখা গেল। তারপর সে আমার ডান হাতটি আস্তে আস্তে ঘষতে লাগল, হাতের কোমলতা ও রঙ দেখে বোধ হয় ভালো লাগছিল। কিন্তু তারপরেই হাতটাকে খুর আর পায়ের গাঁটের মধ্যে এমনি চিপে ধরল যে আমি ষাঁড়ের মতো চ্যাঁচাতে বাধ্য হলাম। এর পর থেকে দুজনেই আমাকে যতটা সম্ভব কোমলভাবে স্পর্শ করতে লাগল।

আমার জুতো মোজা দেখে তাদের দুজনেরই ভারি ধোঁকা লেগে গেল, বারবার ছুঁয়ে দেখল, পরস্পরের মধ্যে ডাকাডাকি করতে আর এমন ভাব দেখাতে লাগল যেন দুজন দার্শনিক পণ্ডিত কোন নতুন এবং জটিল তথ্যের রহস্য ভেদ করবার চেষ্টা করছেন।

মোটের উপর, এই দুটি জানোয়ারের ব্যবহার এতই সুনিয়ন্ত্রিত ও যুক্তিসঙ্গত, এতই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ও বিজ্ঞের মতো যে আমি এই সিদ্ধান্তে এলাম এরা নিশ্চয়ই জাদুকর, নিজেদের কোন অভীষ্ট সাধনের জন্য অন্য রূপ ধারণ করেছে এবং পথে একটা অচেনা লোক দেখে একটু মজা করে নিচ্ছে। কিম্বা হয়তো এই দূর দেশবাসীদের সচরাচর যে রকম চেহারা, গায়ের রং ও পোষাকপরিচ্ছদ হয়, তার থেকে আমার এত বেশি তফাৎ দেখে সত্যি সত্যিই ঘোড়াদুটি অবাক হয়ে গিয়েছে।

মনে মনে এই রকম যুক্তি করে একটু বল পেয়ে ওদের বললাম—মহাশয়গণ, আপনারা যদি বাস্তবিক জাদুকর হয়ে থাকেন, যেমন আমার সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ আছে, তাহলে তো আপনারা পৃথিবীর যে কোনো ভাষা বুঝতে পারেন। অতএব আপনাদের মতো মহামান্য ব্যক্তিদের সাহস করে জানাচ্ছি যে আমি একজন দীনহীন বিপদ্‌গ্রস্ত ইংরেজ, যাকে দুর্ভাগ্য

আপনাদের উপকূলে এনে ফেলেছে। অনুনয় করি যে আপনাদের মধ্যে একজন, সত্যিকার ঘোড়ার মতো আমাকে পিঠে চড়িয়ে, কোন বাড়ি বা গ্রামে নিয়ে চলুন, যেখানে আমি আশ্রয় ও সাহায্য পেতে পারি। এই অনুগ্রহের পরিবর্তে আমি আপনাদের এই ছুরি ও ব্রেসলেট উপহার দিচ্ছি—এই বলে পকেট থেকে ঐ দুটি জিনিস বের করলাম।

যতক্ষণ কথা বলেছিলাম ঘোড়াদুটি চুপ করে ছিল, যেন গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে শুনছে। আমার কথা বলা শেষ হলে, পরস্পরের মধ্যে ওরা খুব খানিকটা ডাকাডাকি করল যেন কোন গুরুতর বিষয়ে আলোচনা করছে। স্পষ্ট বুঝলাম ওদের ভাষায় মনের আবেগ খুব ভালো করেই প্রকাশ করা যায়। সামান্য কষ্ট করলেই শব্দগুলোকেও বোধহয় চীনাভাষার চেয়ে অনেক সহজ একটা বর্ণমালায় সাজিয়ে ফেলা যায়।

ওদের কথাবার্তার মধ্যে অনেকবার ইয়াহু শব্দটাকে চিনতে পারলাম, এই কথাটি ওরা দুজনেই অনেকবার ব্যবহার করেছিল। যদিও শব্দটার অর্থ অনুমান করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না, তবু যতক্ষণ ঘোড়াদুটি তাদের আলোচনায় রত ছিল, আমি কথাটির উচ্চারণ অভ্যাস করতে লাগলাম। তারপর যেই তারা চুপ করল, ঘোড়ার ডাক যথাসম্ভব নকল করে আমিও সাহস করে খুব জোরে 'ইয়াহু' শব্দটা উচ্চারণ করলাম। দেখেই বোঝা গেল যে তাই শুনে ওরা খুব অবাক হয়ে গেছে; ছাই রঙের ঘোড়াটি শব্দটিকে আরও দুবার পুনরাবৃত্তি করল, যেন আমাকে বিশুদ্ধ উচ্চারণ শেখাচ্ছে। আমিও যতটা ভালো করে পারি সঙ্গে সঙ্গে কথাটি বললাম আর নিজেই বুঝলাম প্রতিবার একটু করে উচ্চারণের উন্নতি হচ্ছে, যদিও একেবারে নিখুঁত হতে তখনো ঢের দেরি।

তারপর মেটে ঘোড়াটি আমাকে দ্বিতীয় একটা শব্দ নিয়ে পরীক্ষা করে দেখল। সে শব্দটির উচ্চারণ অনেক বেশি কঠিন, তবে লিখিত ভাষায় পরিণত করতে গেলে তার বানানটি দাঁড়াবে অনেকটা এইরকম 'হুইন্‌ম্'। আগেরটার মতো এই উচ্চারণটিতে অত বেশি সাফল্য লাভ করতে পারিনি, তবে আরও দু-তিনবার চেষ্টার পর আরেকটু উন্নতি হল। মনে হল তারা দুজনেই আমার ক্ষমতা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছে।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর—তখনি অনুমান করেছিলাম আমারই

বিষয়েই কথাবার্তা—দুই বন্ধু বিদায় নিল, আগের মতো পরস্পরের খুরে আঘাত করে। ছাই ঘোড়া ইসারায় জানাল যে আমাকে তার সামনে সামনে হাঁটতে হবে। আমারও মনে হল যতক্ষণ না আরও ভালো কোন পথপ্রদর্শক পাওয়া যাচ্ছে, এর কথামতো চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। যেই চলার বেগ একটু কমাতে যাই, সে বলে হ্‌হুঁ ! হ্‌হুঁ। তার মানেটা আন্দাজ করে নিয়ে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম আমি বড় ক্লান্ত, এর বেশি জোরে চলা আমার সাধ্য নয়। তারপর থেকে আমাকে জিরিয়ে নেবার জন্যে সে একটুক্ষণ করে থামতে লাগল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

লেখককে হুইনম্‌-এর গৃহে আনয়ন—গৃহের বর্ণনা—লেখকের অভ্যর্থনা—হুইনম্‌দিগের আহার—মাংসের অভাবে লেখকের কষ্ট ও কষ্টের উপশম—ঐ দেশে বাসকালে লেখকের আহারের নিয়ম।

মাইল তিনেক গিয়ে নিচু লম্বা কি রকম একটা বাড়ির সামনে এসে পৌঁছলাম, বাড়িটা কাঠের তৈরী, মাটির সঙ্গে সমান করে বসানো, কঞ্চির দেয়াল, নিচু ছাদ, খড়ের চাল। এবার মনে একটু আরাম পেলাম। আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের আর অন্যান্য দেশের অসভ্য অধিবাসীদের উপহার দেবার জন্যে ভ্রমণকারীরা যেরকম খেলনা ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে বেড়ায়, আমিও এবার সেইরকম গুটিকতক বের করলাম, এই আশায় যে সেগুলি পেয়ে গৃহবাসীরা আমাকে বেশি করে অপ্যায়ন করবার উৎসাহ পাবে। ঘোড়াটা ইসারায় আমাকে আগে ঘরে ঢুকতে বলল। প্রকাণ্ড ঘর, পরিষ্কার মাটির মেঝে, আর গোটা একটা দিক জুড়ে একটা তাক আর লম্বা একটা দানা খাবার ডাবা।

ঘরে ছিল তিনটি টাট্টু ঘোড়া ও দুটি ঘোটকী, তারা কেউই কিছু খাচ্ছিল না, তবে কেউ কেউ পা গুটিয়ে মাটিতে বসেছিল, তাই দেখে আমি ভারি অবাক! কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশি অবাক হলাম বাকিদের ঘরকন্নার কাজে ব্যাপৃত থাকতে দেখে। এদের দেখে অবিশ্যি সাধারণ জাতের ঘোড়া বলে মনে হল। সে যাই হক, এসব দেখে আমার আগেকার ধারণাটি আরও বদ্ধমূল হয়ে উঠল—যে জাতি অবোধ পশুকে পর্যন্ত এতদূর শিক্ষা দিতে পারে, তারা নিঃসন্দেহে বিদ্যাবুদ্ধিতে পৃথিবীর সকল জাতির শ্রেষ্ঠ। আমার ঠিক পিছন পিছন ছাই ঘোড়াও ঘরে ঢুকল, কাজেই এরা যদি বা আমার সঙ্গে কোনো রকম খারাপ ব্যবহার করতে পারত, সেটা বন্ধ হল। কর্তৃত্বের ভঙ্গিতে সে তাদের উদ্দেশে কয়েকবার হ্রেষাধ্বনি করল, তারাও উত্তর দিল।

এ ঘরের পরে বাড়িটার লম্বা বরাবর আরও তিনটি ঘর। সে সব ঘরে যেতে হলে একই সারিতে পর পর তিনটি দরজা পার হয়ে যেতে হয়

দরজাগুলি এমনভাবে সাজানো যে প্রথম ঘরের এক প্রান্তে দাঁড়ালে শেষ ঘরের শেষ প্রান্ত অবধি দেখা যায়। দ্বিতীয় ঘরের মধ্যে দিয়ে আমরা তৃতীয়টিতে প্রবেশ করলাম। আমাকে অপেক্ষা করতে ইসারা করে, ছাই ঘোড়া আগে চলল। আমি দ্বিতীয় ঘরে অপেক্ষা করতে করতে গৃহকর্তা ও গৃহিণীকে দেব বলে উপহারগুলি গুছিয়ে ফেলছিলাম ; দুটি ছুরি, তিনটি নকল মুক্তোর ব্রেস্‌লেট, ছোট একটা আয়না আর একটা পুঁতির মালা। তিনচারবার ঘোড়াটাকে ডাকতে শুনে, মানুষের কণ্ঠে উত্তর শুনবার আশায় ছিলাম, কিন্তু ঘোড়াদের ভাষাতে ছাড়া অন্য কোন উত্তর শুনলাম না ; তবে দু একটা স্বর ছাই ঘোড়ার গলার চেয়ে অনেক মিহি শোনাল।

আমি একথা ভাবতে শুরু করলাম যে সম্ভবতঃ এ বাড়িটা কোন অভিজাত বংশীয় ভদ্রলোকের, তাই প্রবেশ করবার অনুমতি পেতেই এত কায়দাকানুন। কিন্তু এটা ভেবে পেলাম না যে কোন উচ্চপদস্থ ভদ্রলোকের অনুচররা সকলেই ঘোড়া হবে কেন। মনে হল হয়তো দুঃখে কষ্টে আমার মস্তিষ্কের বিকৃতি হয়েছে। নিজেকে জাগিয়ে তুলে, যে ঘরে আমাকে একা বসিয়ে রাখা হয়েছে, সে ঘরটার চারদিক নজর করে দেখতে লাগলাম। দেখলাম এর আসবাবগুলিও ঐ প্রথমটার মতোই, তবে আরেকটু শৌখিন। বারবার নিজের চোখ ঘষে নিলাম, তবু ঐ একই জিনিস দেখতে পেলাম। আশা ছিল হয়তো সবই স্বপ্ন দেখছি, তাই ঘুম ভাঙ্গাবার উদ্দেশ্যে বারবার নিজের হাতে গায়ে চিমটি কাটতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এলাম যে এ সমস্তই ইন্দ্রজাল আর জাদুবিদ্যা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। তবে এই চিন্তাধারা বেশিদূর অনুসরণ করবার সময় পাইনি কারণ ছাই ঘোড়া এই সময় দোরগোড়ায় এসে আমাকে তার পিছন পিছন তৃতীয় ঘরে যেতে ইসারা করল। সেখানে গিয়ে দেখি পরমাসুন্দরী এক ঘোটকী ও দুটি বাচ্চা ঘোড়া, একটি ছেলে ও একটি মেয়ে, খড়ের মাদুরের উপরে পা গুটিয়ে বসে আছে। মাদুরগুলি ভারি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর তাদের কারুকার্য মন্দ নয়।

আমি ঘরে ঢুকলে পর ঘোটকী মাদুর থেকে উঠে আমার কাছে এসে, খুব মনোযোগ সহকারে আমার হাতমুখ দেখে কেমন যেন গভীর অবজ্ঞার সঙ্গে তাকিয়ে রইল। তারপরে সে ছাই ঘোড়ার দিকে ফিরে যে কথাবার্তা আরম্ভ করল তার মধ্যে অনেকবার ইয়াহু শব্দটি শুনতে পেলাম। এ কথাটির

অর্থ আমি তখন পর্যন্ত জানি না, যদিও ওদের ভাষায় এই কথাটিই আমি প্রথম উচ্চারণ করতে শিখেছিলাম। অবিশ্যি মানেটা জানতেও আমার বেশি বিলম্ব হয়নি এবং জেনে অবধি আমার লজ্জা ও অপমানের শেষ থাকে নি। এদিকে ঘোড়াটা মাথা নেড়ে আমাকে ডেকে বার বার 'হুহুঁ হুহুঁ' শব্দ করতে করতে বাইরের উঠোনের দিকে নিয়ে চলল। আসবার পথেও, ও এই রকম শব্দ করেছিল। যতদূর বুঝলাম কথাটার মানে হল, 'আমার সঙ্গে চল।' উঠোনে প্রবেশ করে দেখি যে জঘন্য জীবগুলোকে এদেশে প্রথম পা দিয়েই দেখেছিলাম, সেই রকম তিনটে কিসের যেন শিকড় আর কোনো জানোয়ারের মাংস খেতে ব্যস্ত—পরে জানলাম গাধার আর কুকুরের এবং কখনো-সখনো অপঘাতে বা ব্যামো হয়ে মরা গরুর মাংস। এদের সকলের গলা মজবুৎ দড়ি দিয়ে একটা লম্বা কড়িকাঠের সঙ্গে বাঁধা; সামনের পায়ের বড় বড় নখওয়ালা আঙুলের ফাঁকে মাংস ধরে, দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

মালিক ঘোড়া একটা লাল টাট্টু চাকরকে বলল ঐ জানোয়ারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়টার বাঁধন খুলে উঠোনে নিয়ে আসতে। এবার ওটাকে আমার খুব কাছাকাছি নিয়ে আসা হল এবং মুনিব ও চাকরে মিলে আমাদের মুখের আদল খুঁটিয়ে তুলনা করে তারা বারবার 'ইয়াহু' শব্দটি উচ্চারণ করতে লাগল। আমি নিজেও যখন এই কদাকার জন্তুটার মধ্যে একটা অবিকল মানুষের চেহারা চিনতে পারলাম, তখন আমার যে কি রকম ঘৃণা আর আতঙ্ক হল সে বর্ণনার বাইরে। ওদের মুখটা অবিশ্যি অনেকখানি চওড়া আর চ্যাপ্টা, নাক থ্যাবড়া, ঠোঁট পুরু আর হাঁ প্রকাণ্ড, কিন্তু আমাদের চেহারার সঙ্গে সব অসভ্য জাতের চেহারার এটুকু তফাৎ দেখা যায়। তার কারণ হল যে ঐ সব দেশের লোকরা তাদের শিশুদের হয় উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে থাকতে দেয়, কিম্বা পিঠে বেঁধে বেড়ায় আর বাচ্চারা মা'র কাঁধে কেবলি নাক মুখ ঘষতে থাকে, তার ফলে মুখের চেহারা বিকৃত হয়ে যায়।

ইয়াহুগুলোর সামনের পায়ের সঙ্গে আমার হাতের কোনো তফাৎ দেখলাম না, শুধু ওদের নখগুলো লম্বা, হাতের তেলো কর্কশ ও মেটে রঙের আর হাতের পিঠটা লোমে ঢাকা। পায়েরও সেই একই সাদৃশ্য ও একই তফাৎ; তার কারণটি ঘোড়ারা না জানলেও, আমি খুব ভালো করেই জানতাম—অর্থাৎ আমি জুতো মোজা পরি। আমাদের শরীরের প্রত্যেকটি অংশের

বেলাতেও এই কথা খাটে, তফাৎ শুধু লোমেতে আর রঙেতে, তার বর্ণনা তো আগেই দিয়েছি।

এখন ঘোড়া দুটোর সবচেয়ে আশ্চর্য লাগছিল যে আমার শরীরের বাকি অংশ ইয়াহুদের শরীর থেকে একেবারে আলাদা রকমের ; কিন্তু সেটা যে কেবল আমার কাপড়চোপড়ের জন্যে, এ ধারণা তাদের মনেই আসেনি। ওরা যে-রকম করে খুর আর পায়ের গিটের মাঝখানে চেপে জিনিস ধরে, পরে যথাস্থানে তার বর্ণনাও দেব, সেইভাবে একটা শিকড় ধরে, লাল ঘোড়া আমাকে দিতে গেল। আমি সেটি হাতে নিয়ে, একবার শুঁকে, যতটা ভদ্রভাবে পারি তাকে আবার ফিরিয়ে দিলাম। তখন সে ইয়াহুটার থাকবার ছোট কুঠরির ভিতর থেকে এক টুকরো গাধার মাংস বের করে নিয়ে এল, তার এমনি দুর্গন্ধ যে আমি ঘৃণার সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। তখন সে মাংসের টুকরোটিকে ছুঁড়ে ইয়াহুটাকে দিয়ে দিল, ইয়াহুটাও গাঁউ গাঁউ করে খেয়ে ফেলল। তারপর ঘোড়াটা আমাকে এক কুচি শুকনো ঘাস দেখাল ; পায়ের খুরের কাছের খাঁজ ভরে জই-এর দানা দেখাল ; আমি মাথা নেড়ে জানালাম এর কোনোটাই আমার খাদ্য নয়।

বাস্তবিক এবার আমার ভয় ধরে গেল যে দু-একজন স্বজাতির সন্ধান না পেলে শেষটা কি আমাকে একেবারে না খেয়ে মরতে হবে! আর যদি ইয়াহুগুলোর কথাই ধরা যায়, সে সময় আমার চেয়ে মানবপ্রেমিক কমই দেখা যেত, তবু আমাকে স্বীকার করতে হল যে সব দিক দিয়ে এ-রকম জঘন্য জীব আমি জন্মে দেখিনি। ও দেশে যত দিন ছিলাম, এদের কাছে যত বেশি গেছি তত বেশি খারাপ লেগেছে।

আমার রকম সকম দেখে মালিক ঘোড়া সে-কথা বুঝতে পেরে, ইয়াহুটাকে তার নিজের কুঠরিতে ফেরৎ পাঠাল। তারপর সে নিজের সামনের খুর নিজের মুখে পুরে দিল, আমি তো দেখে অবাক, যদিও অতি স্বচ্ছন্দে ও স্বাভাবিকভাবেই দিল। তাছাড়া আরও অন্য রকম ইসারা করেও সে জানতে চাইল আমি কি খেতে ইচ্ছা করি। কিন্তু তার বোধগম্য কোনো উত্তরই আমি দিতে পারলাম না ; আর যদি বা আমার কথা সে বুঝতে পারতও, তবু আমার আহারের ব্যবস্থা যে কি করে হওয়া সম্ভব, সে আমি ভেবে পেলাম না। আমাদের এই সব ব্যাপারের মাঝখানে দেখি পাশ দিয়ে একটা গরু

যাচ্ছে। তখন আমি গরুটাকে দেখিয়ে ওটার কাছে গিয়ে দুধ দুইয়ে নেবার অনুমতি চাইলাম।

এর ফল দিল; ঘোড়াটা আমাকে আবার বাড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়ে ঘোটকী চাকরাণীকে হুকুম দিল একটা বিশেষ ঘর খুলে দিতে; সেখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সারি সারি মাটির ও কাঠের পাত্রে ভরা প্রচুর দুধ তোলা ছিল। চাকরানীটা আমাকে বড় এক গামলা ভরা দুধ দিল; সেই দুধ প্রাণ ভরে পান করে বাঁচলাম।

প্রায় বেলা বারোটার সময় দেখি চারটে ইয়াহুতে টানা স্লেজ্ ধরনের একটা গাড়ি এই বাড়ির দিকে আসছে। গাড়ির মধ্যে একটি বুড়ো ঘোড়া, দেখে মনে হল ভারি গণ্যমান্য কেউ। পিছনের পা আগে দিয়ে সে গাড়ি থেকে নামল, কারণ সামনের দিকের বাঁ পায়ে আকস্মিকভাবে তার ব্যথা লেগেছিল। আমাদের ঘোড়ার সঙ্গে সে খেতে এসেছে, গৃহস্বামী তাই তাকে ভারি খাতির করে অভ্যর্থনা করল। খাওয়াদাওয়া হল সবচেয়ে ভালো ঘরটিতে। ভোজনের দ্বিতীয় পদ ছিল দুধে সিদ্ধ করা জইয়ের দানা, বুড়ো ঘোড়া এটি গরম গরম খেল, বাকিরা সব ঠাণ্ডা করে। ঘরের মাঝখানে ওদের খাবার চাড়িগুলোকে গোল করে সাজানো হয়েছিল। ওরা তার চারদিক দিয়ে খড়ের গাদার উপরে পা গুটিয়ে বসে পড়ল। চাড়িগুলো খোপ খোপ করে ভাগ করা, মাঝখানে মস্ত একটা র‍্যাক, চাড়ির মতো তাতেও কোণাকুণি ভাগ, যাতে ঘোটক-ঘোটকীরা যে যার নিজের শুকনো ঘাস আর দুধ দিয়ে জই মাখা, গুছিয়ে ভদ্রভাবে খেতে পারে। বাচ্চা ঘোড়া-ঘুড়ীর ব্যবহার দেখলাম ভারি বিনীত আর গৃহস্বামী ও তার স্ত্রীও অতিথির সঙ্গে ভারি প্রফুল্ল ও অমায়িক আচরণ করতে লাগল। ছাই ঘোড়া আমাকে তার পাশে দাঁড়াতে আদেশ করল আর অতিথির সঙ্গে আমাকে নিয়ে যে তার প্রচুর আলাপ-আলোচনা হল, সেটা আমি বুঝে নিলাম আমার দিকে আগন্তুকের পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত আর ঘন ঘন 'ইয়াহু' শব্দের পুনরুক্তি থেকে।

ঘটনাক্রমে আমার হাতে দস্তানা পরা ছিল, তাই দেখে ছাই রঙের প্রভু ভারি আশ্চর্য হয়ে, আমার সামনের পায়ে এ কি করলাম সে বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করতে লাগল। তিন-চার বার সে আমার হাতে তার খুর ঠেকাল, যেন বলতে চাইছে সে-দুটোর পুর্বেকার চেহারা ফিরিয়ে আনা হক; তাই

করলাম, দস্তানা দুটি টেনে খুলে ফেলে পকেটে পুরলাম। এতে ওদের মধ্যে আরও কথা হল, দেখলাম আমার ব্যবহারে উপস্থিত সকলে খুবই সন্তুষ্ট ; শীঘ্রই এর সুফলও পেলাম। ওদের ভাষার যে কটা কথা বুঝি, সেগুলি বলবার হুকুম পেলাম ; তারপর গৃহস্বামী আমাকে জই, দুধ, আগুন, জল এবং আরও কয়েকটি জিনিসের নাম শিখিয়ে দিল। তার বলার পর আমিও বিনা কষ্টে শব্দগুলি উচ্চারণ করতে পারলাম, কারণ অল্প বয়স থেকেই ভাষা শিখতে আমি ওস্তাদ।

খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে কর্তা ঘোড়া আমাকে আলাদা ডেকে নিয়ে খানিক ইঙ্গিতে খানিক কথায় বোঝাতে চেষ্টা করল আমি কিছু খেলাম না বলে সে কত উদ্বিগ্ন। ওদের ভাষায় জইকে বলে হ্লুঁন্‌। দু-তিন বার এই শব্দটি উচ্চারণ করলাম, কারণ যদিও গোড়ায় জই খেতে আপত্তি করে ছিলাম, তবু আরেকবার ভেবে দেখলাম যে জই দিয়ে সম্ভবতঃ একরকম রুটি তৈরী করে নিতে পারব, সেই রুটি দুধ দিয়ে খেলেই হয়তো প্রাণধারণের পক্ষে যথেষ্ট হবে, যতদিন না অন্য দেশে আমার স্বজাতিদের কাছে পালিয়ে যেতে পারি।

ঘোড়াটি তখুনি একটা সাদা ঘোটকী-চাকরাণীকে হুকুম করল একটা কাঠের ট্রের মতো পাত্রে বেশ খানিকটা জই দানা এনে দিতে। এগুলিকে আমি আগুনের সামনে যথা সম্ভব গরম করে নিয়ে, ঘষে ঘষে খোসা ছাড়িয়ে, কৌশল করে ভুষি আলাদা করে নিলাম। তারপরে দুটো পাথরের সাহায্যে দানাগুলো ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে নিয়ে, জল দিয়ে মেখে লেচি পাকিয়ে, আগুনে সেঁকে, দুধের সঙ্গে গরম গরম খেলাম।

এ খাবার যদিও ইউরোপের অনেক জায়গায় যথেষ্ট প্রচলিত, তবু আমার প্রথম প্রথম বিস্বাদ লাগত, পরে অবিশ্যি অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। জীবনে অনেকবার খাওয়াদাওয়ার কষ্ট সইতে হয়েছে ; কাজেই প্রকৃতি যে কত সামান্যে সন্তুষ্ট থাকতে পারে, সে বিষয় এ আমার প্রথম অভিজ্ঞতাও নয়। এ-প্রসঙ্গে, এ-কথা না বলে পারছি না যে যতদিন ঐ দ্বীপে ছিলাম তার মধ্যে এক ঘণ্টার জন্যেও অসুস্থ বোধ করিনি। অবিশ্যি এ-কথাও সত্যি যে মাঝে মাঝে ইয়াহুদের চুলের তৈরী ফাঁদ পেতে খরগোস কিম্বা পাখি ধরবার ব্যবস্থা করতাম। প্রায়ই পুষ্টিকর শাক-সব্জিও তুলে এনে সিদ্ধ করে নিতাম, কিম্বা

রুটির সঙ্গে স্যালাডের মতো খেতাম। ক্বচিৎ কদাচিৎ মুখ বদল করবার জন্যে একটু মাখন তুলতাম, ঘোলটাও খেতাম। প্রথম প্রথম নুনের অভাবে মুস্কিলে পড়েছিলাম, কিন্তু অল্প দিনেই বিনা নুনে খাওয়া অভ্যাস হয়ে গেল। এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই ঘন ঘন নুন খাওয়াটা বিলাসের একটা অভ্যাস মাত্র এবং নিশ্চয়ই এর প্রথম প্রচলন হয়েছিল মদ্য পানের আনুষঙ্গিক হিসাবে। এর ব্যতিক্রম ছিল শুধু যখন সুদীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার সময়ে কিম্বা যে সব জায়গা হাটবাজার থেকে অনেক দূরে, সেখানকার জন্য নুন দিয়ে মাংস জারিয়ে রাখতে হত। মানুষ ছাড়া কোনো জানোয়ারকে তো নুন ভালোবাসতে দেখা যায় না। আর আমার কথাই যদি ধরা যায়, এদেশ ছেড়ে চলে গেলে পর, আহারের সঙ্গে আবার নুনের স্বাদ অভ্যাস করতে আমার অনেক সময় লেগেছিল।

আমার খাওয়াদাওয়া সম্পর্কে এই যথেষ্ট, যদিও অন্য ভ্রমণকারীরা এই বিষয় দিয়েই বই ভরিয়ে ফেলে, যেন আমরা ভালো খেলাম কি মন্দ খেলাম, তাই দিয়ে পাঠকদের কিছু যায় আসে! তবে কথাটা উল্লেখ করার দরকার ছিল এই জন্যে যে তা না হলে পৃথিবীর লোকে ভাবতে পারে এরকম দেশে এবং এরকম অধিবাসীদের মধ্যে তিন বছর বেঁচে থাকবার মতো আহার জোগাড় করা কি করে সম্ভব হয়েছিল।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে, তখন মালিক ঘোড়া আমার জন্যে একটা থাকবার জায়গা ঠিক করে দিতে হুকুম দিল।

জায়গাটা বাড়ি থেকে মাত্র ছয় গজ দূরে আর ইয়াহুদের আস্তাবল থেকে আলাদা করা। খানিকটা খড় জোগাড় করে এনে, নিজের কাপড়চোপড় দিয়ে গা ঢেকে এখানে খাসা ঘুম দিলাম। তবে অল্প দিনের মধ্যেই যে আমার এর চেয়ে ভালো বাসস্থান জুটেছিল, সে কথা পাঠকমহাশয় পরে জানতে পারবেন, যখন আমার জীবনযাত্রার প্রণালী সম্পর্কে আরও বিশদভাবে আলোচনা করব।

তৃতীয় অধ্যায়

স্থানীয় ভাষা শিক্ষার্থে লেখকের অনুশীলন—প্রভু হুইনম্ দ্বারা শিক্ষণে সাহায্য—ভাষার বিবৃতি—কৌতূহল বশতঃ লেখকের দর্শনার্থে অনেকগুলি হুইনম্-এর আগমন—প্রভুর কাছে সমুদ্রযাত্রার সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদান।

আমার প্রধান চেষ্টা ছিল ওদেশের ভাষাটি শেখা ; এবং আমার প্রভু—এখন থেকে তাই বলেই তাঁর বিষয় উল্লেখ করব—তাঁর ছেলেমেয়ে ও বাড়ির প্রত্যেকটি চাকর আমাকে তা শেখাতে উদ্‌গ্রীব। তার কারণ, তাদের সকলেরই এটা বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার বলে মনে হত যে একটা বুনো জানোয়ারের মধ্যেও বুদ্ধির লক্ষণ দেখা যায়। প্রত্যেকটি জিনিস দেখাই আর তার নাম জিজ্ঞাসা করি, তারপর নিরিবিলি পেলেই খাতায় লিখে রাখি আর বাড়ির লোকদের দিয়ে বার বার করে একটা কথা বলিয়ে নিজের উচ্চারণের ভুল শুধরিয়ে নিই। এই ব্যাপারে নিম্নশ্রেণীর চাকরদের মধ্যে থেকে একটা লাল টাট্টু ঘোড়া আমার সাহায্যে আসতে সর্বদাই প্রস্তুত ছিল।

কথা বলবার সময় এরা নাকের আর গলার ভিতর দিয়ে শব্দ বের করে।

আমার যত ইউরোপীয় ভাষা জানা আছে, তার মধ্যে হাইডাচ্ আর জর্মান ভাষার সঙ্গেই এদের ভাষার সব চেয়ে বেশি সাদৃশ্য, তবে ও দুটির চেয়ে এ ভাষা অনেক বেশি শ্রুতিমধুর ও অর্থমূলক। সম্রাট পঞ্চম চার্ল্‌স্‌ও প্রায় এই মতই প্রকাশ করেছিলেন, যখন তিনি বলেছিলেন, যে তাঁর ঘোড়ার সঙ্গে যদি কখনো কথাবার্তা বলতে হয়, তাহলে তাঁকে হাইডাচে বলতে হবে।

আমার প্রভুর কৌতূহল ও অসহিষ্ণুতা এতই বেশি ছিল যে তাঁর অবসর সময়ের অনেক ঘণ্টাই তিনি আমাকে ভাষা শিখিয়ে কাটিয়ে দিতেন। পরে তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তাঁর মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আমি নিশ্চয়ই একটা ইয়াহু, কিন্তু আমার শিক্ষাপ্রবণতা ও পরিচ্ছন্নতা দেখে তিনি অবাক হয়ে যেতেন, কারণ ঐ জন্তুগুলোর স্বভাব ছিল ঠিক তার বিপরীত। সব চেয়ে ধাঁধা লাগত আমার কাপড়চোপড় দেখে ; মাঝে মাঝে মনে চিন্তা করতেন ওগুলো আমার দেহেরই অংশ কি না, কারণ বাড়িসুদ্ধ সবাই না ঘুমোলে

আমি কাপড় ছাড়তাম না আর ভোরে কেউ উঠবার আগেই আবার পরে ফেলতাম।

আমি কোথা থেকে এলাম আর সব কাজে এই যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিই এ আমি কোথায় পেলাম, এই কথা জানবার জন্য আমার প্রভুর সে কি আগ্রহ! আমার নিজের মুখে আমার কাহিনী শুনবার তাঁর বড় ইচ্ছা। এদিকে তাঁদের ভাষা শিক্ষায় আর নানান শব্দ ও গোটা গোটা বাক্য উচ্চারণে আমি যে রকম উন্নতি করছি, তাই দেখে তাঁর বড় আশাও ছিল যে শীঘ্রই সে কাহিনী শুনতে পাবেন। নিজের স্মৃতিশক্তিকে সাহায্য করবার জন্যে যা শিখি তাই ইংরিজি অক্ষরে লিখে রাখি, কথাগুলির পাশে তাদের মানেগুলোও টুকে রাখি। কিছুদিন গেলে পর এ কাজটি আমার প্রভুর সাক্ষাতেই করবার সাহস হত। কি করছি সেটা তাঁকে বোঝাতে আমার প্রচুর কষ্ট করতে হয়েছিল, কারণ ওদেশের অধিবাসীদের বই কিম্বা সাহিত্য সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নেই।

প্রায় দশ সপ্তাহের মধ্যে প্রভুর অধিকাংশ প্রশ্নেরই মানে বুঝতে পারতাম; তিন মাসের মধ্যে তার চলনসই উত্তর দিতে পারতাম। দেশের কোন অঞ্চল থেকে আমি এসেছি আর বুদ্ধিসম্পন্ন জীবের এমন নকল করতে আমি কোথায় শিখেছি একথা জানবার তাঁর ভারি কৌতূহল। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে এদিকে আমার মাথা, হাত আর মুখ, অর্থাৎ আমার শরীরের যেটুকু তাঁর দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল, সবই ইয়াহুদের মতো। অথচ খানিকটা ধূর্ততা আর প্রচুর বদমাইস বুদ্ধি থাকলেও, যত রকম জন্তু আছে তার মধ্যে কিছু শিখবার ক্ষমতা ইয়াহুদেরই সব চেয়ে কম।

আমি তাঁকে বললাম যে আমি অনেক দূর দেশ থেকে, আমারই অনেকগুলি জাতভাইয়ের সঙ্গে, গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরী একটা ফাঁপা পাত্রে চড়ে, সমুদ্রের উপর দিয়ে এসেছি। আমার সঙ্গীরা আমাকে এই দেশের উপকূলে নামতে বাধ্য করে, একা ফেলে রেখে চলে গেছে। বেশ খানিকটা কষ্ট করে, কিছু কিছু ইসারা ইঙ্গিতের সাহায্য নিয়ে, তবে তাঁকে এত কথা বোঝাতে পেরেছিলাম।

তিনি উত্তরে বললেন যে নিশ্চয়ই আমি কোথাও ভুল করছি, নয় তো যা হয়নি তাই বলছি; ওদের ভাষায় মিথ্যা বলা বা প্রতারণার প্রতিশব্দ নেই।

তিনি জানেন যে সমুদ্রের ওপারে কোনো দেশ থাকাও অসম্ভব আর একদল পশুর পক্ষে একটা কাঠের পাত্রকে সমুদ্রের উপর দিয়ে ইচ্ছামতো চালিয়ে নিয়ে যাওয়াও অসম্ভব। তিনি নিশ্চিত জানেন যে এমন কোন হুইন্‌ম্‌ও জগতে নেই যে ঐরকম একটা পাত্র তৈরী করতে পারবে এবং সে পাত্র সামলাবার জন্য ইয়াহুদের উপরে নির্ভর করাও সম্ভব হবে না।

ওদের ভাষায় ঘোড়াকে বলে 'হুইন্‌ম্‌' আর ওদের শব্দবিজ্ঞান অনুসারে কথাটার মানে হল—'প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ কীর্তি'। আমি প্রভুকে বললাম এখন আমি নিজেকে প্রকাশ করার উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না, কিন্তু যত তাড়াতাড়ি পারি নিজের জ্ঞানের উন্নতি করে নিয়ে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁকে নানা আশ্চর্য বিষয়ে বলতে পারব। তিনিও অনুগ্রহ করে তাঁর নিজের ঘোটকী, ছেলে-মেয়ে ও বাড়ির চাকরদের বলে দিলেন সুযোগ পেলেই যেন আমাকে ভাষা শিক্ষা দেয়। নিজেও রোজ তিন চার ঘণ্টা ধরে কষ্ট করে ঐ কাজ করতেন।

যেই খবর রটে গেল যে একটা আশ্চয রকমের ইয়াহু পাওয়া গেছে হুইন্‌ম্‌দের মত কথা বলতে পারে আর তার কথাবার্তায় ও কাজে বুদ্ধিসুদ্ধির ক্ষীণ আভাস পাওয়া যায়, অমনি বহু উচ্চ বংশীয় ঘোটক-ঘোটকী প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতে আরম্ভ করলেন। এঁরা আমার সঙ্গে কথা বলে খুব আনন্দ পেতেন; অনেক প্রশ্ন করতেন আর আমিও সাধ্যমত উত্তর দিতাম। এসব কারণে আমার ভাষা শেখার এতই সুবিধা হয়ে গেল যে ও দেশে পৌঁছবার পর পাঁচ মাসের মধ্যেই আমাকে যা বলা হত সব বুঝতে পারতাম আর নিজের মনের ভাবও বেশ ভাল করে প্রকাশ করতে পারতাম। আমাকে দেখাবার ও আমার সঙ্গে আলাপ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে হুইন্‌ম্‌রা আমার প্রভুর কাছে আসত, তারা কিন্তু বিশ্বাসই করতে চাইত না যে আমি একটি সত্যিকার ইয়াহু, কারণ আমার গায়ের খোলসটা আমার স্বজাতিদের মতো ছিল না। তারা এই দেখে আবাক হয়ে যেত যে আমার মাথায়, মুখে আর হাতে ছাড়া কোথাও ইয়াহুদের মতো চামড়া আর লোম নেই। কিন্তু এর দিন পনেরো বাদে নিতান্ত আকস্মিক ভাবেই আমার প্রভুর কাছে রহস্যটি প্রকাশ হয়ে গেল।

ইতঃপূর্বেই পাঠকমহাশয়কে বলেছি যে প্রত্যেক দিন রাত্রিবেলায় বাড়ির

সবাই শুয়ে পড়লে পর, কাপড়চোপড় ছেড়ে সেগুলি দিয়ে গা ঢাকা দিয়ে শোয়াই ছিল আমার অভ্যাস। এখন হয়েছে কি, একদিন খুব ভোরে আমার প্রভু তাঁর খাস বেয়ারা লাল টাট্টুকে দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। সে যখন এসে হাজির হয়েছে আমি ঘুমে অচেতন, কাপড়চোপড়গুলো এক পাশে পড়ে আছে, কামিজ গেছে কোমরের উপরে উঠে। তার চ্যাঁচামেচির চোটে আমার ঘুম গেল ভেঙ্গে আর সে-ও যা বলতে এসেছিল খানিকটা এলো-মেলো ভাবে বলে গেল ; তারপর দারুণ ঘাবড়ে আমার প্রভুর কাছে গিয়ে, কি দেখেছে তার একটা জগাখিচুড়ি বর্ণনা দিল। এসব আমি পরে শুনেছিলাম, কাপড়চোপড় পরা হলেই মালিককে সেলাম জানাতে যেই গেছি, তিনি তাঁর চাকরের রিপোর্টের মানে জিজ্ঞাসা করে বসলেন। সে বলছে অন্য সময় আমাকে যেমন দেখতে লাগে, ঘুমোলে পর নাকি আর সেরকম থাকি না ; আমার গায়ের খানিকটা সাদা খানিকটা হলদে, অন্ততঃ ততটা সাদা নয়, আর খানিকটা মেটে রঙের।

মুখপোড়া ইয়াহু জাত থেকে আমি যে কত বিভিন্ন সেইটা দেখাবার জন্যেই এতকাল আমি আমার পোষাকের রহস্যটি গোপন করে রেখেছিলাম, কিন্তু দেখলাম সে-চেষ্টার আর কোন মানে হয় না। তাছাড়া ভেবে দেখলাম আমার কাপড়চোপড় আর জুতোজোড়া অনতিবিলম্বেই ছিঁড়েখুঁড়ে শেষ হয়ে যাবে, এখনি তাদের যেরকম জীর্ণ দশা হয়েছে! তখন আমাকে হয় ইয়াহুদের নয় অন্য কোন জানোয়ারের চামড়া দিয়ে একটা ব্যবস্থা করে নিতে হবে আর তক্ষুণি সমস্ত রহস্যটাই জানাজানি হয়ে যাবে।

কাজে কাজেই আমার প্রভুকে বললাম আমি যে দেশ থেকে এসেছি, সেখানে আমার স্বজাতিরা সর্বদা জানোয়ারের লোম থেকে খোলস তৈরী করে নিজেদের গা ঢেকে রাখে, খানিকটা ভদ্রতার খাতিরে আর খানিকটা শীত-গ্রীষ্মের প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে। আরো বললাম যে তিনি যদি আদেশ করেন তো আমার নিজের শরীরের দৃষ্টান্ত দিয়েই তাঁর কাছে এ কথার প্রমাণ দিতে পারি, তবে তিনি যেন আমার উপর এইটুকু অনুগ্রহ করেন যে দেহের যে সব অংশ ঢেকে রাখতে প্রকৃতিই আমাদের শিখিয়েছে, সে সব যেন প্রকাশ করতে না হয়।

তিনি বললেন আমার বক্তব্যটি বড়ই অদ্ভুত, বিশেষ করে শেষের দিকটা,

কারণ তিনি ভেবেই পাচ্ছেন না যে নিজেই যা দিয়েছে তাকে গোপন করতে প্রকৃতি কেন শেখাবে। তিনি নিজে কিম্বা তাঁর পরিবারের কেউ তো তাঁদের দেহের কোন অংশ সম্পর্কে লজ্জা বোধ করেন না, তবে এ ক্ষেত্রে আমার যা ভালো লাগে আমি তাই করতে পারি। তাই শুনে আমি প্রথমেই কোটের বোতাম খুলে কোটটা ছেড়ে ফেললাম। ওয়েস্ট কোটটাও খুললাম; মোজা, জুতো, ইজের টেনে খুলে ফেললাম। কামিজটাকে উপর থেকে কোমর অবধি নামিয়ে, তলাটাকে গুটিয়ে তুলে কোমরের চারদিক ঘিরে কটিবাসের মতো করে জড়িয়ে, লজ্জা নিবারণ করলাম।

আমার প্রভু সমস্ত অনুষ্ঠানটিকে গভীর কৌতূহল ও বিস্ময়ের লক্ষণ সহ নিরীক্ষণ করলেন। পায়ের গিঁট দিয়ে ধরে জামাগুলি একটা একটা করে তুলে নিয়ে মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করলেন, তারপরে খুব মৃদুভাবে আমার সমস্ত গায়ে খুর বুলোলেন, শেষে অনেকবার আমাকে ঘুরে ফিরে দেখে বললেন স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে আমি একটি খাঁটি ইয়াহু। তবে আমার স্বজাতিদের চেয়ে কয়েকটা বিষয়ে আমি অন্য রকম, যেমন আমার চামড়া অনেক বেশি মোলায়েম ও সাদা, আমার শরীরের অনেক জায়গায় লোম নেই, আমার সামনের ও পিছনের পায়ের থাবাগুলো অনেক ছোট আর আকৃতিতেও অন্য রকমের আর পিছনের পা দুটোতে ভর দিয়ে আমার হাঁটার অভ্যাসটিও নিজস্ব। তিনি আর কিছু দেখতে চাইলেন না, কাপড়চোপড়গুলো আবার পরে ফেলবার অনুমতিও দিলেন, কারণ ততক্ষণে শীতে আমি কাঁপতে শুরু করেছিলাম।

তিনি আমাকে ক্রমাগত ইয়াহু আখ্যা দিচ্ছেন বলে আমার মনে যে কতখানি অস্বস্তি হচ্ছে সে কথা তাঁর কাছে প্রকাশ করলাম; অতিশয় ঘৃণ্য জীব এই ইয়াহুরা, তাদের প্রতি আমার মনে আছে শুধু বিদ্বেষ আর অবজ্ঞা। অনুনয় করে বললাম আর যেন তিনি আমাকে ঐ আখ্যা না দেন, তাঁর পরিবারবর্গকে ও যে সব বন্ধুবান্ধবদের আমার সঙ্গে দেখা করতে দেন তাঁদের সবাইকে যেন তাই বলে দেন, তাছাড়া আরো অনুরোধ করলাম যেন আমার দেহের কৃত্রিম আবরণের কথা তিনি ছাড়া আর কেউ জানতে না পারে, অন্ততঃ যত দিন পর্যন্ত আমার বর্তমান পোষাক পরিচ্ছদ টেঁকে। আর খাস চাকর লাল টাট্টু যা দেখেছে, প্রভু যেন তাকে সে-কথা গোপন করতে আদেশ দেন।

আমার প্রভু দয়া করে এ-সমস্ত অনুরোধই রক্ষা করতে সম্মত হলেন, কাজেই যতদিন না আমার কাপড়চোপড় ছিঁড়েখুঁড়ে একাকার হল, ততদিন রহস্যটি গোপন ছিল; তারপরে অবিশ্যি নানান বিচিত্র উপায়ে পোষাকের অভাব মেটাতে হয়েছিল, সে সব কথা পরে হবে। প্রভু অনুরোধ করলেন যেন ততদিন আমি আমার সমস্ত ক্ষমতা নিয়োজিত করি ওঁদের ভাষা শেখার কাজে, কারণ আমার শরীর আবৃত থাকুক কিম্বা অনাবৃতই থাকুক, তার চেয়ে আমার ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা ও বিচারবুদ্ধি দেখে তিনি ঢের বেশি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছেন। তাছাড়া যে-সব বিস্ময়কর ব্যাপার তাঁর কাছে বিবৃত করব বলে কথা দিয়েছি সে শুনবার জন্য তাঁর আর তর সইছে না।

সে-দিন থেকে আগের চাইতে দ্বিগুণ উৎসাহে আমাকে তিনি শিক্ষা দিতে লাগলেন। যত অতিথি অভ্যাগতই আসুক না কেন, আমাকে তাদের সামনে নিয়ে এসে, আমার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতে তাদের বাধ্য করতেন। আবার তাদের গোপনে বলতেন যে তাহলে আমার মেজাজ খুসি থাকবে এবং আমি তাদের আরও বেশি আমোদ দিতে পারব।

প্রতিদিন যখন তাঁর কাছে হাজিরা দিতাম, আমাকে শিক্ষা দেবার কষ্টটুকু স্বীকার করা ছাড়াও, তিনি আমাকে আমার নিজের সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করতেন, আমিও তার যথাসাধ্য উত্তর দিতাম। এইভাবে আমাদের সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই তাঁর মোটামুটি খানিকটা ধারণা হয়ে গিয়েছিল, অবিশ্যি সে ধারণাটি নির্ভুল ছিল না। কি করে আমি ধাপে ধাপে এগিয়ে শেষটা আরও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে বাক্যালাপ করতে পেরেছিলাম, তার বর্ণনা দিতে গেলে সকলের বিরক্ত লাগবে। তবে নিজের সম্বন্ধে গুছিয়ে এবং বিস্তারিত ভাবে প্রথম যে বিবৃতিটি দিয়েছিলাম, সেটা ছিল অনেকটা এই রকম—

এর আগেও যে কথা আমি বলবার চেষ্টা করেছি সেটা হল যে আমি অনেক দূর দেশ থেকে এসেছি; সঙ্গে আমার গোটা পঞ্চাশেক স্বজাতি ছিল। আমার প্রভুর বাড়ির চেয়েও প্রকাণ্ড একটা ফাঁপা কাঠের আধারে চড়ে সমুদ্রের উপর দিয়ে আমরা এসেছিলাম। যতটা স্পষ্ট করে পারি জাহাজের একটা বর্ণনাও দিলাম; তারপর আমার রুমালের সাহায্যে দেখিয়ে দিলাম কেমন করে বাতাসের জোরে জাহাজ চলে। তারপরে নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটির ফলে এখানকার উপকূলে তারা যে আমাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল

সেকথাও বললাম। কোন দিকে যেতে হবে কিছুই না জেনে হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছিলাম এমন সময় তিনি আমাকে জঘন্য ইয়াহুদের অত্যাচার থেকে উদ্ধার করলেন।

প্রভু তখন জিজ্ঞাসা করলেন জাহাজটা কে তৈরী করেছিল? আর এটাই বা কি করে সম্ভব হল যে আমাদের দেশের হুইন্‌ম্‌রা জাহাজ চালানোর ভার জানোয়ারদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিল? উত্তরে আমি বললাম যতক্ষণ না তিনি কথা দিচ্ছেন যে আমি যা বলব তাতে তিনি একটুও ক্ষুব্ধ হবেন না, ততক্ষণ আমার পক্ষে সাহস করে আর বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়। তারপরে, যে-সব বিস্ময়কর ব্যাপার তাঁকে শোনাব বলে এতদিন আশা দিয়ে আসছি, সে-সব কথা বলা যেতে পারে।

তখুনি তিনিও কথা দিলেন আর আমিও তাঁকে আসল ব্যাপারটি বললাম, যে ঐ জাহাজটি তৈরী করেছিল আমারই মতো জীবরা আমি যত দেশে ভ্রমণ করেছি সে সমস্ত জায়গায় এবং নিজের দেশেও আমরাই হলাম একমাত্র বুদ্ধিসম্পন্ন জীব, সব ক্ষমতা আমাদেরই হাতে। যে জানোয়ারদের তিনি 'ইয়াহু' বলেন, তাদের একজনের মধ্যে বিচারবুদ্ধির লক্ষণ দেখে তিনি ও তাঁর বন্ধুরা যতখানি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, এদেশে পৌছে হুইন্‌ম্‌দের সবাইকে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীবের মতো আচরণ করতে দেখে, আমিও ঠিক ততখানিই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এ-কথা আমি মেনে নিলাম যে যদিও আমার সমস্ত দেহ ইয়াহুদের মতো, তবুও তাদের ঐরকম জঘন্য জংলি আচরণের আমি কোন কারণ খুঁজে পাই না।

আমি আরও বললাম যে দেশের লোককে এইসব কাহিনী শোনাবার জন্যে ভাগ্যদেবী যদি কখনো আমাকে আবার ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়ে নিয়ে যান, তা হলে আমি নিশ্চয়ই তাদের কাছে সব কথা বলব এটুকু আমি সঙ্কল্প করেছি। সবাই কিন্তু তখন মনে করবে 'যা নয় তাই' বলছি, নিজের মাথা থেকে বানিয়ে বানিয়ে বলছি। তাছাড়া তাঁকে, তাঁর পরিবারবর্গ ও বন্ধুবান্ধবদের যথাসম্ভব শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং তিনি কিছু মনে করবেন না এই ভরসাতে, এটুকু বলতে বাধ্য হচ্ছি যে হুইন্‌ম্‌রা একটা জাতির মাথা আর ইয়াহুরা তাদের অধীনে গৃহপালিত পশু হয়ে রয়েছে, একথার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে আমাদের দেশের লোকদের মনে যথেষ্ট সন্দেহের উদ্রেক হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

সত্যমিথ্যা সম্পর্কে হুইনম্‌দের ধারণা—লেখকের বক্তব্যে প্রভুর অনমুমোদন—নিজের ও নিজের সমুদ্রযাত্রার দুর্ঘটনা সম্পর্কে লেখকের বিশদ আলোচনা।

মুখে ভারি একটা অস্বস্তির ভাব নিয়ে প্রভু আমার কথাগুলি শুনছিলেন; সন্দেহ করা কিম্বা অবিশ্বাস করা সম্বন্ধে এখানকার অধিবাসীরা এত কম জানে যে সেরকম অবস্থায় পড়লে কি ধরনের আচরণ করতে হবে এরা ভেবেই পায় না। আমার মনে আছে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনার সময় প্রসঙ্গক্রমে মিথ্যা বলা আর অলীক ভাব দেখানো বিষয়ে যখনি কোন মন্তব্য করেছি, তখনি আমি ঠিক কি বলতে চাইছি সেটা বুঝতে তাঁর খুব কষ্ট হত, অথচ অন্য দিক দিয়ে তাঁর খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। তাঁর যুক্তি হল, ভাষার ব্যবহার হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যাতে আমরা পরস্পরকে বুঝতে পারি আর প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করতে পারি; এখন কেউ যদি 'যা নয় তাই' বলে তাহলে এই দুটি উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়; কারণ সেক্ষেত্রে আমি যে তার কথা ঠিক বুঝছি তাও বলা যায় না আর প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করা দূরে থাকুক, বরং যখন কিছুই জানতাম না তখন আমার অবস্থা আরও ভালো ছিল, যেহেতু এখন আমাকে সাদা জিনিসকে কালো আর লম্বা জিনিসকে বেঁটে বলে বোঝানো হচ্ছে। যে মিথ্যা বলবার ক্ষমতা সম্বন্ধে মানুষমাত্রেরই এত জ্ঞান আর এত ব্যাপক অভ্যাস, তার বিষয়ে আমার প্রভুর এইটুকু মাত্র ধারণা ছিল।

এবার অবান্তর কথা থেকে আবার আসল বিষয়ে ফিরে আসা যাক। আমি যখন বললাম যে আমাদের দেশে ইয়াহুদেরই হাতে দেশ পরিচালনার ভার, আমার প্রভু বললেন এরকম তিনি ধারণাই করতে পারেননি, এখন তাঁর জিজ্ঞাস্য হল আমাদের দেশে হুইনম্‌ আছে কি নেই, আর যদি থাকে, তাহলে তাদের কি বা কাজ। আমি বললাম বহু সংখ্যক হুইনম্‌ আছে, গ্রীষ্মকালে তারা মাঠে চরে, শীতকালে ঘরে বসে শুকনো ঘাস আর জই খায়; সেখানে ইয়াহু চাকর রাখা হয় তাদের গায়ের চামড়া ঘষে মসৃণ করবার জন্যে,

চুল আঁচড়ে দেবার জন্যে, পা পরিষ্কার করবার জন্যে, খাবার দেবার আর বিছানা পাতবার জন্যে।

আমার প্রভু বললেন—আমি তোমার কথা খুব ভালো করেই বুঝলাম। যা বললে তার থেকে স্পষ্টই জানা গেল যে ইয়াহুরা যতই বুদ্ধিসুদ্ধি দাবি করুক, আসলে হুইন্‌ম্‌রাই তোমাদের প্রভু। আমার বড় ইচ্ছা করছে যে আমাদের ইয়াহুরাও তোমাদের ইয়াহুদের মতো পোষ মানুক। তখন আমি আমার প্রভুকে অনুনয় করে বললাম, আর বেশি বিবরণ দেওয়া থেকে তিনি যেন আমাকে নিষ্কৃতি দেন, কারণ আমি নিশ্চয় জানি যে আরও যে বর্ণনা তিনি চাইছেন, সে কথা শুনলে পর তিনি অতিশয় ক্লেশ পাবেন। কিন্তু তিনি নাছোড়বান্দা হয়ে আমাকে হুকুম করলেন ভালোমন্দ সব তাঁকে শোনাতে হবে। আমিও বললাম, যে আজ্ঞা!

আমি একথা স্বীকার করলাম যে আমাদের দেশে যত রকম পশু আছে, তার মধ্যে হুইন্‌ম্‌রাই সবচেয়ে উন্নত ও সুশ্রী; হুইন্‌ম্‌দের আমরা ঘোড়া বলি। গায়ের জোরে আর দ্রুত বেগে দৌড়তে এরাই শ্রেষ্ঠ। এই হুইন্‌ম্‌রা যদি উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সম্পত্তি হয়, তাদের কাজ হয় ভ্রমণ করা, ঘোড় দৌড় করা ও রথ টানা। তাদের সঙ্গে ভারি সদয় ব্যবহার করা হয় ও খুব যত্ন নেওয়া হয়, যত দিন না রোগে পড়ে, কিম্বা পা খোঁড়া হয়। তখন তাদের বেচে দেওয়া হয় এবং যতদিন না মরে রেহাই পায় ততদিন যত রাজ্যের খাটুনি তাদের ভাগ্যে জোটে। মারা গেলে তাদের ছাল ছাড়িয়ে যে দাম পাওয়া যায়, তার বিনিময়ে বিক্রী করে দেওয়া হয় আর শরীরটা পড়ে থাকে, কুকুরে, শকুনে খায়। তবে সাধারণ ঘোড়াদের এত সৌভাগ্য হয় না; তাদের মালিকরা হয় চাষবাস, নয়তো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মাল পৌঁছনোর কাজ করে; এরা ঘোড়াদের অনেক বেশি খাটায় আর অনেক মন্দ খাওয়ায়।

তারপর আমরা কিভাবে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াই তার যথাসাধ্য বিবরণ দিলাম, জিন, লাগাম, ঘোড়সোয়ারদের জুতোর সঙ্গে লাগানো কাঁটা আর চাবুকের আকৃতি আর ব্যবহারের বর্ণনা দিলাম, ঘোড়াকে কিভাবে গাড়ির সঙ্গে জোড়া হয়, চাকা ইত্যাদির কথাও বললাম। আরও বললাম যে ঘোড়াদের পায়ের তলায় লোহা বলে একরকম শক্ত পদার্থের নাল বাঁধিয়ে দিই আমরা যাতে পাথুরে রাস্তা দিয়ে যাওয়া-আসার ফলে পায়ের খুর ক্ষয়ে না যায়।

প্রথমে খানিকটা ক্রোধ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে, তারপর আমার প্রভু বললেন যে তাঁর এই ভেবে সবচেয়ে আশ্চর্য লাগছে যে একজন হুইন্‌ম্‌এর পিঠে চড়বার আমাদের সাহস হয় কি করে, কারণ এবিষয়ে তাঁর কোন সন্দেহ নেই যে তাঁর বাড়ির সব চেয়ে দুর্বল যে চাকর, সেও ইয়াহুদের মধ্যে সবচেয়ে জোয়ানকে পিঠ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারবে, কিম্বা চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে হতভাগাকে পিষে মেরে ফেলতে পারবে। আমি বললাম তিন-চার বছর বয়স থেকেই আমাদের ঘোড়াদের যে কাজে আমরা লাগাতে চাই, সে বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। কোন ঘোড়া যদি অসহ্য রকমের বদ্‌মেজাজী হয় তাকে গাড়িতে জুতে দেওয়া হয়; কোন রকম বদমাইসি করলে বাচ্চা বয়স থেকেই তাদের বেদম চাবুক মারা হয়; যে সব পুরুষ ঘোড়া মানুষে চড়বে কিম্বা যারা মালবোঝাই গাড়ি টানবে তাদের অনেক সময় দুবছর বয়সেই খোজা করে দেওয়া হয়, যাতে তাদের অতিরিক্ত তেজ কমে গিয়ে তারা বাধ্য ও কোমল হয়ে আসে। বাস্তবিকই ঘোড়ারা শাস্তি ও পুরস্কার দুই-ই বুঝতে পারে. কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার প্রভু যেন মনে রাখেন যে এদেশের ইয়াহুদেরই মতো সেখানে তাদেরও এককণা বিচারবুদ্ধি নেই।

অনেক কষ্টে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বুঝিয়ে, তবে এই যে এতগুলো কথা বললাম, তার সঠিক মর্মটি প্রভুকে ধরাতে পেরেছিলাম, কারণ ওদের ভাষার শব্দের খুব প্রাচুর্য নেই, যেহেতু আমাদের চেয়ে ওদের প্রয়োজন ও আবেগের সংখ্যা অনেক কম। তবু হুইন্‌ম্‌ জাতির প্রতি আমাদের এই বর্বরোচিত ব্যবহারের কথা শুনে তাঁর সেই মহাজনোচিত মনের ক্ষোভের বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়, বিশেষতঃ যখন আমি ওঁকে বুঝিয়ে বললাম ঘোড়াদের বংশবৃদ্ধি বন্ধ করবার আর তাদের আরও আজ্ঞাবহ দাসের মতো করে তুলবার জন্যে কিভাবে আমরা ওদের খোজা করে দিই।

তিনি বললেন যে এও যদি সম্ভব হয় যে একটা দেশে কেবলমাত্র ইয়াহুদেরই বিচারবুদ্ধি আছে, তাহলে দেশ পরিচালনার ভার যে তাদের হাতেই থাকবে এ আর বিচিত্র কি, কারণ শেষ পর্যন্ত পশুবলের উপরেই বুদ্ধির জয় অবশ্যম্ভাবী। তবে আমাদের শরীরের কাঠামোটি দেখে, বিশেষ করে আমারটি দেখে, তাঁর ধারণা হয়েছে যে বুদ্ধি খাটিয়ে দৈনিক জীবনের সাধারণ ও স্বাভাবিক কর্তব্য সম্পাদনের পক্ষে এত বড় মাপের অন্য কোন জীবের দেহ এতটা

আনাড়ি নয়। তারপর তিনি জানতে চাইলেন আমি যাদের মধ্যে বাস করে থাকি তারা কি আমার মতো, নাকি অন্য ইয়াহুদের মতো।

আমি তাঁকে আশ্বাস দিলাম যে আমার সমবয়সীদের চেয়ে আমার গড়ন কিছু মন্দ নয়; তবে যাদের বয়স কম আর মেয়েদের শরীর আরো মসৃণ ও নরম, আর শেষোক্তদের গায়ের চামড়া প্রায়ই দুধের মতো সাদা হয়। তিনি বললেন, বাস্তবিকই অন্য ইয়াহুদের সঙ্গে আমার অনেক তফাৎ, আমি অতটা নোংরা নই, আমার শরীরটাও অতখানি বিকৃত নয়; কিন্তু আসলে যেটা হলে আমার সুবিধা হত সেদিক থেকেই আমার অবস্থা ওদের চেয়ে অনেক খারাপ, অর্থাৎ আমাদের সামনের ও পিছনের পায়ের নখগুলো কোনোই কাজে লাগে না। আর সামনের পা দুটোকে তো পা-ই বলা চলে না কারণ তার উপর ভর দিয়ে আমাকে চলতে তিনি কোনদিন দেখলেন না; মাটিতে চলার পক্ষে ও দুটি বড় বেশি নরম। তাছাড়া সাধারণতঃ ওদের উপর আমি আবরণও ব্যবহার করি না আর যদি বা মাঝেসাঝে করে থাকি, তা হলেও সেগুলি পিছনের পায়ের আবরণের মতো দেখতেও নয়, অতটা মজবুৎও নয়। ভারসাম্য রেখে চলাই আমার পক্ষে সম্ভব নয়; পিছনের একটা পা হড়কালে তো পতন নিশ্চিত!

তারপর তিনি আমার শরীরের অন্যান্য অংগের মধ্যেও খুঁৎ বের করতে লাগলেন; মুখটা বড়ই চ্যাপ্টা, নাকটার বড় বেশি প্রাধান্য, চোখ দুটো একেবারে সামনে বসানো, এপাশে ওপাশে দেখতে হলে মাথা সুদ্ধ না ঘুরিয়ে উপায় নেই; সামনের একটা পা মুখ অবধি না তুলে খেতে পারি না, কাজেই প্রকৃতিও পায়ের গাঁটগুলিকে সেই রকম অদ্ভুত করে গড়েছে। আমার পিছনের পায়ে অত খাঁজভাঁজের দরকারটা কি ছিল তাও তিনি ভেবে পেলেন না; সেগুলো আবার এতই নরম যে অন্য জানোয়ারের গায়ের চামড়া দিয়ে একটা ঢাকনি তৈরী করে না পরলে, শক্ত পাথরের ধার সইতে পারে না; এমন কি শীত তাপের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য আমার সারা দেহেরই একটা আস্তরণের দরকার হয়, রোজ সেটাকে পরা এবং খোলা সেও একটা বিরক্তি ও ঝামেলার ব্যাপার!

সবার শেষে প্রভু বললেন—তাছাড়া তিনি লক্ষ্য করেছেন এদেশের কোনো জানোয়ার ইয়াহুদের দেখতে পারে না, দুর্বলরা ওদের এড়িয়ে যায় আর

বলিষ্ঠরা ওদের তাড়িয়ে দেয়। অতএব যদি বা ধরেও নেওয়া যায় যে আমরা সকলে বুদ্ধিলাভ করেছি, তবু আমাদের প্রতি সব জানোয়ারদের এই স্বাভাবিক বিদ্বেষের প্রতিকার কি করে হবে, এটা তিনি ভেবে পেলেন না। ফলতঃ, অন্য জানোয়ারদের আমরা কি উপায়ে পোষ মানিয়ে কাজে লাগাব! যাই হক, এই নিয়ে আর তিনি তর্ক করতে চান না, কারণ তার চেয়েও তাঁর বেশি ইচ্ছা হচ্ছে আমার নিজের কথা, যে দেশে জন্মেছিলাম তার কথা, এখানে আসবার আগে কি কি কাজ করেছি ও কি কি ঘটনা ঘটেছে—এইসব শুনবেন।

আমিও তাঁকে ভরসা দিয়ে বললাম যে সমস্ত কথা তাঁকে বলবার জন্যে আমার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমার খুব সন্দেহ হচ্ছে অনেকগুলি বিষয়ে ভালো করে তাঁকে বোঝানো সম্ভব হবে কি না, কারণ সেসব বিষয়ে প্রভুর হয়তো কোনো ধারণাই নেই, তাদের সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন কোনো জিনিসও এদেশে দেখি নি। সে যাই হক, উপমার সাহায্যে যতটা সম্ভব মনের কথা প্রকাশ করবার চেষ্টা করব, কিন্তু সেই সঙ্গে আমার বিনীত প্রার্থনা রইল যে কোথাও যদি কথার অভাবে আটকিয়ে যাই, প্রভু যেন আমার সাহায্যে আসেন। তিনিও অনুগ্রহ করে এই প্রস্তাবে রাজী হলেন।

তখন আমি বললাম, এখান থেকে অনেক দূরে, সূর্যকে একবার তার পরিক্রমা শেষ করতে যত দিন লাগে, ততদিন ধরে দৌড়লে আমার প্রভুর সব চাইতে জোরালো চাকর যতদূর যেতে পারবে ঠিক ততটা দূরে, ইংল্যাণ্ড বলে একটা দ্বীপে, সৎ মাতাপিতার ঘরে আমার জন্ম হয়েছিল। আমাকে অস্ত্র চিকিৎসকের কাজ শেখানো হয়েছিল। এঁদের কাজ হল দুর্ঘটনায় কিম্বা মারামারি করে কেউ যদি আহত হয়, তবে তার আঘাত ও যন্ত্রণা সারিয়ে দেওয়া। আমাদের দেশ শাসন করেন একজন স্ত্রী মানুষ, তাঁকে আমরা রাণী বলি। দেশ ছেড়েছিলাম টাকা রোজগারের আশায়, যাতে ফিরে গিয়ে স্ত্রী পুত্র পরিবারের ও নিজের ভরণপোষণের ভার নিতে পারি। এই শেষবারের যাত্রায় আমিই ছিলাম জাহাজের কর্তা, আমার নিচে প্রায় পঞ্চাশজন ইয়াহু ছিল। তাদের অনেকে সমুদ্রপথেই মারা গেলে পর, নানান দেশী লোকের মধ্যে থেকে বেছে নিয়ে ওদের অভাব পূর্ণ করতে বাধ্য

হয়েছিলাম। দুবার জাহাজডুবির আশঙ্কা হয়েছিল, প্রথমবার ঝড়ে, দ্বিতীয়বার একটা পাথরের গায়ে ধাক্কা লেগে।

এখানে আমার প্রভু বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমার অতগুলো লোক মারা যাবার এবং অত বিপদের মধ্যে পড়ার পরেও কি করে আমার সঙ্গে সাহস করে যেতে নানান দেশী নাবিকদের রাজী করালাম। আমি বললাম তারা সবাই অতি বেপরোয়া লোক, যারা দারিদ্র্যের জন্যেই হক, কিম্বা কোনো অন্যায় কাজ করেই হক, নিজেদের দেশ থেকে পালাতে বাধ্য হয়েছিল। কেউ কেউ মামলামোকদ্দমার ফলে সর্বস্বান্ত হয়েছিল; কেউ মদ খেয়ে, দুষ্ট মেয়েমানুষদের সঙ্গে মিশে, জুয়ো খেলে তবে পালিয়েছিল; কেউ বা রাজদ্রোহী, কেউ কেউ খুন করে, চুরি করে, বিষ খাইয়ে, ডাকাতি করে, মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে, মিথ্যা সই দিয়ে, কিম্বা টাকা জাল করে, বলাৎকার কিম্বা অন্য পুরুষের সঙ্গে যৌনসম্বন্ধ করে, কিম্বা সৈন্য বিভাগ থেকে ফেরারি হয়ে, বা শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগ দিয়ে দেশত্যাগী হয়েছিল আর বেশির ভাগই জেল ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল। ফাঁসি যাবার কিম্বা না খেয়ে জেলে মরবার ভয়ে এদের কারো দেশে ফিরবার সাহস নেই, কাজেই অন্যান্য জায়গায় দিনগুজরানোর ব্যবস্থা দেখতে বাধ্য হয়েছে।

যখন এইসব বলছিলাম আমার প্রভু অনুগ্রহ করে অনেকবার আমাকে বাধা দিয়েছিলেন। যে সব ভিন্ন ভিন্ন অপরাধের জন্যে আমাদের অধিকাংশ নাবিক দেশত্যাগী হতে বাধ্য হয়েছিল, তার বিবৃতি আমাকে অনেক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দিতে হচ্ছিল। তার জন্যে বেশ কয়েকদিন খেটে আলোচনা করতে হয়েছিল, তবে বক্তব্যটি অবশেষে তাঁর বোধগম্য হল। কিন্তু তিনি কিছুতেই ভেবে পেলেন না এইসব জঘন্য অপরাধ করবার তাদের দরকারটা কি ছিল। সেটা বোঝাবার জন্যে, ক্ষমতা ও অর্থের লোভ, লালসার সাংঘাতিক ফলাফল, অমিতাচার, বিদ্বেষ, হিংসা এ সমস্ত বিষয়ে তাঁকে খানিকটা আভাস দেবার চেষ্টা করেছিলাম। এই সব ব্যাপার বোঝাতে ও বর্ণনা করতে আমাকে নানান উদাহরণ ও কাল্পনিক দৃষ্টান্তের সাহায্য নিতে হয়েছিল।

সব কথা শুনে, বিস্ময়ে রাগে দুঃখে আকাশের দিকে তিনি দুই চোখ তুললেন, অদৃষ্টপূর্ব অশ্রুতপূর্ব ব্যাপারের সম্মুখীন হওয়ার ফলে কল্পনাশক্তি অভিভূত হলে লোকে যেমন করে থাকে।

ওঁদের ভাষায় ক্ষমতা, সরকার, যুদ্ধ, আইন, শাস্তি এবং এইরকম হাজার কথা বোঝাবার জন্যে কোনো প্রতিশব্দই নেই, কাজেই আমি যে কি বলতে চাইছি, আমার প্রভুকে তার এতটুকু ধারণা দেবার পথে প্রায় অলঙ্ঘ্য বাধা! তবে তাঁর বোধশক্তি ছিল অসাধারণ, তার উপরে চিন্তা ও আলোচনার ফলে তার আরও উন্নতিও হয়েছিল, কাজেই শেষ পর্যন্ত, আমাদের দেশের দিকে মানবচরিত্র যে কি কীর্তি করতে পারে, সে বিষয় তাঁর একটা কার্যকরী ধারণা হয়ে গেল। তখন তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন, যে দেশকে আমরা ইউরোপ বলি তার, আর বিশেষ করে আমার নিজের মাতৃভূমি সম্বন্ধে যেন বিশদ্‌ভাবে বিবরণী দিই।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রভুর আদেশে লেখকদ্বারা ইংল্যাণ্ডের অবস্থা বর্ণন—ইউরোপীয় রাজাদের মধ্যে যুদ্ধের কারণ—লেখক কর্তৃক ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা শুরু।

পাঠকমহাশয় দয়া করে লক্ষ্য করবেন যে দুই বছরেরও অধিক কাল ধরে, নানান সময়ে, আমার প্রভুর সঙ্গে আমার যে-কথাবার্তা হয়েছিল, তার আলোচ্য বিষয়বস্তুর সারমর্মের অধিকাংশই, নিম্নলিখিত উদ্ধৃতির মধ্যে পাওয়া যাবে। হুইন্‌মদের ভাষা-শিক্ষায় আমি যতই উন্নতি করতে লাগলাম, আমার প্রভুও ততই বিস্তারিত বিবৃতি দাবী করতে লাগলেন। আমার ক্ষমতায় যতটা সম্ভব, সমস্ত ইউরোপের অবস্থার বিবরণী তাঁর সামনে ধরে দিয়েছিলাম। ব্যবসা, শিল্প, জ্ঞানবিজ্ঞানের বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম; আলাপ প্রসঙ্গে তিনি যে সব প্রশ্ন করতেন তার উত্তর দিতেই একটি অফুরন্ত আলোচ্য বিষয়ের ভাণ্ডার তৈরী হয়ে গিয়েছিল। তবে বর্তমানে কেবল মাত্র আমার জন্মভূমি সম্পর্কে যে কথাবার্তা হয়েছিল তার সারমর্মটুকু দেব। সালতারিখ বা অন্যান্য অবস্থার কথা বাদ দিয়ে, অবিকল সত্যের প্রতি নিষ্ঠা রেখে, যতটা সম্ভব গুছিয়ে সব কথা বলছি। আমার একমাত্র ভাবনা হল যে আমার প্রভুর যুক্তি ও মন্তব্যের প্রতি ঠিক সুবিচার করতে পারলাম কি না, কারণ খানিকটা আমার নিজের অক্ষমতার জন্যে আর খানিকটা আমাদের বর্বর ইংরিজিতে ভাষান্তরিত হওয়ার ফলে, তাঁর বক্তব্যগুলির কিছুটা ক্ষতি হওয়া অনিবার্য।

প্রভুর আদেশে প্রিন্স অফ অরেঞ্জের প্ররোচনায় যে বিদ্রোহ হয়েছিল তার কথা বললাম; উক্ত প্রিন্স কর্তৃক ফ্রান্সের সঙ্গে দীর্ঘ যুদ্ধের সূচনা এবং তাঁর উত্তরাধিকারী আমাদের বর্তমান রাণী কর্তৃক সেই যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি, কিভাবে তাতে খৃষ্টীয় জগতের শ্রেষ্ঠ রাজ্যগুলি লিপ্ত হল এবং আজ পর্যন্ত কেমন করে সে-যুদ্ধ চলেছে, সমস্তই বললাম। তাঁর অনুরোধে হিসাব করে বললাম যে এই যুদ্ধের আরম্ভ থেকে এখন পর্যন্ত সম্ভবতঃ প্রায়

দশ লক্ষ ইয়াহু নিহত হয়েছে, শতাধিক সহর অধিকৃত হয়েছে আর তার পাঁচ-গুণ জাহাজ পুড়েছে কিম্বা ডুবেছে।

প্রভু জানতে চাইলেন সাধারণতঃ কি কারণে ও কি উদ্দেশ্য নিয়ে এক দেশ অন্য দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যায়। আমি বললাম—অসংখ্য কারণ থাকে, তবে তার মধ্যে প্রধান কয়েকটির কথা বলছি। কখনো কখনো কারণটি হল রাজাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তাঁদের কখনোই মনে হয় না যে তাঁদের যে রাজ্য বা প্রজাসংখ্যা আছে সেই তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট। মাঝে মাঝে যুদ্ধের কারণ হল মন্ত্রীদের নষ্টামি ; তাদের কু-শাসনের বিরুদ্ধে প্রজাদের বিক্ষোভকে হয় মুখচেপে বন্ধ করবার, নয় অন্য দিকে চালিত করবার জন্যে রাজাকে তারাই যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত রাখে। মতভেদের দরুণ লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ দেয়, যথা মাংসই রুটি না রুটিই মাংস ; একরকম ফলের রস রক্ত না মদ ; শিষ্ দেওয়া পাপ না পুণ্য ; একটা কাঠের খুঁটিকে চুমো খাওয়া উচিত, না আগুনে ফেলে দেওয়া উচিত ; কোটের কোন রঙ সব চেয়ে ভালো, কালো, সাদা, লাল না ছাই, কোটটা কেমন হবে, লম্বা না বেঁটে, সরু না বড় ঘের, নোংরা না পরিষ্কার, এমনধারা আরো কত কি। এই মতভেদের জন্যে যেসব যুদ্ধ হয়, বিশেষ করে মতভেদটা যদি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে হয়ে থাকে, তাতে যেমন নিদারুণ রক্তপাত হয় আর যত দীর্ঘকাল ধরে লড়াই চলে, সেরকম অন্য কোনো কারণে হয় না।

মাঝে মাঝে দুই রাজার মধ্যে এই নিয়ে বিবাদ হয় যে তৃতীয় একজন রাজার রাজ্য এঁদের মধ্যে কে আত্মসাৎ করবেন ; অথচ সে রাজ্যের উপর এঁদের দুজনের মধ্যে কারো কোনো অধিকার নেই। মাঝে মাঝে একজন রাজা দ্বিতীয় রাজার সঙ্গে ঝগড়া করেন, পাছে দ্বিতীয় রাজা তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করেন এই ভয়ে। মাঝে মাঝে যুদ্ধে নামা হয়, কারণ শত্রুপক্ষ বড় বেশি প্রবল হয়ে উঠেছে আর মাঝে মাঝে সে বড় দুর্বল বলে। কখনো কখনো আমাদের যা আছে আমাদের প্রতিবেশীরা সেটি চায়, কিম্বা আমরা যা চাই তাদের সেটি আছে। কাজেই দুজনে যুদ্ধ করতে থাকি, যতদিন না হয় ওরা আমাদেরটি নিয়ে নেয়, নয় তো ওদেরটি আমাদের দিয়ে দেয়।

যুদ্ধ আরম্ভ করে দেবার একটা অতিশয় ন্যায্য কারণ হল কোনো দেশের লোকেরা দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত, ব্যাধিতে মরণাপন্ন কিম্বা নিজেদের মধ্যে

ঝগড়াঝাটি করে বিভক্ত হয়েছে। আমাদের কোনো নিকট মিত্রশক্তির কোনো সহর যদি এমন জায়গায় অবস্থিত হয় যে সেটি পেলে আমাদের সুবিধা, কিম্বা যদি একটুকরো জমি থাকে যেটা নিলে আমাদের রাজ্যটি বেশ সুডোল ভরাট হয়ে ওঠে, তাহলে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধানোতে কোনো দোষ নেই। যদি কোনো দেশের অধিবাসীরা গরীব ও মূর্খ হয়, তাহলে একজন রাজা সেখানে সৈন্য পাঠিয়ে তাদের মধ্যে অর্ধেককে হত্যা করে, বাকি অর্ধেককে সভ্যতা শিখিয়ে, ঐরকম বর্বরোচিত জীবনযাত্রা থেকে বিরত করবার উদ্দেশ্যে, তাদের ক্রীতদাস করে রাখলে কোনো অন্যায় হয় না। আরেকটি রাজোচিত, ধর্মানুমোদিত, সাধারণ ঘটনা হল, বিদেশী আক্রমণকারীর হাত থেকে একজন রাজাকে রক্ষা করবার জন্যে যদি আরেকজন রাজা তাঁর সাহায্যে আসেন, তাহলে শত্রুকে তাড়িয়ে দেবার পর, সাহায্যকারী নিজেই রাজ্যটাকে দখল করেন এবং যে রাজাকে সাহায্য করতে এসেছিলেন তাঁকে হয় হত্যা করেন, নয় কারারুদ্ধ বা নির্বাসিত করেন।

রক্ত কিম্বা বৈবাহিক সম্পর্ক রাজাদের মধ্যে লড়াই বাধবার পক্ষে যথেষ্ট কারণ, আর সম্পর্কটা যতই ঘনিষ্ঠ হয় ঝগড়া করবার প্রবৃত্তিটাও ততই বেশি। গরীব জাতিদের বড় খিদে, ধনী জাতিদের বড় অহঙ্কার; অহঙ্কারের সঙ্গে খিদের কোনো দিনও বনিবনা হয় না। এইসব কারণে অন্য সব ব্যবসা থেকে সৈনিকের ব্যবসাকে বেশি সম্মান দেওয়া হয়, কারণ সৈনিকরা হল এমন ইয়াহু যারা বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে যতগুলি সম্ভব নিজের স্বজাতিকে, যারা তার কোনো দিনও কোনো অনিষ্ট করে নি এমন লোকদের, মেরে ফেলবার জন্যে ভাড়া খাটে।

ইউরোপে এক ধরনের ভিখারি রাজা আছে যাদের নিজেদের যুদ্ধ করবার ক্ষমতা নেই, কিন্তু যারা দৈনিক মাথাপিছু এত টাকা নগদ হিসাবে নিজেদের সৈন্যবাহিনীকে ধনী রাজাদের কাছে ভাড়া দেয়। এই ভাড়ার তিন ভাগ তারা নিজেদের জন্য রাখে আর তাতেই তাদের বেশির ভাগ খরচ চলে। ইউরোপের উত্তর দিকে এইরকম অনেক রাজা আছে।

আমার প্রভু শুনে বললেন, বাস্তবিকই এই যা বললে এতে তোমার ঐ তথাকথিত বিচারবুদ্ধির কি ফল হয় তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। তবু এও ভালো যে এতে বিপদের চেয়ে লজ্জাই বেশি আর প্রকৃতি তোমাদের

খুব বেশি অনিষ্টসাধন করবার পক্ষে একেবারে অক্ষম করে ছেড়ে দিয়েছেন, কারণ তোমাদের হাঁগুলো তো মুখের সঙ্গে সমান করে বসানো, নিজেদের সমর্থন না থাকলে পরস্পরকে কামড়িয়েও কোনো সুবিধা করতে পারবে না। তারপর সামনের আর পিছনের পা'র নখগুলোর কথাই ধর না, সেগুলো এমনি ভোঁতা আর নরম যে আমাদের একটা ইয়াহু একলাই তোমাদের দশটাকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবে। কাজেই যুদ্ধে কটা মল তার যে সংখ্যা দিলে, তা শুনে আমি তো একথা না ভেবে পারছি না যে তুমি 'যা নয় তাই' বলছ।

তাঁর অজ্ঞতা দেখে আমিও একটু মাথা নেড়ে না হেসে পারলাম না। তাছাড়া যুদ্ধবিদ্যা তো আর আমার একেবারে অজানা নয়, তাই তাঁকে ছোট বড় কামান, বন্দুক, ক্যারাবাইন, পিস্তল, গুলি, বারুদ, তলোয়ার, বেয়নেট, যুদ্ধ, অবরোধ, পিছু-হটা, আক্রমণ, দেয়ালের ভিৎ ভাঙ্গার মাইন, অবরোধ প্রতিরক্ষার মাইন, বোমা ফেলা, সমুদ্রযুদ্ধ, হাজার লোক শুদ্ধ জাহাজডুবি, এক এক পক্ষে কুড়ি হাজার নিহত হওয়া, মরণাপন্নদের কাতরোক্তি, কাটা হাত পা শূন্যে ওড়া, ধোঁয়া, শব্দ, গোলমাল, ঘোড়ার পায়ের নিচে পিষে মরা, পলায়ন, পশ্চাৎধাবন, জয়লাভ, মাঠে ছড়ানো শবদেহ কুকুর, নেকড়ে, শকুনে ভক্ষণ, লুটপাট, সর্বস্বাপহরণ, বলাৎকার, আগুন লাগানো, ধ্বংস করা— এ সমস্তর বর্ণনা দিলাম। তারপর আমার প্রিয় স্বদেশবাসীদের বীরত্বের কথা প্রমাণ করবার জন্যে, আমি তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললাম একটা অবরোধে এক তোপে একশো লোক উড়িয়ে দিতে তাদের দেখেছি, জাহাজেও অতগুলো লোক ওড়াতে দেখেছি, মৃতদেহগুলোকে টুকরো টুকরো হয়ে মেঘের উপর থেকে আবার মাটিতে পড়তে দেখেছি, দর্শকদের সবার তাই দেখে কি ফূর্তি!

আরো বিস্তারিত বিবরণ দিতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় আমার প্রভু আমাকে চুপ করতে আদেশ করলেন। তারপর তিনি বললেন ইয়াহুদের স্বভাব যাদের কাছে পরিচিত, তারা সহজেই বিশ্বাস করবে এ রকম জঘন্য জানোয়ারের পক্ষে আমি যেসব কীর্তির বর্ণনা দিলাম সে সমস্তই সম্ভব, যদি তাদের দৈহিক শক্তি আর মনের চাতুর্য তাদের দুষ্টবুদ্ধির সমান হয়। কিন্তু আমার বক্তৃতা শুনে ইয়াহু জাতটার উপর তাঁর ঘৃণা এতই বেড়ে গেছে,

এবং তিনি মনে যেরকম অশান্তি ভোগ করছেন, আগে তাঁর কখনো এমন হয় নি।

তাঁর মনে হচ্ছিল যে তাঁর কান দুটি যদি এরকম ঘৃণ্য কথা শুনে শুনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, তাহলে শেষ পর্যন্ত হয় তো সে সব আর এত অসহ্য মনে হবে না। তিনি আরো বললেন তাঁদের দেশের ইয়াহুদের তিনি অবজ্ঞা করেন বটে, কিন্তু একটা 'গ্নাই' পাখিকে—অর্থাৎ শিকারী পাখিকে—তার নিষ্ঠুরতার জন্যে, কিম্বা একটা ধারালো পাথরকে তাঁর পা কেটে দেবার জন্যে তিনি যতখানি দোষী মনে করেন, এদের জঘন্য স্বভাবের জন্যে তার চেয়ে বেশি করেন না। কিন্তু যে জীব বিচারবুদ্ধি দাবী করে, সে যদি এই রকম মহাপাপ করতে পারে, তাহলে তাঁর এই আশঙ্কা হচ্ছে যে বিচারবুদ্ধির এমন বিকৃত রূপ পাশবিকতারও অধম। অতএব তাঁর নিশ্চিত মনে হচ্ছে বিচারবুদ্ধির বদলে আমাদের এমন একটা শক্তি আছে, যাতে স্বাভাবিক দোষগুলি আরও বেড়ে যায়। যেমন একটা তরঙ্গময় নদীতে বিকলাঙ্গ দেহের ছায়াটিকে শুধু আরও বড় নয়, আরও বেশি বিকৃত করে দেখা যায়।

তারপর আমার প্রভু বললেন আজকের এবং এর আগেকার আলোচনায় যুদ্ধের কথা বড় বেশি শোনা গেছে, এদিকে আরেকটা বিষয়ে তাঁর মনে একটু সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমি বলেছিলাম আমাদের নাবিকদের কেউ কেউ দেশত্যাগী হয়েছিল, কারণ আইনের হাতে তাদের সর্বনাশ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি এইটে ভেবে পাচ্ছেন না যে এ কি করে সম্ভব হয় যে মানুষকে রক্ষা করবার জন্যে যে আইনের সৃষ্টি হয়েছে, সেই আইন কারও সর্বনাশ ঘটাবে। কাজেই আইন এবং আইনের বিধায়ক বলতে আমি আমাদের দেশের বর্তমান ব্যবস্থায় কি বোঝাতে চাই, সেটুকু তাঁর জ্ঞাতব্য আছে। তাঁর তো ধারণা ছিল যে একটা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীবের পক্ষে—যেরকম জীব বলে আমরা নিজেদের পরিচয় দিই—কোনটি করণীয় আর কোনটি বা বর্জণীয় এ বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্য বিবেক ও বিচারবুদ্ধিই যথেষ্ট।

আমি তখন আমার প্রভুকে বুঝিয়ে বললাম যে আইন হল এমন একটা বিষয় যে ক্ষেত্রে আমার উপরে কোনো অন্যায় ব্যবহার হলে তার ব্যবস্থার জন্যে বৃথা উকীল লাগানো ছাড়া আমার আর কোনো চর্চাই নেই। তবে আমার পক্ষে যতটা সম্ভব তাঁর কৌতূহলকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করব।

তারপরে আরও বললাম যে আমাদের মধ্যে একটা গোষ্ঠি আছে যারা যৌবন থেকেই, কেমন করে কথার উপরে কথা চাপিয়ে সাদাকে কালো এবং কালোকে সাদা করতে হয়, যাকে যত টাকা দেওয়া যায় ঠিক সেই অনুপাতে, প্রমাণ করে দিতে শিক্ষা করে। দেশের বাকি অধিবাসীরা সকলেই এই গোষ্ঠির ক্রীতদাস। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আমার গোরুটার উপর যদি আমার প্রতিবেশীর নজর থাকে, সে গোরুটার যে আমার কাছ থেকে তার কাছেই যাওয়া উচিত একথা প্রমাণ করে দেবার জন্যে সে একজন উকীল ভাড়া করে। তখন নিজের মালিকানা রক্ষা করবার জন্যে আমাকেও একজন উকীল ভাড়া করতে হয়, কারণ কেউ যে তার নিজের পক্ষ অবলম্বন করে কিছু বলবে, এটা আইন-বিরুদ্ধ। এক্ষেত্রে গোরুর আসল মালিকের অর্থাৎ আমার দুটি বড় অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ, আমার উকীল প্রায় আঁতুড় থেকেই মিথ্যার পক্ষ অবলম্বন করতে অভ্যস্ত, কাজেই ন্যায়ের পক্ষ নিয়ে কিছু করতে হলে সে ঠিক জুৎ পায় না; সেরকম কর্তব্যে সে এতই অনভ্যস্ত যে সে অতি আনাড়ির মতো আচরণ করে, এমন কি প্রায় বিগ্‌ড়িয়েই যায়।

দ্বিতীয় অসুবিধা হল যে আমার উকীলকে ভারি সতর্ক হয়ে অগ্রসর হতে হয়, নইলে আইনের পদ্ধতির অমর্যাদা করছে বলে বিচারপতি তাকে তিরস্কার করেন, আর তার সমগোষ্ঠিরা তার প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। কাজেই আমার গোরুটিকে রক্ষা করার আমার দুটি পন্থা থাকে। প্রথমটি হল দ্বিগুন ভাড়া দিয়ে প্রতিপক্ষের উকীল ভাগিয়ে আনা, সে তখন আমিই ন্যায়ের পক্ষ নিয়েছি এটা প্রতিপন্ন করে নিজের মক্কেলকে ডুবিয়ে দেবে। দ্বিতীয় পন্থা হল, আমার উকীল আমার পক্ষটিকে যতটা সম্ভব অন্যায় বলে প্রতিপন্ন করবে। সে মেনে নেবে যে গোরুটির মালিক আমার প্রতিপক্ষ; এ কাজটি যদি খুব কৌশলে করা হয় তাহলেই বিচারপতির সুনজরে পড়া যাবে।

এখন আমার মান্যবর প্রভুকে বুঝে নিতে হবে যে সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ মীমাংসা করবার কিম্বা অপরাধীদের বিচারের জন্যেই এই বিচারপতিদের নিয়োগ করা হয়। যে সব ধূর্ত উকীল হয় বুড়ো নয় কুঁড়ে হয়ে গেছেন, তাঁদের মধ্যে থেকে এঁদের নির্বাচন করা হয়। সত্য এবং ন্যায়ের প্রতি এমন একটা অশ্রদ্ধা নিয়ে এঁরা জীবন কাটিয়েছেন যে বঞ্চনা, মিথ্যাসাক্ষী আর অত্যাচারকে সমর্থন করতে এঁরা মর্মান্তিকভাবে বাধ্য। এতই বাধ্য, যে

আমি কয়েকজনের কথা জানি যাঁরা ন্যায়পক্ষ থেকে অনেক টাকার ঘুষ নিতে বরং অস্বীকার করেছেন, তবু তাঁদের প্রকৃতি ও পদের পক্ষে অশোভন আচরণ করে গোষ্ঠিকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে রাজী হন নি।

এই উকীলদের একটা মন্ত্রই হল আগে যা একবার করা হয়ে গেছে, পরেও তা আইনতঃ আবার করা যেতে পারে। কাজেই সাধারণ ন্যায়বোধ আর মানুষের স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধির বিরুদ্ধে যত বার রায় দেওয়া হয়েছে, সব তাঁরা বিশেষ যত্ন সহকারে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। এগুলোকে তাঁরা 'নজির' বলেন এবং এগুলোর বিধান দেখিয়ে নিকৃষ্টতম মতামত সমর্থন করেন; বিচারপতিও তদনুযায়ী রায় দিয়ে থাকেন।

ওকালতি করবার সময়ে কোনো মামলার ন্যায়-অন্যায়ের দিকটা তাঁরা সযত্নে এড়িয়ে গিয়ে যত রাজ্যের অবান্তর ব্যাপার নিয়ে বেজায় উগ্র ও বিরক্তিকরভাবে চ্যাচামেচি করেন। যে মামলাটার কথা উল্লেখ করেছি, তাতে আমার গোরুটাকে প্রতিপক্ষ কোন অধিকারে দাবী করছে একথা উকীলরা জিজ্ঞাসা করবেন না; বরং জানতে চাইবেন গোরুটা লাল না কালো, তার সিং দুটি লম্বা না বেঁটে; যে মাঠে তাকে আমি চরাই সেটি গোল না চার কোণা, ঘরেই তাকে দোয়ানো হয়, না বাইবে; তার কি কি রোগ হয় ইত্যাদি। তারপর তাঁরা নজির দেখে, থেকে থেকে মামলার তারিখ পিছোন, তারপর দশ বিশ কি ত্রিশ বছর বাদে সিদ্ধান্তে আসেন।

এটাও লক্ষণীয় যে এই সম্প্রদায়ের নিজস্ব একটা অদ্ভুত বুলি বা অপভাষা আছে যেটা তাঁরা নিজেরা ছাড়া আর কোনো মানুষের বোঝার সাধ্য নেই; ওঁদের সমস্ত আইন এই ভাষাতেই লেখা; খুব যত্ন করে তার অসংখ্য ব্যাখ্যা করেন এঁরা, তার ফলে সত্যমিথ্যা ন্যায়অন্যায়ের সারমর্মটি পর্যন্ত এমন গুলিয়ে যায় যে আমার ছয় পুরুষের বাপঠাকুরদার কাছ থেকে যে খেতটি আমি পেয়েছি, সেটি আমার না তিনশো মাইল দূরের একজন অচেনা লোকের, সেটা স্থির করতেই ত্রিশ বছর লেগে যায়।

রাজশক্তির বিরুদ্ধে যারা অপরাধ করে, তাদের বিচার অনেক সংক্ষিপ্ত ও প্রশংসনীয়। বিচারপতি প্রথমেই যাঁদের হাতে ক্ষমতা তাঁদের মনোভাবটি জেনে নেন; তারপরে অতি সহজেই আইনের মুখটি সম্পূর্ণ রক্ষা করে তাকে ফাঁসিও দিতে পারেন, ছেড়েও দিতে পারেন।

এই জায়গায় আমার প্রভু বাধা দিয়ে বললেন, এটা বড়ই আপশোষের বিষয় যে এইসব উকীলের মতো প্রাণীদের, যাঁদের এমন অসাধারণ মানসিক শক্তি, অন্ততঃ আমার বর্ণনা শুনে মনে হয় নিশ্চয়ই তাই, তাঁদের এ কাজ না করে, অন্যদের বিদ্যা দান করবার কাজে কেন উৎসাহিত করা হয় না। তার উত্তরে আমি বললাম, মহাশয়, নিজেদের ব্যবসার ক্ষেত্রের বাইরে যাবতীয় বিষয়ে এঁদের মতো মূর্খ ও বোকা সচরাচর খুঁজে পাওয়া যায় না; সাধারণ কথাবার্তায় এঁরা একেবারে আহাম্মুক এবং প্রকাশ্যভাবেই জ্ঞানবিদ্যার বিরোধী। তাছাড়া নিজেদের ব্যবসার ক্ষেত্রেও যেমন, তেমনি সমস্ত আলোচ্য বিষয়ের ক্ষেত্রেও মানুষের সাধারণ বিচারবোধকে বিকৃত করে তোলাই এঁদের স্বভাব।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাণী অ্যানের শাসনাধীন ইংলণ্ডের অবস্থার আরো বিবৃতি—ইউরোপের রাজসভার প্রধান মন্ত্রীদের চরিত্র।

আমার প্রভু কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারছিলেন না যে শুধু কয়েকটা স্বজাতীয় জানোয়ারদের ক্ষতি করবার জন্যে এভাবে অন্যায় ষড়যন্ত্র করে নিজেদের হতবুদ্ধি, অস্থির ও ক্লান্ত করার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে। আর পারিশ্রমিক নিয়ে তারা একাজ করে বলতেই বা কি বোঝায়, তাও তাঁর বোধের বাইরে। তখন আমি অনেক কষ্টে তাঁকে অর্থের ব্যবহার বোঝাতে লাগলাম, কি পদার্থ দিয়ে টাকা তৈরী হয়, ধাতুর মূল্য কি, ইত্যাদি। আমি বললাম একজন ইয়াহু যখন এই মূল্যবান বস্তুর অনেকখানি জমিয়ে তুলতে পারে, তাই দিয়ে তার যা মন চায় তাই কিনতে পারে, সবচেয়ে মূল্যবান পোষাক, চমৎকার বাড়ি, বিশাল জমির খণ্ড, সবচেয়ে দামী পানভোজনের জিনিস, এমন কি সেরা সুন্দরীদের মধ্যে যাকে মনে ধরে তাকেও পেতে পারে। অতএব কেবলমাত্র টাকা দিয়েই যখন এতখানি সম্পন্ন করা যায়, আমাদের ইয়াহুদের মতে জমা করবার জন্যেই হক, কি খরচ করার জন্যেই হক, কারো হাতে টাকার কোনো পরিসীমা থাকতে পারে না, বিশেষতঃ মানুষে যখন দেখছে যে হয় অমিতাচার নয় অর্থলোভের দিকেই তাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। গরীবদের পরিশ্রমের সুফল ভোগ করে ধনীরা; যেখানে একজন ধনী সেখানে এক হাজার দরিদ্র; মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করতে দেবার উদ্দেশ্যে, আমাদের দেশের অধিবাসীদের বেশির ভাগ সামান্য বেতনে সারাদিন খেটে, বড় দুঃখে জীবন কাটাতে বাধ্য হয়। এইসব কথা ও এই ধরণের আরো বহু তথ্য আমি তাঁকে বিস্তারিতভাবে বললাম।

তবু আমার প্রভুর জিজ্ঞাসার শেষ হয় না। তাঁর ধারণা যে পৃথিবীতে উৎপন্ন সামগ্রীর অংশ ভোগ করবার অধিকার সব জানোয়ারেরই আছে, বিশেষতঃ যারা সংখ্যায় বেশি। কাজেই তিনি জানতে চাইলেন এইসব দামী খাবার কি জিনিস আর আমাদের মধ্যে কারো সেগুলো খাবার ইচ্ছাই বা হয়

কি করে। তখন আমিও যত রকম দামী খাবারের কথা মনে পড়ল সবগুলোর একটা ফর্দ করে দিলাম, সেগুলোকে কিভাবে প্রস্তুত করতে হয়, কেমন করে সমুদ্রপথে পৃথিবীর যাবতীয় বন্দরে জাহাজ পাঠিয়ে উপকরণগুলো না আনলে কিছুই করা যায় না, তাও বললাম। তাছাড়া নানারকম পানীয় ও আরক আচার ইত্যাদি এবং অসংখ্য অন্যান্য মুখরোচক সামগ্রীও আনতে হয়। বললাম যে আমাদের উচ্চশ্রেণীর একজন মহিলা ইয়াহুর প্রাতরাশের জোগাড়ই হয় না গোটা পৃথিবীকে তিনবার ঘুরে না এলে, নইলে প্রাতরাশের একটি বাটিও পূর্ণ হবে না।

প্রভু বললেন, এতো বড়ই লক্ষ্মীছাড়া দেশ যে নিজের অধিবাসীদের খাবার জোগাতে পারে না। তবে যাতে তিনি সব চেয়ে অবাক হচ্ছেন সেটা হল যে এ কি করে সম্ভব হয় যে যেসব বিশাল ভূমিখণ্ডের বর্ণনা দিলাম, সেখানে মোটেই বিশুদ্ধ জল পাওয়া যায় না, সমুদ্রের ওপার থেকে লোকদের পানীয় আনাতে হয়! উত্তরে আমি বললাম যে আমার প্রিয় জন্মভূমি ইংল্যাণ্ডের অধিবাসীরা যতখানি খাবার শেষ করতে পারে, হিসাব করে দেখা গেছে দেশে তার তিনগুণ খাবার উৎপন্ন হয়; তাছাড়া শস্য ও নানারকম গাছের ফল পিষে চমৎকার পানীয়ও প্রস্তুত হয়। কিন্তু দেশের পুরুষদের বিলাসিতা ও অমিতাচার আর মহিলাদের সৌখিনতার রসদ জোগাবার জন্যে আমাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বেশির ভাগই আমরা বিদেশে পাঠিয়ে দিই; তার বদলে সেখান থেকে আনাই নিজেদের জন্যে রোগ, মূঢ়তা আর পাপের উপকরণ! এর অবশ্যম্ভাবী ফল হল আমাদের দেশের হাজার হাজার লোক ভিক্ষা, চুরি, ডাকাতি, অসৎ ব্যবসা, ভণ্ডামি, খোসামুদি, ঘুষ দিয়ে লোক ভাঙ্গানি, জালিয়াতি, জুয়া, মিথ্যাচরণ, পাচেটোমি, দুর্বলের উপর অত্যাচার, ভোট বিক্রী, বাজে লেখা, তারা দেখা, বিষ খাওয়ানো, বেশ্যালয়ে যাওয়া, কপটতা, মানহানি, উচ্ছৃঙ্খল চিন্তা ইত্যাদি নানান ব্যবসা ধরতে বাধ্য হয়। প্রভুকে এই কথাগুলির প্রত্যেকটার মানে বোঝাতে আমার প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ!

অনেক কষ্টে তাঁকে বোঝালাম যে জল কিম্বা অন্যান্য পানীয়ের অভাব মেটাবার জন্যে বিদেশ থেকে মদ আমদানি করা হয় না, আনাবার একমাত্র কারণ হল যে মদ একরকম জলীয় বস্তু যা পান করলে আমাদের বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পায় ও খুব ফুর্তি লাগে; মদ পান করলে মনের দুঃখ দূর হয়ে যায়,

মস্তিষ্কে নানান উদ্ভট কল্পনার উদয় হয়, আশা বাড়ে, ভয়ভাবনা কেটে যায়। কিছুক্ষণের জন্যে বুদ্ধির সব ক্রিয়া স্থগিত থাকে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালাবার শক্তিও লোপ পায়, শেষ পর্যন্ত গভীর নিদ্রায় মগ্ন হই; অবিশ্যি ওদিক দিয়ে এও স্বীকার করতে হবে যে সে ঘুমটা ভাঙ্গলে বড়ই অসুস্থ ও বিমর্ষ বোধ করি এবং মদ্যপান অভ্যাস করলে নানান রোগ হয়, জীবন যন্ত্রণাময় ও সংক্ষিপ্ত হয়।

অবিশ্যি বড়লোকদের বাদ দিয়ে আমাদের দেশের অধিবাসীদের বেশির ভাগই বড়লোকদের ও পরস্পরের জীবন যাপনের নানান প্রয়োজনীয় ও আরামের সামগ্রী জুগিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আমি যখন নিজের বাড়িতে যথাযোগ্য কাপড়চোপড় পরে থাকি, তখন আমি নিজের গায়ে একশো কারিগরের হাতের কাজ বয়ে বেড়াই। আমার বাড়ি ও আসবাব তৈরী করতেও ঐ অতজন কর্মী লেগেছিল আর আমার স্ত্রীকে সাজাতে তার পাঁচগুণ।

আমি তাঁকে আরেকদল লোকের কথা বলতে যাচ্ছিলাম, যারা রুগীদের সেবা করে নিজেদের খরচ চালায়।

এর আগে অন্য প্রসঙ্গে তাঁকে যখন বলেছিলাম যে অসুখ করে আমার অনেক নাবিক মারা গিয়েছিল, তখন তাঁকে আমার কথার অর্থ বোঝাতে অত্যন্ত অসুবিধা হয়েছিল। এটা তিনি খুব সহজেই বুঝতেন যে মৃত্যুর ঠিক আগেকার কয়েকদিন একজন হুইন্‌ম্‌ দুর্বল বোধ করে, শরীর ভারী হয়ে আসে, কিম্বা হয়তো আকস্মিকভাবে কারো একটা অঙ্গ জখম হতে পারে, কিন্তু এটা তাঁর নিতান্তই অসম্ভব বলে মনে হচ্ছিল যে প্রকৃতির সব কাজ যখন একেবারে নিখুঁৎ, তিনি কি করে আমাদের শরীরে ব্যথা যন্ত্রণা জন্মাতে দেন! এ রকম যুক্তিহীন অমঙ্গলের কারণ তিনি জানতে চাইলেন।

আমি বললাম আমরা হাজার রকমের জিনিস খাই যেগুলি পরস্পর বিরোধী; খিদে না পেলেও ভোজন করি, বিনা তৃষ্ণাতেই পান করি, এককণা খাবার না খেয়ে শুধু মদ্যপান করেই সারা রাত জেগে কাটাই। এর ফলে আমাদের স্বভাব অলস ও শরীর গরম হয় এবং হয় বড় বেশি তাড়াতাড়ি সব হজম হয়ে যায়, নয়তো হজম একেবারেই হয় না।

আরো বললাম যে বেশ্যাবৃত্তি নিয়েছে যেসব মেয়ে ইয়াহু, তাদের একরকম রোগ হয়, তার ফলে তারা যাদের আলিঙ্গন করে, তাদের হাড়ে

পচন ধরে যায়। এই রোগ এবং আরো কয়েকটা রোগ বাপ থেকে ছেলে পায়, কাজেই নানারকম জটিল ব্যাধি শরীরে নিয়েই বহু মানুষ পৃথিবীতে জন্মায়। মানুষের দেহে কতরকমের রোগ হয় তার ফর্দ দিয়ে শেষ করা যাবে না, কারণ প্রত্যেকটি অঙ্গে, প্রত্যেকটি গাঁটে মিলে পাচ ছয় শোর কম রোগ হয় না। মোট কথা, শরীরের বাইরের আর ভিতরের প্রত্যেকটি জায়গার নিজস্ব বিশেষ বিশেষ রোগ আছে। এ সমস্ত রোগের চিকিৎসার জন্যে আমরা এক শ্রেণীর লোক তৈরী করে নিই, যাদের কাজ হল রোগ সারানো বা সারানোর ভান করা। যেহেতু এবিষয়ে আমার খানিকটা পারদর্শিতা আছে, আমার প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা বশে আমি তাঁর কাছে রোগ সারাবার রহস্য ও যে যে পদ্ধতি এইসব লোকেরা অবলম্বন করে সে সমস্ত বিবৃত করছি।

চিকিৎসকদের মূল ধারণা হল যে সব রোগের আদি কারণ হচ্ছে মাত্রাধিক্য। এর থেকে তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে শরীরটাকে ভালো করে খালাস করে দেওয়া দরকার, স্বাভাবিক পথেই হক, কিম্বা মুখ দিয়ে উঠিয়েই হক। এর পরের কাজটি হল নানান গাছগাছড়া, খনিজ দ্রব্য, গাছের আঠা, খোসা, লবন, আরক, সমুদ্রের ঘাস, বিষ্ঠা, গাছের ছাল, সাপ, কোলা ব্যাঙ, সাধারণ ব্যাঙ, মাকড়সা, মরা মানুষের মাংস ও হাড়, পাখি, জন্তু, মাছ, ইত্যাদি মিশিয়ে একটি পদার্থ তৈরী করা, যার স্বাদ ও গন্ধ ওদের সাধ্যানুযায়ী এমনি জঘন্য ও বিশ্রী যে গা গুলিয়ে ওঠে এবং সেটি খাওয়া মাত্র পাকস্থলী তাকে ঘৃণায় প্রত্যাহার করে। চিকিৎসকরা একেই বলেন বমন।

নয়তো ঐ একই ভাণ্ডার থেকে উপকরণ নিয়ে তার সঙ্গে আরো কতকগুলো বিষাক্ত জিনিস মিশিয়ে, আগেরটির মতোই জঘন্য ও আপত্তিকর একটি ওষুধ বানিয়ে, চিকিৎসক তাঁর মর্জি মতো বিধান দেন শরীরের উপরের বা নিচের ছিদ্র দিয়ে সেটিকে ভিতরে প্রবিষ্ট করাতে হবে। এর ফলে পেট নামিয়ে সব বেরিয়ে আসে। একে তাঁরা বলেন জোলাপ বা পিচকারি। এর কারণ হল যে চিকিৎসকদের মতে প্রকৃতির বিধানানুসারে উপর দিকের সামনে বসানো ছিদ্রটি অর্থাৎ মানুষের মুখটি হল স্থূল ও জলীয় পদার্থ প্রবেশের জন্যে আর নিচেকার পিছনের ছিদ্রটি হল বেরিয়ে যাবার জন্যে। এখন এই পণ্ডিতরা বুদ্ধি করে ব্যাখ্যা করেছেন যে রোগের সময় প্রকৃতি তাঁর নিজের আসন থেকে

বিতাড়িত হন, কাজেই তাঁকে সেখানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে শরীরটার স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীত ব্যবস্থা করতে হয়, অর্থাৎ ছিদ্র দুটির কাজ বদলে নিতে হয়, তলা দিয়ে স্থূল ও জলীয় পদার্থ প্রবেশ করাতে হয় আর মুখ দিয়ে বের করে নিতে হয়।

তার উপরে সত্যিকার রোগ ছাড়া আমরা অনেক কাল্পনিক রোগেও ভুগি ; তার জন্যে চিকিৎসকরা নানান কাল্পনিক ওষুধের ব্যবস্থাও করেন। এ রোগগুলিরও নানান নাম আছে, ওষুধগুলিরও তাই। এইসব রোগে সর্বদাই আমাদের মেয়ে ইয়াহুদের শরীর বোঝাই হয়ে থাকে।

এই শ্রেণীর লোকদের একটা বড় গুণ হল তাঁরা চমৎকার ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন, এ বিষয়ে তাঁদের ক্বচিৎ ভুল হয়। রোগ বাড়াবাড়ি হলে, সত্যিকার রোগের বেলা তাঁরা সাধারণত গুণে বলেন যে মৃত্যু অবধারিত ; রোগ সারানো তাঁদের হাতে না থাকলেও, এটি সর্বদাই তাঁদের সাধ্যের মধ্যে। তারপর তাঁরা একবার যদি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে মৃত্যু হবে, তারপরে অপ্রত্যাশিতভাবে রুগী সারবার লক্ষণ দর্শায়, তখন ভুল গণনার অপবাদ নেওয়ার চেয়ে তাঁরা বুদ্ধি করে সময় মতো একটু পাঁচন খাইয়ে পৃথিবীর সামনে নিজেদের অভ্রান্ত বুদ্ধির প্রমাণ দেন।

যেসব স্বামীস্ত্রীদের পরস্পরের প্রতি অরুচি ধরে গেছে, তাঁদের কিম্বা জ্যেষ্ঠ পুত্রদের বা রাজমন্ত্রীদের এবং প্রায়ই রাজকুমারদের এঁরা বিশেষ কাজে আসেন।

এর আগে প্রসঙ্গক্রমে মাঝে মাঝে আমার প্রভুর সঙ্গে সাধারণভাবে শাসন প্রণালী সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম, বিশেষ করে আমাদের দেশের উৎকৃষ্ট শাসনতন্ত্রের বিষয়ে, যা যোগ্যরূপেই সমস্ত পৃথিবীর বিস্ময় ও ঈর্ষার কারণ হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে অকস্মাৎ রাজমন্ত্রীর উল্লেখ করাতে, তিনি একটু পরেই আমাকে আদেশ করলেন তাই বলতে কোন জাতের ইয়াহু বোঝায় তাঁকে বলে দিতে।

আমি তাঁকে বললাম যে তাহলে একজন প্রথম বা প্রধান রাজমন্ত্রীর বিবরণী দিতে হয়। এই জীবটির চরিত্রে আনন্দ বা দুঃখ, স্নেহ বা ঘৃণা, দয়া বা ক্রোধ কোনোটাই নেই। অন্ততঃ অর্থ, ক্ষমতা ও উপাধি লাভের প্রবল বাসনা ছাড়া আর কোনরকম আবেগই তিনি কার্যতঃ প্রকাশ করেন না।

নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করবার জন্যে ছাড়া ভাষাকে তিনি অন্য সব রকম কাজেই লাগান। তিনি সত্যি কথা বলেন শুধু তখনি, যখন তাঁর অভিপ্রায় হল শ্রোতা সেই সত্যটিকে মিথ্যা মনে করবেন এবং মিথ্যাও বলেন শুধু তখনি, যখন শ্রোতা তাকে সত্য বলে গ্রহণ করবেন। পিছনে যাদের সবচেয়ে বেশি নিন্দা করবেন, কাজের বেলায় তাদের প্রতিই নিশ্চিৎ অনুগ্রহ দেখাবেন। তেমনি যেই তিনি অপরের কাছে কিম্বা আপনার সামনেই আপনার প্রশংসা করতে শুরু করবেন, সেই দিন থেকেই আপনার সর্বনাশের সূচনা। আপনার সব চাইতে দুর্ভাগ্য হল যদি তিনি আপনাকে কোনো কথা দেন, বিশেষ করে যদি সেই সঙ্গে শপথ নেন ; সেরকম হলে বুদ্ধিমান মাত্রেই সব আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে সরে পড়েন।

তিনটি উপায় আছে যা অবলম্বন করে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সম্মান লাভ করা যায়। প্রথমটি হল কি ভাবে স্ত্রী, কন্যা বা ভগ্নীর ব্যবস্থা করতে হয় সেইটে জেনে রাখা। দ্বিতীয় উপায় হল পূর্ববর্তী পদধারীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তা তলায় তলায় তাঁর ক্ষমতা নষ্ট করে। আর তৃতীয় উপায় হল জন-সভায় দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড উদ্যমের সঙ্গে রাজসভার নষ্টামির নিন্দা করা। যারা শেষোক্ত উপায়টি অবলম্বন করে বুদ্ধিমান রাজারা তাদেরই নির্বাচন করেন। কারণ কোনো বিষয় নিয়ে যারা এই রকম তেজ দেখাতে পারে, তারাই মুনিবের ইচ্ছা ও বাসনা সম্পর্কেও ঠিক সেইরকম আজ্ঞাবহ ভৃত্য হয়। এখন এইসব মন্ত্রীদের হাতেই দেশের যাবতীয় বড়বড় পদে লোক নিয়োগ করবার ক্ষমতা থাকে, কাজেই তারা যে কোন প্রতিনিধি বা মন্ত্রণা সভার সভ্যদের মধ্যে বেশির ভাগকেই ঘুষ দিয়ে কিনে রাখতে পারে। শেষ পর্যন্ত তারা ক্ষতিপূরণের আইন বলে একটা ভারি সুবিধাজনক উপায় অবলম্বন করেছে ; এই আইনটি আমার প্রভুকে ভালো করে বুঝিয়েও দিলাম। এইভাবে নিজেদের কাজের পরিণাম এড়িয়ে লুটের মালের ওজনে নুয়ে পড়ে, জনসাধারণের দৃষ্টি থেকে তারা বিদায় গ্রহণ করে।

এক একজন প্রধানমন্ত্রীর অট্টালিকা হল নিজেদের ব্যবসা শেখাবার এক একটি বিদ্যালয়। গোলাম নফর দ্বারপালরা সবাই মুনিবের নকল করে ; যে যার নিজের পাড়ায় এক একটি রাজমন্ত্রী বিশেষ, এবং ঔদ্ধত্য, মিথ্যা কথা ও ঘুষ প্রধানতঃ এই তিনটিকে অবলম্বন করে, যে যার ক্ষেত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ

করে। এর ফলে সবচেয়ে উচ্চশ্রেণীর লোকরাও এদের এই ছোট আদালতটিতে নজরানা দিয়ে যান। এমন কি মাঝে মাঝে স্রেফ চাতুরী ও আস্পর্ধার জোরে ধাপে ধাপে নিজেদের উন্নতি করে, শেষে একদিন এই গোলামরাই তাদের প্রভুর আসনের উত্তরাধিকারী হয়ে বসে!

প্রধানমন্ত্রীদের অনেক সময়ই একজন করে পোড়াকপালি মেয়েমানুষ চালিয়ে থাকে, কিম্বা একজন পেয়ারের নফর। এরাই হয়ে ওঠে প্রভুর অনুগ্রহ দানের মাধ্যম, এবং শেষ পর্যন্ত এদেরই দেশের রাজ্যপাল বলা চলে।

আমাদের দেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের কথা আমাকে উল্লেখ করতে শুনে আমার মুনিব এমন একটা বিষয়ে আমার তারিফ করলেন যার এতটুকু যোগ্যতা আমার নেই। তিনি বলেছিলেন আমি নিশ্চয়ই কোনো অভিজাত পরিবারে জন্মেছি, কারণ শরীরের গঠন, গায়ের রঙ ও পরিচ্ছন্নতায় আমি ওদের দেশের ইয়াহুদের চেয়ে শতগুণে শ্রেষ্ঠ। অবিশ্যি আমার গায়ের জোর ও ক্ষিপ্রতার কিঞ্চিৎ অভাব দেখা যায়, তবে তার কারণ সম্ভবতঃ আমার জীবনযাত্রার প্রণালী ঐ জন্তুগুলোর মতো নয়। তাছাড়া শুধু যে আমার কথা বলবার ক্ষমতা আছে তা নয়, তার সঙ্গে এতটা প্রাথমিক বুদ্ধিসুদ্ধিও আছে যে তাঁর বন্ধুবান্ধবরা আমাকে একটি অসাধারণ জীব বলে ধরে নিয়েছেন।

হুইন্‌ম্‌দের মধ্যেও একটা বৈশিষ্ট্যের প্রতি তিনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে দিলেন, সেটি হল যে সাদা, লালচে ও লোহা রঙের ঘোড়ারা, পাটকিলে, ফুটফুটে, ছাই রঙের কিম্বা কালো ঘোড়াদের মতো সুগঠিত হয় না। অতখানি মানসিক প্রতিভা এবং ঐ প্রতিভার উন্নতি করবার ক্ষমতা নিয়েও তারা জন্মায় না, কাজেই সর্বদা চাকর হয়েই জীবন কাটায়, কোনো দিনও স্ব-জাতিদের মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়ে নিজেদের উন্নতি করতে চায় না, আবার সেটি করলেও কিন্তু ওদের দেশে সকলেই কাজটাকে অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক বলে মনে করবে।

আমার সম্বন্ধে এতখানি উচ্চ ধারণা পোষণ করার জন্যে আমি বিনীতভাবে প্রভুকে কৃতজ্ঞতা জানালাম, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁকে এ কথাও বললাম যে আমার জন্ম হয়েছে সাধারণ ঘরে; আমার মা বাবা খুবই সাদাসিধা কিন্তু সৎলোক; মোটামুটিভাবে আমাকে শিক্ষা দেওয়ার বেশি কিছু করা তাঁদের সামর্থ্যে

কুলোয় নি। তাঁর যে রকম ধারণা হয়েছে, আসলে আমাদের দেশের অভিজাতসম্প্রদায় একেবারে অন্য প্রকারের। এসব বংশের যুবকরা ছোটবেলা থেকেই আলস্য ও বিলাসিতার মধ্যে লালিত হয় এবং একটু বয়স হলেই নিজেদের সমস্ত শক্তি তারা ক্ষয় করে ফেলে ও অসচ্চরিত্র মেয়েমানুষের সঙ্গে মিশে নানান জঘন্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। তার পরে নিজেদের সমস্ত পয়সাকড়ি যখন প্রায় শেষ হয়ে আসে, তখন শুধু টাকার লোভে তারা বিয়ে করে একজন হীনবংশীয়া কুৎসিৎ মেয়েকে, যার স্বাস্থ্য একেবারে নিখুঁৎ নয় আর যাকে তার স্বামী সর্বদা ঘৃণা ও বিদ্বেষের চোখে দেখে।

এইরকম বিবাহের ফলে যেসব সন্তানরা জন্মায়, তাদের হয় গলগণ্ড থাকে নয়তো রিকেটে ভোগে বা অন্য কোন বিকৃতি থাকে। এর ফলে বংশটি তিন পুরুষেই নির্মূল হয়ে যায়, যদি না স্ত্রীটি প্রতিবেশীদের বা অনুচরদের মধ্যে থেকে নিজের সন্তানদের জন্যে একটি স্বাস্থ্যবান পিতা খুঁজে নেন, যাতে বংশ সুস্থ ও সুরক্ষিত হয়। অভিজাত বংশের লক্ষণ হল দুর্বল রুগ্ন দেহ, শীর্ণ মুখ ও পাংশু রঙ। সম্ভ্রান্ত পরিবারের কোন ছেলের যদি সুস্থ ও বলিষ্ঠ চেহারা হয়, সকলেই ধরে নেয় যে ওর বাবা হয় একজন সহিস কিম্বা নিদেন গাড়োয়ান। অভিজাত বংশীয়দের মনের দোষগুলিও দেহের দোষের সঙ্গেই সমান তাল রেখে চলে, অর্থাৎ সেগুলি হল বদমেজাজ, মূঢ়তা, মূর্খতা, খামখেয়াল, লাম্পট্য ও অহঙ্কার।

এই মহামান্য গোষ্ঠির সম্মতি ছাড়া কোনো আইন তৈরী বা রদ বা পরিবর্তিত হতে পারে না। তাছাড়া এঁরাই আমাদের সম্পত্তি সংক্রান্ত সব প্রশ্নের মীমাংসা করেন এবং তাঁদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল করবারও আমাদের অধিকার নেই।

সপ্তম অধ্যায়

লেখকের গভীর স্বদেশপ্রেম—লেখকবিবৃত ইংল্যাণ্ডের শাসনপ্রণালী ও বিধান সম্পর্কে প্রভুর মন্তব্য—অন্যান্য দৃষ্টান্ত ও তুলনা সহ মানব প্রকৃতি সম্পর্কে প্রভুর মতামত।

পাঠক মহাশয় হয়তো ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছেন আমাদের সঙ্গে ইয়াহুদের এত সাদৃশ্য দেখে যে জাতের আমাদের সম্বন্ধে অতিশয় হীন ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক, তাদের কাছে কি করে স্বজাতিদের বিষয়ে এমন খোলাখুলিভাবে আলোচনা করতে আমি নিজেকে রাজী করালাম! তাহলে আমাকে খোলাখুলিভাবে এও স্বীকার করতে হয় যে এই উন্নত চতুষ্পদগুলির নানান গুণের সঙ্গে মানুষের বহুতর দোষের তুলনা করে দেখে, আমার চোখ এতদূর খুলে গেছে ও বোধশক্তি পরিব্যাপ্ত হয়েছে যে আজকাল আমি মানুষের ক্রিয়াকলাপ ও মনের ভাবাবেগ একেবারে অন্য চোখে দেখি এবং এও আমার মনে হয় যে আমার স্বজাতির সম্মান যে রক্ষা করব—সে যোগ্যতাও নেই। তাছাড়া আমার প্রভুর তীক্ষ্ণ বিচার বুদ্ধির কাছে রক্ষা করবার উপায়ও ছিল না, তিনি প্রতিদিন আমাকে আমার সহস্র দোষ সম্বন্ধে সচেতন করে দিতেন, যে সব দোষ আছে বলে আগে কখনো সন্দেহও করিনি আর যেগুলোকে আমাদের দেশে দোষ দুর্বলতার মধ্যে ধরাই হয় না। তাঁর দৃষ্টান্ত দেখে আমি আরো শিখেছিলাম মিথ্যা ও প্রবঞ্চনাকে ঘৃণা করতে। দিনে দিনে সত্য আমার কাছে এতই প্রিয় হয়ে উঠেছিল, যে তার জন্যে আমি সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলাম।

তাহলে পাঠক মহাশয়ের কাছে সরলভাবে বলেই ফেলি যে এসব ব্যাপারের এতটা অকপট বর্ণনা দেওয়ার আরো প্রবল একটা উদ্দেশ্য ছিল। এদেশে পুরোপুরি এক বছরও বাস করবার আগেই এখানকার অধিবাসীদের প্রতি আমার মনে এত শ্রদ্ধা ভালোবাসার উদ্রেক হয়েছিল যে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলাম আর মানব সমাজে ফিরব না; এই আদর্শস্থানীয় হুইন্‌মদের সঙ্গে যাবতীয় সদ্‌গুণের ধ্যান এবং অভ্যাস করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব। এখানে কোন পাপের দৃষ্টান্তও চোখে পড়বে না, পাপ করবার প্ররোচনাও

থাকবে না। কিন্তু আমার চিরশত্রু ভাগ্যদেবীর বিধানে এমন সুখ আমার কপালে লেখা ছিল না। তবে আজকাল এই কথা ভেবে সান্ত্বনা পাই যে এমন কড়া পরীক্ষকের সামনে আমরা স্বজাতিদের দোষের কথা যখন বলেছিলাম যথাসাধ্য কমিয়েই বলেছিলাম এবং প্রত্যেকটি বিষয়কে যথাসম্ভব প্রশংসনীয় করেই তুলেছিলাম। বাস্তবিকই এ জগতে কে এমন আছে যে তার জন্মস্থানের প্রতি পক্ষপাত ও প্রীতি দ্বারা অভিভূত হয় না?

আমার প্রভুর কাজে যতকাল নিয়োজিত থাকবার সম্মান লাভ করেছিলাম তার মধ্যে নানান সময়ে তাঁর সঙ্গে আমার যে সমস্ত আলোচনা হয়েছিল তার অধিকাংশেরই সারমর্ম বললাম, তবে সংক্ষেপ করবার উদ্দেশ্যে যা লিখেছি তার চেয়ে অনেক বেশি বাদ দিয়েছি।

যখন তাঁর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়ে গেল ও আমার মনে হচ্ছে তাঁর কৌতূহল এবার মিটেছে, তখন একদিন ভোরে তিনি আমাকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর থেকে সামান্য দূরে বসতে বললেন। এতখানি সম্মান এর আগে তিনি আমাকে কখনো দেখান নি। তারপর তিনি বললেন যে আমার নিজের বিষয়ে ও স্বদেশের প্রসঙ্গে আমার সমস্ত বিবৃতি তিনি মনে মনে খুব ভালো করে যাচিয়ে দেখেছেন। কেন এবং কোন আকস্মিক কারণে সেটি তার জানা নেই, কিন্তু তাঁর মতে আমরা হলাম একরকম জানোয়ার যাদের ভাগ্যে সামান্য একটুখানি বিচারবুদ্ধির অংশ জুটে গেছে। অবিশ্যি আমাদের স্বাভাবিক নষ্টামি বাড়িয়ে তোলা এবং যে সব দোষ প্রকৃতি আমাদের দেন নি সেগুলিকে আয়ত্ত করা ছাড়া এই বিচারবুদ্ধিকে আমরা আর কোনো কাজে লাগাই না। যে কটি ক্ষমতা তিনি আমাদের দিয়েছিলেন সে কটিকে ঝেড়ে ফেলে, আমাদের মূল প্রয়োজনগুলিকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলতে আমরা ওস্তাদ হয়ে উঠেছি এবং দেখে যতদূর মনে হয় নিজেদের উদ্ভাবন শক্তির সাহায্যে প্রয়োজনগুলি মেটাবার ব্যর্থ চেষ্টায় আমরা গোটা জীবন কাটিয়ে দিই। আর আমার কথাই যদি ধরা যায়, একটা সাধারণ ইয়াহুর শক্তি বা ক্ষিপ্রতা কোনোটাই আমার নেই, পিছনের পায়ে ভর দিয়ে টলমল করে হাঁটি, নিজের নখগুলো যাতে কোন প্রয়োজনে বা আত্মরক্ষার কাজে না আসে তার ব্যবস্থা করে রেখেছি, রোদ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে আশ্রয় দেবার জন্যে থুতনিতে যে কয়েকটা চুল গজায় সে-গুলোকেও চেঁছে ফেলে

দিই এবং শেষ কথা আমার এদেশের ইয়াহু-ভাইদের—এটা তাঁরই কথা—মতো না পারি ছুটতে না পারি গাছে চড়তে।

আমার প্রভুর বিশ্বাস যে শাসনতন্ত্র ও আইন নামক অনুষ্ঠান দুটির আদি কারণ হল আমাদের বিচারবুদ্ধির একান্ত অভাব; সদ্‌বুদ্ধিরও অভাব সে তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। একটা বুদ্ধিসম্পন্ন জীবকে চালাবার জন্যে বিচারবুদ্ধিই যথেষ্ট; আমার স্বদেশবাসীদের যে বিবৃতি নিজেই দিয়েছি তার থেকেও প্রমাণ হয় আমরা যে বুদ্ধিসম্পন্ন জীব এ দাবী টিকবে না। এ সবই তিনি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন, যদিও নিজের দেশবাসীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে আমি অনেক কথা চেপে গিয়েছি এবং অনেকবার 'যা নয় তাই' বলেছি।

তাঁর এই ধারণা আরো বদ্ধমূল হয়েছে কারণ তিনি লক্ষ্য করেছেন যে আমার দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গের সঙ্গে ইয়াহুদের মিল আছে, বাদে কয়েকটা বিষয়ে যেখানে আমি ওদের চেয়ে নিকৃষ্ট, যেমন গায়ের জোরে, দ্রুত ছোটায় বা ক্ষিপ্রতায়। তারপরে আমার নখও অনেক ছোট; আরো কয়েকটা তফাৎ আছে যার সঙ্গে প্রকৃতির কোন সম্বন্ধ নেই। ঠিক সেইরকম আমাদের জীবনযাত্রা, আচার ব্যবহার ও কীর্তিকলাপ সম্পর্কে তাঁকে যা বলেছি, তাই থেকে আমাদের মানসিক প্রবৃত্তিরও একটা সাদৃশ্য দেখা যাচ্ছে।

তিনি বললেন ইয়াহুদের নাকি অন্য সব রকম জানোয়ারের চেয়ে নিজেদের স্বজাতিদের উপর বেশি বিদ্বেষ; সবাই বলে এর কারণ ওদের কদাকার চেহারা। তারা অন্যদের চেহারা দেখতে পায় বটে, কিন্তু নিজেরটা তো আর দেখে না। কাজেই তিনি ভেবেছিলেন আমরা গা ঢাকা রেখে কিছু নির্বুদ্ধিতার কাজ করি না, এই উপায়ে আমরা পরস্পরের কাছ থেকে আমাদের দেহের বিকৃতিগুলোকে লুকিয়ে রাখতে পারি, নইলে একেবারে অসহ্য হয়ে উঠত। কিন্তু এখন তিনি বুঝতে পারছেন তাঁর এ ধারণা ভুল; আমাদের দেশের ঝগড়া বিবাদের যে সব কারণ দেখিয়েছি, ওদের দেশের এই জন্তুগুলোও সেই একই কারণে পরস্পরকে দেখতে পারে না। পাঁচটা ইয়াহুর সামনে যদি পঞ্চাশটার যোগ্য খাবার ফেলে দেওয়া যায়, তবু নিশ্চিন্ত হয়ে সেগুলি না খেয়ে ওরা কামড়াকামড়ি লাগাবে, প্রত্যেকে চেষ্টা করতে একাই সবটা গ্রাস করতে। সেই জন্য যারা বাইরে চরতে যায় তাদের সঙ্গে একটা করে চাকর রাখতে হয়

আর যারা ঘরের মধ্যে খায়, খাবার সময় তাদের পরস্পরের কাছ থেকে তফাৎ করে বেঁধে রাখতে হয়; বুড়ো হয়ে কিম্বা কোন দুর্ঘটনায় যদি একটা গোরু মরে, যার গোরু সেই হুইন্‌ম্‌ তাকে নিজের ইয়াহুদের জন্যে ঘরে নিয়ে যাবার আগেই পাড়ার যত ইয়াহু, সব পালে পালে এসে গোরু নিয়ে টানাটানি লাগায়। তারপরে আমি যেরকম বর্ণনা দিয়েছি সেইরকম একটা লড়াই বেধে যায়। উভয় পক্ষ পরস্পরকে নখ দিয়ে সাংঘাতিকভাবে জখম করে, অবিশ্যি পরস্পরকে মেরে ফেলতে ওরা বড় একটা পারে না, কারণ আমরা যেসব সুবিধাজনক মারণাস্ত্র উদ্ভাবন করেছি, সেসব তো আর ওদের নেই।

অন্য সময় দেখা গেছে ভিন্ন ভিন্ন পাড়ার ইয়াহুদের মধ্যেও ঐরকম সাংঘাতিক লড়াই বেধে গেছে, অথচ তার কোনো কারণ দেখা যাচ্ছে না। এক পাড়ার ইয়াহুরা করে কি, অন্য পাড়ার ইয়াহুরা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হবার আগেই তাদের অসতর্কে আক্রমণ করবার সুযোগ খুঁজে বেড়ায়। তারপরে যদি দেখে মতলবটা হাসিল হল না, তখন বাড়ি ফিরে গিয়ে শত্রু অভাবে নিজেদের মধ্যেই গৃহযুদ্ধ লাগিয়ে দেয়!

এদেশের কোনো কোনো মাঠে নানা রঙের চকচকে নুড়ি পাওয়া যায়, ইয়াহুদের সেগুলি ভারি পছন্দ। মাঝে মাঝে এমন হয় যে নুড়িগুলির খানিকটা হয়তো মাটির মধ্যে শক্ত করে গাঁথা, তখন তারা কি দিনের পর দিন নখ দিয়ে খুঁড়তে থাকে নুড়ি বের করার জন্যে। তারপরে সেগুলোকে বয়ে নিয়ে গিয়ে নিজেদের খুপরির মধ্যে ঢিপি করে লুকিয়ে রাখে। এবং পাছে সঙ্গীরা কেউ লুকোনো ধন দেখে ফেলে তাই সারাক্ষণ অতিশয় সতর্ক থাকে।

আমার প্রভু বললেন এই অস্বাভাবিক আকর্ষণের কোনো কারণ তিনি আবিষ্কার করতে পারেন নি এবং এইসব নুড়িগুলো ইয়াহুদের কোন কাজে আসতে পারে তাও ভেবে পান নি, তবে এখন মনে হচ্ছে হয়তো মানুষদের যে ধনলিপ্সার কথা বললাম, এর মূলেও তাই। একবার নাকি পরীক্ষা করবার জন্যে তিনি নিজেই তাঁর ইয়াহুদের একজন যেখানে পাথর পুঁতে রেখেছিল, সেখান থেকে পাথরগুলোকে গোপনে সরিয়েছিলেন। তারপর লোভী জানোয়ারটা তার নুড়ি খুঁজে না পেয়ে এমনি ক্যাঁওম্যাও লাগাল যে পাল সুদ্ধ সবকটা ইয়াহু সেখানে এসে হাজির! প্রথম ইয়াহুটা মহা চ্যাঁচামেচি করতে করতে বাকি কটাকে আঁচড়ে কামড়ে একাকার করতে লাগল।

তারপরে ইয়াহুটা একেবারে শুকিয়ে যেতে লাগল, খায় না, ঘুমোয় না, কাজ করে না। তখন তিনি একটা চাকরকে বললেন নুড়িগুলোকে আবার সেই গর্তটাতে রেখে আসতে। ইয়াহুটাও যেই তার নুড়ি ফিরে পেল, আবার তার উৎসাহ আর ফূর্তিও ফিরে এল। তবে নুড়িগুলোকে নিয়ে এবার সে যত্ন করে আরো ভালো জায়গায় লুকিয়ে রাখল এবং সেই অবধি এই ইয়াহুটা ভারি কাজের হয়ে উঠেছে।

এছাড়া একটা কথা আমার প্রভুও বললেন আর আমি নিজেও লক্ষ্য করলাম। যেসব মাঠে এই চকচকে নুড়িগুলো সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়, সেখানেই সবচেয়ে বেশি ও সবচেয়ে হিংস্রভাবে মারামারিও লাগে, তার কারণ হচ্ছে আশেপাশের ইয়াহুরা ক্রমাগত সেইখানে হানা দেয়।

প্রভু বললেন, প্রায়ই এমন হয় যে দুজন ইয়াহু একটা মাঠে একটা নুড়ি খুঁজে পেল, অমনি কে নুড়ি নেবে তাই নিয়ে ঝগড়া বেধে গেল; সেই ফাঁকে তৃতীয় একটা ইয়াহু এসে নুড়ি নিয়ে দুজনের কাছ থেকে কেটে পড়ল! আমার প্রভু জোর করে বলতে লাগলেন আমাদের দেশের মামলার সঙ্গে নাকি এ ব্যাপারের সাদৃশ্য আছে। আমার মনে হল তাঁর ভুলটা না ভাঙলেই আমাদের পক্ষে মঙ্গল, কারণ তিনি যে মীমাংসার কথা বললেন, সেটি আমাদের ডিক্রির চেয়ে ঢের বেশি ন্যায়সঙ্গত। ইয়াহুদের বেলায় বাদী ফরিয়াদীর পাথর হারানো ছাড়া আর কোনো ক্ষতি হয় না, কিন্তু আমাদের ন্যায়বিধানের বিচারালয়গুলো দুজনকে সর্বস্বান্ত না করে কখনো মামলার নিষ্পত্তি করে না।

আমার প্রভু আরো মতামত প্রকাশ করেছিলেন; ইয়াহুদের সবচেয়ে জঘন্য অভ্যাস হল কোনরকম বাছাবাছি না করে হাতের কাছে যা পাবে তাই গিলে বসে থাকবে, সে শাক হক, কিম্বা শিকড় বা দানা বা কোন মরা জন্তুর পচা মাংস কিম্বা এইসব একসঙ্গে মিশিয়ে। আর এও ওদের একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য যে দূর থেকে কেড়ে বা চুরি করে আনা জিনিস নিজেদের ঘরের অনেক ভালো খাবারের চেয়ে বেশি ভালো লাগে। লুটের মাল যদি না ফুরোয় তো খেয়ে খেয়ে প্রায় পেট ফাটার জোগাড় করে, তারপর কি একটা শিকড় খেয়ে আবার শরীরটাকে সব দিক দিয়ে হাল্কা করে নেয়।

আরেক রকম ভারি রসালো শিকড় আছে, সেগুলো বড একটা পাওয়া

যায় না, অনেক কষ্টে খুঁজে আনতে হয় ; এই শিকড়ের জন্যে ইয়াহুরা কোমর বেঁধে লড়াই করে আর পেলে মহা আনন্দে চুষে খায়। আমাদের উপর মদের যে প্রতিক্রিয়া, এদের উপর সেই শিকড়েরও তাই। খেয়ে কখনো তারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করে, কখনো কামড়াকামড়ি করে, কখনো চ্যাঁচায়, হাসে, বাজে বকে, মাটিতে গড়ায়, আছাড় খায়, শেষে কাদার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে।

আমি এটাও লক্ষ্য করেছিলাম যে এদেশের সব জানোয়ারদের মধ্যে একমাত্র ইয়াহুগুলোরই অসুখবিসুখ করে। তবে আমাদের ঘোড়াগুলো যত রোগে ভোগে, এরা অবিশ্যি অতটা ভোগে না এবং এদের রোগের কারণ মালিকের দুর্ব্যবহারে নয় ; যেরকম হীন পশু এরা, এদের রোগের কারণ হল নিজেদের নোংরামি আর লোভ।

হুইন্‌ম্‌ ভাষাতে ঐ সমস্ত রোগ বোঝাতে একটা সাধারণ নাম ছাড়া আর বিশেষ উল্লেখ নেই। নামকরণটি হয়েছে ইয়াহুদের নাম থেকেই 'হ্নিয়া ইয়াহু' বা ইয়াহুদের দুর্ভোগ। আর তার চিকিৎসা হল ওদেরি মলমূত্র একসঙ্গে মিশিয়ে জোর করে ওদের গলা দিয়ে নামিয়ে দেওয়া। পরে দেখলাম বাস্তবিকই এই চিকিৎসা উত্তম ফল দেয় এবং আমার দেশবাসীদের জন্যেও এই ওষুধটি আমি জনসাধারণের মঙ্গলার্থে মুক্তকণ্ঠে অনুমোদন করছি। অতিরিক্ত খাওয়ার ফলে যত রকম রোগ হয় তার জন্যে এর চেয়ে ভালো ওষুধ আর হতে পারে না।

তবে বিদ্যাশিক্ষা, রাজ্যশাসন, শিল্প ও কারিগরি বিদ্যা ইত্যাদির কথা যদি ধরা যায়, আমার প্রভুও স্বীকার করলেন যে সেক্ষেত্রে ওঁদের দেশের ইয়াহুদের সঙ্গে আমাদের ইয়াহুদের সামান্যই সাদৃশ্য, এমন কি হয়তো কোনো সাদৃশ্যই নেই। তবে কোথায় কোথায় সাদৃশ্য আছে, সেটুকু লক্ষ্য করাই তাঁর উদ্দেশ্য। কোনো কোনো কৌতূহলী হুইন্‌মের কাছে তিনি শুনেছেন যে অধিকাংশ ইয়াহুর পালে একজন করে পাণ্ডা থাকে, আমাদের দেশের পার্কের হরিণদের যেমন একটি করে পালের গোদা থাকে। এই মোড়লটির শরীর অন্যদের চেয়ে সর্বদাই বেশি কদাকার আর স্বভাব সবচেয়ে মন্দ। মোড়লদের সাধারণতঃ একজন করে প্রিয়পাত্র থাকে, যতটা সম্ভব ঠিক তাদের নিজেদেরই মতো : তার কাজ হল প্রভুর পা ও পশ্চাৎ চাটা এবং মেয়ে ইয়াহুগুলোকে তার

খুপরিতে তাড়িয়ে আনা। এর জন্যে মাঝে মাঝে তাকে এক টুকরো গাধার মাংস পুরস্কার দেওয়া হয়। এই প্রিয়পাত্রটিকে পালের আর সবাই দুচক্ষে দেখতে পারে না, কাজেই আত্মরক্ষার্থে তাকে সর্বদা প্রভুর কাছাকাছি থাকতে হয়।

এই জীবটির চাকরি থাকে যতদিন না তার চেয়েও মন্দ কাউকে পাওয়া যায় আর যেই না তাকে বরখাস্ত করে দেওয়া হয়, অমনি তার উত্তরাধিকারী ঐ অঞ্চলে যত ইয়াহু আছে সব কটাকে সঙ্গে নিয়ে তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বাঙ্গে মলমূত্র ত্যাগ করে যায়! তবে আমার প্রভু এও বললেন যে আমাদের রাজসভা, রাজমন্ত্রী ও প্রিয়পাত্রদের ক্ষেত্রে একথা কতখানি প্রযোজ্য সেটা আমিই ভালো বুঝব!

এই বিষময় ইঙ্গিতটির কোনো উত্তর দেবার আমার সাহস হল না। আমার প্রভু মানুষের বিচারবুদ্ধিকে একটা সাধারণ কুকুরের বুদ্ধির চেয়েও হীন পদ দিলেন, কারণ কুকুরদের এত বুদ্ধি যে সর্বদা তারা পালের মধ্যে সবচেয়ে জোরালো কুকুরকে বেছে নিয়ে তার অধীনতা স্বীকার করে এবং এ বিষয়ে তাদের কখনো ভুল হয় না।

আমার প্রভু আরো বললেন যে ইয়াহুদের মধ্যে আরো কয়েকটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়, যার কথা আমার বর্ণনাতে আমি উল্লেখই করিনি কিম্বা খুব সামান্যই বলেছি। অন্যান্য জানোয়ারদের মতো, ইয়াহুদেরও স্ত্রীদের উপরে সকলের সমান দাবী থাকে, কিন্তু এইখানে তফাৎ যে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থাতেও স্ত্রীরা পুরুষদের গ্রহণ করে আর পুরুষরা নিজেদের মধ্যেও যেমন ঝগড়াঝাটি করে, স্ত্রীদের সঙ্গেও তেমনি করে। যে কোনো বুদ্ধি-সম্পন্ন জীবের কাছেই এই দুটি অভ্যাস জঘন্য পাশবিকতা বলে গণ্য হয়।

ইয়াহুদের মধ্যে আরেকটি জিনিস দেখেও তাঁর বিস্ময়ের সীমা থাকে না, সেটি হল কদর্যতা ও নোংরামির প্রতি ওদের অদ্ভুত আসক্তি। অথচ অন্য সব জানোয়ারের মধ্যেই একটা স্বাভাবিক পরিচ্ছন্নতাবোধ দেখা যায়। যদিও প্রথম দুটি অভিযোগের উপযুক্ত সদুত্তর দিতে আমার খুব ইচ্ছা করছিল, তবুও কিছু না বলেই ছেড়ে দিলাম, কারণ এ ক্ষেত্রে মানুষদের পক্ষ অবলম্বন করে আমার বলবার কিছু ছিল না। তবে ওদেশে যদি শুওর থাকত, তাহলে শেষের অভিযোগটি যে একমাত্র মানুষের প্রতি প্রযোজ্য নয় সেটা প্রমাণ করে

মানুষদের সম্মান রক্ষা করতে পারতাম ; কিন্তু দুঃখের বিষয় একটিও শুওর ছিল না। এখন শুওররা ইয়াহুদের চেয়ে আস্বাদে মিষ্টি হতে পারে কিন্তু তারা যে তাদের চেয়ে পরিষ্কার, ন্যায়তঃ তো আর এ কথা বলা যায় না। যদি আমার প্রভু একবার দেখতে পেতেন কি জঘন্য নোংরাভাবে ওরা খায় আর কি রকম করে কাদায় গড়ায় আর ঘুম লাগায়, তাহলে তিনিও নিশ্চয়ই আমার কথা মেনে নিতেন।

আমার প্রভু ইয়াহুদের আরেকটি বিশেষত্বের কথাও বললেন, যেটি অনেক ইয়াহুর মধ্যেই ওঁর চাকররা লক্ষ্য করেছে, এরও কোনো কারণ উনি খুঁজে পাননি। মাঝে মাঝে নাকি একেকটা ইয়াহুর কি খেয়াল হয়, এক কোণে গিয়ে শুয়ে, চ্যাঁচায়, গোঙায়, কেউ কাছে গেলে তাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়! অথচ এই ইয়াহুগুলোর বয়স কম, দিব্যি মোটা সোটা চেহারা, খাবারের বা জলের অভাব নেই ; ওর যে কি কষ্ট হতে পারে চাকররা ভেবে তার হদিস পায় না। তাদের অভিজ্ঞতায় এ রোগের একমাত্র ওষুধ হল, ইয়াহুটাকে খুব খাটানো, তারপরেই সর্বদা দেখা যায় যে সে সুস্থ হয়ে উঠেছে, এর কোনো ব্যতিক্রম হয় না। আমার স্বজাতিদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব বশতঃ এ কথা শুনেও আমি চুপ করে রইলাম। তবে নিজে আমি স্পষ্টই বুঝলাম যে এই হল বদ্‌মেজাজের ব্যামো, কেবলমাত্র কুঁড়েদের, বিলাসীদের আর ধনীদের এ রোগ হয়। আর যদি এই একই ওষুধ নিতে তাদেরও বাধ্য করা যেত, আমি নিশ্চয় বলতে পারি আমি সব কটাকে সারিয়ে তুলতে পারতাম।

আমার প্রভু এও লক্ষ্য করেছিলেন যে স্ত্রী-ইয়াহুরা অনেক সময় একটা ঢিপি কিম্বা ঝোপের পিছনে দাঁড়িয়ে অল্পবয়সী পুরুষরা পাশ দিয়ে গেলে তাকিয়ে দেখে, তারপর নিজে দেখা দিয়েই আবার অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি মুখভঙ্গি করে লুকিয়ে পড়ে। এও দেখা গেছে যে এসময়ে তাদের গা থেকে খুব দুর্গন্ধ বেরোয়। পুরুষদের কেউ এগিয়ে এলে, স্ত্রী-ইয়াহুটা আস্তে আস্তে সরে যায়, বারে বারে ফিরে তাকায়, ভাব দেখায় যেন কতই না ভয় পাচ্ছে, তারপর এমন একটা সুবিধা মতো জায়গায় ছুটে পালায়, যেখানে পুরুষটাও যে তার পিছন পিছন গিয়ে উপস্থিত হবে, এটা সে ঠিক জানে।

অন্য সময় দেখা গেছে একটা অচেনা স্ত্রী-ইয়াহু যদি এদের মধ্যে এসে পড়ে, অমনি এখানকার তিন চারজন স্ত্রী-ইয়াহু তাকে ঘিরে দাঁড়ায়, তাকিয়ে

থাকে, কিচিরমিচির করে, দাঁত বের করে হাসে, তার সর্বাঙ্গ দেখে, তারপর এমন ভাব দেখিয়ে সরে যায়, যেন কতই না ঘৃণা আর অবহেলা দেখানো হচ্ছে !

নিজে যা লক্ষ্য করেছেন কিম্বা অন্য লোকের কাছ থেকে শোনা এই সব কথা হয়তো আমার প্রভু খানিকটা বাড়িয়েই বলেছিলেন, তবুও বেশ খানিকটা বিস্ময় ও অনেকখানি দুঃখের সঙ্গে এ কথা না মেনে পারলাম না যে লাম্পট্য, পুরুষকে লুব্ধ করবার চেষ্টা, অপরের খুঁৎ ধরা আর পরচর্চা স্ত্রীজাতির স্বভাবগত।

প্রতি মুহূর্তেই আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে এই বুঝি আমাদের দেশে যে সব অস্বাভাবিক কামের দৃষ্টান্ত স্ত্রীপুরুষ উভয়ের মধ্যেই দেখা যায়, ইয়াহুদের বিরুদ্ধেও প্রভু সেই অভিযোগ এনে বসেন। তবে মনে হল প্রকৃতিদেবী অত ভালো গুরুগিরি করে উঠতে পারেন নি ; তাই এইসব সুসভ্য আমোদ-প্রমোদ নিতান্তই আমাদের ওদিককার শিল্পসৃষ্টি !

অষ্টম অধ্যায়

লেখকদ্বারা ইয়াহুদিগের কতিপয় বৈশিষ্ট্যের বিবৃতি—হুইনম্‌দিগের অধিকতর গুণশালিতা—হুইনম্‌ তরুণদিগের শিক্ষা ও অভ্যাস বিষয়ক—উহাদের সাধারণ সভা।

আমার মনে হত আমার প্রভুর পক্ষে মানবচরিত্র বোঝা যতখানি সম্ভব, আমি নিজে তার চেয়ে ভালো করে বুঝি। কাজেই তিনি ইয়াহুচরিত্র যেভাবে এঁকেছিলেন, তার সঙ্গে নিজের ও আমার স্বজাতিদের তুলনা করা আমার পক্ষে খুবই সহজ কাজ। আমার এও মনে হয়েছিল যে নিজে যা লক্ষ্য করেছি তার মধ্যে থেকেও আরো অনেক তথ্য আবিষ্কার করা যায়। কাজেই প্রায়ই আমি আশেপাশের ইয়াহুদের পালের মধ্যে যাবার অনুমতি চাইতাম। এতে তিনি সর্বদাই প্রসন্নচিত্তে সম্মতি দিতেন, কারণ তিনি নিশ্চিত জানতেন যে ইয়াহুদের আমি যেরকম ঘৃণা করি, আমার উপর ওদের মন্দ প্রভাব কখনোই বিস্তারিত হবে না। আমার প্রভু তাঁর ভৃত্যদের মধ্যে থেকে একটি বলিষ্ঠ লালচে ঘোড়াকে আমার রক্ষী হয়ে যেতে বলে দিলেন, এ ঘোড়াটির স্বভাব যেমন সাধু তেমনি অমায়িক। রক্ষী হিসাবে ও সঙ্গে না থাকলে ওসব জায়গায় যাবার আমার সাহসেই কুলোত না। পাঠকমহাশয়কে তো আগেই বলেছি, আমি প্রথম যখন এসেছিলাম এই জঘন্য জানোয়ারগুলো আমাকে কি জ্বালাতনটাই না করেছিল। তারপরেও দুতিনবার তলোয়ার না নিয়ে একটু বেশি দূরে গিয়ে পড়ে, কায়ক্লেশে ওদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি।

আমার বিশ্বাস ওরা সন্দেহ করে যে আমি ওদের স্বজাতি; মাঝে মাঝে সঙ্গে যখন রক্ষক রয়েছে তখন জামার হাত গুটিয়ে, খালি হাত ও বুক ওদের সামনে প্রকাশ করে হয়তো এ ধারণাটি আমিই করে দিয়েছি। এরকম সময় ওদের সাহসে যতখানি কুলোয়, ততটা কাছে এসে ওরা আমার অঙ্গভঙ্গি নকল করত, ঠিক যেমন বাঁদররা করে। তবে সেই সঙ্গে সর্বদা একটা বিদ্বেষের ভাবও থাকত, মোজা টুপি পরা পোষা দাঁড়কাক যদি কতকগুলো বুনো কাকের মাঝখানে পড়ে, তারা যেমন তাকে নাস্তানাবুদ করে, এও যেন ঠিক তাই।

বাচ্চা অবস্থা থেকেই চলাফেরায় এরা আশ্চর্য রকম চটপটে হয়। একবার

একটা তিন বছর বয়সের পুরুষ ইয়াহু ধরে, নানান ভাবে আদর করে তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সে লক্ষ্মীছাড়া চেঁচিয়েমেচিয়ে এমনি সাংঘাতিকভাবে আঁচড়াতে কামড়াতে লাগল যে তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম। আর সময় মতোই ছেড়েওছিলাম, কারণ শব্দ শুনে এক পাল ধাড়ি ইয়াহু আমাদের ঘিরে ফেলেছিল। তবে যখন তারা দেখল ছানাটার কোনো অনিষ্ট হয়নি, তাছাড়া লালচে ঘোড়া সঙ্গে রয়েছে, তখন আর বেশি কাছে আসতে সাহস পেল না।

আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে বাচ্চাটার গায়ে বেজায় দুর্গন্ধ, বেজি আর শেয়ালের গন্ধের মাঝামাঝি, কিন্তু তার চেয়েও অনেক বিশ্রী। আরেকটা কথা বলতে ভুলে গেছিলাম, তবে সেটি বাদ দিলেও পাঠকমহাশয় কিছু মনে করতেন না। জঘন্য বাচ্চাটাকে যখন হাতে করে তুলেছিলাম সে আমার কাপড়চোপড়ের উপরে হলুদ রঙের জল জল ময়লাটয়লা করে একাকার! সৌভাগ্যবশতঃ কাছেই একটা ছোট নদী ছিল, আমি সেখানে গিয়ে যথাসম্ভব ধুয়ে পরিষ্কার হলাম, অবিশ্যি গায়ে যথেষ্ট হাওয়া লাগিয়ে গন্ধ দূর না করে প্রভুর সামনে যেতে সাহস করিনি।

দেখে যতটা বুঝলাম, যত রকম জানোয়ার আছে তার মধ্যে ইয়াহুদেরই কিছু শিখবার ক্ষমতা সব চেয়ে কম। বোঝা টানা বা ভার বয়ে নিয়ে যাওয়ার বেশি কিছু ওদের দিয়ে হয় না। তবু আমার ধারণা যে এই অক্ষমতার একমাত্র কারণ হল ওদের ঢ্যাঁটামি আর চঞ্চলতা। ভারি ধূর্ত হয় ওরা, অপরের অনিষ্ট করতে ওস্তাদ, তার উপরে বিশ্বাসঘাতক ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। গায়ে জোর আছে, কষ্টও সইতে পারে, কিন্তু বড্ড ভীতু, কাজেই বেয়াড়া, নীচ, আর নিষ্ঠুর। এটাও লক্ষণীয় যে পুরুষ কিম্বা স্ত্রীদের যাদেরই মাথার চুল লাল রঙের, তারা সবাই ভারি কামুক স্বভাবের হয় আর বড় বদমাইস, যদিও শরীরের শক্তি আর কর্মক্ষমতা বেশি।

হুইন্‌ম্‌রা তাদের কাজের সুবিধার জন্যে নিজেদের বাড়ির কাছেই কুঁড়েঘরে কয়েকটা ইয়াহু রাখে। বাকিদের দূরে বিশেষ বিশেষ মাঠে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে তারা মাটি খুঁড়ে শিকড় বের করে খায়, নানারকম শাকপাতা খায়, মরা জানোয়ার খোঁজে, কিম্বা বেজি বা 'লুহিমু' বলে এক ধরণের জংলি ইঁদুর ধরে মহা আগ্রহের সঙ্গে খায়। জমির ঢালুর উপরে নখ দিয়ে আঁচড়িয়ে গত

খুঁড়তে প্রকৃতিই তাদের শিখিয়ে দিয়েছে, এইসব গর্তে তারা একলা একলা শুয়ে থাকে। স্ত্রী-ইয়াহুদের থাকবার খুপরিগুলো আরো বড়, যাতে দু তিনটি বাচ্চা নিয়ে শুতে পারে।

শৈশব থেকেই ইয়াহুরা ব্যাঙের মতো সাঁতরাতে আর অনেকক্ষণ ধরে জলের নিচে থাকতে পারে, সেখানে তারা মাছ ধরে আর স্ত্রী-ইয়াহুরা সেই মাছ বাচ্চাদের জন্যে বাসায় নিয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে, পাঠকমহাশয়ের ক্ষমা ভিক্ষা করে, একটি অদ্ভুত গল্প বলব।

একদিন আমার রক্ষী সেই লালচে ঘোড়ার সঙ্গে বেরিয়েছি, বেজায় গরম পড়েছে, তাই কাছের একটা নদীতে স্নান করবার অনুমতি চাইলাম। সেও যেই মত দিল অমনি আমি সমস্ত কাপড়চোপড় খুলে ফেলে আস্তে আস্তে নদীতে গিয়ে নামলাম। এখন হয়েছে কি এক তরুণী ইয়াহু একটা ঢিপির আড়াল থেকে সব দেখেছিল; লালচে ঘোড়ার ও আমার ধারণা তাই দেখেই কামাসক্ত হয়ে প্রবল বেগে ছুটে এসে, আমি যেখানে স্নান করছি তার পাচ গজের মধ্যে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। জীবনে কখনো আমি এত ভয় পাই নি; ঘোড়াটা কোনো বিপদের আশঙ্কা না করে কিছু দূরে ঘাস খাচ্ছিল। ইয়াহুটা যে কি জঘন্যভাবে আমাকে আলিঙ্গন করল সে আর কহতব্য নয়। আমি তো যত জোরে পারি চিৎকার করতে লাগলাম; অমনি ঘোড়া দৌড়ে এল আর ইয়াহুটা ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে ছেড়ে দিয়ে, এক লাফে অন্য পাড়ে গিয়ে উঠল। যতক্ষণ আমি কাপড়চোপড় পরছি সে দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে দেখতে আর সমানে চ্যাচাতে লাগল।

এই ব্যাপারে আমি যতখানি ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম, আমার প্রভু ও তার পরিবারবর্গ ততখানি আমোদ পেয়েছিলেন। এখন আর আমার অস্বীকার করার কোনো উপায় রহল না যে আমি একটা সত্যিকার ইয়াহু, যেহেতু স্বজাতি বলে চিনে স্ত্রী-ইয়াহুগুলোও স্বাভাবিকভাবে আমার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে! এই জন্তুটার চুলের রঙ লাল ছিল না—তাই যদি থাকত তাহলে খানিকটা অস্বাভাবিক লালসা হওয়াটা স্বাভাবিক বলেই ধরে নেওয়া যেত—এর চুল কুচকুচে কালো, আর মুখখানিও অন্যান্য ইয়াহুদের মতো অতটা কদাকার ছিল না; আমার মনে হল বছর এগারোর বেশি ওর বয়সও নয়।

ইতিমধ্যে এদেশে আমার তিন বছর বাস হয়েছে, কাজেই পাঠকমহাশয়

হয়তো আশা করছেন যে অন্যান্য ভ্রমণকারীদের মতো আমিও তাঁকে এখানকার অধিবাসীদের রীতিনীতি ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে কিছু বলব। বাস্তবিকই আমার অনুশীলনের বেশির ভাগটাই ছিল এই বিষয় নিয়ে।

প্রকৃতিদেবী এই মহিমাময় হুইন্‌ম্‌দের যাবতীয় সদ্‌গুণের প্রতি একটা স্বাভাবিক প্রবণতা দিয়েছেন; একটা বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন জীবের মধ্যেও যে পাপ থাকতে পারে এটা তাদের চিন্তা ও ধারণার বাইরে। কাজেই তাদের জীবনের প্রধান ব্রত হল বিচারবুদ্ধির অনুশীলন করা এবং সর্বতোভাবে বিচারবুদ্ধির দ্বারা চালিত হওয়া। ওদের কাছে যুক্তি বা বিচার এমন একটা সমস্যার বিষয়ই নয় যে একই প্রসঙ্গে দুই পক্ষ দুই বিপরীত দিক থেকে সমান প্রতীতি সহকারে তর্ক করে যেতে পারে, মানুষরা যেমন করে থাকে। ওদের কাছে বিচারের সিদ্ধান্ত তৎক্ষণাৎ প্রতীয়মান হয়; বাসনা ও ব্যক্তিগত স্বার্থ যেখানে বিচারকে অশুদ্ধ, ছায়াচ্ছন্ন ও পঙ্কিল করে তোলে নি, সেখানে এরকম হতে বাধ্য। আমার প্রভুকে মতামতের অর্থ, কিম্বা কোনো তথ্য নিয়ে কি করে তর্ক উঠতে পারে এসব বোঝাতে আমাকে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছিল। তার কারণ—তাঁর মতে কোনো বিষয়ে নিঃসন্দেহ জ্ঞান না থাকলে সে বিষয়ে হাঁ না কিছুই বলা যায় না। আর যে বিষয়ে আমরা জানি না সে বিষয়ে তো কিছু বলাই যায় না। কাজেই বিরোধ, বিবাদ-বিতর্ক, ভ্রান্ত বা সন্দেহজনক প্রস্তাবে আস্থা, এসব অমঙ্গল হুইন্‌ম্‌দের কাছে অজ্ঞাত।

ঠিক এইভাবেই, যখন তাঁর কাছে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের কথা বোঝাতে চেষ্টা করতাম তাঁর খুব হাসি পেত এই ভেবে, যে জীব নিজেকে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন বলে মনে করে, সে কি করে ভাবতে পারে যে অন্য লোকের অনুমান কিম্বা যে তথ্য নিঃসন্দেহ হলেও একেবারে অকেজো, কিম্বা যে বিষয়ে সম্পূর্ণ জানা যায়নি, তার কোন মূল্য আছে। এই বিষয়ে প্লেটো বর্ণিত সক্রেটিসের মন্তব্যের সঙ্গে তিনি এক মত; দর্শনশাস্ত্রের রাজাধিরাজকে এর চেয়ে বড় সম্মান দেওয়া যায় না বলেই এই কথাটির উল্লেখ করলাম। এর পরে আমি অনেক সময় ভেবেছি যে এই মতবাদটি গৃহীত হলে ইউরোপের লাইব্রেরিগুলোর কি সর্বনাশটাই না হত আর জ্ঞান জগতে খ্যাতি অর্জন করবার কত পন্থাই না বন্ধ হয়ে যেত!

হুইন্‌ম্‌দের দুটি প্রধান গুণ হল সহৃদয়তা ও হিতৈষিতা; এ দুটি গুণ কোন

ব্যক্তিবিশেষেও আবদ্ধ থাকে না, সমস্ত জাতির মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। সুদূরতম স্থান থেকে আগত অপরিচিত ব্যক্তিও নিকটতম প্রতিবেশীর মতোই আদর পায়। সেও যেখানে যায় সে জায়গাটিকেই নিজের ঘরবাড়ি বলে মনে করে।

এঁরা সর্বদা শিষ্টতা ও সৌজন্যের উচ্চতম আদর্শ রক্ষা করে চলেন, কিন্তু আনুষ্ঠানিক ব্যাপার সম্পর্কে কিছুই জানেন না। নিজেদের সন্তানদের উপর এঁদের এতটুকু টান নেই, তবু তাদের শিক্ষিত করে তুলবার জন্যে এঁরা যে এত যত্ন নেন, তার একমাত্র হেতুই হল ওঁদের বিচারবুদ্ধি। আমি লক্ষ্য করেছিলাম নিজের সন্তানের প্রতি আমার প্রভু যে স্নেহ দেখাতেন, প্রতিবেশীর সন্তানের বেলাও তাই। ওঁরা বলেন প্রকৃতির শিক্ষাই হল সমগ্র জাতটাকে ভালোবাসা, তবে যেখানে বেশি সদগুণের পরিচয় পাওয়া যায়, কেবলমাত্র সেইখানেই বিচারবুদ্ধির প্ররোচনায় প্রভেদ করা চলে।

হুইন্‌ম্‌ মায়েরা একটি পুত্র ও একটি কন্যা সন্তান বহন কববার পর আর স্বামীসঙ্গ করেন না, এক যদি না কোনো অপঘাতে একটি সন্তান হারান, কিন্তু সে হয় ক্বচিৎ কদাচিৎ। এসব ক্ষেত্রে তাঁরা আবার সহবাস করেন। কিম্বা যদি কারো স্ত্রীর সন্তান ধারণের বয়স পার হয়ে যাবার পর একটি সন্তানের মৃত্যু হয়, তাহলে অন্য দম্পতি তাঁদের নিজেদের একটি সন্তান দান করে নিজেরা পুনরায় সহবাস করেন, যতদিন না স্ত্রী গর্ভবতী হন। এই সতর্কতাটুকু অবলম্বন করা দরকার যাতে দেশের জনসংখ্যা বড় বেশি বেড়ে না যায়। তবে এ বিষয়ে ছোট জাতের হুইন্‌ম্‌রা, যারা পরে চাকর বাকরের কাজ করবে, তারা অতটা কড়াকড়ি করে না। এদের তিনটি পুত্র ও তিনটি কন্যা উৎপাদন করবার অধিকার আছে, যারা পরে অভিজাত পরিবারে ভৃত্যের কাজ করবে।

বিয়ের সময় পাত্রপাত্রী খুব সাবধানে অপর পক্ষের রঙ দেখে নেন, যাতে বংশধরদের গায়ে কোনো উদ্ভট রঙের সংমিশ্রণ দেখা না দেয়। পুরুষদের বলিষ্ঠতা আর মেয়েদের লালিত্যকে বিশেষ মূল্য দেওয়া হয়, প্রেমের কারণে নয়, যাতে বংশের অবনতি না হয় এই জন্যে। যেখানে পাত্রী হলেন অসাধারণ বলিষ্ঠ, পাত্রকে নির্বাচন করা হয় তার চেহারার সৌন্দর্য দেখে। পূর্বরাগ, প্রেম, উপহার, পত্নীর প্রাপ্য, যৌতুক ইত্যাদি এঁদের চিন্তায় কখনো স্থান পায় না।

তরুণ পাত্রপাত্রীর সাক্ষাৎ ও মিলন হয় তাদের বাবা মা ও বন্ধুহিতৈষীদের ইচ্ছায়। এই রকম ব্যবস্থাই তারাও সর্বদা দেখে এসেছে এবং বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন জীবের পক্ষে এই রকম ব্যবস্থারই প্রয়োজন আছে বলে তারা বিশ্বাস করে। বিবাহ-বন্ধনের অপমান বা অন্য কোনো রকম অসতীত্বের কথা কেউ কখনো শোনে নি। নিজেদের চারপাশের অন্যান্য স্বজাতিদের সঙ্গে যে বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক মঙ্গল চিন্তা নিয়ে এঁরা জীবন কাটান, বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সঙ্গেও তাই করেন। ঈর্ষা, প্রণয়, ঝগড়া বা অসন্তোষের কথাই ওঠে না।

এঁদের তরুণ বয়সের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবার পদ্ধতিটি বড় ভালো এবং অতিশয় অনুকরণযোগ্য। আঠারো বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত, বিশেষ উপলক্ষ্য ছাড়া কখনো এদের এক দানা জই খেতে দেওয়া হয় না এবং দুধও খুব ক্বচিৎ। গ্রীষ্মকালে সকালে দু ঘণ্টা বিকেলে দু ঘণ্টা এরা মাঠে চরে, বাবা মারাও তাই করেন। তবে, চাকরদের চরবার সময় হল এর ঠিক অর্ধেক। অনেক ঘাস বাড়িতে নিয়ে আসা হয়, কাজের ফাঁকে সুযোগ মতো সেই ঘাস চাকরবাকররা খায়।

কি ছেলে কি মেয়ে সবাইকেই মিতাচার, কর্মনিষ্ঠা, পরিশ্রম ও পরিচ্ছন্নতার পাঠ সমানভাবে দেওয়া হয়। আমার প্রভুর মতে আমরা যে মেয়েদের ছেলেদের চেয়ে অন্য রকম শিক্ষা দিই, একমাত্র কতকগুলি গার্হস্থ্যবিষয়ক শিক্ষা ছাড়া, এই নিয়মটি অত্যন্ত নিন্দনীয়। তিনি বললেন এর ফলে আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেক কেবল সন্তান প্রসব করা ছাড়া আর কোন কাজে আসে না। আর এইরকম অপদার্থ জানোয়ারদের হাতে সন্তান পালনের ভার দেওয়া তো আরো বেশি মূঢ়তা।

খাড়া পাহাড় বেয়ে দৌড়ে ওঠানামা করিয়ে কিম্বা শক্ত পাথুরে জমির উপরে দৌড় করিয়ে, হুইন্‌ম্‌রা তাদের তরুণদের বলিষ্ঠ, বেগবান ও কষ্টসহিষ্ণু করে তোলেন। সর্বাঙ্গ যখন ঘেমে ওঠে, নদী বা পুকুরে ডিগ্‌বাজি খেয়ে তাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে বলা হয়। প্রতি বছর চারবার বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের তরুণরা একত্র হয়ে দৌড়, লাফ, গায়ের জোর ও ক্ষিপ্রতার অন্যান্য খেলায় পারদর্শিতার পরীক্ষা দেয়। পুরস্কারস্বরূপ বিজয়ীর প্রশংসা করে গান বাঁধা হয়। এই উৎসবের সময় চাকররা এক পাল ইয়াহুর পিঠে

শুকনো ঘাস, জই, দুধ বোঝাই করে, হুইন্‌ম্‌দের খাবার জন্যে মাঠের মধ্যে নিয়ে আসে। তারপরেই অবিশ্যি তাদের আবার তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয় নইলে সভার মাঝে কোথায় কি নোংরামি করে বসবে।

চার বছর অন্তর মহাবিষুব সংক্রান্তির সময়, জাতীয় প্রতিনিধি সভার অধিবেশন হয়। আমাদের বাড়ি থেকে কুড়ি মাইল দূরে একটা উপত্যকায় সভা বসে আর চার দিন ধরে চলে। এই সভায় ওঁরা বিভিন্ন অঞ্চলের অবস্থা ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশ্নাদি করেন, যথেষ্ট শুকনো ঘাস, জই, গোরু, ইয়াহু আছে কি না ইত্যাদি। যেখানেই অভাব দেখা যায়, অবিশ্যি এটা হয় খুব কদাচিৎ, অমনি সকলে একমত হয়ে কিছু কিছু দিয়ে সেই অভাব দূর করে দেন।

এখানে সন্তান সংখ্যাও নিয়ন্ত্রিত হয়, যথা, একজন হুইন্‌ম্‌মের যদি দুটি পুত্র থাকে, তাহলে যাঁর দুটিই কন্যা এমন কারো সঙ্গে একটি পুত্র অদলবদল করে নেন। আকস্মিক কারণে কারো সন্তান যদি মারা গিয়ে থাকে আর মায়ের যদি আর সন্তান ধারণের শক্তি না থাকে, তাহলে এখানেই স্থির হয়ে যায় যে সেই অভাবটি মেটাবার জন্যে ঐ অঞ্চলের কোন পরিবার আরেকটি সন্তান উৎপাদন করবেন।

নবম অধ্যায়

হুইনম্‌দিগের সাধারণ সভায় মহতী বিতর্কসভা—বিতর্কের নিষ্পত্তি—হুইনম্‌দিগের জ্ঞানবিদ্যা—তাঁহাদের গৃহনির্মাণ—সমাধির নিয়ম—ভাষার অসম্পূর্ণতা।

আমি থাকতে থাকতে হুইন্‌ম্‌দের ঐরকম একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়েছিল; আমার প্রভু আমাদের আঞ্চলিক প্রতিনিধি হয়ে ঐ সভায় গিয়েছিলেন। সেখানে ওঁদের এক পুরোনো তর্ক নিয়ে পুনরায় আলোচনা হয়; বাস্তবিক ওঁদেব দেশে বিতর্কের বিষয় ঐ একটিই আছে; ফিরে এসে আমার প্রভু তার বিশদ বিবরণ দিয়েছিলেন।

বিতর্কের বিষয়টি হল ভূপৃষ্ঠ থেকে ইয়াহুদের নির্মূল করে দেওয়া হবে কি না। সভ্যদের একজন এই প্রস্তাব সমর্থন করে অনেকগুলি গভীর ও গুরুতর যুক্তি উপস্থাপিত করলেন। তিনি বললেন প্রকৃতি যত জীব সৃষ্টি করেছে, তার মধ্যে ইয়াহুরাই হল সবচেয়ে নোংরা, ঘৃণ্য ও কদাকার; উপরন্তু তারা তেমনি অস্থির, অবাধ্য, দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন ও অনিষ্টকারী। লুকিয়ে লুকিয়ে ওরা হুইন্‌ম্‌দের গোরুর বাঁট থেকে দুধ চুষে খায়, ওঁদের বেড়াল মেরে খেয়ে ফেলে, সমস্তক্ষণ পাহারা না দিলে জইগাছ আর ঘাস সব মাড়িয়ে নষ্ট করে দেয়; এই ধরণের হাজার রকম বাড়াবাড়ি করতে ওরা ওস্তাদ। একটা সাধারণ প্রবাদের দিকে তিনি শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, সেটি হল যে ইয়াহুরা চিরকাল এদেশে ছিল না। বহুকাল আগে এইরকম দুটি জন্তু হঠাৎ একটা পাহাড়ের উপর একসঙ্গে দেখা দিল। পচা কাদামাটির উপরে সূর্যের তাপের প্রভাবেই হক কিম্বা সমুদ্রের শ্যাওলা আর ফেনা থেকেই হক, এদের কি করে যে উৎপত্তি হয়েছিল সেটা কারো জানা নেই।

এই ইয়াহুদের বংশবৃদ্ধি হতে লাগল এবং অল্পকালের মধ্যেই সংখ্যায় এরা এতই বেড়ে গেল যে সমস্ত দেশটা ছেয়ে একেবারে গিজগিজ করতে লাগল। পাপ দূর করবার আশায় হুইন্‌ম্‌রা সবাই ইয়াহু শিকারে নেমে, শেষ অবধি সবকটাকে একটা জায়গায় ঘেরাও করে ফেললেন। সমস্ত ধাড়িগুলোকে মেরে ফেলে, হুইন্‌ম্‌রা প্রত্যেকে দুটি করে অল্প বয়স্ক ইয়াহু কুকুর থাকবার

খুপরির মতো একটা ঘরে রেখে দিলেন। কালে এইরকম জংলি জানোয়ারের পক্ষে যতটা পোষ মানা সম্ভব, এরা তা মানল ; ভার বইবার গাড়ি টানবার কাজে এদের লাগানো হল। এই কিংবদন্তীর মধ্যে অনেকখানি সত্য আছে বলে মনে হয়, এই জানোয়ারগুলো কখনোই এদেশের "ইহল্‌নিয়ামসি" বা আদিবাসী হতে পারে না, কারণ হুইন্‌ম্‌রা এবং অন্য সব প্রাণীরা ওদের উপরে হাড়ে চটা। অবিশ্যি ওদের বিশ্রী স্বভাবের মধ্যেই এইরকম তীব্র বিদ্বেষের যথেষ্ট কারণ পাওয়া যেতে পারে, তবুও আদিবাসী হলে, বিদ্বেষটা এত বেশি বাড়তে পেত না, তার অনেক আগেই গোটা ইয়াহু বংশকে নির্মূল করে দেওয়া হত।

দেশবাসীদের যখন ইয়াহু পুষে কাজ করবার সখ চেপে গেল, নিতান্ত নির্বোধের মতো তাঁরা গাধার বংশ প্রতিপালন করা ছেড়ে দিলেন ; অথচ গাধা দেখতে ভালো, রাখা সহজ, অনেক বেশি পোষ মানে আর নিয়ম মেনে চলে, গায়ে দুর্গন্ধ নেই, পরিশ্রম করবার পক্ষে যথেষ্ট বলিষ্ঠতাও আছে, অবিশ্যি শারীরিক ক্ষিপ্রতায় গাধারা ইয়াহুদের কাছে হার মানে। তাছাড়া গাধার ডাক খুব শ্রুতিমধুর না হলেও, ইয়াহুগুলোর বিকট চিৎকারের চেয়ে ঢের ঢের ভালো।

আরো অনেকে এঁকে সমর্থন করে মত প্রকাশ করেছিলেন ; এই সময় আমার একটা বুদ্ধি ধার করে নিয়ে আমার প্রভু একটি উপায় বাৎলালেন। তিনি বললেন তাঁর শ্রদ্ধাভাজন পূর্ববর্তী বক্তা যে কিংবদন্তীর উল্লেখ করেছিলেন সেটি ইনি স্বীকার করে নিয়ে এই মত প্রকাশ করছেন যে দুজন ইয়াহুকে এদেশে প্রথম দেখা গিয়েছিল, তারা সমুদ্রের উপর দিয়ে এখানে এসে পড়েছিল। ডাঙ্গায় পৌছে দেখে সঙ্গীরা তাদের পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছে, তখন তারা পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। তারপর তাদের বংশের অবনতি ঘটতে ঘটতে, কালক্রমে যে দেশ থেকে তাদের আদি পুরুষরা এসেছিল সেখানকার অধিবাসীদের চেয়ে এরা অনেক বেশি বন্য হয়ে উঠল। তাঁর একথা বলবার কারণ হল যে তাঁর কাছে একটি আশ্চর্য ইয়াহু আছে—তার মানে আমি—অনেকেই তার কথা শুনেছেন, কেউ কেউ দেখেওছেন।

তারপর তিনি তাঁদের বললেন আমাকে কি ভাবে প্রথমে পেয়েছিলেন। অন্য জানোয়ারের চামড়া আর লোমের তৈরি একটা কৃত্রিম ছাল দিয়ে আমার

সমস্ত শরীর ঢাকা থাকে; আমার নিজের ভাষায় আমি কথা বলি, কিন্তু ওদের ভাষাটিও উত্তমরূপে শিখে নিয়েছি। নানান্ আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে আমি এদেশে এসে পড়েছিলাম। ছালটি বাদে দেখতে আমি সব বিষয়ে অবিকল ইয়াহুদের মতো, শুধু আমার গায়ের রঙ আরো সাদা, লোম আরো কম, নখ আরো ছোট।

তিনি আরো বলেছিলেন যে তাঁকে আমি অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে আমাদের দেশে এবং আরো অন্য দেশে ইয়াহুরাই বুদ্ধিসম্পন্ন শাসকের আসন নিয়ে, হুইন্‌ম্‌দের তাদের দাস করে রেখেছে।

আমার মধ্যে তিনি ইয়াহুদের সব বৈশিষ্ট্যই দেখতে পাচ্ছেন শুধু বিচার-বুদ্ধির একটুখানি ছোঁয়া লেগে ওদের চেয়ে আমি খানিকটা বেশি সভ্য। তবে ইয়াহুরা আমার চেয়ে যতখানি নিকৃষ্ট, আমাদের সভ্যতাও হুইন্‌ম্ সভ্যতার চেয়ে ঠিক ততখানি নিকৃষ্ট।

অন্যান্য প্রসঙ্গের মধ্যে আমি আমাদের দেশে হুইন্‌ম্‌দের অল্প বয়সে খোজা করে দেবার কথা উল্লেখ করেছি, যাতে তারা আরো বাধ্য হয়। ব্যাপারটা খুবই সহজ ও নিরাপদ; জন্তু-জানোয়ারদের কাছ থেকে বুদ্ধি নেওয়াতে কোনো লজ্জা নেই; পিঁপড়েদের কাছ থেকে কর্মনিষ্ঠা শেখা যায়; বাড়ি তৈরি শেখা যায় সোয়ালো পাখিদের কাছ থেকে। 'লিহাঁহ্' পাখির অনুবাদ করলাম সোয়ালো, যদিও সে পাখি সোয়ালোর চেয়ে আকারে অনেক বড়। এখন এই উপায়টি এখানকার অল্পবয়সী ইয়াহুদের উপরে কাজে লাগানো যেতে পারে, তার ফলে তারা অনেক বেশি বাধ্য ও কর্মঠ তো হবেই, উপরন্তু কালে গোটা ইয়াহু বংশই লোপ পেয়ে যাবে, অথচ কাউকে প্রাণে মারতে হবে না।

ইত্যবসরে হুইন্‌ম্‌দের গাধা পালতে উৎসাহিত করা হক; সব দিক দিয়ে তারা ইয়াহুদের চেয়ে মূল্যবান জানোয়ার তো বটেই, উপরন্তু পাঁচ বছর বয়স থেকেই তারা কাজের উপযোগী হয়ে ওঠে, ইয়াহুরা বারো বছরের আগে হয় না।

মহাসভায় যে সব আলোচনা হয়েছিল, তার মধ্যে থেকে এইটুকুই আমার কাছে প্রকাশযোগ্য বলে আমার প্রভু বিবেচনা করেছিলেন। আমার ব্যক্তিগত বিষয়ে একটি বিশেষ প্রসঙ্গ তিনি ইচ্ছা করেই গোপন

করেছিলেন। যথাস্থানে পাঠকমহাশয় এও জানতে পারবেন যে অনতিবিলম্বেই তার কুফল আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এবং এইখান থেকেই আমার পরবর্তী কালের যাবতীয় তুর্ভাগ্যের সূত্রপাত হয়েছিল বলে আমি মনে করি।

হুইন্‌ম্‌দের কোনো অক্ষরজ্ঞান নেই, কাজেই ওদের সমস্ত জ্ঞানবিদ্যা মুখে মুখে চলে আসছে। তবে এইরকম একটা ঐক্যবদ্ধ জাতি, সর্বপ্রকার ধর্মপালনেই যাঁদের স্বাভাবিক প্রবণতা, একমাত্র বিচারবুদ্ধি দ্বারা যাঁরা চালিত, পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সঙ্গে যাঁদের কোনোরকম যোগাযোগ নেই, স্মৃতিশক্তিকে খুব বেশি ভারাক্রান্ত না করেও, এঁদের ঐতিহ্য খুব সহজেই সুরক্ষিত হতে পারে। আগেই বলেছি এঁদের কখনো অসুখবিসুখ করে না, কাজেই ডাক্তার বদ্যির কোনো প্রয়োজন নেই। তবে ধারালো পাথর লেগে আকস্মিকভাবে পায়ের কব্জি বা তলা কেটে গেলে, কিম্বা শরীরের অন্যান্য জায়গার কাটা ছড়া সারাবার জন্যে গাছ-গাছালির তৈরী চমৎকার সব ওষুধ আছে ওঁদের।

সূর্য-চন্দ্রের অয়ন গতি দেখে ওঁরা বর্ষের হিসাব করেন, তবে তাকে সপ্তাহে ভাগ করেন না। চন্দ্রসূর্যের কক্ষপথে চলা সম্বন্ধে তাঁদের যথেষ্ট জ্ঞান আছে, চন্দ্রসূর্যে গ্রহণ কেন হয় তাও জানেন, জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁরা এইটুকুমাত্র অগ্রসর লাভ করেছেন।

কিন্তু কাব্যে এঁরা সকল জীবের শ্রেষ্ঠ। এঁদের উপমার যাথার্থ্যকে বর্ণনার সূক্ষ্মতা ও সততাকে একেবারে অতুলনীয় বলা চলে। ওঁদের কবিতায় এই তুটি অলঙ্কারের প্রচুর ব্যবহার। তাছাড়া ওঁদের কাব্যে সৌহার্দ ও মঙ্গলকামনা সম্পর্কে বহু উচ্চ চিন্তার বিকাশ হয়েছে; ঘোড়দৌড়ে যাঁরা বিজয়ী হয়েছেন কিম্বা অন্যান্য শারীরিক ক্রীয়াতে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তাঁদের গুণগান আছে।

ওঁদের বাড়িঘরগুলি যদিও খুবই রুক্ষ ও সাদাসিধা, তবু সেখানে থাকতে কোনো অসুবিধা হয় না, শীতগ্রীষ্মের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাবার পক্ষে যথেষ্ট উপযুক্ত। ওঁদের দেশে একরকম গাছ আছে, সেগুলোর চল্লিশ বছর বয়স হলেই শিকড় ঢিলা হয়ে যায় তারপর একটা ঝড় হলেই অমনি গাছটি পড়ে যায়। এই গাছগুলি একটি সরলরেখার মতো সোজা হয়ে বাড়ে। হুইন্‌ম্‌রা লোহার ব্যবহার জানেন না, কাজেই ধারালো পাথরের সাহায্যে এই

গাছের আগা ছুঁচলো করে নিয়ে, দশ ইঞ্চি দূরে দূরে মাটিতে খাড়া করে পুঁতে দেন। তারপর গাছের বেড়ার ফাঁকগুলোকে জই খড় কিম্বা কঞ্চি দিয়ে বুনে দেন। এইভাবে ছাদ আর দরজাও তৈরি হয়।

আমরা যেমন আমাদের হাতদুটি দিয়ে কাজ করি, হুইনম্‌রা তাঁদের সামনের পায়ের কব্জি আর খুরের মাঝখানের খাঁজটি দিয়ে ঠিক সেইভাবেই কাজ করেন এবং এমনি দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেন যে না দেখলে আমি সেরকম ধারণাই করতে পারতাম না।

আমাদের বাড়ির একটি সাদা ঘোটকীকে আমি ঐভাবে ছুঁচে সুতো পরাতে দেখেছি; ছুঁচটি আমি ইচ্ছা করেই তাঁকে দিয়েছিলাম। ওঁরা গোরু দোন, জইয়ের ফসল কাটেন এবং যাবতীয় হাতের কাজ এইভাবে করেন। ওঁদের একরকম শক্ত চকমকি পাথর আছে, তাই দিয়ে ঘষে ঘষে অন্য পাথর দিয়ে ওঁরা নানা রকম অস্ত্র তৈরি করেন; এইসব অস্ত্রই গোঁজ, কুড়ুল, হাতুড়ির কাজ করে। চকমকি পাথর দিয়ে তৈরী এইরকম যন্ত্র দিয়েই ওঁরা ঘাস কেটে শুকোন, জই কাটেন, কিন্তু মাঠে মাঠে জই আপনি ফলে। গাড়িতে চাপিয়ে জইয়ের শীষ টেনে নিয়ে ঘরে তোলেন; দেয়াল ঘেরা খড়ের চালের ঘর আছে, সেখানে চাকররা মাড়িয়ে মাড়িয়ে তুষ আর দানা আলাদা করে, তারপরে দানাগুলোকে গোলায় জমা করে রাখা হয়। মোটা মোটা পাত্র তৈরি করেন ওঁরা মাটি দিয়ে আর কাঠ দিয়ে, মাটির বাসনগুলো রোদে পুড়িয়ে নেন।

যদি আকস্মিক দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, তাহলে ওঁদের মৃত্যুর একমাত্র কারণ হল বৃদ্ধ বয়স। সব চেয়ে কম চোখে পড়ে এমন সব জায়গা বেছে নিয়ে ওঁরা মৃতদেহ সমাধিস্থ করেন; কেউ গেলে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবরা আনন্দ বা দুঃখ কিছুই প্রকাশ করেন না। কোনো প্রতিবেশীর বাড়ি বেড়াতে গিয়ে ফিরবার সময় যেমন মনে কোনো খেদ থাকে না, মরবার সময় এঁদের পৃথিবীটাকে ছেড়ে যেতেও তেমনি কোনো খেদ থাকে না। আমার মনে পড়ছে কোনো বিশেষ উপলক্ষ্যে আমার প্রভুর কাছে তাঁর একজন বন্ধুর সপরিবারে আসবার কথা; সেদিন কিন্তু শুধু বন্ধুর গৃহিণী ছেলে মেয়ে নিয়ে খুব দেরী করে এসে উপস্থিত হলেন। দেরী করার দুটি কৈফিয়ৎ দিলেন তিনি। প্রথমতঃ স্বামীর অনুপস্থিতির জন্যে ক্ষমা চাইলেন, তিনি নাকি সেদিন সকালেই, 'হ্লুন্‌' হয়েছেন। ওদের ভাষায় ঐ কথাটির

অনেকখানি তাৎপর্য, কিন্তু ইংরিজিতে অনুবাদ করা খুব সহজ নয়। ভাবার্থটি হল তাঁর আদি মাতার কাছে ফিরে গেছেন। স্ত্রীর দ্বিতীয় কৈফিয়ৎটি হল যে সেদিন সকালে বেশ বেলা করে তাঁর স্বামী তো মারা গেলেন, এবার তাঁকে কোথায় গোর দিলে সুবিধা হয়, এই নিয়ে চাকরবাকরদের সঙ্গে অনেক পরামর্শ করতে হয়েছিল, তাই এর আগে আসতে পারেন নি। আমি লক্ষ্য করলাম যে তিনি যতক্ষণ আমাদের বাড়িতে ছিলেন অন্য সকলের মতো দিব্যি প্রফুল্লচিত্তেই ছিলেন।

এঁরা সাধারণতঃ সত্তর পঁচাত্তর বছর বাঁচেন, কদাচিৎ আশী পর্যন্তও বাঁচেন। মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ আগে থেকে ক্রমশঃ একটা ক্ষয়ে যাবার ভাব টের পান, কিন্তু কোনো যন্ত্রণা থাকে না। এই সময় বন্ধুবান্ধবরা ঘন ঘন এসে দেখা করেন, কারণ নিজেরা অন্য সময়ের মতো অনায়াসে ও প্রসন্নচিত্তে চলাফেরা করতে পারেন না। তবে মৃত্যুর দিন দশেক আগে—এই হিসাবটি তাঁদের বড় একটা ভুল হয় না—ইয়াহুটানা একটা আরামের শ্লেজগাড়িতে চড়ে, নিকটতম প্রতিবেশীদের আগমনের প্রতিদানে তাঁদের বাড়িতে গিয়ে দেখা করে আসেন। এই গাড়িটি শুধু এই সময় ব্যবহার হয় না; বয়স হলে দূরে বেড়াবার জন্যে, কিম্বা আকস্মিকভাবে পায়ে চোট লাগলেও ওঁরা এটিতে চড়ে বেড়ান।

মরনোন্মুখ হুইন্‌ম্‌রা যখন বন্ধুদের আগমনের প্রতিদানে তাঁদের বাড়িতে যান, ফিরবার সময় পরম গাম্ভীর্যের সঙ্গে তাঁদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করেন, যেন দেশের কোনো সুদূর অঞ্চলে চলে যাচ্ছেন আর সেখানেই বাকি জীবনটা কাটাবার ইচ্ছা!

একথা উল্লেখযোগ্য কি না জানি না, কিন্তু হুইন্‌ম্‌দের ভাষায় খারাপ কিছু বোঝাবার কোনো প্রতিশব্দ নেই, এক যদি না ইয়াহুদের নানান বিকৃতি ও অসদ্‌গুণের নাম নেওয়া যায়। কাজেই চাকরের বোকামি দেখলে কিম্বা ছোট ছেলে ভুল করলে কিম্বা পা কেটে যায় এরকম ধারালো পাথর পেলে কিম্বা অনেকদিন ধরে ঝড়বাদলা চললে বা অস্বাভাবিক রকম আবহাওয়া চললে, ওঁরা তার বর্ণনার সঙ্গে 'ইয়াহু' শব্দটি জুড়ে দেন। যথা, হঁ্‌ম্ ইয়াহু, হ্লাহোল্ম ইয়াহু, ইনিল্ম্‌ গুইল্মা ইয়াহু; বিশ্রী করে তৈরি বাড়ি দেখে ওঁরা বলেন—ইনোল্ম্‌ব্রল্‌ন ইয়াহু!

এই মহিমাময় জাতির আচরণ ও গুণাবলী সম্পর্কে আমি আনন্দের সঙ্গে আরো বিস্তারিত বিবরণ দিতে পারি, কিন্তু শীঘ্রই ঐ বিষয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করবার ইচ্ছা আছে বলে সেদিকেই পাঠকমহাশয়ের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। ইত্যবসরে আমার নিজের শোচনীয় পরিণামের কথাই বলি।

দশম অধ্যায়

লেখকের গৃহস্থালি ও হুইনম্‌দিগের মধ্যে সুখে কালাতিপাত—তাহাদের সহিত আদানপ্রদানে তাঁহার সদ্‌গুণের বিশেষ উন্নতি—প্রভু কর্তৃক দেশত্যাগের আদেশ জারি—দুঃখে সংজ্ঞা হারানো তথাপি আত্মসমর্পণ—নৌকার পরিকল্পনা ও নির্মাণে অন্য ভৃত্যের সাহায্য লাভ এবং নৌকা প্রস্তুত হইলে সাহস করিয়া সমুদ্রযাত্রা।

মনের মতো করেই নিজের ঘরগৃহস্থালি গুছিয়ে নিয়েছিলাম। আমার প্রভুর আদেশে বাড়ি থেকে ছয় গজ দূরে আমার জন্যে ওঁদের নিয়মে একটি ঘর তৈরি হল। তার দেয়াল ও মেজে আমি মাটি দিয়ে লেপে. নিজের হাতে ঘাসের মাদুর তৈরি করে ঢেকে দিয়েছিলাম। ওখানে বনে জঙ্গলে পাটগাছ হয়, সেই পাট আছড়িয়ে তোষকের খোলের মতো করে নিয়েছিলাম; ইয়াহুদের চুল দিয়ে তৈরি ফাঁদ পেতে নানা রকম পাখি ধরে, তাদের পালকগুলো তোষকের খোলে ভরে নিয়েছিলাম। ছুরি দিয়ে কেটে দুটি চেয়ার বানিয়েছিলাম। ভারি ও পরিশ্রমের কাজগুলো করতে লালচে ঘোড়া আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

কাপড়চোপড় যখন ছিঁড়ে তেনার মতো হয়ে গেল, তখন খরগোসের আর অন্য একটা সুন্দর জানোয়ারের লোম দিয়ে নতুন পোষাক করে নিয়েছিলাম। অন্য জানোয়ারটা খরগোসের মতোই বড়, ওরা তাকে 'ন্নুহ্নো' বলে, তার সারা গা মিহি নরম লোমে ঢাকা। এই লোম দিয়ে চলনসই গোছের মোজাও বানালাম। গাছ থেকে কাঠ কেটে জুতোর তলাটা বানালাম, তার সঙ্গে উপরের চামড়ার অংশটা জুড়ে দিলাম। সেটা যখন ছিঁড়ে গেল, তখন ইয়াহুর চামড়া রোদে শুকিয়ে নিয়ে তাই দিয়ে জুতোর উপরটা তৈরি করলাম।

অনেক সময় ফাঁপা গাছের মধ্যে মধু পেয়েছি, জলে গুলে কিম্বা রুটিতে মাখিয়ে সেই মধু খেয়েছি। দুটি প্রবাদ আছে—একটি হল 'প্রকৃতি সামান্যেই সন্তুষ্ট।' আর দ্বিতীয়টি হল, 'উদ্ভাবনের জন্ম প্রয়োজনের কোলে।' আমার জীবনে এ দুটি প্রবাদ যতখানি প্রমাণিত হয়েছে আর কারো জীবনে তার

বেশি হয় নি। ওদেশে যতদিন ছিলাম, অটুট স্বাস্থ্য ও মনের শান্তি ভোগ করেছি। কোনো বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা বা অসঙ্গত ব্যবহারে কষ্ট পেতে হয় নি। গোপনে কিম্বা প্রকাশ্যে কোনো শত্রু আমার অনিষ্ট করতে পারে নি। কোনো বড়লোককে কিম্বা তাঁর তাঁবেদারদের প্রসাদ লাভ করবার জন্যে ঘুষ দিতে, খোসামোদ করতে বা তাঁদের কারো লালসা মেটাতে হয় নি। প্রবঞ্চনা বা অত্যাচারের কাছ থেকে আশ্রয় খুঁজতে হয় নি। আমার শরীরের সর্বনাশ করতে এখানে কোনো ডাক্তারবদ্যি নেই, আমার আর্থিক সর্বনাশের জন্যে কোনো উকীল নেই। ভাড়া খেয়ে আমার প্রত্যেকটি কথা ও কাজের উপর নজর রাখবে কিম্বা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনবে এমন কোনো গুপ্তচর নেই এদেশে। বিদ্রূপ, সমালোচনা বা পিছনে নিন্দা করবার কেউ নেই; পকেটমার, ডাকাত, সিঁদেল চোর, এটর্নি, পাপব্যবসায়ী, বিদূষক, জুয়াচোর, রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ, কথাবাজ, বদমেজাজি, অতিরিক্ত বাক্যবাগীশ, মহাতার্কিক কেউ নেই; ধর্ষণকারী, খুনে, লুণ্ঠনকারী, বিদ্যাদিগ্‌গজ নেই; দলাদলির পাণ্ডাও নেই, দলও নেই; লুব্ধ করে বা কুদৃষ্টান্ত দেখিয়ে কেউ পাপ বাড়ায় না; অন্ধকূপ নেই, খাঁড়া, ফাঁসিকাঠ, বেত মারবার বা প্রকাশ্যে লজ্জা দেবার খুঁটি নেই। জোচ্চোর দোকানদার বা কারিগর নেই। অহঙ্কার, বিলাসিতা, ন্যাকামি নেই। সখের বাবু, দুর্বলের উপর অত্যাচারী, মাতাল, বেশ্যা বা জঘন্য ব্যাধি নেই; ঝগড়াটে, কামুক, খরচে স্ত্রী নেই। নির্বোধ ও দাম্ভিক পণ্ডিত নেই; এমন সঙ্গী নেই যারা পেড়াপিড়ি করে, হুমকি দেয়, ঝগড়া করে, চ্যাচামেচি গোলমাল করে; অন্তঃসারশূন্য, গর্বিত বন্ধুবান্ধব নেই, যাদের মুখে খারাপ কথা লেগেই থাকে। এখানে পাপের জোরে কেউ ধূলো থেকে উঁচু পদে উঠতে পারে না; গুণের জন্যেও কোনো উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে ধূলোয় ফেলা হয় না। এখানে রাজন্যবর্গ, বাদ্যকার, বিচারক বা নাচের মাস্টার, কেউ নেই।

অনেক সময় বিশিষ্ট হুইন্‌ম্‌রা আমার প্রভুর সঙ্গে দেখা করতে বা খাওয়াদাওয়া করতে এলে আমি সেখানে উপস্থিত থাকবার অনুমতি পেতাম। আমার প্রভু অনুগ্রহ করে আমাকে সেই ঘরে থেকে ওঁদের কথাবার্তা শুনতে দিতেন। তিনি ও তাঁর অতিথিরা অনেক সময় কৃপা করে আমাকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করতেন ও আমার উত্তর শুনতেন। মাঝে মাঝে আমার প্রভু

যখন অন্যদের বাড়িতে যেতেন, আমি তাঁর সঙ্গে যাবার সম্মান পেতাম। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা না করলে আমি কথা বলার ধৃষ্টতা প্রকাশ করতাম না; যখন কথা বলতাম তখন মনে মনে খেদ হত এই যে সময়টা নষ্ট করলাম, এই সময়ে নিজের কতখানি উন্নতি করে নিতে পারতাম। এইসব আলোচনার বিনীত শ্রোতার পদ পেয়েও আমি কৃতার্থ হয়ে যেতাম, কারণ এখানে সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থপূর্ণ ভাষায় কাজের কথা ছাড়া আর কিছু হত না। এর আগেও বলেছি এঁদের কথায়বার্তায় অত্যন্ত শালীনতা প্রকাশ পায়, লোকদেখানো অনুষ্ঠান কিছুই থাকে না, নিজে খুসি না হয়ে এবং অন্যদের খুসি না করে কেউ মুখ খোলেন না; কেউ কারো কথায় বাধা দেন না, একঘেঁয়ে বক্তৃতা দেন না, রেগে ওঠেন না, মতভেদ জানান না।

এঁদের একটা ধারণা হল যে লোকজন একত্র হলে পর খানিকক্ষণ নীরব থাকলে কথাবার্তার উন্নতি হয়। আমিও দেখলাম বাস্তবিকই তাই, কথা বলার মাঝে মাঝে এইসব ফাঁকার সময় মনে নতুন চিন্তার উদ্রেক হয়, তাতে আলোচনা আরো সজীব হয়ে ওঠে। আলোচনার সাধারণ বিষয় হল বন্ধুত্ব, প্রীতি ও মঙ্গলকামনা, শৃঙ্খলা ও মিতব্যয়িতা; কখনো বা চক্ষুগোচর নিসর্গ লীলা কিম্বা প্রাচীন ঐতিহ্য; সদ্‌গুণের ক্ষেত্র ও সীমা, বুদ্ধির অভ্রান্ত বিচার, কিম্বা পরবর্তী সাধারণ সভায় কি কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে তাই নিয়ে এবং প্রায়ই কাব্যের নানান চমৎকারিত্ব সম্বন্ধেও আলোচনা হত।

অহঙ্কার প্রকাশ না করেও এ কথা বলতে পারি যে অনেক সময় আমার উপস্থিতি থেকেই আলোচনার প্রসঙ্গ পাওয়া যেত, কারণ তাতে আমার প্রভু আমার নিজের ও আমার দেশের ইতিহাস সম্পর্কে কিছু বলার সুযোগ পেয়ে যেতেন, তারপর তাঁরা সকলে মিলে যেভাবে আলোচনা করতেন তাতে মানবজাতির খুব সুখ্যাতি হত না, কাজেই সেকথার আর পুনরুক্তি না-ই করলাম। তবে এটুকু মাত্র বলা যেতে পারে যে আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম ইয়াহু চরিত্র আমার চেয়েও আমার প্রভু বেশি ভালো বোঝেন। আমাদের যাবতীয় দোষপাপ ও মূঢ়তার কথা তো বলতেনই, তার উপরে তাঁদের দেশের ইয়াহুদের যদি খানিকটা বুদ্ধিসুদ্ধি থাকত তাহলে তাদের অবস্থা কিরকম দাঁড়াত, সেটুকু অনুমান করে নিয়ে তিনি আমাদের আরো অনেক দুর্বলতা আবিষ্কার করে ফেলতেন, যার বিষয়ে আমি আদৌ কোনো

উল্লেখ করি নি। অবশেষে অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবে বলতেন—তাহলে ভেবে দেখুন এহেন জীব কত জঘন্য, কত হতভাগা!

আমি অকপটভাবে বলছি যেটুকু মূল্যবান জ্ঞান আমি অর্জন করতে পেরেছি সে সমস্তই আহরণ করেছি আমার প্রভুর বক্তৃতা ও তাঁর সঙ্গে তাঁর বন্ধুবান্ধবের আলাপ আলোচনা থেকে। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক বিজ্ঞ বিদ্বৎ-সভায় বক্তৃতা করতে পারার চেয়েও, এঁদের আলোচনার শ্রোতা হতে পারাকে আমি অধিক গৌরবের বিষয় বলে মনে করি। এদেশের অধীবাসীদের দেহের বল, সৌন্দর্য ও গতির বেগ দেখে আমার শ্রদ্ধা হত; এমন সব অমায়িক চরিত্রে এত গুণের উজ্জ্বল সমাবেশ দেখে আমি ভক্তিতে বিগলিত হতাম।

ইয়াহুরা ও অন্যান্য জানোয়াররা স্বভাবতঃই এঁদের যেরকম ভয়ভক্তি করত, আমি অবিশ্যি প্রথম প্রথম ততটা করতাম না; সে ভাবটি আমার মনে জন্ম নিয়ে, ক্রমে ক্রমে যে এতটা বেড়ে যাবে এ আমি নিজেও আশা করি নি। তাঁরা যে আবার আমাকে আমার স্বজাতিদের থেকে আলাদা করে দেখবেন, এই অনুগ্রহটুকুর জন্যে আমার মনের ভক্তির সঙ্গে সশ্রদ্ধ ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতাও মিশ্রিত ছিল।

যখনই আমার পরিবারবর্গ, আমার বন্ধুবান্ধব, আমার স্বদেশবাসী বা সাধারণভাবে মানবজাতির কথা মনে হত, তাদের আসল রূপটি চিনতে পারতাম, অর্থাৎ আকৃতি প্রকৃতিতে ইয়াহু, হয়তো আরেকটু সভ্য ও কথা বলবার ক্ষমতার অধিকারী। তবে সংখ্যায় ও নিকৃষ্টতায় নিজেদের পাপ বাড়িয়ে তোলা ছাড়া, নিজেদের বুদ্ধিকে তারা অন্য কোনো কাজেই লাগায় না, তাদের এদেশী জাতভাইদের বরং প্রকৃতি যেটুকু দুর্বুদ্ধি দিয়েছে তার বাড়া কিছু নেই।

দৈবাৎ যদি পুকুরের বা ঝর্ণার জলে নিজের ছায়া দেখতে পেতাম, অমনি নিজের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষে পুর্ণ হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিতাম; নিজের চেয়ে একটা সাধারণ ইয়াহুর চেহারা বরং বেশি সহ্য হত। হুইন্‌ম্‌দের সঙ্গে আলাপ করে আর প্রসন্নদৃষ্টিতে তাঁদের ক্রমাগত দেখে, তাঁদের হাবভাব আমি এতই অনুকরণ করতে আরম্ভ করেছিলাম যে এখন পর্যন্ত আমার সেইটাই অভ্যাস হয়ে আছে। বন্ধুরা আমার মুখের উপর বলে দেয় যে আমি

ঘোড়ার মতো দৌড়াই। তা ছাড়া এও আমি অস্বীকার করতে পারি না যে কথা বলতে গিয়ে আমি অনেক সময় ঘোড়ার মতো স্বর ও ভঙ্গী করি; তাই নিয়ে সবাই যখন আমাকে টিটকারি দেয়, আমি এতটুকু ক্ষুণ্ণ হই না।

এইরকম সুখের পরিবেশে নিজেকে যখন চিরকালের মতো প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করছি, এইসময় একদিন সকালে, অন্য দিনের চেয়ে আরো ভোরে, আমার প্রভু আমাকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর মুখের ভাব দেখেই বুঝলাম তিনি মহা সমস্যায় পড়েছেন এবং কথাটি কি ভাবে উত্থাপন করবেন তাই ভেবে পাচ্ছেন না। একটুক্ষণ চুপ করে থাকার পর তিনি বললেন তাঁর বক্তব্যটি আমি যে কি ভাবে গ্রহণ করব এটা তিনি বুঝতে পারছেন না। গতবারের মহাসভায় যখন ইয়াহুদের সম্পর্কে কথা উঠেছিল, তিনি যে একটা ইয়াহুকে—অর্থাৎ আমাকে—বন্য পশুকে যেভাবে রাখতে হয় সেভাবে না রেখে, নিজের পরিবারের মধ্যে একজন হুইন্‌মের মতো প্রতিপালন করছেন—এই নিয়ে সভ্যরা আপত্তি জানিয়েছিলেন। তিনি আমার সঙ্গে এভাবে আলাপ-আলোচনা করেন, যেন আমার সঙ্গ থেকে তিনি জ্ঞান বা আনন্দ লাভ করছেন, এটাও তাঁদের অজানা নেই। বিচারবুদ্ধি বা প্রাকৃতিক স্বভাব, কোনো দিক থেকে এ আচরণ সমর্থনযোগ্য নয় এবং এমন ব্যাপার আগে কখনো হয়েছে বলে শোনা যায় নি। অতএব মহাসভা তাঁকে বিশেষভাবে এই আদেশ করছেন যে হয় আমাকে আমার স্বজাতিদের মতো করে রাখা হক, নয়তো যেদেশ থেকে এসেছি সাঁতরে সেখানে ফিরে যেতে বলা হক।

প্রথম পন্থাটিকে যে-হুইন্‌ম্‌রা আমাকে নিজেদের কিম্বা আমার প্রভুর বাড়িতে দেখেছেন তাঁরা সকলেই নাকচ করে দিলেন, কারণ তাঁদের মতে যেহেতু আমার মধ্যে একটুখানি প্রাথমিক বুদ্ধির আভাস দেখা যায়, তার সঙ্গে ইয়াহুদের বদ্‌মাইসি গিয়ে মিললে, আমি হয়তো ইয়াহুদের ভাগিয়ে ওখানকার বন্য পার্বত্য প্রদেশে নিয়ে যেতে পারি। তারপর হয়তো আমরা রাত্রে দলে দলে পাহাড় থেকে নেমে এসে হুইন্‌ম্‌দের গোরুবাছুর ধ্বংস করতে আরম্ভ করব, কারণ আমাদের স্বাভাবিক খিদে বড় সাংঘাতিক আর খেটে খেতে আমরা নারাজ!

আমার প্রভু আরো বললেন, এই আদেশটি পালন করবার জন্যে সভ্যরা নিত্য তাঁকে তাগাদা দিচ্ছেন, এখন আর বেশি দেরি করা যায় না। সাঁতরে

অন্য দেশে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব কি না সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ আছে, কাজেই তাঁর ইচ্ছা যে আমি তাঁর কাছে সমুদ্রের উপর দিয়ে চলবার যে গাড়ির কথা বলেছি, সেই ধরণের একটা কিছু বানিয়ে নিই। এই কাজে তাঁর এবং প্রতিবেশীদের চাকররা আমাকে সাহায্য করবে। পরিশেষে এই কথা বললেন যে তাঁর নিজের দিক থেকে তিনি আমাকে আজীবন তাঁর চাকরিতে বহাল রাখতে সজ্ঞানে রাজী ছিলেন, কারণ এটা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে আমার নিকৃষ্ট স্বভাবের পক্ষে যতদূর সম্ভব আমি হুইনম্‌দের অনুকরণ করবার চেষ্টা করে, নিজের অনেক বদভ্যাস ও স্বভাব শুধরিয়ে ফেলেছি।

এখানে পাঠকমহাশয়কে জানানো উচিত যে এদেশের সাধারণ সভার বিধানকে বলা হয় হ্নোয়াই। শব্দটিকে যতদূর অনুবাদ করা চলে, তার অর্থ দাঁড়ায় 'উপদেশ'। একটা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীবকে যে কিছু করতে বাধ্য করা যেতে পারে, এটা ওঁরা ভাবতেই পারেন না, বড়জোর তাকে পরামর্শ বা উপদেশ দেওয়া যেতে পারে; যেহেতু বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব বলে পরিচিত হবার দাবী ছেড়ে না দিলে, কারো পক্ষে বুদ্ধির নির্দেশ অমান্য করা সম্ভব নয়।

আমার প্রভুর কথা শুনে আমি দুঃখে, হতাশায় বিহ্বল হয়ে পড়লাম এবং তার যন্ত্রণা সইতে না পেরে, তাঁর পায়ের কাছে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম। যখন জ্ঞান হল, তিনি বললেন তিনি ভেবেছিলেন আমি বুঝি মরেই গিয়েছি। এদেশের অধিবাসীদের এসব প্রাকৃতিক মূঢ়তার অভ্যাস নেই। ক্ষীণকণ্ঠে আমি বললাম, মৃত্যুও এর চেয়ে সুখকর হত। মহাসভার নির্দেশ বা বন্ধুদের তাগাদা কোনটারই নিন্দা করছি না, তবু আমার দুর্বল ও ভ্রান্ত বিচারে মনে হয়েছিল যে এতটা কঠোর না হয়েও যুক্তিসঙ্গতভাবে কাজ করা যেত।

তিন মাইলও আমি সাঁতরাতে পারি না, নিকটতম দেশ হয়তো তিনশো মাইলের চেয়েও বেশি দূরে। যে নৌকা করে যাব, সেটি তৈরি করতে হলে এমন অনেক জিনিস লাগবে যা এদেশে পাওয়া যায় না, তবুও প্রভুর প্রতি বাধ্যতা ও কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ আছি বলে একবার চেষ্টা করে দেখব; যদিও আমার বিশ্বাস কাজটা নিতান্তই অসম্ভব, অতএব এখন থেকেই আমি নিজেকে সর্বনাশের কাছে বলিদত্ত বলে মনে করছি।

অস্বাভাবিক মৃত্যুর নিশ্চয়তা আমার সব চেয়ে কম দুশ্চিন্তার কারণ ছিল, বরং যদি কোনো আশ্চর্য উপায়ে আমি প্রাণে বেঁচে যাই, তবু ইয়াহুদের মধ্যে জীবন কাটানো, আমাকে সৎপথে উদ্বুদ্ধ ও রক্ষা করবার জন্যে উপযুক্ত আদর্শের অভাবে আগেকার দোষদুর্বলতাগুলোর পুনরাবির্ভাব, এ সব সম্ভাবনার কথা আমি অবিচলিত চিত্তে ভাবতেও পারছিলাম না।

আমি ভালো করেই জানতাম হুইন্‌ম্‌দের সিদ্ধান্তগুলি এত দৃঢ় যুক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় যে আমার মতো একটা হতভাগ্য ইয়াহুর কথায় তার কোনো নড়চড় হতে পারে না, কাজেই নৌকো তৈরীর কাজে চাকরদের সাহায্য দেবার প্রস্তাবের জন্যে আমার প্রভুকে ধন্যবাদ জানিয়ে, এই কঠিন কাজ সম্পাদনের জন্যে দু মাস সময় চাইলাম। তাঁকে বললাম আমার এই লক্ষ্মীছাড়া জীবন রক্ষা করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব। যদি কখনো ইংল্যাণ্ডে ফিরতে পারি স্বনামধন্য হুইন্‌ম্‌দের গুণগান করে ও তাঁদের গুণাবলী মানব-জাতির অনুকরণীয় বলে প্রতিপন্ন করে, স্বজাতিদের যে খানিকটা মঙ্গলসাধন করতে পারব এ বিষয়ে আমি নিতান্ত নিরাশ নই।

গুটিকতক কথায় আমার প্রভু প্রসন্নভাবে উত্তর দিলেন। নৌকোর কাজ শেষ করবার জন্যে দু মাস সময় দিলেন এবং আমার সহকর্মী ভৃত্য সেই লালচে ঘোড়াকে—এত দূর থেকে তাকে এভাবে অভিহিত করতে সাহস পাচ্ছি—আদেশ করলেন আমার কথা মতো কাজ করতে ; তার কারণ আমি প্রভুকে বলেছিলাম এর সাহায্য পেলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট হবে আর আমিও জানতাম যে ও আমাকে স্নেহ করে।

উপকূলের যে জায়গায় বিদ্রোহী নাবিকরা আমাকে নামিয়ে দিয়েছিল, আমার প্রথম কাজ হল লালচে ঘোড়ার সঙ্গে সেইখানে যাওয়া। একটা উঁচু টিলার উপরে চড়ে চারধারের সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে মনে হল উত্তরপুর্বে যেন একটা দ্বীপ দেখতে পাচ্ছি। পকেট দূরবীণ দিয়ে দেখে হিসাব কষে স্পষ্ট মনে হল দ্বীপটি মাইল পনেরো দূরে হবে কিন্তু লালচে ঘোড়ার মনে হল ওটা একটা নীল মেঘ বই আর কিছু নয়। নিজের দেশ ছাড়া অন্য কোনো দেশ সম্বন্ধে তার ধারণাই নেই ; তাছাড়া সমুদ্রের মধ্যে দূরের জিনিস দেখতে আমরা যতখানি অভ্যস্ত, সে তো আর নয়, কাজেই তার পক্ষে দ্বীপ চেনা সম্ভবও নয়।

এই দ্বীপটিকে আবিষ্কার করার পর আমি আর বেশি চিন্তা করলাম

না; মনে মনে স্থির করলাম ঐখানেই আমার নির্বাসন শুরু হবে, তার পরে যা কপালে থাকে তাই ঘটবে। বাড়ি ফিরে লালচে ঘোড়ার সঙ্গে পরামর্শ করবার পর, কিছু দূরে একটা বনে গিয়ে, আমি আমার ছুরি দিয়ে আর সে, ওদের যেমন থাকে, একটা ধারালো চকমকি পাথরের সঙ্গে কৌশল করে কাঠের হাতল লাগানো, তাই দিয়ে ছড়ির মতো সরু অনেকগুলি ওক গাছের কঞ্চি আর কয়েকটা তার চেয়ে মোটা ডাল কেটে নিয়ে এলাম।

আমার কারিগরির বিশদ্ বিবরণ দিয়ে পাঠক মহাশয়কে বিরক্ত করতে চাই না। এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে লালচে ঘোড়ার সাহায্য নিয়ে, ছয় সপ্তাহের মধ্যে রেড ইণ্ডিয়ানদের ক্যেনুর মতো একটা নৌকো তৈরী করে ফেললাম। লালচে ঘোড়া সমস্ত পরিশ্রমের কাজগুলি করে দিল। আয়তনে নৌকোটি ক্যেনুর চেয়ে অনেক বড়; নিজের হাতে তৈরী পাটের সুতো দিয়ে ইয়াহুর চামড়া সেলাই করে বাইরেটা মুড়ে ফেললাম। পালগুলিও ঐ জানোয়ারের চামড়া দিয়ে বানালাম, তবে যতটা সম্ভব কচি জানোয়ার বেছে নিলাম। ধাড়িগুলোর চামড়া বড় শক্ত ও পুরু। চারটে দাঁড়ও তৈরী করে নিলাম। খরগোস আর পাখির মাংস সিদ্ধ করে মজুত রাখলাম; দুটি পাত্রও নিলাম, একটিতে দুধ ও একটিতে জল।

প্রভুর বাড়ির কাছে বড় পুকুরে নৌকোটি চালিয়ে পরীক্ষা করলাম, দোষ-গুলি শুধরিয়ে নিলাম, ইয়াহুর চর্বি দিয়ে ফাটাফাটল বন্ধ করলাম, যতক্ষণ না বুঝলাম নৌকোটি যথেষ্ট মজবুৎ হয়েছে এবং আমার ও আমার মালপত্রের ওজন নিতে পারবে। তারপরে যখন যতটা সম্ভব নিখুঁৎভাবে কাজ শেষ হল, তখন লালচে ঘোড়া ও আরেকজন চাকরের তত্ত্বাবধানে নৌকোটাকে একটি গাড়িতে চাপিয়ে, খুব আস্তে আস্তে ইয়াহুদের দিয়ে টানিয়ে সমুদ্রতীরে নিয়ে এলাম।

সব যখন প্রস্তুত, যাবার দিন আগত, তখন বিগলিত নেত্রে ও শোক-ভারানত চিত্তে আমার প্রভু, তাঁর পত্নী ও সমস্ত পরিবারের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করলাম। কিন্তু কতকটা কৌতূহলের কারণে আর অহঙ্কার না করেও এটুকু বলতে পারি কতকটা দয়াপরবশ হয়ে, আমাকে নৌকো পর্যন্ত তুলে দেবেন বলে প্রভু স্থির করলেন; সঙ্গে কয়েকজন প্রতিবেশী বন্ধুকেও নিলেন।

জোয়ারের জন্যে এক ঘণ্টার উপরে আমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল, তারপরে যেই দেখলাম কি ভাগ্যে বাতাসটা আমার লক্ষ্যস্থল সেই দ্বীপটির

দিকে বইতে আরম্ভ করেছে, আমিও দ্বিতীয়বার প্রভুর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। মাটিতে শুয়ে পড়ে যেই তাঁর পায়ের খুরে চুমো খেতে যাব, তিনি নিজেই আস্তে আস্তে খুরটি আমার মুখের কাছে তুলে ধরে আমাকে সম্মানিত করলেন।

শেষোক্ত ব্যাপারটি উল্লেখ করার জন্যে অনেকে আমার নিন্দা করেছে এ কথা আমার অজানা নেই। নিন্দুকেরা ভাবতে পারে যে অমন উচ্চপদস্থ কেউ এতখানি বিনয় করে আমার মতো একটা নগণ্য লোককে অতখানি সম্মান দেখাতে যাবে এটা খুব বিশ্বাসযোগ্য কথা নয়। তাছাড়া তারা কত রকম অসাধারণ সম্মান লাভ করেছে এই নিয়ে ভ্রমণকারীরা চিরকালই দেমাক করতে প্রস্তুত এ কথাও ভুলিনি। কিন্তু এই সমালোচকরা যদি হুইন্‌ম্‌দের উন্নত ও শিষ্ট ব্যবহারের সঙ্গে আরেকটু পরিচিত হতেন, তখুনি তাঁদের মত বদলে যেত। সে যাই হক, আমার প্রভুর সঙ্গে বাকি যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে, আমি নৌকোয় চড়ে উপকূল ত্যাগ করে গেলাম।

একাদশ অধ্যায়

লেখকের বিপদসঙ্কুল সমুদ্রযাত্রা—বসবাসের আশায় নিউহল্যাণ্ডে আগমন—স্থানীয় অধিবাসীর তীরে আহত হওন—বন্দী অবস্থায় পর্টুগীজ জাহাজে বলপূর্বক আনীত হওয়া—ক্যাপ্টেনের অশেষ সৌজন্য—ইংল্যাণ্ডে আগমন।

১৫ই ফেক্রয়ারি ১৭১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে সকাল নয়টায় আমি এই বিপদসঙ্কুল যাত্রা শুরু করি। বাতাস খুবই অনুকুল।

প্রথমে শুধু দাঁড় ব্যবহার করছিলাম, তারপরে ভাবলাম যে এতে শীঘ্রই ক্লান্ত হয়ে পড়ব, বাতাসের দিক পরিবর্তন হতে পারে, কাজেই সাহস করে আমার ছোট পালটি তুলে দিলাম। সেই সঙ্গে জোয়ারের সাহায্যও পেয়ে যাওয়াতে ঘণ্টায় আন্দাজ সাড়ে চার মাইল বেগে এগুতে লাগলাম। যতক্ষণ আমাকে দেখা যায় প্রায় ততক্ষণ আমার প্রভু ও তাঁর বন্ধুরা তীররেখা ধরে এগিয়ে যেতে লাগলেন। প্রায়ই শুনতে পাচ্ছিলাম লালচে ঘোড়া, সে আমাকে সর্বদা বড় ভালোবাসত, চেঁচিয়ে বলছে হুঁই ইল্লা নিহা মাইয়া ইয়াহু, অর্থাৎ, হে কোমল ইয়াহু, সাবধানে যেও।

আমার অভিপ্রায় ছিল, যদি সম্ভব হয় ছোট একটা দ্বীপ খুঁজে নেব, যেখানে জনমানুষের বাস নেই কিন্তু নিজের চেষ্টায় জীবনধারণের ব্যবস্থা করা যায়। আমার মনে হচ্ছিল ইউরোপের আধুনিকতম রাজসভার প্রধানমন্ত্রীর আসন লাভ করার চেয়ে এতেই আমি বেশি সুখী হব; মানবসমাজে আবার ফিরে এসে ইয়াহুদের শাসনে বাস করার কথা ভেবে আমার মনে এমনি বিভীষিকার উদ্রেক হচ্ছিল। আমি যে ধরণের নৈঃসঙ্গ কামনা করছিলাম তাতে অন্ততঃ নিজের মনের চিন্তাগুলি উপভোগ করা সম্ভব হবে আর আমার স্বজাতিদের নানান দোষপাপে লিপ্ত হবার কোনও সুযোগ না পেয়ে অননুকরণীয় হুইন্‌ম্‌দের গুণাবলী স্মরণ করে আনন্দ সাগরে মগ্ন হতে পারব।

আমার নাবিকরা যখন বিদ্রোহ করে আমাকে ক্যাবিনে আটক করে রেখেছিল, সেই প্রসঙ্গে যা বলেছিলাম সে কথা পাঠকমহাশয়ের স্মরণ থাকতে পারে। বহু সপ্তাহ ঐভাবে আটক ছিলাম, কোন দিকে চলেছি সে বিষয়ে আমার

কোনো ধারণাও ছিল না; তারপরে যখন লংবোটে করে আমাকে তীরে নামিয়ে দেওয়া হল তখন, কথাটা সত্যি হক বা মিথ্যা হক, নাবিকরা দিব্যি করে বলেছিল, আমরা যে ভূপৃষ্ঠের কোন জায়গায় এসে পড়েছি তারাও জানে না। তবু আমার নিজের মনে হয়েছিল, আমরা উত্তমাশা অন্তরীপের দশ ডিগ্রি দক্ষিণে আছি, অর্থাৎ ৪৫° দক্ষিণ অক্ষাংশে। নাবিকদের নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা থেকে এইরকম মনে হয়েছিল, সম্ভবতঃ ওদের গন্তব্যস্থল মাদাগাস্কার যাবার পথের তখনো পুবদক্ষিণে ছিলাম। এ সমস্তই যদিও নিছক অনুমানের চেয়ে বেশি কিছু নয়, তবু স্থির করলাম পুবদিকেই যাব, এই আশাতে যে এদিকে গেলে হয়তো নিউ হল্যাণ্ডের দক্ষিণপশ্চিম উপকূলে পৌঁছে যাব এবং হয়তো বা তার পশ্চিমে আমি যেরকম চাই সেইরকম একটা দ্বীপও পেয়ে যেতে পারি।

পশ্চিমদিক থেকে সমানে বাতাস দিচ্ছে, সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যে আমার হিসাবে আমি পুব দিকে কম করে চুয়ান্ন মাইল এগিয়েছি, এমন সময় দেড় মাইল দূরে একটা ছোট দ্বীপ দেখতে পেলাম এবং অনতিবিলম্বে সেখানে পৌঁছেও গেলাম। দ্বীপ বলতে একটা প্রকাণ্ড পাথর আর একটি খাঁড়ি ছাড়া আর কিছু নয়, ঝড়ের তোড়ে পাথর কুঁদে খাঁড়িটি আপনি হয়েছে। এই খাঁড়ির মধ্যে নৌকো ঢুকিয়ে দিলাম, তারপর নেমে পাথরের উপর খানিকদূর চড়ে স্পষ্ট দেখলাম পুবদিকে একটি প্রকাণ্ড ভূমিখণ্ড, উত্তর থেকে দক্ষিণ অবধি ছড়িয়ে আছে। সারারাত নৌকোয় শুয়ে রইলাম, পরদিন ভোরে আবার যাত্রা করে সাত ঘণ্টা পরে নিউ হল্যাণ্ডের পুবদক্ষিণ কোণে পৌঁছলাম। যে ধারণা আমি মনে মনে বহুদিন ধরে পোষণ করেছি, অর্থাৎ এই অঞ্চলের সব মানচিত্র আর চার্টে জায়গাটাকে তার আসল অবস্থান থেকে তিন ডিগ্রি পুবে ঠেলে আঁকা হয়, এবার সে ধারণা সত্য বলে প্রমাণিত হল। এ কথা আমি অনেক বছর আগে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু মিস্টার হার্মান মলকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে বলেছিলাম, কিন্তু আমার কথা না শুনে, অন্য গ্রন্থকারদের কথা মেনে চলাটাই তিনি যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচনা করেছিলেন।

যেখানে নেমেছিলাম সেখানে কোনো অধিবাসীর চিহ্ন দেখতে পেলাম না আর সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র না থাকাতে ভিতর দিকে বেশি দূর যাবারও সাহস হল না। উপকূলেই কয়েকটা কাঁকড়া পেলাম, আগুন জ্বাললে পাছে অধিবাসীরা

আমার আগমনের কথা টের পায়, তাই সেগুলোকে কাঁচাই খেয়ে ফেললাম। সঙ্গে যা খাবার ছিল সেগুলো বাঁচাবার জন্যে তিনদিন শামুক গুগলি খেয়ে রইলাম, তবে আমার কপাল ভালো যে একটা মিষ্টি জলের ঝর্ণা পেয়ে গেলাম, সেই জল পান করে বড়ই আরাম বোধ করলাম।

চতুর্থ দিন ভোর বেলা বেরিয়ে সাহস করে একটু বেশি দূর চলে গিয়েছিলাম, দেখি খুব বেশি হলে আমার কাছ থেকে পাঁচশো গজ দূরে একটা টিলার উপর বিশ ত্রিশ-জন স্থানীয় অধিবাসী। সকলে একেবারে উলঙ্গ, ধোঁয়া দেখে আন্দাজ করলাম পুরুষ, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে সবাই মিলে আগুন জেলে তার চারদিকে বসে আছে। ওদের মধ্যে একজন আমাকে দেখতে পেয়ে অন্যদের জানিয়ে দিল। মেয়েরা আর ছেলেপিলেরা আগুনের ধারেই বসে রইল আর জনা পাঁচেক পুরুষ আমার দিকে এগিয়ে এল। আমিও যত তাড়াতাড়ি পারি সমুদ্রতীরে পৌঁছে, নৌকো চেপে রওনা দিলাম। আমাকে পালাতে দেখে অসভ্যরাও আমার পিছন পিছন ছুটতে লাগল আর আমি খুব বেশি দূর এগোবার আগেই আমাকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ল। একটা তীর এসে আমার বাঁ হাঁটুর পিছনে লাগল, তার দাগ আমি আমরণ বয়ে বেড়াব। ভয় হচ্ছিল তীরটা যদি বিষাক্ত হয়, কাজেই ওদের নাগালের বাইরে গিয়ে, আবহাওয়া শান্ত দেখে, ক্ষতটাকে চুষে পরিষ্কার করে যে করে হোক ব্যাণ্ডেজ করে ফেললাম।

কি যে করি ভেবে পাই না, ঐ জায়গায় আর ফিরবার সাহস হল না, তাই উত্তরদিকে চললাম। বাধ্য হয়ে দাঁড় বাইতে লাগলাম, কারণ বাতাস খুব মৃদুমন্থর হলেও, আমার প্রতিকূল দিক থেকে উত্তরপশ্চিম অভিমুখে বইছে। তীরে আসবার একটা নিরাপদ জায়গা খুঁজছি, এমন সময় উত্তর-উত্তর-পূর্বে একটা জাহাজের পাল দেখতে পেলাম; প্রতি মুহূর্তে সেটা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল আর আমি ইতস্তত: করতে লাগলাম জাহাজটার জন্যে অপেক্ষা করব কি না। শেষ পর্যন্ত ইয়াহু জাতির প্রতি আমার বিদ্বেষের জয় হল, আমি পাল তুলে দাঁড় বেয়ে, সকাল বেলায় যে খাঁড়িটা থেকে বেরিয়েছিলাম আবার তার মধ্যে গিয়ে সেঁধোলাম; ভাবলাম ইউরোপের ইয়াহুদের সঙ্গে বাস করার চেয়ে এই অসভ্যদের কাছে আত্মসমর্পন করা ভালো।

তীরের যথাসম্ভব কাছে নৌকোটাকে নিয়ে গেলাম, তারপর মিষ্টি জলে ভরা যে ছোট ঝর্ণাটির কথা বলেছি, তারি ধারে একটা পাথরের পিছনে লুকিয়ে রইলাম।

জাহাজ খাঁড়িটার দেড় মাইলের মধ্যে এসে, হাঁড়িকলসি দিয়ে লংবোট পাঠাল পানীয় জলের জন্যে ; পরে শুনলাম এ জায়গাটা নাকি সকলেরই জানা, কিন্তু ওদের নৌকো প্রায় তীরে পৌছে যাবার আগে আমি কিছু লক্ষ্য করিনি, তখন আর লুকোবার জন্যে নতুন জায়গা দেখে নেবার সময় ছিল না। নেমেই নাবিকরা আমার ক্যেনুটা দেখতে পেয়ে এবং সেটি নেড়ে চেড়ে সহজেই বুঝল নৌকোর মালিকও নিশ্চয়ই বেশি দূরে নেই। ওদের মধ্যে চারজন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আশেপাশে খাঁজে ফাটলে সব জায়গায় আমাকে খুঁজে বেড়াতে লাগল, শেষ অবধি দেখে পাথরটার আড়ালে মাটিতে উপুড় হয়ে মুখ গুঁজে পড়ে আছি।

কিছুক্ষণ তারা হাঁ করে আমার অদ্ভুত জংলি পোষাকের দিকে চেয়ে রইল, জানোয়ারের ছালের কোট, কাঠের তৈরী জুতোর তলা, লোমের মোজা। তবে এসব দেখে তারা এও বুঝল যে আমি এখানকার অধিবাসী নই, কারণ এরা উলঙ্গই থাকে।

নাবিকদের মধ্যে একজন পর্তুগিজ ভাষায় আমাকে উঠতে বলল, তারপর জানতে চাইল আমি কে। ও ভাষাটি আমি ভালোই বুঝি, উঠে দাঁড়িয়ে বললাম আমি একজন হতভাগ্য ইয়াহু, হুইনম্‌রা আমাকে নির্বাসন দিয়েছে, আমাকে যেন এরা ছেড়ে দেয়। তাদের নিজেদের ভাষায় আমাকে উত্তর দিতে শুনে তারা তো অবাক। আমার গায়ের রঙ দেখে অবিশ্যি সবাই বুঝতেই পারছিল যে আমি ইউরোপবাসী, কিন্তু ইয়াহু হুইনম্‌ বলতে কি বোঝাতে চাই সেটি একেবারেই ভেবে পাচ্ছিল না আর সেই সঙ্গে ঘোড়ার ডাকের মতো অদ্ভুত স্বরে আমাকে কথা কইতে শুনে তো সব হেসেই খুন!

ভয় আর বিদ্বেষের মাঝ-টানে পড়ে আমি কেঁপে টেঁপে একাকার, আবার বললাম আমাকে ছেড়ে দিতে, বলেই গুটিগুটি নৌকোর দিকে এগুতে যাচ্ছি, এমন সময় ওরা আমাকে চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করল আমার বাড়ি কোন দেশে, কোথা থেকে এসেছি, এই ধরণের আরো কত কি। বললাম আমি

ইংল্যাণ্ডে জন্মেছি, বছর পাঁচেক আগে সেখান থেকে এসেছি, সে সময় পর্তুগালের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের শান্তির সম্বন্ধ ছিল, কাজেই আশা করি ওরা আমাকে শত্রু ঠাওরাচ্ছে না, কারণ আমি ওদের কোনো অনিষ্ট করতে চাই না, আমি একজন হতভাগ্য ইয়াহু, লক্ষ্মীছাড়া জীবনের বাকি অংশটুকু কাটাবার জন্যে একটা নির্জন স্থান খুঁজে বেড়াচ্ছি।

ওরা কথা বলতে শুরু করতেই আমার মনে হচ্ছিল এরকম অস্বাভাবিক ব্যাপার কখনো দেখিনি বা শুনিনি। ইংল্যাণ্ডে যদি হঠাৎ একটা কুকুর কিম্বা গোরু কথা কইতে শুরু করত, কিম্বা হুইনম্‌দের দেশে যদি একটা ইয়াহু কথা কইত, তা হলে যেরকম অদ্ভুত ব্যাপার হত, আমার মনে হচ্ছিল এও যেন তাই। পর্তুগিজরা লোক ভালো ছিল, কিন্তু আমার কিম্ভূতকিমাকার পোষাক, কথা বলার অদ্ভুত ঢং দেখে তারা অবাক, অবিশ্যি সবই বুঝতে পারছিল। আমার সঙ্গে তারা ভারি সদয়ভাবে আলাপ করতে লাগল, বলল যে তারা নিশ্চিত জানে যে তাদের ক্যাপ্টেন আমাকে বিনা মাশুলে লিজবন অবধি নিয়ে যাবেন, সেখান থেকে আমি দেশে ফিরতে পারব; দু জন নাবিক এখুনি জাহাজে ফিরে গিয়ে ক্যাপ্টেনকে ব্যাপারটা সবিশেষ জানিয়ে তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসছে। কিন্তু ইত্যবসরে যদি আমি পালাবার চেষ্টা করব না বলে কথা না দিই, তাহলে ওরা আমাকে জোর করে বেঁধে রাখবে। ওদের কথায় রাজী হওয়াই বুদ্ধির কাজ বলে মনে হল। আমার কাহিনী শুনবার জন্যে এদিকে ওদের ভারি কৌতূহল, আমি কিন্তু বেশি কিছু বলে ওদের কৌতূহল মেটালাম না, শেষ পর্যন্ত ওরা মনে করল, দুঃখে কষ্টে পড়ে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। জল বোঝাই নৌকোগুলো চলে গেল এবং ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে ক্যাপ্টেনের হুকুম নিয়ে ফিরে এল আমাকে যেন জাহাজে নিয়ে যাওয়া হয়। আমি হাঁটু গেড়ে স্বাধীনতা ভিক্ষা করতে লাগলাম, কিন্তু তার কোনও ফল হল না, দড়ি দিয়ে বেঁধে তারা আমাকে নৌকোয় তুলল, সেখান থেকে জাহাজে তুলল, তারপর ক্যাপ্টেনের ক্যাবিনে নিয়ে গেল।

তাঁর নাম ছিল পেড্রো ডি মেণ্ডেজ্, ভারি ভদ্র ও উদার স্বভাব তাঁর। তিনি আমাকে নিজের কথা খুলে বলতে অনুনয় করতে লাগলেন; কি খেতে চাই, কি পান করতে চাই জানতে চাইলেন আর বললেন যে তাঁর সঙ্গে

সকলে যে রকম ব্যবহার করে, আমার সঙ্গেও তাই করবে; তাছাড়া আরো এত রকম ভালো কথা বললেন যে একজন ইয়াহুর মুখে সেসব শুনে আমি অবাক! তবুও চুপ করে হাঁড়িমুখ করে রইলাম; তাঁর ও তাঁর লোকজনের গায়ের গন্ধেই আমার অজ্ঞান হবার জোগাড়। শেষ পর্যন্ত বললাম আমার নিজের নৌকো থেকে কিছু খাবার এনে দিলে খেতে পারি, কিন্তু তিনি আমাকে একটা মুর্গি আর খানিকটা উৎকৃষ্ট মদ এনে দিতে বললেন। তারপর হুকুম দিলেন যেন একটা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক্যাবিনে আমার শোবার বন্দোবস্ত করা হয়। কিছুতেই কাপড় ছাড়লাম না; সব পরেই বিছানার উপরে শুয়ে রইলাম, তারপর আধ ঘণ্টা বাদে যখন মনে হল নাবিকরা বোধ হয় খেতে গেছে, তখন গুটিগুটি বেরিয়ে এলাম। ইয়াহুদের মধ্যে বাস করার চেয়ে প্রাণ হাতে নিয়ে সাঁতরে পালানো ভালো, এই ভেবে জাহাজের কিনারায় গিয়ে সবে জলে ঝাঁপ দেবার জোগাড় করছি, এমন সময় একজন নাবিক আমাকে বাধা দিল। তারপর ক্যাপ্টেনকে ব্যাপারটা জানানো হল, ফলে আমাকে শিকল দিয়ে ক্যাবিনে বেঁধে রাখা হল।

রাত্রে খাবার পর ডন পেড্রো আমার কাছে এসে এইরকম মরীয়া হয়ে উঠবার কারণ জানতে চাইলেন। তাঁর একমাত্র ইচ্ছা ছিল তাঁর সাধ্যমতো আমার উপকার করা; এত মর্মস্পর্শীভাবে তিনি কথা বলতে লাগলেন যে শেষ পর্যন্ত একটা অল্পবুদ্ধি জানোয়ারের সঙ্গে লোকে যে ব্যবহার করে ওঁর সঙ্গেও তাই করলাম। আমার সমুদ্রযাত্রার সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিলাম, আমার অধীনস্থ নাবিকদের বিদ্রোহের কথা বললাম, যে দেশের উপকূলে তারা আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল তার কথা ও সেখানে পাঁচ বছর বাসের কথা বললাম। তিনি এমন করে শুনতে লাগলেন যেন স্বপ্ন বা মায়াজাল দেখছেন, তাতে আমার ভারি রাগ হল, কারণ ততদিনে মিথ্যা বলার ক্ষমতা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম। যেখানেই ইয়াহুরা যায় সেখানেই তারা নিজেরা মিথ্যা কথা বলে, কাজেই স্বজাতিদের কথার সততা সন্দেহ করাই তাদের স্বভাব। ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞাসা করলাম তাঁদের দেশের লোকদের 'যা নয় তাই' বলা অভ্যাস কিনা। বললাম মিথ্যা বলতে কি বোঝায় সে কথা আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছি, যদি হুইন্‌মদের দেশে হাজার বছর বাস করতাম তবু কখনো ওখানকার হীনতম চাকরের মুখেও মিথ্যা কথা শুনতাম না। আমার

কথা তিনি বিশ্বাস করছেন কি না করছেন, তাতে আমার বিন্দুমাত্র এসে যায় না, তবু তিনি যখন আমার প্রতি এতটা অনুগ্রহ দেখিয়েছেন, তার বিনিময়ে তাঁর স্বাভাবিক নিকৃষ্টতা মার্জনা করে, তাঁর যদি আপত্তি করার কিছু থাকে, তার সদুত্তর দেব, তাতে সত্য অবস্থা আবিষ্কার করতে তাঁর এতটুকু কষ্ট হবে না।

ক্যাপ্টেন ছিলেন বুদ্ধিমান ব্যক্তি; আমার কাহিনীতে ভুল ধরে দেবার অনেক চেষ্টা করার পর, আমার সততা সম্পর্কে তাঁর আরো ভালো ধারণা হল। তারপর কিন্তু তিনি বললেন যে আমি যখন নিজেকে এতই সত্যানুরাগী বলে পরিচয় দিচ্ছি, তখন তাঁকে কথা দিতে হবে যে যাত্রাপথে আর কখনো আমি নিজের প্রাণহানির চেষ্টা করব না। কথা দিলাম বটে, তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও বললাম যে ইয়াহুদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের সঙ্গে বাস করার চেয়ে, যত রকম কষ্ট হতে পারে সব আমি সহ্য করতে প্রস্তুত আছি।

যাত্রাপথে বিশেষ কোনো দুর্ঘটনা হয়নি। ক্যাপ্টেনের প্রতি কৃতজ্ঞতা বশতঃ, তাঁর বিশেষ অনুরোধে মাঝে মাঝে কাছে বসতাম। মানবজাতির প্রতি আমার বিদ্বেষ যথাসাধ্য গোপন করবার চেষ্টা করলেও, থেকে থেকে সেটা ফেটে বেরুত, তিনি তখন যেন দেখেও দেখতেন না। পাছে নাবিকদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তাই দিনের মধ্যে বেশির ভাগ সময় আমার নিজের ক্যাবিনের ভিতরে কাটাতাম। প্রায়ই ক্যাপ্টেন আমাকে অনুরোধ করতেন জংলি পোষাক ছেড়ে তাঁর সবচেয়ে ভালো পোষাকটি গায়ে দিতে; সেটি তিনি আমাকে ধার দিতে চাইতেন। এ প্রস্তাবে আমি কিছুতেই রাজী হতাম না; যে জিনিস ইয়াহুতে পরেছে, সে জিনিস গায়ে দিতে আমার দারুণ ঘৃণা হত। আমি বলতাম আমাকে দুটি পরিষ্কার সার্ট দিলেই হবে; সার্টগুলি তিনি গায়ে দেবার পর সেগুলোকে কাচা হয়েছে, কাজেই এতে আমার নিজেকে অতটা অপবিত্র মনে হত না। একদিন অন্তর সার্ট বদলিয়ে, নিজেই কেচে নিতাম।

১৭১৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর আমরা লিজবন পৌঁছলাম। জাহাজ থেকে নামবার সময়, পাছে রাস্তার বাজে লোকরা আমার চারদিকে ভিড় করে, তাই ক্যাপ্টেন আমাকে তাঁর ক্লোক দিয়ে সর্বাঙ্গ ঢাকতে বাধ্য করলেন। তিনি আমাকে তাঁর নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন; সেখানে পৌঁছে আমার

অনুরোধে বাড়ির পিছন দিকের সব চেয়ে উপরতলার একটি ঘরে আমাকে জায়গা দিলেন। আমি তাঁকে বিশেষ করে বলে দিলাম যেন হুইন্‌ম্‌দের সম্পর্কে যা যা বলেছি সব গোপন করেন, কারণ এমন একটা গল্পের বিন্দুবিসর্গও যদি বাইরে জানাজানি হয়, শুধু যে দলে দলে লোক আমাকে দেখতে আসবে তা নয়, উপরন্তু এই ভয়ও আছে যে হয় ওরা আমাকে ধরে জেলে পুরবে, নয় তো ইন্‌কুইজিসন নামক ওদিককার কুখ্যাত ধর্মযাজকদের দল আমাকে পুড়িয়ে মারবে। এক স্যুট কাপড়চোপড় গ্রহণ করতে ক্যাপ্টেন আমাকে রাজী করালেন, তাই বলে দর্জিকে আমার মাপ নিতে দিইনি। ডন পেড্রোর আর আমার মাপ অনেকটা এক রকম ছিল, কাজেই তাঁর মাপে তৈরী পোষাক আমার গায়েও বেশ লাগল। অন্যান্য দরকারি পরিচ্ছদ সব নতুন করিয়ে দিলেন তবে সেগুলো ব্যবহার করবার আগে চব্বিশ ঘণ্টা হাওয়ায় মেলে রেখেছিলাম।

ক্যাপ্টেনের স্ত্রী ছিলেন না, তিনটির বেশি চাকরও ছিল না; খাবার সময় তাদের কাউকে পরিবেশন করতেও দিলেন না; মোটের উপর তাঁর সমস্ত ব্যবহার এত সদয় ও সহানুভূতিশীল যে বাস্তবিকই তাঁর সঙ্গ আমার কাছে আর অসহ্য বলে মনে হচ্ছিল না। তিনি আমাকে এতখানি প্রভাবিত করলেন যে সাহস করে পিছন দিকের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিলাম। ক্রমে ক্রমে আমাকে অন্য একটা ঘরেও নিয়ে আসা হল, সেখান থেকে একবার সদর রাস্তায় উঁকি মেরেই আবার তখুনি ভয়ের চোটে মাথা ঢুকিয়ে নিলাম। এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি আমাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে সদর দরজা অবধি নিয়ে যেতে পারলেন। দেখলাম যে আস্তে আস্তে আমার ভয়টা কমে যাচ্ছে বটে, কিন্তু বিদ্বেষ ও ঘৃণার ভাবটা যেন আরো বেড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত এতটা সাহস হল যে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে রাস্তায় বেড়াতে বেরুলাম, অবিশ্যি 'রু' বলে একরকম সুগন্ধী পাতা কিম্বা একটু তামাক পাতা দিয়ে নাকের ফুটো বন্ধ করে, তারপর।

ডন পেড্রোকে আমার পারিবারিক ব্যাপার কিছু কিছু বলেছিলাম; দশ দিন পরে তিনি বললেন যে দেশে ফিরে গিয়ে স্ত্রী-পুত্র পরিবারের সঙ্গে বাস করাই ধর্ম ও বিবেকের দিক থেকে আমার কর্তব্য। তিনি আরো বললেন যে বন্দরে একটা ইংল্যাণ্ডের জাহাজ একেবারে তৈরী, সেটাতে চড়ে দেশে যাবার

জন্য যা যা করা দরকার, সব কিছুর তিনি ব্যবস্থা করে দেবেন। তাঁর যুক্তি ও আমার আপত্তির কথা শুনতে পেলে সকলের বিরক্ত লাগবে, মোট কথা তিনি বললেন যে আমি যেরকম নির্জন দ্বীপে বাস করতে চাই, সেরকম পাওয়া নিতান্তই অসম্ভব, কিন্তু নিজের বাড়িতে আমার হুকুম মতো ব্যবস্থা হতে পারে, সেখানেই যত খুসি সকলের দৃষ্টির আড়ালে বাস করতে পারব।

শেষ অবধি নিরুপায় হয়ে রাজী হয়ে গেলাম। ২৪শে নভেম্বার একটা ইংলিশ বাণিজ্যপোতে চড়ে লিজবন ছেড়ে গেলাম ; জাহাজের ক্যাপ্টেনের নাম জিজ্ঞাসাও করিনি। ডন পেদ্রো আমাকে জাহাজে পৌছে দিলেন, কুড়ি পাউণ্ড ধার দিলেন ও বিদায়কালে আলিঙ্গন করলেন, অনেক কষ্টে সেটা সহ্য করলাম, কিন্তু আমার এই শেষ যাত্রাকালে ক্যাপ্টেন কিম্বা তার নাবিকদের কারো সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখিনি, অসুখের ভান করে নিজের ক্যাবিনের ভিতরে পড়েছিলাম। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বার সকাল ন'টায় ডাউন্সে পৌছে আমরা নোঙর ফেললাম আর বেলা তিনটের মধ্যে রেডরিফে নিজের বাড়িতে নিরাপদে পৌছলাম।

আমার স্ত্রী-পুত্র পরিবার ধরেই নিয়েছিল যে আমি মরে গেছি, কাজেই আমাকে দেখে তারা যেমন আশ্চর্য তেমনি আনন্দিত হয়েছিল, কিন্তু আমি খোলাখুলি স্বীকার করছি যে তাদের দেখে আমার নিজের মনটা শুধু বিদ্বেষ, ঘৃণা আর অবজ্ঞায় ভরে উঠেছিল এবং তাদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা মনে করে এ ভাবটা উত্তরোত্তর বেড়েই যাচ্ছিল। আমার মন্দ ভাগ্যের জন্যে হুইন্‌ম্‌দের দেশ থেকে নির্বাসিত হবার পর, যদিও ইয়াহুদের দর্শন করতে ও ডন পেদ্রো ডিমেণ্ডেজের সঙ্গে আলাপ করতে নিজেকে জোর করে অভ্যাস করিয়েছিলাম, তবু আমার সমস্ত স্মৃতিপট ও কল্পনালোক সর্বদাই মহিমান্বিত হুইন্‌ম্‌দের নানান গুণ ও আদর্শ দিয়েই পূর্ণ থাকত। তাছাড়া যখনি ভেবেছি যে একজন ইয়াহু জাতীয়ার সঙ্গে সহবাস করে আরো কতকগুলো ইয়াহুর জনক হয়েছি, তখনি নিরতিশয় লজ্জা, মানসিক বিপর্যয় ও নিদারুণ ঘৃণায় পূর্ণ হয়েছি।

বাড়িতে প্রবেশ করবামাত্র আমার স্ত্রী আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেলেন। অনেকদিন ঘৃণিত ইয়াহুর স্পর্শে অভ্যাস নেই, তক্ষুনি অচেতন হয়ে পড়ে গেলাম, ঘণ্টা খানেকের আগে জ্ঞান ফিরে এল না। এ কথাগুলি লেখা কালে

আমার ইংল্যাণ্ডে ফেরার পর পাঁচ বছর কেটে গেছে। প্রথম বছরটা আমার স্ত্রী কিম্বা ছেলে মেয়েরা কাছে এলে আমি সইতে পারতাম না, তাদের গায়ের গন্ধই অসহ্য মনে হত, একঘরে বসে খাওয়া-দাওয়া করা তো দূরের কথা! আজ অবধি ওরা আমার রুটি ছুঁতে বা আমার পেয়ালা থেকে জল খেতে সাহস পায় না; ওদের কাউকে আমার হাত ধরতেও দিই না।

ফিরে এসে প্রথম পয়সা খরচ করলাম দুটি ভালো ঘোড়া কিনে। ঘোড়া দুটিকে একটা চমৎকার আস্তাবলে রেখেছি, তাদের পরেই আমার সব চেয়ে প্রিয় পাত্র হল তাদের সহিসটি। আস্তাবল থেকে তার গায়ে যে গন্ধ লেগে থাকে তাতেই আমার মন ভালো হয়ে যায়। আমার ঘোড়ারা আমার কথা বেশ বোঝে, রোজ তাদের সঙ্গে অন্ততঃ ঘণ্টা চারেক গল্প করি। জিন লাগাম কাকে বলে ওরা জানে না; আমার প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি ও পরস্পরের প্রতি বন্ধুত্ব, এই নিয়েই ওরা বেঁচে আছে।

দ্বাদশ অধ্যায়

লেখকের সত্যবাদিতা—এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য—মিথ্যাবাদী ভ্রমণকারীদের নিন্দা—এ রচনার কোনো মন্দ উদ্দেশ্যে রচয়িতার অস্বীকৃতি—আপত্তির প্রতিবাদ—উপনিবেশ স্থাপনের পদ্ধতি—স্বদেশের স্তুতিবাদ—বিবৃত দেশসমূহের উপর ইংল্যাণ্ড-রাজের দাবী সমর্থন—সে সব দেশ জয় করার অসুবিধা—পাঠকের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ—ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রার প্রস্তাব—সৎপরামর্শ ও সমাপ্তি।

হে ভদ্র পাঠক, এই আমার ষোল বছর সাত মাসের অধিককালের বিদেশ ভ্রমণের যথার্থ বিবৃতি ; আগাগোড়া সত্য ঘটনাই লিখে গিয়েছি, বাক্যালঙ্কারের দিকে দৃষ্টি দিইনি। অন্যদের মতো হয়তো আমিও আশ্চর্য ও অবিশ্বাস্য গল্প বলে আপনাকে অবাক করে দিতে পারতাম, কিন্তু ইচ্ছা করেই আমি অনাড়ম্বর সত্য কথা সরলভাবে ও সহজ ভাষায় বিবৃত করলাম। আমার উদ্দেশ্য আপনাকে জ্ঞানদান করা, বিনোদন করা নয়।

যে সব দূরদেশে ইংল্যাণ্ড বা ইউরোপের অধিবাসীরা কদাচিৎ যায়, সেখানে যারা ভ্রমণ করে, তাদের পক্ষে আশ্চর্য সব সামুদ্রিক ও স্থলচর জীবের কথা বলা খুব সহজ। অথচ দেশ বিদেশ সম্পর্কে ভ্রমণকারীরা যা কিছু বলেন, তার প্রধান উদ্দেশ্যই হওয়া উচিত পাঠকদের জ্ঞানের বৃদ্ধি ও স্বভাবের উন্নতি করা এবং ভালোমন্দ দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁদের মানসিক উন্নয়ন ঘটানো।

আমার আন্তরিক বাসনা যে এমন একটা আইন প্রণয়ন করা হক, যাতে স্ব-স্ব ভ্রমণকাহিনী প্রকাশ করবার আগে প্রত্যেক ভ্রমণকারীকে দেশের প্রধান বিচারক মহাশয়ের সামনে শপথ নিতে হয় যে তিনি যা-যা প্রকাশ করতে ইচ্ছুক, তাঁর জ্ঞানানুসারে সে সব নির্ভেজাল সত্য। এইরকম যদি করা যায়, তাহলে সচরাচর যে প্রবঞ্চনা ঘটে থাকে সেটি বন্ধ হবে, যথা, কোনো কোনো রচয়িতা নিজেদের রচনাকে জনপ্রিয় করে তুলবার অভিপ্রায়ে, অসতর্ক পাঠকের উপর ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা কথা চাপান। অল্প বয়সে আমিও পরম আনন্দের সঙ্গে অনেক ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়েছি ; কিন্তু তারপরে ভূপৃষ্ঠের অধিকাংশ স্থানে ভ্রমণ করে, নিজে চাক্ষুষভাবে দেখে এসে এইসব অতিরঞ্জিত কাহিনীর

অযাথার্থ প্রতিপন্ন করতে পারি। এই ধরনের পাঠ্যের উপর এখন আমার ঘৃণা ধরে গেছে এবং সেই সঙ্গে পাঠকদের বিশ্বাস করবার ক্ষমতার এ রকম দুর্বিনীত অপমান দেখে রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে।

অতএব আমার বন্ধুবান্ধবরা যখন বলেছিলেন দেশের লোকে আমার ভ্রমণবৃত্তান্ত গ্রহণযোগ্য মনে করতেও পারে, তখনি আমি মনে মনে এই ব্রত নিয়েছিলাম যে কদাচ সত্যের পথ থেকে বিচলিত হব না, চিরকাল সত্যের প্রতি নিষ্ঠা রাখব। আমার শ্রদ্ধাভাজন প্রভু এবং অন্যান্য গুণবান হুইন্‌ম্‌দের কথার বিনীত শ্রোতা হবার সম্মান দীর্ঘকাল ধরে লাভ করেছিলাম, বাস্তবিক এঁদের বক্তৃতা ও দৃষ্টান্তের কথা যতদিন আমার স্মরণ থাকবে, সত্য থেকে ভ্রষ্ট হবার প্রলোভনের আমার এতটুকুও আশঙ্কা থাকবে না।

যে সব লেখার জন্যে প্রতিভা বা বিদ্যা লাগে না, কিম্বা প্রখর স্মৃতিশক্তি অথবা একটা নিখুঁৎ দিনপঞ্জিকা রাখা ছাড়া অন্য কোনো গুণের দরকার হয় না, সে সব রচনা থেকে কতটুকু খ্যাতি অর্জন করা যায় সেটা আমার খুব ভালো করেই জানা আছে। এও আমি জানি যে অভিধান রচয়িতাদের মতোই, ভ্রমণকাহিনীকারদের মধ্যেও যাঁরা পরে এসে পূর্ববর্তীদেব ঘাড়ে চাপেন, তাঁদের ভারাবেগের চোটে আগের লেখকরা একেবারে নিখোঁজ হয়ে যান। আমার গ্রন্থে যে সব দেশের বর্ণনা দিয়েছি, সেখানে ভবিষ্যৎকালে যে ভ্রমণ-কারীরা যাবেন, তাঁরা হয়তো আমার ভুলগুলি ধরে দেবেন—অর্থাৎ যদি ভুল থেকে থাকে—তারপর সেইসঙ্গে হয়তো নিজেদের নতুন নতুন আবিষ্কারের কথা বলে আমার জনপ্রিয়তা ঘুচিয়ে, নিজেরাই আমার জায়গাটি জুড়ে বসবেন; আমি যে আবার একজন লেখক ছিলাম, পৃথিবীর লোকে হয়তো তাও ভুলেই যাবে। যদি খ্যাতির জন্যে এ বই লিখতাম, তা হলে এতে আমি নিদারুণভাবে মর্মাহত হতাম। কিন্তু যেহেতু আমার একমাত্র অভিপ্রায় হল জনসাধারণের উপকার করা, ওরকম হলেও আমার কোনো দুঃখ থাকবে না।

মহামহিমাময় হুইন্‌ম্‌দের গুণের কথা পড়ে কে বা নিজেকে দেশের শাসকবর্গের অন্যতম বলে পরিচয় দেবার সময় নিজের পাপরাশির জন্যে লজ্জিত না হবে? যে সব সুদূর দেশে ইয়াহুরা রাজত্ব করে তাদের সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না; তাদের মধ্যে ব্রবডিংনাগবাসীরা সব চেয়ে কম পাপী, এদের নীতির ও রাষ্ট্রনীতির জ্ঞানসমৃদ্ধ আদর্শগুলি আমরা যদি গ্রহণ করতাম

তাহলে আমরা কত সুখী হতাম। আর বৃথা বক্তৃতা করব না, বুদ্ধিমান পাঠক মহাশয় নিজেই বিচার করে এসব শিক্ষা প্রয়োগ করবেন।

এ কথা ভেবে আমি কম খুশি হচ্ছি না যে আমার এ গ্রন্থের কোনো নিন্দুক থাকা সম্ভবপর নয়, কারণ যে লেখক শুধু এমন সব দূর দেশের সরল সত্য ঘটনার কথা লেখেন, যাদের সঙ্গে কি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কি রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে, আমাদের কোনো স্বার্থের যোগাযোগই নেই, তার রচনার মধ্যে কি কোনো দোষ থাকতে পারে? সাধারণ ভ্রমণকাহিনীকারদের বিরুদ্ধে যে সব ন্যায্য অভিযোগ আনা যায়, সে সমস্তই আমি সযত্নে পরিহার করে গিয়েছি। তাছাড়া আমি দলীয় নীতির ধার ধারি না। আজকাল যখন লিখি তখন কোনো মানুষ বা মানবগোষ্ঠির বিরুদ্ধে কোনো উগ্র ভাব, কি বিদ্বেষ, কি অসদিচ্ছা নিয়ে লিখি না। আমি যে অভিপ্রায় নিয়ে লিখি সেই হল শ্রেষ্ঠ, যথা, মানবজাতিকে জ্ঞান ও শিক্ষা দান করা। পরম গুণশীল হুইনম্‌দের সঙ্গে এতকাল সদালাপ করার ফলে, সাধারণ মানুষদের চেয়ে আমি যদি কিঞ্চিৎ উৎকর্ষ দাবী করি, বিনয়ের অভাব তাতে প্রকাশ করা হবে না। লাভ বা খ্যাতির আশাতেও আমি লিখি না। আমি কখনো এমন একটি কথাও লিখি না যাকে কারো সম্পর্কে মন্তব্য বলা যেতে পারে, কিম্বা যাঁরা সর্বদাই ক্ষুণ্ণ হতে প্রস্তুত তাঁদের মধ্যেও কেউ যাতে অসন্তুষ্ট হতে পারেন। অতএব আশা করছি আমি ন্যায্যভাবেই নিজেকে একজন নিখুঁৎ গ্রন্থকার বলতে পারি, যাঁর বিপক্ষে উত্তরদাতা, বিবেচক, নিরীক্ষক, পরীক্ষক, তদন্তকারী ও মন্তব্যকারের দল স্ব-স্ব প্রতিভার কৌশল দেখাবার কোনো উপকরণ খুঁজে পাবেন না।

একথা স্বীকার করছি যে প্রথম যখন দেশে ফিরলাম, আমার কানে কানে কেউ কেউ বলেছিলেন যে যেহেতু আমি ইংল্যাণ্ড-রাজের প্রজা, কোনো রাজসচিবের কাছে আমার একটি স্মারকলিপি সমর্পণ করা উচিত, কারণ প্রজা যদি কোনো নতুন দেশ আবিষ্কার করে, রাজার মধ্যে তার মালিকানা বর্তায়। কিন্তু দিগ্‌বসন আদি মার্কিনবাসীদের ফার্ডিনাণ্ডো কর্টেজ যত সহজে পরাজিত করেছিলেন, আমি যে সব দেশের কথা লিখেছি তাদের অত সহজে জয় করা যাবে কি না, সে বিষয় আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে।

লিলিপুটবাসীদের পরাজয় স্বীকার করাতে যে নৌবহর ও সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন হবে, তার খরচ উঠবে না। ব্রবডিংনাগ আক্রমণ করাটা বুদ্ধির

কাজ কিম্বা আদৌ নিরাপদ হবে কি না সেটা বিবেচ্য। মাথার উপরে ভাসমান উড্ডুক্কু দ্বীপের বিপক্ষে ইংরেজ সৈন্য কি খুব সুবিধা করতে পারবে? অবিশ্যি হুইন্‌ম্‌রা যুদ্ধ করবার জন্যে সেরকম প্রস্তুত বলে মনে হয় না। যুদ্ধবিদ্যা তাঁদের কাছে একেবারে অজানা, বিশেষতঃ ক্ষেপণ অস্ত্রের বিরুদ্ধে। তবু যদি আমি রাজমন্ত্রী হতাম, আমি কদাচ হুইন্‌ম্‌দের আক্রমণ করার পরামর্শ দিতাম না। ওদের সতর্কতা, ঐক্য, ভয়শূন্যতা ও দেশপ্রেম দিয়ে যুদ্ধবিদ্যার ঘাটতিটুকু পর্যাপ্ত পরিমাণে পূর্ণ হয়ে যাবে।

কল্পনা করে দেখুন কুড়ি হাজার হুইন্‌ম্‌ ইউরোপীয় সৈন্যদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লে কি অবস্থাটা হবে, ব্যূহ ভেঙ্গে, কামানের গাড়ি উল্টিয়ে, পিছনের পায়ের প্রচণ্ড আঘাতে যোদ্ধাদের মুখ থেঁৎলো করে, সব একাকার করে দেবে। হুইন্‌ম্‌দের দেশ জয় করার প্রস্তাব না করে আমি বরং এই ইচ্ছা প্রকাশ করছি যে আমাদের ধর্ম, ন্যায়, সত্যপরায়ণতা, মিতাচার, নাগরিক কর্তব্য, সহিষ্ণুতা, পবিত্রতা, বন্ধুত্ব, মানবকল্যাণ ও বিশ্বস্ততা শিখিয়ে ইউরোপবাসীদের সভ্য করে তুলবার জন্য যথেষ্ট সংখ্যায় হুইন্‌ম্‌ পাঠাবার ক্ষমতা ও ইচ্ছা যদি ওদের থাকত, তাহলে মঙ্গল হত। আমাদের দেশের অধিকাংশ ভাষায় এসব গুণের নামটুকু মাত্র অবশিষ্ট আছে এবং প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থেও পাওয়া যায়। আমি নিজে যে সামান্য পড়াশুনো করেছি, তার থেকেই এ কথা বলতে পারছি।

তবে আরেকটি কারণও আছে যার জন্যে আমার আবিষ্কৃত দেশগুলি জুড়ে ইংল্যাণ্ডধিপতির সাম্রাজ্য বিস্তার করা সম্পর্কে আমি ততটা উৎসাহী নই। সত্যি কথা বলতে কি এসব ক্ষেত্রে রাজা-রাজড়াদের সুবিচারের উপরে আমার খানিকটা অনাস্থা আছে। ধরুণ এক দল জলদস্যু ঝড়ের মুখে পড়ে অজানা স্থানে উপস্থিত হল, মাস্তুলে চড়ে এক ছোকরা তীর রেখা দেখতে পেল, অমনি লুটের আশায় তারা সব জাহাজ থেকে নেমে পড়ল; হয়তো দেখল অধিবাসীরা সব নিরীহ; আগন্তুকদের তারা আপ্যায়ন করতে লাগল আর এরা দেশটার একটা নতুন নাম দিয়ে নিজেদের রাজার প্রতিনিধি হয়ে, আনুষ্ঠানিকভাবে দখল নিয়ে বসল। তারপর স্মারক চিহ্ন স্বরূপ এরা একটা পচাকাঠের তক্তা কিম্বা পাথর পুঁতে, দুতিন ডজন অধিবাসী খুন করে, জোর করে নমুনাস্বরূপ ডজন দুই ধরে নিয়ে দেশে ফিরল, অমনি তাদের দস্যুবৃত্তিও ক্ষমা পেয়ে গেল।

দেশে দৈব অধিকারের মালিকানায় অমনি রাজত্ব শুরু হল। যেই সুযোগ হল জাহাজ পাঠানো হল, সেখানকার দেশবাসীদের কতক মেরে ফেলা হল, কতক তাড়ানো হল, ধনের সন্ধানে রাজাদের উপর নির্মমভাবে অত্যাচার করা হল, সবাইকে অমানুষিক লালসার ছাড়পত্র দেওয়া হল, অধিবাসীদের রক্তে দেশের মাটি ভিজল। এমন পবিত্র অভিযানে লিপ্ত এই পাপিষ্ঠ খুনের দলটি হয়ে উঠল আধুনিক ঔপনিবেশিক, যাদের আগমনের উদ্দেশ্য নাকি পৌত্তলিক বর্বর জাতিদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করে সভ্যতা শেখানো।

অবিশ্যি একথাও মানছি যে এই বর্ণনাটি ব্রিটিশ জাতির প্রতি প্রযোজ্য নয়; উপনিবেশ স্থাপন করবার সময় তাঁরা যে বিচক্ষণতা, যত্ন ও ন্যায় বিচার দেখান তা সমগ্র পৃথিবীর সামনে আদর্শস্বরূপ। ধর্ম ও জ্ঞান বিস্তারের জন্য তাঁরা উদার হস্তে দান করেন; খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্যে তাঁরা ধর্মপরায়ণ ও দক্ষ পাদ্রী নিযুক্ত করেন; মাতৃভুমি থেকে উপনিবেশে যে সব লোক পাঠানো হয় তাদের ব্যবহার ও কথাবার্তা যেন ভদ্র ও সংযত হয় সেদিকে তাঁরা দৃষ্টি রাখেন, ন্যায় বিধানের প্রতি তাঁদের এত যত্ন যে উপনিবেশগুলির শাসন বিভাগের জন্যে যখনি কর্মচারী পাঠানো হয়, সবচেয়ে গুণী লোক নির্বাচন করা হয়, যারা কখনো ঘুষ নেয় না বা অন্যায় করে না এবং সবচেয়ে বড় কথা, সর্বদা তাঁরা এমন সব সতর্ক ও ধর্মপরায়ণ রাজ্যপাল পাঠান যাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল অধীনস্থ প্রজাদের সুখ বিধান করা এবং তাঁদের প্রভু ইংল্যাণ্ডের রাজার গৌরব রক্ষা করা।

কিন্তু আমি যেসব দেশের কথা লিখেছি, সেখানকার অধিবাসীরা পরাজিত হতে বা ক্রীতদাস হতে, কিম্বা খুন হতে বা বিতাড়িত হতে এতটুকু ইচ্ছুক নয়; সেখানে সোনা, রূপো, চিনি বা তামাকের ছড়াছড়ি নেই; আমার বিনীত মন্তব্য হল ওসব দেশ আমাদের আগ্রহ, বীরত্ব বা স্বার্থসিদ্ধির উপযুক্ত ক্ষেত্র নয়। তবে এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট এমন কেউ যদি থাকেন, যিনি আমার সঙ্গে একমত হতে পারছেন না, আমাকে বিধিমতে ডাকা হলে, আমি সকলের সামনে এই কথাই পেশ করব যে আমার আগে কোনো ইউরোপবাসী এসব দেশে পদার্পণ করেনি, অন্ততঃ ওখানকার অধিবাসীদের কথায় তাই মনে হয়।

তবে রাজার নামে দেশ অধিকার করার কথা আমার একবারও মনে

হয়নি; আর তাই যদি হত, তবু যে অবস্থায় পড়েছিলাম সেখানে, সুবুদ্ধি ও আত্মরক্ষার কারণে দেশ দখল করাটাকে অন্য এবং অধিক উপযুক্ত সময়ের জন্যে স্থগিত রাখতে হত।

ভ্রমণকারী হিসাবে আমার বিরুদ্ধে একমাত্র যে অভিযোগ আনা যায় তার উত্তর দিয়ে, এবার আমি আমার সুশীল পাঠকবর্গের কাছ থেকে শেষ বারের মতো বিদায় গ্রহণ করে, আমার রেডরিফের ছোট বাগানে নিজের চিন্তারাশি উপভোগ করতে ফিরে যাই।

সেখানে ফিরে গিয়ে হুইন্‌ম্‌দের কাছ থেকে সংজীবন সম্পর্কে যে সব উৎকৃষ্ট পাঠ নিয়েছিলাম, সেগুলি প্রয়োগ করব; আমার নিজের পরিবারের ইয়াহুদেব তাদের সাধ্যানুসারে শিক্ষা দেব; আয়নায় ক্রমাগত নিজের চেহারা দেখে দেখে, সময়কালে সম্ভব হলে মানুষের দিকে তাকানো অভ্যাস করব আমাদের দেশের হুইন্‌ম্‌দের দুরবস্থার জন্য আক্ষেপ করব, কিন্তু আমাব মহানুভব প্রভু, তাঁর পরিবার পরিজন ও সমগ্র হুইন্‌ম্ জাতির কথা মনে করে ব্যক্তিগতভাবে এদেশের ঘোড়াদেরও শ্রদ্ধা দেখাব, কারণ চেহারায় এরা হুইন্‌ম্‌দেব সঙ্গে হুবহু সাদৃশ্যের সম্মান পেয়েছে, যদিও বুদ্ধিসুদ্ধির অবনতি ঘটেছে।

গত সপ্তাহ থেকে খাবার সময় লম্বা টেবিলের অন্য মাথায় আমার স্ত্রীকে বসতে দিচ্ছি; যে দুচারটি প্রশ্ন করছি তাকে, সংক্ষেপে তার উত্তর দিতেও দিচ্ছি। তবু ইয়াহুদের গায়ের গন্ধ এখনো বড় বিশ্রী লাগে, তাই সর্বদা নাকে রু কিম্বা ল্যাভেণ্ডারের সুগন্ধি পাতা কিম্বা তামাকপাতা গুঁজে রাখি এবং যদিও বেশি বয়সে অভ্যাস বদলানো বড় শক্ত, তবু সময়কালে ইয়াহুদের নখ দাঁতের ভয়টা দূর হলে পব, পাড়ার কাউকে কাউকে কাছে আসতে দেব এরকম আশা যে একেবারে নেই তাও নয়।

যে সব দোষ দুর্বলতা প্রকৃতিদত্ত, ইয়াহু জাতটা যদি তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকত, তাহলে ওদের সঙ্গে আমার বনিবনা হওয়াটা খুব কঠিন হত না। একজন উকীল, কিম্বা পকেটমার, কি কর্নেল, কিম্বা একটা আহাম্মুক বা বড়লোক বা জুয়াড়ী বা রাজনীতিজ্ঞ কিম্বা পাপব্যবসায়ী বা বদ্যি কিম্বা মিথ্যা সাক্ষী বা যারা ঘুষ দিয়ে লোক ভাঙ্গায়, বা এটর্নি কিম্বা বিশ্বাসঘাতক ইত্যাদি দেখে আমার সেরকম রাগ হয় না। এদেব ব্যাপার তো সচরাচর

াটেই থাকে। কিন্তু যখনই দেখি নানারকম শারীরিক ও মানসিক রোগগ্রস্ত বিকৃত একটা মাংসপিণ্ডের অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ছে না, তখন আমার ধৈর্য আর বাধ মানে না। এরকম একটা কদাকার জীবের যে কি করে এতটা অহঙ্কার থাকতে পারে তাই আমি ভেবে পাই না।

বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন জীবরা যত রকম সদ্‌গুণ দিয়ে ভূষিত হতে পারে, বুদ্ধিমান ও ধর্মপ্রাণ হুইন্‌ম্‌দের মধ্যে সে সমস্তই প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান, কিন্তু তাদের ভাষায় অহঙ্কার কথাটির কোনো প্রতিশব্দ নেই; বাস্তবিক ইয়াহুদের জঘন্য স্বভাবের বর্ণনা দেবার জন্যে যে শব্দগুলি ওরা ব্যবহার করে থাকে, সেগুলি ছাড়া ওদের ভাষার কোনো মন্দ ভাব বোঝাবার যোগ্য শব্দই নেই। .মন কি ইয়াহু চরিত্রের মধ্যেও এই রিপুটিকে হুইন্‌ম্‌রা চিনতে পারেনি, কারণ যেসব দেশে ইয়াহুদের প্রাধান্য সেখানে মানবচরিত্রের কি ভাবে বিকাশ হয়, সে বিষয়ে এদের যথেষ্ট জ্ঞানই নেই। কিন্তু আমি ওদের চেয়ে এ বিষয়ে বেশি অভিজ্ঞ বলে, জংলি ইয়াহুদের মধ্যেও অহঙ্কারের সূচনা লক্ষ্য করেছি।

কারো যদি একটা হাত পা কম থাকে তার খুবই কষ্ট হয়, কিন্তু তাই বলে হাত পা কম না থাকলে কেউ অহঙ্কার করে বেড়ায় না, আমিও যেমন করি না, ঠিক সেই ভাবে হুইন্‌ম্‌রা সর্বদাই বিচারবুদ্ধির অধীনে থাকেন, তাঁরাও কখনো তাদের সদ্‌গুণ নিয়ে গর্ব করেন না। আমি চাই যে যেমন করেই হক, ইংল্যাণ্ডের ইয়াহুদের সঙ্গ যেন আমার কাছে দুর্বিষহ না হয়, তাই এই বিষয়টি নিয়ে এত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলাম এবং এই কারণেই যাঁদের মধ্যে ঐ রিপুটির লক্ষণ দেখা যায়, তাঁরা যেন খবরদার কখনো আমার চোখের সামনে না আসেন, এই আমার অনুরোধ।

সমাপ্ত